সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ

সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ

সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ

পঞ্চম খণ্ড

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA
22 cm

প্রাইমা পাবলিকেশন্‌স
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক
উপমা সেনগুপ্তা
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর
প্রভাসচন্দ্র অধিকারী
স্বপ্না প্রেস
৩৫/২/১এ, বিডন স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

দাম পঁচিশ টাকা মাত্র

আমার লেখা গল্পের এই সংগ্রহ তাঁদেরই কাছে আমার কৃতজ্ঞতার উৎসর্গ হয়ে রইল, যাঁদের শুভেচ্ছা আমার লেখকতার জীবনে সবচেয়ে বড় সহায় ও সম্বল হয়েছে।

সুবোধ ঘোষ

সূচীপত্র

গরল অমিয় ভেল—১
মনভ্রমরা—১৫
আত্মজা—৪০
রূপো ঠাকরুণের ভিটা—৫৮
মিছার মা—৭৮
নিমের মধু—৯৬
সুনিকেতা—১০৯
মায়ামানিক—১৩৫
রামগিরি—১৪৬
ভাট তিলক রায়—১৫৬
রূপনগর—১৬৯
ব্রততী—১৮০
তৃষিত মরু—১৮৭
কোন কথা না বলি—২১৪
জীবনে তোমার পরিচয়—২২৩
গুহামানব—২৩৭
বহুরূপী—২৫৯
উচলে চাড়নু—২৬৬
কতটুকু ক্ষতি—২৮২
অধীশ্বরী—২৮৯
হঠাৎ গোধূলি—৩০৭
ফল্গু ও ফাল্গুন—৩১৪
সম্পত্তি—৩৩০
গানের চেয়ে বেশী—৩৩৮
নমিতার সেতার—৩৫২
মিথ্যা মা—৩৫৮
বৈরনির্যাতন—৩৬৬
রিতা—৩৭৯
পণরক্ষা—৩৮৫
অমানিশা—৪০০
অনাত্মিক—৪১৬

গরল অমিয় ভেল

মেহেদি গাছের বেড়ার ওপারে চন্দ্রবাবুর বাড়ির একটি জানালা। প্রায় সব সময় একটি মেয়েকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মেয়েটির নাম মালা বিশ্বাস। চন্দ্রবাবুর মেয়ে। শহরের সকলেই একে চেনে।

জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা, মেয়ে হয়ে দুর্নাম কেনার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। মালা বিশ্বাসের চাল চলনে যেন মাত্রা নেই। দুর্নামও তাই এককালে মাত্রা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন লোকনিন্দার সেই অশান্ত গুঞ্জন কিছুটা থিতিয়ে গেছে। চন্দ্রবাবুর বাড়ির মেহেদি গাছের বেড়া, ফটকের ল্যাম্পপোস্ট আর পথের কাছে মাকাল গাছটা—এসবের মতই জানালার কাছে মালার দাঁড়িয়ে থাকাটাও এখন একটা নিছক নিসর্গ শোভা মাত্র।

মালা তাকিয়ে দেখে সবাইকে। ফেরীওয়ালারা যায়, পুলিশ লাইনের সেপাইরা যায়। কেউ তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয় না। বেলা সাড়ে দশটায় পথ ভর্তি করে স্কুলের ছাত্র আর কাছারীর বাবুরা যায়। হাটের দিনে পথে ভীড় হয় আরও বেশী। দুপুরের রোদে পথের ধুলো ক্ষেপে আঁধি ওঠে, কখনও বৃষ্টি নামে। মালা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে জানালার ধারে। কখনও বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছেলের দল জটলা করে। মালা তবু সরে যায় না। এ এক সমস্যার কথা—একি শুধু দেখার নেশা? অথবা দেখা দেওয়ার নেশা?

ঘরের বাইরেও মালা বিশ্বাসকে দেখা যায়। কখনও বেড়াতে বার হয়, কখনও বা অকারণেই ঘুরে আসে। তাই সে প্রায় সকলেরই চেনা। সকলেই চেনে মালা বিশ্বাসের মুখের বসন্তের দাগগুলি, কালো মোটা চেহারা, চোখে অদ্ভুত রকমের চশমা, হাতে ছাতা, সঙ্গে চাকর রামজীবন। তার শাড়ি, রঙ-এর বৈচিত্র্যে আর পরবার কায়দায় হাঁ করে তাকিয়ে দেখার মতো। পথে যেতে হঠাৎ মালা একবার থামে গ্রামোফোনের দোকানের সামনে। রামজীবন গিয়ে কয়েকটা রেকর্ডের দাম জিজ্ঞাসা করে আসে। কখনও থামে গুরুদাসের ঘড়ির দোকানের কাছে—রামজীবন অনুসন্ধান করে হাতঘড়ির ভাল ব্যাণ্ড আছে কিনা।

আড়ালে থাকতে মালা বোধহয় হাঁপিয়ে ওঠে। শুধু ভীড় খোঁজে যদিও ভীড়ের মধ্যে ঠিক মিশতে পারে না। বারোয়ারীতলায় যাত্রাগানের আসরে বর্ষীয়সী মহিলারা বসেন চিকের আড়ালে। ছোট মেয়েরা বসে চিকের বাইরে

দু' সারি বেঞ্চে। মালা বসে চিকের বাইরেই ভিন্ন একটা চেয়ারে, একটু এগিয়ে —সবা হতে দূরে।

মেয়ে স্কুলের বার্ষিক উৎসবে মালা বিশ্বাসও এসেছিল। সকলে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে দেখেছিল, তার গলায় প্রকাণ্ড সাঁওতালী হাসুলীটা। আশপাশ থেকে নানারকম ঠাট্টা ভরা টিপ্পনি টিক্‌টিক্ করে উঠলো। কিন্তু ওসব মন্তব্য মালার কানেই আসে না।

ভাদ্রের ঠিক মাঝামাঝি এসে আকাশ ভরা বর্ষার ঘটা একেবারে থেমে গেল। রাণী ঝিলের মাঠের ঘাসে, কালো পাথরেব টিলাতে, টেলিগ্রাফের তারে দূরের নিম বনের চূড়ায় প্রথম শরতের আলো চিক্‌চিক্ করে উঠলো ছোট ছেলের হাসির মতো।

ঝাপ্‌সা হয়ে ছিল সাবা শহরের প্রাণ, আড়াই মাস ধরে। আজ আবার আলোয় চমকে উঠেছে রঙীন আয়নার মতো। শিকল দেওয়া প্রাণগুলি ছাড়া পেল ঘরে ঘরে। নিঝুম শহবটা সাড়া দিল আবার।

রাণী ঝিলের মাঠে বেড়িয়ে ফেরার মরসুম এল। একটা দেওদারের নীচে দেখা যায় হরিজন স্কুলের ছেলেরা ড্রিল করছে। আয়ার দল ঘুরছে পেরাম্বুলেটার টেনে। শরৎবাবু ও কান্তিবাবু, বিহার-জুডিসিয়ারির দু'টি রিটায়ার্ড মানুষ, লাঠি হাতে একসঙ্গে পা ফেলে চলেছেন বাঁধের লাল কাঁকরের সড়ক ধরে।

রাণী ঝিলের নতুন বাতাস আজ ডাক দিয়েছে সবাইকে। হাসপাতাল রোড ধরে সপরিবারে ভদ্রলোকেরা বেড়াতে আসছেন। গল্‌ফের লাঠি হাতে মুখে পাইপ কামড়ে আসছে সামুয়েল সাহেব। মালা বিশ্বাস বেড়াতে এসেছে, খোঁপায় জড়ানো প্রকাণ্ড একটা রঙীন রুমাল উড়ছে বাতাসে। প্রচারক চৌধুরী মশায় ঝিলের জলের ধারে একটা খবরের কাগজ পেতেছেন, উপাসনায় বসবার জন্য।

সকলে একবার থমকে দাঁড়াচ্ছিল সেখানে, ছোট একটা কালো পাথরের টিলা, তার গা ঘেঁসে একটা করবী গাছ। এই পাথরটা ক্রস রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে। কোন দিন এব দিকে তাকিয়ে দেখার মতো কিছু ছিল না। গরু চড়াতে এসে রাখালেরা কোন দুপুরে মাঝে মাঝে এখানে ভাত খেতে বসে।

সকলেই একবার থমকে দাঁড়াচ্ছিল সেখানে। জায়গাটা পার হতে অন্তত দু'তিন মিনিট সময় লাগছিল সবারই। পাথরটার ওপর বড় বড় হরফে সাদা খড়ি দিয়ে গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে নানা ছন্দে কিসব লেখা। পথচারী সকলেই, কেউ

একা কেউ সদলে চোখ ভরা দুরন্ত আগ্রহ দিয়ে পড়ছিল লেখাগুলি। প্রথম শরতের সকালবেলা এই পথে পড়ে-থাকা পাথরটার গায়ে কে ছড়িয়ে গেল এমন এক মুঠো রোমান্স!

বেশীক্ষণ কেউ দাঁড়াচ্ছিল না সেখানে। তা সম্ভবও ছিল না। পড়ে নাও আর সরে পড়। লেখাগুলি ভয়ানক রকমের অশ্লীল।

শুধু তাই হ'লে ভাল ছিল। দেখা যাচ্ছে, কথাগুলি সবই একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে লেখা। শুধু নাম থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কাদের বাড়ির মেয়ে। এই নিদারুণ পরিচয়-লিপির অনেককিছু বাদ দিলে সংক্ষেপে তাকে এইটুকু শুধু চেনা যায় ;

—পূর্ণিমা বসু। রূপে আর নামে এমন মিল আর দেখা যায় না। তুমি নাকি গয়না ভালবাস না? লজ্জাই তোমার ভূষণ, খুব সত্যি কথা। ছ'মাস চেষ্টা করে একটি বার শুধু তোমায় চোখে দেখতে পেয়েছি। জানি তোমার চিঠি আসে ভিয়েনা থেকে। তিনি ভাল আছেন তো? আর এক যক্ষ যে সিমলা পাহাড়ে হাঁ ক'রে বসে আছেন। ক'দিক সামলাবে? যাচ্ছ কবে? যখন তখন ওভাবে হাই তুলতে নেই, বড় বিশ্রী দেখায়।

কে লিখেছে কে জানে! এই অজানা অশ্লীল কুৎসাবিশারদের লেখাগুলি মৌচাকে ঢিলের মতো শহরের বুকে এসে লাগলো। তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেক ঘরে ও বৈঠকে, নিভৃতে ও নেপথ্যে গুন্ গুন্ করে উঠলো শুধু এই প্রসঙ্গ—কালো পাথরের লেখা।

শুধু এই প্রশ্ন,—কে লিখলো?—কে পূর্ণিমা বসু?—কথাগুলি কি সত্যি? মনে মনে, মুখে মুখে, আলাপে আলোচনায়, সন্দেহে ও সন্ধানে এক প্রচণ্ড কৌতূহল যেন পরোয়ানা হয়ে ছুটলো চারদিকে। এই প্রশ্নের উত্তর চাই।

প্রথম কৌতূহলের বিকার একটু শান্ত হয়ে এল। পূর্ণিমা বসুর পরিচয় পাওয়া গেছে। দু'বছর হলো পুরনো গির্জার দক্ষিণে যে নতুন বাড়িটা তৈরী হয়েছে, সেই বাড়ির মালিকের নাম মহীতোষবাবু। মহীতোষবাবুর মেয়ে পূর্ণিমা। ক'জনই বা এদের চেনে! লতা-মোড়া উঁচু প্রাচীর দিয়েই ঘেরা থাকে এঁদের বড়মানুষী বনিয়াদ। এঁরা অগোচর। তার মধ্যে পূর্ণিমা বসুকে একরকম অলীক বললেই হয়। কিন্তু সেও আজ সব জানা-অজানার ব্যবধান ঘুচিয়ে নতুন এক আবিষ্কারের মতো সবার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

নিশ্চয় নতুন কেউ একজন এসেছে এ শহরে। যেই হোক, পূর্ণিমা বসুর ওপর তার এত আক্রোশ কেন? একি কোন বিগত অপমানের প্রতিশোধ? তবুও

এটা বড় কাপুরুষের মতো কাজ হয়েছে। অত্যন্ত গর্হিত।

অনেকে এই ভেবে লজ্জিত হচ্ছে, পূর্ণিমার বাড়ির লোকেরা কি মনে করলো। কেন তাদের ওপর এই অহেতুক কুৎসার আঘাত? সত্য হোক মিথ্যা হোক, এই আঘাত কারও গায়ে না বেজে পারে না।

মহীতোষবাবুর বাড়ির সবাই বিকেলের দিকে একবার বেড়াতেবার হতেন। সমস্ত দিনের মধ্যে প্রাচীরের বাইরের পৃথিবীতে একটিবার ঘোরাফেরার এই শ্রদ্ধাটুকুও তাঁদের হারাতে হলো। তাঁদের কাউকে আজ আর কোথাও দেখা গেল না।

কিন্তু পূর্ণিমা কি ভাবলো? এতক্ষণে সেও নিশ্চয় সব খবর শুনেছে। হয়তো ঘরে খিল দিয়ে কাঁদছে, হয়তো আজ সারাদিন খায়নি। ভাবতে গেলে কত কি মনে হয়, কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না, এই উপদ্রবে পূর্ণিমার মনের শান্তি কতটা নষ্ট হলো। এও হতে পারে, সে কিছুই গ্রাহ্য করছে না, তার রীতিমত মনের জোর আছে। ক্ষুব্ধ হয়েছেন চৌধুরী মশায়।

ঠিক বেলা বারটার সময় কাছাবি রোড দিয়ে যেতে চোখে পড়ে, সমাজ-বাড়ির সামনে কুঁয়োতলায় প্রচারক চৌধুরী মহাশয় স্নান করছেন। মাথা ভরা টাক আর চিবুক ভরা পাকা দাঁড়ি, ফর্সা রোগা চেহারা। এক এক সময় দেখা যায় স্নান সেরে আদুড় গায়ে কুঁয়োতলার শানে বসে সাবান দিয়ে খদ্দরের ধুতি কাচছেন। দু'খানার বেশী তাঁর ধুতি নেই। সমাজবাড়ির কোণের ঘরটাতে তাঁর আস্তানা। দারা সুত পরিবার অর্থাৎ সংসার বলতে কোন বালাই তার নেই। দুপুরের রোদে সেই লোলপেশী বুড়ো মানুষের সাদা শরীরটা বড় অদ্ভুত দেখায়।

তিনি সত্যবাদী ও নির্ভীক। এই কারণেই সরকারী চাকরী গ্রহণ করতে পারেন নি। যেখানে দুর্নীতি, সেখানে তিনি ক্রূর ও কঠোর। বহু বহুবার তিনি ছেলেদের সখের থিয়েটারের আয়োজন পণ্ড করেছেন। তিনি একবার মিউসি-প্যালিটির কমিশনার হয়েই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর প্রস্তাব ছিল বিড়ির দোকানগুলিকে উচ্ছেদ করা, যাতে ধূমপানের পাপ যথেচ্ছা ধুঁইয়ে না ওঠে। সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি।

অন্য দিকে যতই নিরীহ ও নমনীয় মানুষ হোন্ না কেন, নীতিগত কোন অন্যায়ের ব্যাপারে তিনি নিজের কর্তব্য ভুলতে পারেন না। সেখানে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখার মতো প্রতাপ কারও নেই। লোকে জানুক্ আর না জানুক্, প্রচারক চৌধুরী মশায় জানেন, তিনিই স্বয়ং এ-শহরের ভদ্র সমাজের নীতি রুচি ও শালীনতার অভিভাবক স্বরূপ। একবার হোলির দিনে মেথরদের মদ খাওয়া

বন্ধ করে সকলকে গেলাস ভর্তি দুধ খাইয়েছিলেন চৌধুরী মশায়। এরকম অঘটনও এ' শহরের ইতিহাসে ঘটে গেছে।

তাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন চৌধুরী মশায়, তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন পাপের এই দুঃসাহসিক রূপ দেখে। রাগে ও ঘৃণায় চৌধুরী মশায় ধৈর্য হারালেন। স্বয়ং থানায় এসে ডায়েরি করিয়ে গেলেন, কে বা কারা শহরের বুকের ওপর বসে এই অপকীর্তি করলো? অবিলম্বে তাকে যেন ধরে ফেলা হয়। এমন কঠোর শাস্তি তাকে দেওয়া হোক্ যাতে এক যুগ ধরে যত দুষ্ট ও দুর্বৃত্তের বুক কাঁপতে থাকবে। নইলে বুঝতে হবে দেশে সুশাসনের শেষ হয়েছে, গভর্নমেণ্ট নেই।

পুলিশের ইনস্পেক্টর প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি এই ঘড়িয়াল বদমায়েসকে সাত দিনের মধ্যে ধরে ফেলবেন, সে যতই গভীর জলে থাক্ না কেন।

মালা বিশ্বাস অবশ্যই দেখেছে পাথরের লেখাগুলি। বোধহয় একমাত্র সেই লেখাগুলি ভাল করে পড়েছে, পরম নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে। মালা চিনেছে পূর্ণিমাকে, লোকমুখে শুনে নয়, সে আগেই তাকে জানতো। গির্জায় সড়কে বেড়াতে গিয়ে কতদিন সকালবেলা মালা তাকে দেখেছে, দোতালা ঘরের জানালার কাছে বই হাতে বসে আছে পূর্ণিমা। চোখাচোখি হতেই পূর্ণিমা সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিত। বোঝা যেত, এই জানালা বন্ধ করা একটা সশব্দপ্রতিবাদ মাত্র। কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে বা কার বিরুদ্ধে তা ঠিক আন্দাজ করা যায় না। হতে পারে —সেটা মালার গায়ে জড়ানো ঐ সবুজ রঙের রেশমী নেট, বড বেশী ঝক্‌ঝক্ করে।

আজ সারাক্ষণ হেসেছে মালা। রূপসী পূর্ণিমা বসুর সকল অহঙ্কার কালো পাথরের নোংরামির আঘাতে কী ভয়ানক জব্দ হয়ে গেছে।

সমস্ত শহরের শাসন ও সতর্কতাকে বিদ্রূপ করে ক্রসরোডের পাথরটা পনের দিনের মধ্যে আর একবার খেউড় গিয়ে উঠলো।—"সুমিতা নন্দী, প্রতিজ্ঞা করেছ মনের মতো মানুষ না পেলে গলায় মালা দেবে না। তবে তোমার এলবাম ভরা ওসব কাদের ছবি? কিছু বেছে উঠতে পারলে? এ অভ্যেস ভালো নয়। এটা দ্বাপর যুগ নয়। বয়স তো সাত বছর ধরে সেই তেইশে ঠেকে রয়েছে। তবে তোমার মেক-আপের পায়ে গড় করি। এত শিথিলতাকে কি কৌশলে এত উদ্ধত করে রেখেছ। নাঃ, তুমি সত্যই সুতনুকা, তুমি অমর্ত্য বধূ। ও ছাই মানুষের ছবির এলবামে কি হবে? তোমার বিয়ে না করাই ভাল।"

ব্যাপারটা আগাগোড়া বিস্ময়কর বলেই মনে হচ্ছে। সেই লিখুক না কেন, সে দুঃসাহসী সন্দেহ নেই। সুচতুর তো নিশ্চয়ই। প্রতি দুশ্চিন্ত মনের মেঘে

মেঘে, সন্দেহের পরতে পরতে, এক একবার তার রূপ আবছায়ার মতো গোচরে আসে যেন। কল্পনার নেপথ্যে এই অদ্ভুতকর্মা কাজ করে চলেছে। নেহাৎ বাজে ফক্কর গোছের কেউ নয়। লেখাপড়া খুব ভালই জানে। বয়স বিশ-পঁচিশের বেশী বোধহয় হবে না। বোধহয় কোন হতাশ প্রেমিক।

সেবক সমিতির অফিসে সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে সেক্রেটারী ননীবাবু চিন্তিতভাবে বসেছিলেন। আজ জেনারেল মিটিং আহ্বান করা হয়েছে। সভ্যেরা সব এল একে একে। এরা সবাই ছাত্র—সতু, প্রিয়তোষ, লোকনাথ…।

ননীবাবু জানালেন—এটা আমাদের সবারই অপমান। কোন্ এক বদমাস দিনের পর দিন এইসব কুকর্ম করে চলেছে, আজও ধরা পড়লো না। সে যে শীগগির বন্ধ করবে, তারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কখন কার নামে লেখা উঠবে এই ভয়েই সবাই শঙ্কিত। বাস্তবিক…।

ননীবাবু দুঃখের হাসি হাসলেন।

—যেই হোক্ এটা বুঝতে পারছি, বাইবের লোক কেউ নয়। নিশ্চয় আমরা সবাই তাকে চিনি, তবে ভোল দেখে হয়তো বুঝতে পারছি না।

ননীবাবুর কথায় সংশয়ের কুয়াশা ঠেলে তার মূর্তিটা যেন ছায়াব মতো দেখা যায়।

—এ ধরনের লোককে সহজে চেনা মুস্কিল। যাকে কোন মতেই সন্দেহ হচ্ছে না, এ কাজ হয়তো তারই।

স্বয়ং ননীবাবুই শেষ পর্যন্ত আশ্বাস দিয়ে বলেন,—তাকে না ধরতে পারলে কোন সুরাহা হবে না। হাতে হাতে ধরে ফেলা চাই।

চৌধুরী মশাই রণে হার মানেন নি। অনেকদিন পরে সংগ্রাম করার মতো এক পাপের চ্যালেঞ্জকে পাওয়া গেছে। আবাব একদিন থানায় এসে পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে একপ্রকার বচসা করে গেলেন। চৌধুরী মশাই বিশ্বাস করেন না, পুলিশ আন্তরিকভাবে তার কর্তব্য করছে, নইলে অপরাধী নিশ্চয় এতদিন ধরা পড়তো। তিনি প্রস্তাব করলেন—পাথরটার কাছে দিবারাত্র পাহারা দেবার জন্য এক বন্দুকধারী সান্ত্রী মোতায়েন করা হোক্।

ইনসপেকটর হেসে হেসে বললেন—কি যে বলেন চৌধুরী মশাই, পুলিশের আর কাজ নেই? একটা মামুলী ব্যাপারে কামান-বন্দুক নিয়ে টানাটানি করতে হবে?

চৌধুরী মশাই উত্তেজিত হলেন—মামুলী ব্যাপার! কথাটা প্রত্যাহার করুন।

ইনসপেকটর—আপনি বৃথা রাগ করছেন। চুরি রাহাজানি খুন ডাকাতির

খবর দিন, এক সপ্তাহে আসামীকে বেঁধে আনছি। কিন্তু এসব ভুতুড়ে গোছের ব্যাপার, এটা কি একটা তদন্ত করার মতো কেস চৌধুরী মশায় ?

চৌধুরী মশাই—তাহলে প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ নিয়োগ করুন।

ইন্সপেক্টর—মাপ করবেন, আপনি আমার শ্রদ্ধেয়। তবু আপনার প্রস্তাব গ্রাহ্য করতে আমরা অসমর্থ, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা অবশ্য করবো।

চৌধুরী মশাই—তাহ'লে আমাকেও বাধ্য হয়েই গভর্নরকে টেলিগ্রাম করে কম্‌প্লেন জানাতে হয়।

চৌধুরী মশাই উঠে চলে গেলেন।

ইনসপেক্টর ভয় পেল কিনা বোঝা গেল না। চৌধুরী মশাইয়ের মতো প্রবীণ শ্রদ্ধাভাজন লোককে রাগানো উচিত নয়। যে কারণেই হোক্ সকাল থেকে সন্ধ্যে পযন্ত একজন কনষ্টেবল লাঠি হাতে পাথরটাকে পাহারা দিল। সকাল বেলা ছিল সামান্য একটু পুরনো লেখার অবশেষ। সুমিতা নন্দীর কলঙ্কগুলি প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু এই সজাগ সর্তক পাহারার এক ফাঁকেই বিকেলের মধ্যে ঝলসে উঠলো একটা নতুন লেখা। সারা গোধূলিবেলা পাথরটা যেন ঠাট্টার সুরে হাসতো লাগলো।—"সুধা দত্ত, অনেক মেয়ের গলায় সুর শুনেছি, তবে তোমার মতো এত মিষ্টি কারও নয়। সত্যিই গলাটি তোমার সুধায় ভরা, ছোট্ট গল্পগুটাই তার প্রমাণ। হাই-কলার ব্লাউজে আর ঢাকা পড়ছে না। কেন যে এত ইংরেজী বুলি বলছো, বুঝি না। প্রফেসর ভদ্রলোকের স্ত্রী আছে যে, ও পথ ছেড়ে দাও।"

কনেস্টবলের চাকরী যাবার উপক্রম হলো! সে কসম খেয়ে জানালো, এক মুহূর্তের জন্য সে ডিউটিতে ফাঁকি দেয়নি। একটা পিঁপড়ের দিকেও ভুল করে তাকায়নি।

আশ্চর্য এই কালোপাথরের অশরীরী শিল্পী।

সন্দেহের ঝড় উঠছে। অলক্ষ্যে যদি গরুর হাড় বা মড়ার মাথা কেউ ফেলে দিয়ে যেত, তবে না হয় বলা যেত ভূতের কাণ্ড। কিন্তু এটা নিছক প্রাকৃতিক আর চারিত্রিক ব্যাপার। একজন কেউ আছে পেছনে। সাবাস তার বাহাদুরী। তিন মাস ধরে শহর সুদ্ধ লোককে আঙুলের ডগায় নাচাচ্ছে। এক এক সময় বেশ ভেবেচিন্তে সন্দেহ করতে হয়। যার-তার ওপর এই কৃতিত্ব আরোপ করা যায় না। যেই হোক সে কবি ও প্রেমিক, সে দুঃসাহসী ও চতুর। এতগুলি তরুণী হিয়ার গোপন কথা যে জানতে পেরেছে, সে গুণী ও যাদুকর। সব সময় তাকে অশ্লীল বলতে বাধে, সে বড় রসিয়ে লেখে।

কিন্তু একবার যদি এই অধরা যাদুকর ধরা পড়ে। চৌধুরী মশায়, পুলিশ, সেবক সমিতি আর নিন্দিতাদের বাপ-ভাইয়েরা ওর হাড়মাস কুচিকুচি করে ছড়িয়ে দেবে রাণীঝিলের মাঠে। সন্দেহ হয় অনেককে। কার্নিভালের বাঙালী ম্যানেজারটা ঠিক তিন মাস ধরে শহরে বসে আছে। কেন? ঘড়ির দোকানে নতুন ম্যাট্রিক-পাশ ছেলেগুলি বড় বেশী গুলতানি করে আজকাল। কেন? নন্দ মিস্তিরি উপন্যাস পড়ছে। হাতুড়ি ছেড়ে হঠাৎ এ সখের ব্যামো আবার কেন? প্রশান্ত পানের দোকান করে, এমন কি লাভ হয়? তবু সপ্তাহে তিনখানা রেকর্ড কেনে। হঠাৎ এত সুরেলা হয়ে উঠলো কেন সে? তবু ভরসা, প্রশান্ত নাকি লেখাপড়া জানে না। কিন্তু এ ভব মাঝারে কিছুই অসম্ভব নয়। সেবক সমিতি সন্দেহ করে পুলিশকে, পুলিশ সন্দেহ করে খদ্দরধারী মতিলালকে। মতিলাল চেষ্টা করছে, কাকে সন্দেহ করা যায়। এই সন্দেহের মাৎস্যন্যায়ে কারও অস্তিত্ব বুঝি আর ঠিক থাকে না।

কিন্তু ক্রসরোডের পাথর কি হঠাৎ বোবা হয়ে গেল? এক মাস পার হয়ে গেছে, কোন নতুন রহস্যের দাগ পড়ছে না আর। তাহলে চলে কি করে? শহরের প্রাণের তার যে বাঁধা পড়েছে কালো পাথরের সুরে। দিবস রজনী ঐ কালো পাথরে ফুটে উঠবে নব নব শ্বেতলিপিকার ফুল। জ্যোৎস্না রোদ কুয়াশা শিশির—তারই ছোঁয়ায় প্রতি প্রভাতে কত প্রেমবৈচিত্ত্যের অর্ঘ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ক্রসরোডের পাষাণবেদিকা। ক'মাসের মধ্যে কত অজানা কথা বলে দিল পাথরটা। এই লেখাগুলির মধ্যেই শহরের ঘুমন্ত মহিমা সাড়া দিয়ে উঠেছে।

সিনেমায় দর্শকদের ভীড় কমে গেছে। সকাল বিকেল রাণীঝিলের মাঠে লোকের সমারোহ। গত বছরেও শরৎ এসেছিল এমনি আকাশভরা নীল নিয়ে। কিন্তু রাণীঝিলের মাঠ আর ক্রসরোডের ধূলো এত চঞ্চল হয়ে ওঠেনি জনপদধ্বনির উচ্ছ্বাসে। ঘরে ঘরে চিত্তে চিত্তে দোলা লাগে। ক্রসরোডের পাথর তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এবার কার পালা কে জানে! মনে হয়, এই ক্ষমাহীন পাথরের আমোঘ অনুশাসন একে একে সকল গোপনচারিণীর কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দেবে।

শত শত মূক মুখের প্রার্থনা পাথরের কাছে পৌছল যেন। বহু জিজ্ঞাসার আবেদনে ক্রসরোডের পাথরে অনুগ্রহের স্বাক্ষর আবার জল্ জল্ করে ফুটে উঠলো।

—প্রীতি মুখার্জি, তুমি অপরূপ না হলেও অদ্ভুত। পরের কোলের ছেলে নিয়ে এত টানাটানি কেন? সবই বুঝি সখি। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে,

এবার সামলে থেক। গিরিডিকে ভুলে যাও।

যেই যাক্ ক্রসরোড দিয়ে, সকলকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হবেই লেখাগুলিকে, যতদিন না কেউ সাহস করে মিটিয়ে দেয়। ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ বিরুদ্ধ মুখে যে যাই বলুক, এই কুৎসাদৃপ্ত পাথরের কাছে যেন ঝুঁকে পড়ে সকলেই, অভিবাদনের আবেশে।

শরৎবাবু যান, কান্তিবাবু আসেন। ক্রসরোডে মুখোমুখি দুজনের সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই এই কুপথে চলার গ্লানিটুকু বার্তালাপের মধ্যে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেন।

কান্তিবাবু—এযে অসহ হয়ে উঠলো মশাই। কুৎসিত লেখাগুলি কি বন্ধ হবে না?

শরৎবাবু—আর বলেন কেন, বড়ই ঘৃন্য ব্যাপার!

দুই সজ্জনের আলাপ হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলতো, আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতো কিন্তু তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন চৌধুরী মশাই—সাদা ভুরু ও দাড়ির মাঝখানে শানিত নাক আর কঠোর দৃষ্টি। ওভাবে চলে যাওয়া—বড় অস্বাভাবিক মনে হয়। শরৎবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

কান্তিবাবু—চৌধুরী মশাই ওভাবে তাকালেন কেন বলুন তো?

শরৎবাবু সশব্দে হেসে বলেন—কে জানে, উনি হয়তো মনে করছেন আমরা দুজনেই লেখাগুলি লিখেছি।

কান্তিবাবু—বলা যায় না, এ সন্দেহ তাঁর হতে পারে, যে রকম নীতিবাতিক লোক।

এতক্ষণে তারা কি ভাবছে! কালো পাথরের লেখাগুলি যাদের সুনামকে কালো করেছে, সেই অপমান শয্যা থেকে তারা কি এতদিনে সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে? কিন্তু যতই কৌতূহল হোক্ না কেন, এ সংবাদ জানবার উপায় নেই। প্রথমে ভয় হয়েছিল, নিন্দিতাদের মধ্যে দু'একজন অতি-অভিমানিনী আত্মহত্যা করে না বসে। খুব বেশী ভয় হয়েছিল সুধা দত্তের কথা ভেবে।

সত্য মিথ্যা যাচাই হয় না, তবু রীতিমত মনোবেদনা পায় অনেকে। মানুষ আজ খারাপ থাকে, কাল ভাল হয়ে যায়। কিন্তু লোকসমাজে কারও দোষত্রুটিকে ঢোল পিটিয়ে রটিয়ে দিলে কোন লাভ হয় না, বরং তাতে অনেকে উল্টো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যদি সত্যও হয়, তবুও এতগুলো ভদ্রবাড়ির মেয়ের চরিত্র নিয়ে মাঝ ময়দানে লেখালেখি করা খুবই অন্যায়।

শুধু সন্দেহ নয়, বিচিত্র রকমের গুজব উড়ছে চারদিকে। পূর্ণিমারা নাকি

চিরকালের মতো চলে যাচ্ছে এ শহর ছেড়ে। সুমিত্রা নন্দী বোধহয় বিষ খাবার চেষ্টা করেছিল। প্রীতি মুখার্জীর দাদা খুব সম্ভবত গুণ্ডা লাগিয়েছে—যে এসব লেখা লিখছে, তাকে খুন করা হবে। সুমিতার জোর করে বিয়ে দেওয়া হবে এই মাসেই। গুজব উড়ছে—বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাস করার উপায় নেই। এত গুলি বাড়ির হাঁড়ির খবর কে আর স্বচক্ষে দেখে এসে অধিক বলতে পারে? হ্যাঁ, সে কাজ একমাত্র পারে এবং যদি দয়া করে—সে হলো কালো পাথরের কবি।

মালা বিশ্বাস তাদের দেখলো একদিন, টাউন সিনেমার ওপরের গ্যালারিতে। প্রথম সারিতে বসে আছে—পূর্ণিমা, সুমিতা, সুধা ও প্রীতি। গুণে গুণে তারা ঠিক চারজন। পাশে ও পেছনের সারিতে আরও অনেক মেয়ে বসে আছে। মালা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আছে একেবারে শেষ প্রান্তে—ঝক্‌ঝকে একটা আলোর ঝাড়ের নীচে।

মালা ভাল করে আর একবার দেখলো। হ্যাঁ, ঠিক ওরাই চারজন। কিন্তু কবে ওরা এত ঘনিষ্ঠ হলো? আগে তো ওরা কেউ কাউকে ভাল করে চিনতোও না। আশ্চর্য, আজ ওরা এক হয়ে গেছে।

পেছনের সারিতে সেনপাড়ার মেয়েদের মধ্যে বসে আছে মুক্তি রায়, মালারই স্কুলজীবনের বন্ধু। ওরা সকলেই ব্যস্ত, সবাই উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখছে সামনের সারির চারজনকে। মুক্তি রায় এক-এক করে চিনিয়ে দিচ্ছিল সকলকে—কে পূর্ণিমা, কে সুমিতা, কে সুধা···।

পূর্ণিমারাও চুপ করে ছিল না। ওদের আলাপ গল্পের উদ্বেল কলরব সমস্ত গ্যালারিকে চুপ করিয়ে রেখেছিল। সকলেই আস্তে কথা বলে, শুধু পূর্ণিমারা ছাড়া। ওদের হাসি থামতে চায় না। একজনে বাদাম কেনে, চারজনে ভাগ করে খায়। ওরা তাকায় না কারও দিকে। সমস্ত গ্যালারিব জনতা যেন প্রকাণ্ড একটা ছায়া মাত্র, শুধু ওরাই সজীব।

মালা একা পড়ে গেছে, তাকে কেউ দেখছে না। জীবনে বোধহয় এই প্রথম সে আড়ালে পড়ে গেল। এত প্রখর বিদ্যুতের বাতিটার নীচে বসে আছে মালা, অস্ট্রিচের পালকের বর্ডার দেওয়া মেরিনো পশমের জামা গায়ে, দু'ইঞ্চি লম্বা সোনার চেনে গাঁথা একজোড়া উদ্ভট প্যাটার্ণের দুল দু'কান থেকে ঝুলে ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে আছে। তবু কোন বিস্মিত বিরক্ত বা ধিক্কার ভরা দৃষ্টি কোন দিক থেকে তার দিকে তেড়ে আসছে না। মালা আজ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

ছবির অভিনয় আরম্ভ হলো। ক্ষান্ত হ'ল গ্যালারির কলরব। আলোগুলি নিভলো। পূর্ণিমাদের সারি থেকে এক-এক টুকরো হাসিভরা কলরব মাঝেমাঝে

বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো উছলে পড়ছিল। কে জানে, কোন সার্থকতায় ভরে উঠেছে ওদের জীবনের এই খুশিয়ালী রাত!

সিনেমার ছবি চোখের সামনে বৃথা ঝলসে পুড়ছিল! মালা ডুবেছিল তার মনের অন্ধকারে। কালো পাথরের সেই ভয়ঙ্কর কুৎসা, মনে পড়লেই আতঙ্ক হয়। মালা জানতো, এই গরবিনীরাই তো মান হারিয়েছে। কিন্তু এ আবার কোন্ ছবি! এ যে নতুন করে মান পাওয়া। ওদের চোখে-মুখে সেই তৃপ্তির উল্লাস।

পেছনের মেয়েদের দৃষ্টি আর-এক তৃষ্ণার ছলনায় ছল ছল। ওরা তাকিয়ে আছে পূর্ণিমার দিকে—এক দুরধিগম্য মহিমালোকের দিকে। ওখানে আসন পেতে হলে ছাড়পত্র চাই, সে বড় কঠিন ঠাঁই।

কালো পাথরের কবি মরে যায়নি।

সেদিন মেয়েদের বাৎসরিক আনন্দমেলার অনুষ্ঠান। রানীঝিলের মাঠে বাঁশের জাফরি আর খেজুর-পাতার ঘেরান দিয়ে সারি সারি স্টল সাজানো হয়েছে। পথে যেতে সবাই দেখলো, বহুদিনের স্তব্ধ পাথরটা আবার মুখর হয়ে উঠেছে।

—মুক্তি রায়, অমন মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো ফুলবাগানের গাছের আড়ালে আর কতদিন থাকবে? আজকাল সব সময় হাতে ওটা কি থাকে? কাব্য-গ্রন্থ? তোমার আসল কাব্য ভাল আছেন মজঃফরপুরে। আমার আর কি লাভ? শুধু যখন হেঁটে চলে যাও, তখন পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। বড় সুন্দর—তোমার চলার ছন্দ। মুখের দিকে তাকাতে ভাল লাগে না। স্নো-পাউডার দিয়ে কি চোখের কালি ঢাকা পড়ে! অসুখটা সারাবার ব্যবস্থা কর।

দলে দলে মেয়েরা এসেছে আনন্দমেলায়। মালা বিশ্বাসও এসেছে। আজ তার বেশভূষার কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দীনতা। একটা সাধারণ মিলের শাড়ি, আঁচলটা আধ হাত ছেঁড়া। দেশী ছিটের একটা আধময়লা ব্লাউজ। পায়ে জুতো নেই, চোখে নেই চশমা।

চন্দ্রার দিদিরা একটা স্টল নিয়েছে। হরেক রকম ফুলের তোড়া আর বুকে বিক্রী হচ্ছে সেখানে এক আনা একটি। স্কটিশ মিশনের মেয়েরা খুব ভীড় করেছে সেখানে, তোড়া কেনার জন্য। মালা সেখানে সামান্য একটু দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে চললো।

মালতীরা একটা স্টল নিয়েছে ঘরে তৈরী নানারকম জ্যাম জেলী আর চাটনী ভরে সাজিয়ে রেখেছে। সেখানে কোন ভীড় নেই, তবু মালতীর অনুরোধে দাঁড়ালো একবার। এক শিশির দাম ছ'আনা পয়সা রেখে দিয়ে মালা বলে গেল,

ফেরবার সময় নিয়ে যাবে।

মালার চোখে পড়েছে একটু দূরেই রাণুদের ম্যাজিকের স্টল। ভীড় সেখানেই সবচেয়ে বেশী। নবীণা প্রবীণা সকলেই সেখানে দলে দলে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। কী এমন আকর্ষণ আছে রাণুদের স্টলে?

আর একটু এগিয়ে যেতেই নজরে এল, হ্যাঁ কারণ আছে। সেখানে বসে আছে পূর্ণিমাদের দল। আজ তাদের মধ্যে একটা নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে, মুক্তি রায়। পূর্ণিমারা সবাই খুসী হয়ে ম্যাজিক দেখাছিল, আর অন্য সবাই দেখাছিল পূর্ণিমাদের।

মালার চলার বেগ শান্ত হয়ে এল। ওদিকে এদিকে যেতে ওর বুকটা যেন দুরু দুরু করছে আজ। কিন্তু যেতেই হবে তাকে। তার ছেঁড়া কাপড়, খালি পা, নোংরা ব্লাউজ। নিশ্চয় তাকিয়ে দেখবে সবাই, পূর্ণিমারাও দেখবে।

হঠাৎ পাশে অনেকগুলি বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে চীৎকার করে ডাকলো মালদি! মালদি!

মালা মুখ ঘুরিয়ে দেখলো অনুপমা ডাকছে তাদের চায়ের স্টলে। সবাই মিলে চীৎকার করে মালাকে চা খেতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

কি ভেবে নিয়ে মালা স্টলের ভেতরে গিয়ে বসলো। পর পর তিন কাপ চা খেল। অনুপমারা খুব খুসী। বয়স্কাদের মধ্যে কেউ তাদের এক কাপ চা খেয়েও অনুগৃহীত করেনি। কত চেনা অচেনা মহিলাদের হাত ধরে ওরা টানাটানি করেছে, কিন্তু কারও হৃদয় গলেনি।

অনুপমা মানুষ জাতির ওপর তাই চটে গেছে। ম্যাজিকের স্টলের দিকে তাকিয়ে চড়া মেজাজে বলে, বুঝলে মালাদি. আমাদের দোকানের সব বিক্রী মাটি করে দিয়েছে রাণুদি। কাঁচা আম জলে ডুবিয়ে দেখাচ্ছে আম নেই। ছাই ম্যাজিক, ওটা তো চিনির তৈরী আম।

মালা—রাণু তোমাদের দোকানের বিক্রী মাটি করেনি।

অনুপমা—তবে কে?

মালা--করেছে···।

উত্তর দিতে গিয়ে মালা হঠাৎ সামলে গেল। অনুপমার মতো এতটুকু একটা মেয়েকে অবাক করে দিয়ে আর লাভ কি?

চায়ের স্টলের সামনে দিয়ে কতজন আসছে যাচ্ছে। মালা আজ জোর করে সকলের চোখের ওপর ভেসে রয়েছে। তবু যেন তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না। একটু দূরেই বসে রয়েছে পূর্ণিমারা। খুবই ইচ্ছে করেছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে।

আজও ভীড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো সবাই তাকিয়ে দেখবে তার এই ছেঁড়া ময়লা সাজ তার নিরাভরণ জীবনের চরম বিনতি। এই তো দেখবার মতো একটা নতুন জিনিস। কিন্তু যদি কেউ না তাকায়, এই আবেদনও যদি ব্যর্থ হয়। মালার সাহস হলো না।

মালা যেন আভাষে দেখতে পাচ্ছে—এই মেলার ভীড় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তিন ভাগে। এখানে একদল আছে, যারা পূর্ণিমাদের মতো অসাধারণ। একদল রয়েছে, রাণু অনুপমা ও এই পাঁচশত নবীনা প্রবীণার মতো সাধারণ। আর আছে মাত্র একজন—মালা বিশ্বাস সাধারণের নীচে। তার এতদিনের আত্মবিজ্ঞাপনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সেবক সমিতির বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে আবার। সেক্রেটারী ননীবাবু বললেন—একটা দুঃখের কথা বলবো আজ।

ননীবাবুর গলার স্বরে বোঝা গেল, অদ্ভুত কিছু-একটা ঘটেছে। সভ্যেরা কৌতূহলী হয়ে ননীবাবুর মুখের দিকে তাকালো। ননীবাবু টেবিলের আলোটার গায়ে বই মেলে দিয়ে তাঁর চিন্তিত মুখের ওপর যেন আরো খানিকটা অন্ধকার মেখে নিলেন।

—তোমাদের গ্যারেন্টি দিতে হবে, একথা আমাদের ক'জন ছাড়া বাইরের কোন জীবের কানে পৌছবে না। সে ধরা পড়ে গেছে কালো পাথরের লেখাগুলি যার কুকীর্তি। এ কাজ করেছে চৌধুরী মশাই।

কথাগুলি যেন মাথায় হাতুড়ি মেরে ভয়ানক একটা ঠাট্টা করে বসলো। প্রিয়তোষের রাগ হলো—আপনি কি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন ?

ননীবাবু—ইয়েস্। যারা দেখেছে স্বচক্ষে, তারাই বলেছে।

প্রিয়তোষ—কে স্বচক্ষে দেখেছে ?

ননীবাবু—তাদের নাম বলতে আমি বাধ্য নই।

ননীবাবুর চোখ দুটো মিট মিট ক'রে এক দুর্বোধ্য প্রদীপের মতো জ্বলতে লাগলো।

সেবক সমিতির দায়িত্ব সমাপ্ত হলো এইখানে। কিন্তু এই উদ্ভট অকল্পেয় তথ্যটা প্রতিজ্ঞা দিয়ে বেঁধে গোপন রাখা সম্ভব হলো না। দু'দিনের মধ্যেই সকলে জানলো, বার লাইব্রেরী থেকে আরম্ভ করে গুরুদাসের ঘড়ির দোকান পর্যন্ত। যে শোনে সেই লজ্জা পায়, আপত্তি তোলে এও কি সম্ভব ?

তবু এই বিশ্বাসের সম্পদ হারাতে কেউ রাজী নয়। হোক না শোনা-কথা। শোনা যাচ্ছে কেউ একজন স্বচক্ষে দেখেছে। তাহলেই হলো।

বিশ্বাস বাড়ির জানালায় সেই অচঞ্চল মূর্তিও আর দেখা যায় না। ক্রসরোডের কালো পাথরের আর লেখা পড়ছে না। শহরের উৎসাহে মন্দা পড়েছে। জমাট গানের মাঝখানে হঠাৎ যেন স্বর ছিঁড়ে গেল।

আজকাল ঘরের ভেতরেই থাকতে ভালবাসে মালা। বাইরের পৃথিবী, সেখানে মানায় পূর্ণিমাদের। ওরা অঘ্রাণের তারা, সন্ধ্যা সকাল ওদেরই শুধু দেখতে হয়।

সার্থক জীবন পূর্ণিমাদের। ওরাই প্রার্থিতা। আড়াল থেকে মুক্ত করে এনে সংসার ওদেরই মুখ দেখতে চায়। ওরা দয়িতা—কামনার লীলাকুরঙ্গী। কুৎসা কলুষও ধন্য হতে চায় ওদেরই আশ্রয়ের প্রসন্নতায়। আর সকল কামনার সীমানার ওপারে, এক বেদনাহীন বিবাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে আছে মালা। সে একা, সে নিঃস্ব।

মালা নিজেকে বন্দী করে ফেলেছে। সব দেখা আর দেখা দেওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে। ওর মধ্যে কোন সত্য নেই। পৃথিবীর চোখের ওপর নিজেকে যে এতদিন অকুণ্ঠভাবে সঁপে দিয়ে এসেছে, সেই মুছে গেল আজ।

এই বুঝি দুনিয়ার রীতি!

জানালার খড়খড়ি দিয়ে পড়ন্ত রোদের একফালি ঘরে এসে পড়েছিল। আনমনে জানালাটা খুলে দিয়েই মালা বন্ধ করে দিল আবার।

আয়নার সামনে বসেছিল মালা। নিজের চেহারা চোখে পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিল। আর বুঝতে বাকী নেই, এ চেহারা যদি গ্রহের মতো আকাশে ভেসে বেড়ায়, তবুও চোখ তুলে কেউ তাকাবে না।

এক এক সময় মালা চেষ্টা ক'রেও তার অস্থিরতাকে চেপে রাখতে পারে না। মনে হয় বাইরের বাতাসে নিঃশ্বাস না নিলে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। তবু জোর করে কপাটে খিল এঁটে দেয়—কোন পলাতকার পায়ে যেন বেড়ি পরিয়ে তাকে সবলে ধরে রাখে।

সন্ধ্যে হয়ে আসে, অনেকদিন পরে চাঁদ উঠেছিল আবার। মালা জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা ঝোড়ো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। দৃশ্যটা ভালোই লাগলো মালার। মালা ডাক্‌লো—রামজীবন আমি বেড়াতে যাব এখনি।

সাজ-সজ্জার পর মালা কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইলো আয়নার সামনে। চোখের জলে দু'তুবার মুখের পাউডার ভিজে গেল। রামজীবন বার বার হাঁক দিচ্ছে। নিজেকে একরকম জোর করে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল মালা।

রানীঝিলের চারদিকে দু'তুবার ঘোরা হল, মাঠটা আড়াআড়ি তুবার হাঁটা ফেরা হলো। দিক ছাপিয়ে অন্ধকার আসছে। পূর্বে পশ্চিমে দেওদারের মাথা

শিউরে উঠছে। বন জোয়ানের গন্ধমাখা ধুলো ছিটিয়ে পড়ছে চারিদিকে। ঝড় আসছে। রামজীবনের হাঁক-ডাকে অগত্যা মালা ফিরলো ঘরের দিকে।

রামজীবন এগিয়ে গেছে কিছু দূর। মালা খুবই আস্তে আস্তে যেন টেনে টেনে চলেছিল। হ্যাঁ, এই যে ক্রসরোডের মোড়। এই তো সেই পাথর, অন্ধকারে যেন কারও প্রতীক্ষায় বসে আছে।

মালা থমকে দাঁড়ালো। এই সেই পাথর, এই কলঙ্ক কীর্তনিয়ার প্রসাদে কত নগণ্যা গরীয়সী হয়ে উঠেছে। অপবাদ হয়েছে প্রশস্তি। কিন্তু এ পাথরের মনে সুবিচার নেই। এব সব চক্রান্তকে আজ একটি আঘাতে চূর্ণ করে দেওয়া যায়। কালো পাথরের কবিকে কেউ ধরতে পারেনি, মালা তাকে আজ নিঃশেষ করে দিতে পারে। সব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারা যায় এইক্ষণে। মালা যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়লো পাথরটার ওপর। ব্লাউজের ভেতর থেকে টেনে বার করলো এক টুকরো খড়ি।

বিদ্যুৎ চমকাবার আগে, রামজীবনের হাঁক শোনার আগেই খড়ির আখরে এক স্তবক ঘনঘোর মিথ্যা সাদা ফুলদলের মতো ছিটিয়ে পড়লো গায়ে।

—মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার··· থাক্, বেচারাদেব নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রানীঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।

মনভ্রমরা

মনভ্রমরা অর্থ মন নয়, ভ্রমরাও নয়। দেখতে বেশ সুন্দর যে-মেয়ে যখন তখন গুনগুন্ ক'রে গান করে, তাকে বলে মনভ্রমরা

সেদিন কথাটার অর্থ আমবা এইরকম বুঝেছিলাম, কারণ এইরকমই বুঝতে শিখেছিলাম। কিন্তু শিখিয়েছিলেন যাঁরা, সেই সতুদা, হীরুদা আর কানুদারাও বোধহয় কথাটার সে-অর্থ আজ একেবারে ভুলে গিয়েছেন।

সেই অর্থটা ভুলে গেলেও সেই কথাটা কি তাঁরা ভুলে যেতে পেরেছেন? সেই মনভ্রমরার কথা?

আমার তো মনে হয়, মনে করিয়ে দিলে সতুদা নিশ্চয় এখনো মনে করতে

পারবেন। কানুদা আর হীরুদাও নিশ্চয় আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে স্বীকার করবেন, হ্যাঁ, এখনো তাঁদের মনে আছে সেই কথা। মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে বৈকি। ওঃ, সে কত দিন আগেকার কথা!

অনেকদিন আগেরই কথা বটে। সেদিন আর আজ, মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশ বছর সময়ের ব্যবধান। আমারই মাথা আজ সাদা হয়ে গিয়েছে, আর সতুদা, হীরুদা ও কানুদার মাথার অবস্থা যা হয়েছে তা'তো বোঝাই যায়।

সেদিন ঐ কথাটার অর্থ যা বুঝেছিলাম, তা'তো বুঝেই ছিলাম। কিন্তু যেটুকু স্পষ্ট ক'রে সেদিন বুঝতে পারিনি, আজ মনে হয়, সেটুকু যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। মনভ্রমরার অর্থ মনই বটে, তবে সে-মন হলো চৈত্র মাসের ভ্রমরার মতো, ভালবাসে গন্ধের ফুল, রঙের ফুল নয়। রঙ দেখে গুনগুনিয়ে গান হয়তো করে, কিন্তু গন্ধের কাছে ছুটে যাবার জন্য গুনগুনিয়ে কাঁদে।

সতুদা সম্প্রতি মেধাতিথির মনু-টিকার এক দার্শনিক টীকা রচনা করেছেন। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে তাঁকে, কি বলে আপনার দার্শনিক মন? আমার এই কাব্যিক ব্যাখাটা কি ঠিক নয়?

যাক গিয়ে এসব তত্ত্বের কথা। আজ সতুদার সঙ্গে দেখা হলে কোনরকম তত্ত্বের নাম ক'রেও তাঁদের অতীতকালের কোন ছেলেমানুষী বাচালতার কথা তুলতে পারব না বোধহয়, তোলা উচিতও নয়। সেদিনের সেই ঘটনার অর্থ বুঝবার জন্য সতুদার মনে আজ আর কোন পুরানো অথবা নতুন দুশ্চিন্তা আছে বলেও মনে হয় না। কিন্তু আজকের এই মেধাতিথি সতুদার সেই ছেলেবয়সের মুখ থেকেই তো আমরা ঐ কথাটা প্রথম শুনেছিলাম। আর, সতুদাদের কথা থেকেই সেদিন আমরা বুঝেছিলাম যে, দেখতে বেশ সুন্দর যে-মেয়ে যখন-তখন গুন্‌গুন্‌ ক'রে গান করে, তাকে বলে মনভ্রমরা।

সতুদারা ছিলেন দাদাদের দল, আর আমি ভুতো ও বলাই ছিলাম ভাইদের দল। আমাদের চেয়ে বয়সে ওঁরা ছিলেন পাঁচ-বছরের বড়। আমাদের বয়স তখন দশের উপর, আর ওঁদের বয়স তখন পনর'র উপর। তখন শুধু বেবিরা পড়ত ছোট স্কুলে। আমরা তখন মিডল স্কুল ছেড়ে সবেমাত্র হাইস্কুলে ঢুকেছি, আর সতুদারা হাইস্কুল ছেড়ে সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছেন। কাজেই সতুদা যখন তাঁর দলবল নিয়ে তাঁদের বাড়ির বাইরের ঘরে ক্যারম খেলতেন, তখন আমরা শুধু বাইরে থেকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতাম। বড়দের আড্ডার কাছে থাকা দূরে থাকুক, কাছাকাছি থাকারও অধিকার আমাদের ছিল না। জানালা দিয়ে খুব সাবধানে আর খুব নিঃশব্দে উঁকি-ঝুঁকি দিতে হতো।

দেখতে পেলেই তেড়ে আসতেন সতুদা—ভাগ ভাগ ডেঁপোর দল। ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব, যদি দেখি আবার কখনো বড়দের আড্ডার কাছে গা ঘেঁষতে এসেছ।

তখনকার মতো ভেগে পড়লেও আবার ফিরে আসতাম, সেদিন না হোক আর একদিন, ঠিক সেই জানালার কাছেই দাঁড়াতাম, আর সতুদাদের ক্যারম খেলা দেখতাম।

এইভাবেই একদিন শুনলাম- ক্যারম খেলার খুট্‌স-খুট্‌স হঠাৎ থামিয়ে সতুদা যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন—আজও শুনলি তো হীরু?

হীরুদা হাত গুটিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেন—কি?

সতুদা—মনভ্রমরা গুন্‌গুন্ করে গান করছিল।

হীরুদা বলেন—শুনেছি, এই নিয়ে দশবার শুনলাম।

কাসুদা বিস্মিত হয়ে বলেন—এর মানে কিছু বুঝতে পারছিস?

সতুদা বলেন—কিছু একটা ব্যাপার আছে, নিশ্চয়ই আছে।

জানালার দিকে হঠাৎ সতুদা তাকিয়ে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে এক লাফ দিয়ে উঠে ... হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন ভুতোর ডান হাতের কব্জি। বললেন—কি রে বকাটে, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?

ভুতো আর্তনাদ করে—আপনাদের খেলা শুনছি সতুদা।

গর্জন করলেন সতুদা—খেলা শুনছিস? কি শুনছিস বল?

করুণ মুখ ক'রে ভুতো বলে—খেলা দেখছিলাম সতুদা, কিন্তু শুনতে পাইনি।

হীরুদা উঠে এসে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকেন। প্রশ্ন করেন—সত্যিই কিছু শুনতে পাসনি তো?

ভুতো বলে এবং আমরাও বলি—কিচ্ছু না হীরুদা।

ভুতোকে ছেড়ে দিলেন সতুদা এবং তখনকার মতো আমরাও জানালার কাছ থেকে সরে গেলাম। কিন্তু সেদিন যে কথাগুলি ওদের মুখে প্রথম শুনলাম, ঠিক সেই কথাগুলিই আরও কয়েকবার ঠিক ঐভাবেই নিঃশব্দে সতুদাদের ক্যারম-খেলার ঘরে ঐ জানালার কাছেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে পেলাম এবং আমাদেরও আর বুঝতে বাকি রইল না যে ছোট স্কুলের দিদিমণি সুধাদিই হলেন মনভ্রমরা।

কথাটা শুনে আমরা কিন্তু মনে মনে সতুদাদের উপর রাগই করেছিলাম। সুধাদি গুন্‌গুন্ ক'রে গান করেন তো তোমাদের তাতে কি? গুরুজনের সম্পর্কে মনে কোন মান্যি নেই, যা-তা একটা নাম তৈরী করে দিলেই হলো!

ভুতো বলে—সুধাদি তো সতুদাদের গুরুজন নয়।

বলাই বলে—নিশ্চয় গুরুজন। সুধাদি সতুদাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

ভুতো বলে—সতুদারা তো আর সুধাদির কাছে পড়েননি। সুধাদি আসবার আগেই ওরা হাইস্কুলে চলে গিয়েছিল। ওরা আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র।

কথাটা ঠিকই বলেছে ভুতো। আমরা পড়েছি সুধাদির কাছে, কাজেই সুধাদির জন্য আমাদের মনে যে মায়া আছে, সে মায়া সতুদাদের সিনিয়র-মনে থাকবে কেন? মিডল স্কুলে যাবার আগে ছোট স্কুলের শেষ বছরটা আমরা সুধাদির কাছেই পড়েছিলাম। সুধাদির সঙ্গে এখনো যে আমাদের কত ভাব আছে, তার কোন খবরই জানেন না ক্যারম-মার্কা সতুদা, হীরুদা আর কানুদা। বিকাল বেলা ওরা যখন বড় মাঠে হকি খেলে হাঁপায়, তখন আমরা সুধাদির সঙ্গে ছুটোছুটি ক'রে ছোট স্কুলের মাঠে কাঠবিড়ালী ধরবার চেষ্টা করি। হকি খেলার শেষে ওরা যখন পয়সা খরচ ক'রে মালাই বরফ কেনে আর খায়, আমরা তখন সুধাদির কাছ থেকে কুচো নিমকি নিই আর খাই। রবিবারের সকালে ওরা যখন মাঠের উপরে সাইকেল রেস খেলে, আমরা তখন ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর চুপ করে বসে থাকি।

সে রবিবারের সকালবেলা ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর বসেছিলাম আমরা। রেস খেলার শেষে ছোট স্কুলের এই পাঁচিলের কাছ দিয়েই সতুদারা সাইকেল ছুটিয়ে চলে যাবার সময় আমাদের দিকে কটমট ক'রে একবার তাকালেন। প্রশ্ন করেন সতুদা—তোরা এই সকালবেলাটা এই পাঁচিলের ওপর এরকম ক'রে বসে রয়েছিস কেন?

আমাদের মধ্যে ভুতোরই সাহস সবচেয়ে বেশি। সতুদার প্রশ্নে বেশ একটু তাচ্ছিল্যের স্বরেই ভুতো জবাব দেয়—এই রকম ক'রেই তো বসে থাকতে হয়।

ঘ্যাচ ক'রে ব্রেক দাবিয়ে সাইকেল থামালেন সতুদা। সতুদার চোখ দুটো আরও কটমট করে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন—না, এই রকম বাঁদরের মতো দল বেঁধে বসে থাকতে হয় না।

একটা ঢোঁক গিলে চুপ করে রইল ভুতো। আমাদের সব কথার সাহস সতুদার ঐ একটি ধমকেই ফুরিয়ে গেল। সতুদাও তাঁর চোখের কটমটানি একটু শান্ত ক'রে নিয়ে সাইকেলের প্যাডেলে ঠেলা দিলেন। হেলে দুলে আস্তে আস্তে তাঁর রেস-ক্লান্ত সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন, আমরাও হাঁপ ছাড়লাম।

সতুদারা সত্যিই জানেন না, কেন আমরা সকালবেলাটা ছোট্ট স্কুলের পাঁচিলের উপর চুপ ক'রে বসে আছি, তাই ওরকম একটা গালি দিয়ে চলে গেলেন। আমাদেরও একটা খেলা আছে, যার জন্য এইভাবে অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে এই পাঁচিলের উপর বসে থাকতে হয়। তাকিয়ে থাকতে হয় বড় মাঠের এদিকে

ওদিকে, অনেক দূরের দিকেও। এ খেলা শেষ হবার পর আমরাও মালাই বরফ কিনি আর খাই, কারণ এ খেলার পর আমাদের পকেটে কিছু পয়সাও আসে—কোনদিন তিন আনা, মাঝে মাঝে দু' আনা, আর বেশির ভাগ দিনই এক আনা।

মিডল স্কুলে গিয়েও যে ছোট স্কুলের এই পাঁচিলটার মায়া আমরা ছাড়তে পারিনি, তার কারণ হলো এই বিশেষ খেলাটা। সতুদাদের মতো সিনিয়রেরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না যে, এই রকমের একটা খেলা করা যায়, আর সে খেলায় আবার পয়সা হয়।

জানেন সুধাদি। সতুদারা জানেন না যে, মনভ্রমরা ব'লে যাকে তারা ঠাট্টা করেন, সেই সুধাদির জন্যই আমরা এখন এই পাঁচিলের উপর চুপ ক'রে বসে অপেক্ষা করছি। আমাদের খেলার সব খবর জানেন সুধাদি। তিনিই তো আমাদের রবিবারের সকালবেলার এই খেলা দেখতে দেখতে হেসে গড়িয়ে পড়েন। হাততালি দেন সুধাদি এবং তাঁর ঐ হাসি আর হাততালির জন্য আমাদের সাহস আর উৎসাহ কখনো খান্ত হয় না। সুধাদি এলেই আমরা বড় মাঠে নেমে পড়ব, আর খেলা শুরু হয়ে যাবে। মাঠের দিকে তাকিয়ে আজ আবার অনেকদিন পরে আমাদের বহুদিনের লক্ষ্য ও লোভনীয় সেই বুড়োকে দেখতে পেয়েছি।

বুড়োর সামনের পা দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা, পিছনের পা দুটো স্বাধীন। মনের সুখে ঘাড়ের ঝাঁকড়া বোঁয়া দুলিয়ে মাঠের নতুন দূর্বা খাচ্ছে বুড়ো। বুড়োর কানের কাছে একটা ফড়িং ফরফর করছে। তাই মাঝে মাঝে ছটফট ক'রে উঠছে বুড়ো। মাথা ঝেঁকে কান নেড়ে ফড়িং তাড়ায় বুড়ো, তার পরেই কুঁড়ে ব্যাঙের মতো একটা লাফ দিয়ে সরে যায়। আবার মনের সুখে দূর্বা খায় বুড়ো। প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা, ঐ বুড়োকে আজ ধরতেই হবে। ধরতে যদি পারি, আর ঠেলে-ঠুলে কোনমতে কানি-হাউসে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারি, তবে আজ আমাদের রোজগার হবে তিনটি আনা। কম নয়—তিন আনাতে এবেলা আর ওবেলা, দু'বেলারই মালাই বরফ হয়ে যায়।

কানি-হাউস মানে মিউনিসিপ্যালিটির খোঁয়াড়, যার ইজারা নিয়েছে ছেদি মিঞা। ফোলা-ফোলা দুটো গোদা পা আর শুকনো ঝিরকুট শরীর, চোখে সুরমা দেয়, সেই ছেদি মিঞা। ছেদি মিঞার চোখ কানা নয়, তাই বুঝতে পারি না, এই খোঁয়াড়ের নাম কেন হলো কানি-হাউস?

বড় মাঠের চরন্ত জন্তুগুলিকে আমরা ধরতাম, আর কানি-হাউসে নিয়ে গিয়ে জমা দিতাম। এই ছিল আমাদের খেলা।

ছেদি মিঞা জিজ্ঞাসা করত—কোথায় পেলে এই জানোয়ার, কা'র কি ক্ষতি

করেছে এই জানোয়ার ?

ছেদি মিঞার প্রশ্নে ঘাবড়ে গিয়ে আমরা চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকতাম। বুকের ভিতরটা দুরদুর করত। ছেদি মিঞা মুখ ভেংচিয়ে হেসে হেসে ধমক দিত—স্কুলের ফুলগাছ খেয়ে একেবারে শেষ ক'রে দিয়েছে এই জানোয়ার, তাই না ?

আমরা বলতাম—হ্যাঁ, তাই তাই।

ছেদি মিঞা বলত—তাই বলতে হয়, বুঝলে ?

জানোয়ার জমা ক'রে নিত ছেদি মিঞা। কলম তুলে নিয়ে খরখর ক'রে খাতার উপর কি-সব লিখত। তার পরেই পয়সা দিত। টাট্টু ঘোড়া হলে তিন আনা, গাধা হলে দু' আনা আর ছাগল হলে এক আনা। আমরা দেখতাম,—ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক'রে খোঁয়াড়ের মস্ত বড় কাঠের দরজাটা খুলে গেল, আর বিনা অপরাধের সেই জন্তুগুলি আমাদেরই মিথ্যা কথার চাতুরীতে অভিযুক্ত হয়ে হাজতী কয়েদীর মতো সেই খোঁয়াড়ের ভিতর অন্তর্হিত হলো।

সুধাদিকেই আমরা জিজ্ঞাসা করতাম—এ খেলায় পাপ হচ্ছে না তো সুধাদি ?

সুধাদি বলতেন—হচ্ছে বৈকি।

ভয় পেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করতাম—তাহ'লে এই পাপের কি উপায় হবে সুধাদি ?

হেসে ফেলতেন সুধাদি। বলতেন—উপায় তো আমিই আছি ?

—তার মানে ?

প্রথম প্রথম বুঝতে না পারলেও পরে সবই জেনেছিলাম আর বুঝেও ফেলেছিলাম। সুধাদির কাছেই এসেছিল লছমনের মা, এসেছিল রজ্জাক ধুপী—যার ছাগল আর যার গাধা আমরা খোঁয়াড়ে জমা দিয়ে এক-আনা আর দু' আনা রোজগার করেছিলাম, তাদেরই হাতে দু'আনা আর চারআনা পয়সা দিয়ে সুধাদি আমাদের পাপ কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ পয়সা দিয়ে তাদের ছাগল আর গাধা খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল লছমনের মা আর রজ্জাক ধুপী। সুধাদি সত্যিই সুধাদি। তারপর থেকে পাপের ভয় ছেড়ে দিয়েই আমরা ঐ খেলা খেলতাম, কারণ পাপ কাটাবার উপায় ছিলেন সুধাদি।

পাঁচিলের উপর বেশীক্ষণ বসে থাকতে হয়নি। এলেন সুধাদি, জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার খুব ভাল সুধাদি। হরিদা'র বুড়োকে [illegible] আছে পাওয়া গিয়েছে।

হরিদা'র টাট্টু ঘোড়া, তারই নাম বুড়ো। অনেকদিন অনেক চেষ্টা করেছি

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY ★ AGARTALA, TRIPURA ★
72585
25/5/81

বুড়োকে ধরবার জন্য। কিন্তু বুদ্ধিতে কি ভয়ানক ঝানু ঐ বুড়ো টাট্টুটা। যেন আমাদের ছায়ার শব্দও শুনতে পায় বুড়ো। কতবার চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছি বুড়োকে, কিন্তু প্রত্যেকবার ঐ বাঁধা-পা নিয়েই মুহূর্তের মধ্যে তিন লাফে যেন বাতাসে ঘাই মেরে পালিয়ে গিয়েছে বুড়ো। আমাদের সব ধৈর্য সতর্কতা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে।

মাঠের উপর নিশ্চিন্ত মনে চরন্ত টাট্টু ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলেন সুধাদি। বললেন—আজ কিন্তু যেমন করেই হোক্ ধরা চাই হারদা'র ঐ বুড়োকে। পারবে তো?

আমরাও বললাম—পারতে হবেই সুধাদি। আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি।

অনেক হাসলেন সুধাদি, অনেক হাততালি দিলেন, আর আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু হরিদার বুড়োকে ধরতে পারা গেল না। সেই রকমই তিন লাফে ঘাই মেরে পালিয়ে গেল বুড়ো। মাঠ পার হয়ে সড়কের উপর উঠে আর ঘাড়ের রোঁয়া ঝাঁকিয়ে পিছনের মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। না, আজ আর কোন চান্স পাওয়া যাবে না।

সুধাদি বললেন—ছি ছি, হরিদার বুড়োর কাছে আবার হেরে গেলে?

একে তো হাঁপাচ্ছিলাম, তার উপর আবার ছি ছি করলেন সুধাদি। বড় বেশি দমে গেলাম। তবু বললাম—আর একদিন চান্স পাওয়া যাবেই সুধাদি।

সুধাদি নিজেই তখনি আবার নতুন উৎসাহে হেসে উঠলেন। বললেন—আবার চান্স পাওয়া যাবেই। আর হরিদাকে জব্দ করতে হবেই।

হ্যাঁ, হরিদাকে জব্দ করতেই হবে। এ শহরের সবাই হরিদাকে জব্দ ক'রে আনন্দ পায়, শুধু আমরাই আজ পর্যন্ত সে আনন্দ পাইনি! শুধু তিন আনা পয়সার লোভ নয়, বুড়োকে ধরবার জন্য আমাদের এই আগ্রহের মধ্যে আর একটা জিনিস আছে, হরিদাকে জব্দ করার প্রতিজ্ঞা।

হরিদাকে সতুদারা বলেন, জন গিলপিন হরি। মাথার উপর মস্ত বড় এক শোলার হ্যাট চাপিয়ে আর মালকোঁচা মেরে এই টাট্টু বুড়োর পিঠের উপর সওয়ার হন হরিদা। টাট্টুর পিঠের এক পাশে ঝুলতে থাকে চট জড়ানো একটা ওষুধের বাক্স, আর অপর পাশে হরিদার কম্বল-জড়ানো বিছানা ও একটা ঘটি। শহরের বুকের উপর দিয়ে এইভাবেই সড়কের যত কুকুরকে রাগাতে রাগাতে শহরের বাইরের অনেক দূরের গাঁয়ে ডাক্তারি করতে চলে যান হরিদা, ফেরেন একদিন দু'দিন বা এক সপ্তাহ পরে।

হরিদাকে জব্দ করার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারব তো? ক্লান্ত হয়ে পাঁচিলের

গায়ে হেলান দিয়ে ঘাসের উপর বসে আমরা এই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে দিলেন না সুধাদি, বললেন—চলো বেড়িয়ে আসি।

বলেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন সুধাদি। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপরেই বললেন—নাঃ থাক্‌গে।

আমরা জানতাম, এই কথাই বলবেন সুধাদি। সেই যে কবে বাসন্তী পূজার দিনে আমাদের সঙ্গে একবার বেড়াতে বের হয়েছিলেন সুধাদি, তার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর কোনদিনই বের হননি না।

সেই বাসন্তী পূজার দিন বড় সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুধাদির সঙ্গে আমরা ঐ পলাশতলা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। বড় সুন্দর সাজ করেছিলেন সুধাদি। একে তো দেখতে খুবই সুন্দর, এ শহরের সব মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর সুধাদি, তার উপর অমন সুন্দর একখানা চাঁপা রঙের শাড়ি পরে কি সুন্দরই যে সেদিন হয়ে উঠেছিলেন, সেটা আমরা পথে বের হয়েই বুঝতে পেরেছিলাম।

হীরুদাদের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে অমন স্টাইলের পুঁটিদিও গম্ভীর হয়ে, বোধহয় একটু রাগ ক'রেই তাকিয়ে দেখেছিলেন সুধাদিকে। কানুদাদের বাড়ির কাছে পৌঁছতেই দেখেছিলাম, চারুমাসী পর্যন্ত ঘরের ভিতর থেকে ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন, আর হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন। সবচেয়ে বেশি গর্ব আমাদের। আমরাই প্রত্যেক বাড়ির বারান্দা আর জানালার দিকে তাকিয়ে শহরের যত দিদি মাসী আর খুড়িমাদের লক্ষ্য ক'রে সুধাদির পরিচয় শুনিয়ে যাচ্ছিলাম—সুধাদি, বেবিদের ছোট স্কুলের দিদিমণি সুধাদি।

পলাশতলার কাছে পৌঁছতেই দেখেছিলাম, শান্তিদা বসে বসে একমনে ছবি আঁকছেন। হঠাৎ হাতের তুলি থামিয়ে সুধাদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শান্তিদা। শান্তিদার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন সুধাদি। দেখলাম, যেন হঠাৎ পলাশ ফুলের রঙ ছড়িয়ে পড়েছে সুধাদির মুখের উপর। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সুধাদি। ভুতোর কাঁধে হাত রেখে ব্যস্তভাবে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন—চলো, এখান থেকে চলো।

সেই যে চলে এলাম, তারপর আর কোনদিন সুধাদির সঙ্গে চলবার সুযোগ পাইনি। তাই আজ আবার বললাম—চলুন না সুধাদি।

সুধাদি বললেন—যাব কোথায় রে ভাই?

—চলুন না, সেদিনের মতো ঐ পলাশতলা পর্যন্ত গিয়ে…।

আমরা আর কথা শেষ করতে পারলাম না। ডাকপিওন এসে সুধাদির হাতে একটাখামের চিঠি দিয়ে চলে গেল। রঙীন খামের এক কোণে একটা ফোটা

পলাশের ছবি।

যদিও সুধাদি কোনদিনও বলেননি, কিন্তু, আমরা বুঝি, এই রঙীন চিঠি আসে ঐ পলাশতলা থেকেই। প্রায়ই আসে চিঠি। এবং আর এক রকমের রঙীন খামের চিঠি এদিক থেকেও চলে যায় ঐ পলাশতলার দিকে।

সুধাদির অন্য সব চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসে হয় স্কুলের মালী, না হয় আমি কিংবা ভুতো কিংবা বলাই। কিন্তু এই রঙীন চিঠি সুধাদি নিজের হাতেই ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসেন। বেশি দূরে নয় ডাকবাক্স। ছোট স্কুলের ফটক থেকে বড়জোর দশ গজ দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লালরঙের ডাকবাক্স। ডাকবাক্সের ঠিক অপর দিকে রাস্তার ওপাশে এক সারি দোকান ঘরের মধ্যে একটি ঘর হলো জন গিলপিন হরিদার। হরিদার ঘরের জানালার কাছে একটা পেয়ারা গাছ। সেই পেয়ারাগাছের সঙ্গে বাঁধা থাকে হরিদার প্রিয় টাট্টু, অর্থাৎ বুড়ো।

বুঝতে পারি, পলাশতলার দিকে বেড়াতে যাবার আর কোন দরকার নেই সুধাদির। শান্তিদার রঙীন চিঠির ভিতর দিয়ে পলাশতলাই এখানে আসে। সুধাদিরও যত চাঁপা রঙের কথা এখান থেকে রঙীন চিঠির ভিতর দিয়েই পলাশ-তলায় পৌঁছে যায়।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়লেন সুধাদি। পড়া শেষ ক'রে নিজের মনেই গুন্‌গুন্ ক'রে বলে উঠলেন—পলাশের স্বপ্ন কি বৃথা হবে! চম্পার ঘুম কি ভাঙবে!

ভুতো জিজ্ঞাসা করে—কি বলছেন সুধাদি?

সুধাদি বলেন—কিছু না। আমার একটা কাজ ক'রে দিতে হবে।

আমি ও বলাই একসঙ্গে বলি—বলুন।

—টাউন ক্লাবের লাইব্রেরী থেকে কয়েকটা কবিতার বই আমার জন্য এনে দিতে হবে। পারবে তো?

বললাম—নিশ্চয়ই পারব।

রবিবারের সকাল শেষ হলো। আমরাও ছোট স্কুলের ফটক পার হয়ে বাড়ির দিকে চললাম। শুনতে পেলাম গুন্‌গুন্ ক'রে গান করছেন সুধাদি।

সেদিন সন্ধ্যায় সতুদাদের ক্যারম-খেলার ঘরে উঁকি দিতে এসে আমি ভুতো আর বলাই শুনতে পেলাম, সতুদা বলছেন—আজও আবার শুনলি তো হীরু?

হীরুদা বললেন—কি?

সতুদা—মনভ্রমরা গুন্‌গুন্ ক'রে গান করছিল।

হীরুদা বলেন—হ্যাঁ শুনেছি, এই নিয়ে এগার বার হলো।

কানুদা বলেন—সত্যিই কি যেন হয়েছে মনভ্রমরার, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

অনেকগুলি রবিবারের সকাল পার হয়ে গেল, তবু হরিদার বুড়োকে ধরবার সুযোগ পেলাম না। বুড়োর পিঠের উপর জন গিলপিন হয়ে হরিদা ডাক্তারী করতে কখন যে চলে যান, আর কখন যে ফিরে আসেন, কিছুই জানতে পারছি না। ছোট স্কুলের ফটকে ঢুকবার আগে একবার হরিদার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি, ঘরের দরজার কড়ায় তালা ঝুলছে। হরিদা নেই, পেয়ারা গাছের তলায় বুড়োও নেই! নিরাশ হয়ে স্কুলের পাঁচিলের উপর গিয়ে বসি, বড় মঠের দিকে তাকাই। দু'একটা টাট্টু আর ছাগলকে চরতেও দেখা যায়। কিন্তু এগুলিকে ধরতে মনের ভিতর থেকে আর খুব বিশেষ উৎসাহ পাই না। চেষ্টা করলে ওগুলিকে এখনি ধরতে পারি। কিন্তু তাতে দু'আনা একআনা হলেও এবং মালাই বরফে পেট ঠাণ্ডা হলেও হরিদার বুড়োকে না ধরা পর্যন্ত মন ঠাণ্ডা হবে না।

সবাই জব্দ করে যে হরিদাকে, সেই হরিদাকে জব্দ না করলে যে আমাদের মনের একটা প্রতিজ্ঞাও জব্দ হয়ে যায়। বার বার ছি ছি করবেন সুধাদি, এই গ্লানি বার বার সহ্য করাও যায় না।

এক সারি দোকান ঘরের মধ্যে ঐ ঘরটাতেই থাকেন হরিদা। পথ দিয়ে যাবার সময় কতবার দেখতে পেয়েছি, ঘরের ভিতর রান্না করছেন হরিদা, আর পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিচালি চিবোচ্ছে আর কান নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে বুড়ো।

হরিদা যে কি ধরনের মানুষ, আর কি ধরনের ডাক্তারী করেন, তার বিশেষ কিছুই খবর রাখিনা আমরা। শহরের এতগুলি ভদ্রলোকের মধ্যে বোধহয় কেউ-ই সে খবর রাখেন না। হরিদার মুখটা দেখতে বেশ, যদিও রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে। কুঁয়োতলার কাছে যখন আদুড় গায়ে স্নান করেন হরিদা, তখন কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে হরিদার চেহারাকে। হরিদাকে দেখতে অভিশাপে বনবাসী রাজপুত্তুরের মতোই মনে হয়, শুধু শরীরটা রোদে জলে খেটে খেটে একটু ময়লা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু হরিদা নামে একটা মানুষ থাকে এই শহরে, এটা যেন স্বীকার করতে চায় না এই শহর। কোনদিন কোন বিয়ে-বাড়ির নিমন্ত্রণে হরিদাকে দেখতে পাইনি। কোন উৎসরেই হরিদাকে নিমন্ত্রণ করবার কথা কখনো কোন ভদ্র-লোকের মনেও পড়ে না। পথ দিয়ে যাবার সময় চারুমাসী যে-কোন ভদ্রলোককে

দেখতে পেলেই মাথার কাপড় টেনে বড় করেন, কখনো বা ঘোমটা টানেন, কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়েই দেখেছি, হরিদাকে দেখলে চারুমাসীর মাথার কাপড় নির্বিকার হয়েই থাকে। হাত দিয়ে মাথার কাপড়টা একটু স্পর্শ করবার চেষ্টাও করেন না চারুমাসী। সতুদাকে দেখেছি, সাইকেল থেকে নেমে এক লাফে হরিদার ঘরের দরজার কাছে এসে বলেন—দেশলাইটা একবার দাও তো জন গিলপিন। বয়সে এতবড় হরিদা, তবু তাঁরই কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে তাঁরই সামনে সিগারেট ধরিয়ে নিতে সতুদার একটু বাধে না। পথ দিয়ে যেতে এস-ডি-ও সাহেবের মোটর গাড়ী বিকল হয়ে গিয়েছিল। হরিদাকে দেখতে পেয়েই ডাক দিলেন এস-ডি-ও—এই ইধার আও, গাড়ি ঠেল। সতুদাকে যেমন কোন কথা না বলে দেশলাই এগিয়ে দেন হরিদা, ঠিক তেমনি কোন কথা না বলে গাড়িও ঠেলে দিলেন। সামনের বাড়ির অক্ষয়বাবুর বাচ্চা ছেলেটা যখন না ঘুমিয়ে চেঁচাতে থাকে তখন অক্ষয়বাবুর স্ত্রী বাচ্চাকে শান্ত করার জন্য হরিদার ঘরের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়েই বলতে থাকেন—চুপ চুপ চুপ, বাঘে ধরেছে হরিকে, মস্ত বড় বাঘ। বড় বড় থাবা দিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছে হরিকে। চুপ চুপ চুপ।

এই রকমেই তুচ্ছ হয়ে আছেন হরিদা। সম্ভ্রম দূরে থাক, হরিদার যেন অস্তিত্বও নেই। যেটুকু আছে সেটুকুও বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে একেবারেই শেষ করে দিচ্ছেন অক্ষয়বাবুর স্ত্রী। কিন্তু সকলের কাছে এত জব্দ হয়েও হরিদা যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমাদের কাছে কখনই জব্দ হবেন না। হাতের কাছে পাচ্ছি না হরিদার বুড়োকে, আর দিনগুলি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

সুধাদি পড়ছিলেন রঙিন চিঠি। আমরা এসে বললাম—আজ কোন চান্স পাওয়া যাবে না সুধাদি। হরিদা তাঁর বুড়োকে নিয়ে গাঁয়ের দিকে ডাক্তারী করতে চলে গিয়েছেন।

আমাদের কথাগুলি বোধহয় শুনতে পেলেন না সুধাদি। চিঠি পড়া শেষ হলেই নিজের মনে গুন্‌গুন্ ক'রে বলে উঠলেন—সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে···।

বুঝতেও পারলাম না কিছু। তবে এইটুকু বুঝলাম যে, সুধাদি ঐ রঙীন চিঠিরই কোন একটা কথাকেই গুন্‌গুনিয়ে বলছেন।

উঃ, এত চিঠিও আসে, আর চিঠিতে এত কথাও থাকে, আর পলাশতলার শান্তিদার মনে এত কথাও ছিল?

সুধাদির মনে ঐরকম আর কি-কথা ও আর কত কথা আছে জানি না।

কিন্তু দেখছি তো, সুধাদিও সমানে চিঠি লিখছেন। কিরকম যেন মনে হয়, কিছুটা বুঝতেও পারি, তারপর আর কিছু বুঝতে পারি না।

আজ দেখলাম, সুধাদি আমাদের সামনে বসে চিঠি লিখলেন। আমরা যে কবিতার বইগুলি লাইব্রেরী থেকে এনে দিয়েছিলাম, তারই মধ্যে একটা বই তুলে নিয়ে একটা কবিতা বের করলেন সুধাদি। তার পরেই চিঠি লিখতে শুরু করলেন। দু'মিনিটের মধ্যেই চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেল।

রঙীন খাম বন্ধ ক'রে নিয়ে তারপর সুধাদি আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন—পলাশতলার শান্তিদাকে তোমরা নিশ্চয়ই চেন ?

আমরা বলি—খুব চিনি সুধাদি। খুব ভাল লোক। যেমন চেহারা, তেমনি গুন। আর তেমনি শৌখিন।

হেসে ফেলেন সুধাদি।—এত খবরও জান ?

ভুতো বলে—অনেক টাকা আছে শান্তিদার। সেদিন পথে যেতে যে গালাকুঠিটা দেখেছিলেন, ওটা শান্তিদারই গালাকুঠি।

আমি বলি—খুব ভাল ফটো তুলতে আর ছবি আঁকতে পারেন শান্তিদা।

বলাই বলে—এ শহরে শান্তিদার চেয়ে ভাল বেহালা বাজাতে আর কেউ পারে না।

গুন্‌গুন্ করতে করতেই হঠাৎ যেন আনমনা হয়ে চুপ করে যান সুধাদি। রঙীন খামে বন্ধ-চিঠিটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। আমাদের মনে হয়, সুধাদিকেও যেন কি-এক রঙীন খেলায় পেয়েছে। শান্তিদাকে চেনেনও না, একদিনের জন্য শান্তিদার সঙ্গে একটি কথাও হয়নি সুধাদির, তবুও কত রকম রঙের কথা আর মিষ্টি কথার আসা-যাওয়া চলেছে দু'জনের মধ্যে।

উঠে গিয়ে স্কুলের ফটক পার হয়ে ডাকবাক্সের ভিতর চিঠিটা ফেলে দিয়ে এসে সুধাদি বলেন—বলো এবার তোমাদের খেলার খবর কি ? হরিদাকে জব্দ করবার প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়েছ বোধহয় ?

আমরা বলি—ভুলিনি সুধাদি, কিন্তু আজ আর কোন ভরসা নেই।

সুধাদি—কেন ?

ভুতো বলে—হরিদা'র বুড়ো এখন শহরের বাইরে।

সুধাদি—তা হলে কি করবে আজ ?

বলাই বলে—আজ আর না-ই বা খেললাম সুধাদি। কাঠবিড়ালীর পিছু পিছু ছুটে আর লাভ কি ?

সুধাদি হাসেন—তা'হলে আমার একটা কাজ করে দাও ভাই।

ঘরের ভিতর গিয়ে বাক্স খুলে একটা কাগজ নিয়ে এলেন সুধাদি। তার মধ্যে অনেকগুলি ওষুধের নাম লেখা।

সুধাদি আমাদের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন—এই ওষুধগুলি আমাকে এনে দাও।

আমি প্রশ্ন করলাম—আপনার কি কোন অসুখ করেছে সুধাদি?

সুধাদি—হ্যাঁ, ক'দিন থেকে জ্বর হচ্ছে। এখন থেকেই সাবধান না হলে আমাকে আবার সেই ম্যালেরিয়ায় ধরবে। আর···।

বলাই বলে—আর কি সুধাদি?

সুধাদি হেসে হেসে বলেন—আর তোমাদের সুধাদির চেহারা হয়ে যাবে ঐ লছমনের মায়ের মতো, ঝিরঝিরে জিরজিরে কাঠিকাঠি।

কথাগুলি হেসে হেসে বললেও সুধাদির চোখ দুটো কেমন ছলছল করছিল। ভুতো ঘাবড়ে গিয়ে বলে—আপনাকে কেউ নজর দেয়নি সুধাদি?

সুধাদি বেশ জোরে হেসে ওঠেন—তাই হবে, নিশ্চয় কেউ নজর দিয়েছে।

ভুতোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, ভুতো ভাবছে, কে নজর দিল সুধাদিকে? জানতে পারলে তাকে আচ্ছা করে ইটিয়ে···।

আমি বললাম—দিন সুধাদি, ওষুধের নাম লেখা কাগজটা দিন, এখনি ওষুধ এনে দিচ্ছি।

সারা বিকাল আর সন্ধ্যা শহরের সব ওষুধের দোকানে ঘুরেও সুধাদির ঐ ওষুধগুলি পেলাম না। কেউ বললেন, দশ দিন পরে পাওয়া যাবে, কেউ বললেন, একমাস পরে নতুন চালনের সঙ্গে আসবে! একজন বললেন, স্টেশনের বাজারে যে ফার্মাসি আছে, সেখানে এই সব ওষুধ পাওয়া যাবে।

কিন্তু এ যে একটা সমস্যা! কে যাবে স্টেশনের বাজারে? এখান থেকে তের মাইল দূরে রেল-স্টেশন, পথের উপর আবার একটা ভয়ানক জঙ্গল। কাল সকালে সার্ভিস বাসে চড়ে অবশ্য স্টেশনে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাবে কে? যাবার অনুমতিই বা বাড়ি থেকে পাবে কে?

সুধাদির ঐ সুন্দর চেহারাকে সুন্দর ক'রে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তারই জন্য তো আমাদের এত উদ্বেগ, আর এত পরিশ্রম। কিন্তু সবই যে ব্যর্থ হলো, সুধাদির এই উপকারটুকু আমরা করতে পারব না, এটা একটা দুঃখ বৈকি।

সন্ধ্যার শেষে ছোট স্কুলে ফিরবার সময় দেখলাম, হরিদা ফিরে এসেছেন। রান্না করছেন হরিদা। টাট্টু বুড়ো পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

মুখ ভেংচে ভুতো বলে, হুঁঃ, আমাদের সব চান্স নষ্ট করে এতক্ষণে এত রাত

করে মহারাজ ফিরে এসেছেন।

সুধাদির কাছে এসে বললাম, ওষুধ পেলাম না সুধাদি। এখানে পাওয়া যাবে না, যেতে হবে স্টেশনের বাজারে।

সুধাদিও যেন একটু হতাশ হয়ে পড়লেন! বললেন—তাহলে উপায়?

ভুতো হঠাৎ বলে—একটা উপায় হতে পারে সুধাদি। হরিদাকে বললে নিশ্চয়ই এ-কাজটা করে দেবেন!

সুধাদি বলেন—বলে দেখ।

আমাদের সব কথা চুপ করে শুনলেন হরিদা। কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, যেন একটা স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তার পরেই হাত বাড়িয়ে ওষুধের নাম-লেখা কাগজটা আর পাঁচটা টাকা আমাদের হাত থেকে নিয়ে পকেটে ফেললেন হরিদা। বললেন—এখনি যাচ্ছি।

আমি বলি—এখনি কি করে যাবেন হরিদা? এখন তো কোন গাড়ি নেই?

হেসে হেসে হরিদা বললেন—আমার বুড়ো আছে, ওর চেয়ে ভাল গাড়ি হয় না।

বলাই বলে—এই রাত্রে ঐ ভয়ানক জঙ্গল পার হতে আপনার ভয় করবে না হরিদা?

হরিদা বলেন—একটুও না।

বলাই প্রশ্ন করে—কি করে এরকম নির্ভয় হলেন হরিদা, আমাদের বলুন না?

অনুরোধ শুনে হরিদা হাসতে থাকেন। তারপর বলেন—আমার কাছে অ্যাকোনাইট নামে একরকম ওষুধ আছে, এক ড্রপ খেলেই অন্তত চারঘণ্টার মতো মৃত্যুভয় থাকে না।

ভুতো বলে—এখন তাহ'লে ঐ অ্যাকোনাইট খেয়েই আপনি টাট্টু চড়ে জঙ্গলের পথে···।

হরিদা বলেন—হাঁ, এখনই যাব।

সবাই উৎফুল্ল হয়ে দৌড়তে দৌড়তে স্কুল-ঘরে ফিরে এসে সুধাদিকে শুভ-সংবাদ জানালাম। হরিদাকে যা বলেছি, আর হরিদার কাছ থেকে যা শুনেছি, সবই বললাম সুধাদিকে।

শুনে হেসে ফেললেন সুধাদি। বললেন—হরিদাকে আর এক রকমের জব্দ করা হলো, তাই না?

তারপরেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন এবং তারপরে বড় বেশী গম্ভীর হয়ে

গেলেন সুধাদি। বললেন যাই বলো, একরকম করে লোকটাকে জব্দ করা উচিত হলো না। এই রাত্রে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবে, যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে, তবে···।

সুধাদি হঠাৎ কিরকম একটা রাগের সুরেই বলে ওঠেন—লোকটাকে বারণ করা উচিত ছিল তোমাদের।

বারান্দায় থামের গায়ে হাত দিয়ে আরও কি সব ভাবতে থাকেন সুধাদি। তারপর নিজের মনেই বলে ওঠেন—লোকটাই বা কি-রকম? বলা মাত্র ছুটে চলল?

সুধাদির মেজাজ দেখতে ভাল লাগছিল না আমাদের। বললাম—আসি সুধাদি।

বাড়ি যাবার জন্য আমরা তৈরি হতেই সুধাদি বললেন—আমি কি করে জানব, লোকটা নিরাপদে ফিরল কি না?

আমি বললাম—সকাল হলেই খোঁজ নেব সুধাদি।

সুধাদি বললেন—না, এত খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। যাও, এখনি গিয়ে হরিদাকে বারণ করে দিয়ে বলে এস, ওষুধ আনবার দরকার নেই।

দৌড়ে গেল ভুতো, আর ফিরে এসেই বলল—চলে গিয়েছেন হরিদা।

সুধাদি রাগ করে বললেন—রাত হয়েছে, তোমরাও বাড়ি যাও এবার।

বাড়ি ফিরবার সময় অনেক চিন্তা করেও ঠিক বুঝতে পারলাম না, সুধাদি এরকম রাগারাগি করলেন কেন? প্রথমে তো বেশ হেসেছিলেন।

মনে হয়, সুধাদির সম্মানে খুব লেগেছে। যে হরিদা একটা মানুষ নয়, যে হরিদা হলো লোকের হাসির আর জব্দের জিনিস, সেই হরিদার কাছ থেকে উপকার নিতে সুধাদির লজ্জা করবে বৈকি। পলাশতলা থেকে রঙীন চিঠি আসে সুধাদির কাছে, তার উপকার করবে জন গিলপিন হারদা, এটাও তো ভালো কথা নয়।

যাক, কোন রকম বিপদ-আপদ হয়নি। মৃত্যুভয়হীন হরিদা সকাল হতেই ওষুধ নিয়ে হাজির হলেন, আর আমি এক দৌড়ে সেই ওষুধ সুধাদির হাতে পৌঁছিয়েও দিলাম।

একটু পরেই এলো ভুতো আর বলাই। সুধাদি হেসে হেসে বললেন—আজ তো চান্স এসে গিয়েছে!

হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল, সুযোগ আবার এসেছে। হরিদার বুড়ো টাট্টুকে নিশ্চয় আজ বিকালাবলা মাঠের মধ্যেপাওয়া যাবে। পেলে আজ আর রক্ষা নেই।

সুধাদির হাসি দেখে খুশি হয়ে, আর আমাদের প্রতিজ্ঞাটা সুধাদির কাছে আর একবার ঘোষণা করে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। আর, সন্ধ্যা হবার আগেই ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর গিয়ে বসলাম।

দেখে রাগ হলো, মাঠে ঘাস খাবার জন্য আসেনি হরিদা'র বুড়ো। দু' চারটে ছাগলছানা শুধু চরে বেড়াচ্ছে। ঘরের কাছে গিয়ে সুধাদিকে ডাক দিয়ে বললাম—আজও চান্স হলো না সুধাদি।

সুধাদি হেসে ফেললেন—তোমাদের ভাগ্যটাই এই রকম।

দেখলাম, ফস্ করে একটা রঙীন খাম ছিঁড়লেন সুধাদি। এক মিনিটের মধ্যে চিঠি পড়া শেষ করলেন। ঝট্ করে একটা কবিতার বই খুললেন। তার পর দু'মিনিটের মধ্যে একটা চিঠি লিখে ফেললেন।

শুধু চিঠি আর চিঠি। দেখতে আর ভাল লাগে না আমাদের। যেন পলাশতলায় আর এখানে দু'টো চিঠির কল বসে রয়েছে। চেনা নেই, জানা নেই, মুখ দেখাদেখি নেই, তবু দু'দিক থেকে কতগুলি রঙীন লেখার খেলা চলছে।

সুধাদি জিজ্ঞাসা করেন—হরিদা'র সঙ্গে দেখা হতেই কি বললেন?

আমি বললাম—বললেন, তোমাদের সুধাদি কেমন থাকেন, তার জ্বর কমছে কি না, আমাকে মাঝে মাঝে জানিয়ে যেতে ভুলো না ভাই।

সুধাদি বলেন—বলে দিও, খুব ভাল আছি, ওকে কোন চিন্তা করতে হবে না।

তার পরেই বলেন—থাকগে, ওসব কথা ওকে বলা উচিত নয়, বলার দরকার নেই।

ভুতো বলে—তবে কিছু একটা বলতে হবেই তো সুধাদি।

সুধাদি—বলো, ভাল আছেন সুধাদি, ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অনেকক্ষণ ধরে আনমনাভাবে স্কুলেরই মাঠের ফুলগাছের পাশে পাশে পায়চারি করলেন সুধাদি। খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল সুধাদিকে। আমরা আবার দুশ্চিন্তায় পড়লাম। মনে হচ্ছে, আজও আমাদের সঙ্গে কোন খেলায় মেতে উঠবেন না সুধাদি।

আমরা নিঃশব্দে ঘুরঘুর করছিলাম সুধাদির আশেপাশে। হঠাৎ সুধাদি বলে উঠলেন—আর ভাল লাগে না এই ছাই চাকরি। পঁচিশ টাকা তো মাইনে। ছেড়েই দেব এই চাকরি।

সত্যিই বুক কেঁপে উঠল আমাদের! সুধাদি চলে যাবেন, তবে ছোট স্কুলের এই পাঁচিল আর এই সব খেলার উপর কি আর কোন মায়া থাকবে আমাদের? কখনই না।

চুপ করেই রইলেন সুধাদি। আমরা ধীরে ধীরে সরে পড়লাম।—আসি সুধাদি। বেশ জোরে কথাটা বললেও সুধাদি কোন সাড়া দিলেন না।

সমস্যায় পড়লাম আমরাই। সুধাদির চলে যাওয়া বন্ধ করতেই হবে। মাইনে কিছু বেশি করে দিলে সুধাদি নিশ্চয়ই চলে যাবেন না। কিন্তু আমরা কি আর তাঁর মাইনে বেশি করে দিতে পারি?

তিনজনে মিলে আলোচনা করে শেষকালে একটা বুদ্ধি বের করলাম। এলাম হরিদার কাছে। বললাম—সুধাদি ভাল আছেন, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সেই রকমই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন হরিদা, যেন একটা স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছেন। জীবনে এই বোধহয় প্রথম ধন্যবাদ পেলেন হরিদা। সত্যই তো, স্বপ্নেও নিশ্চয়ই এতটা আশা করতে পারেন নি হরিদা।

আমরা বললাম—সুধাদি কিন্তু চলে যাবেন।

চমকে উঠলেন হরিদা—কেন?

ভুতো বলে—পঁচিশ টাকা মাইনেতে চাকরি করতে পারবেন না সুধাদি।

শুনে চুপ করে আর চোখ দুটো বন্ধ করে বসে রইলেন হরিদা।

বলাই বলে—কিন্তু একটা উপায় তো বের করতেই হবে হরিদা।

হরিদা বলেন—হ্যাঁ, দেখি কি উপায় হয়।

জয় হোক হরিদার! মনে মনে হরিদাকে জীবনে প্রথম সম্মান জানিয়ে আমরা যে যার বাড়ি চলে গেলাম।

কিন্তু মাত্র একটি দিন আমাদের মনে এই জয়ের আশা বেঁচেছিল, মরে গেল পরের দিনই।

উঁকি দিয়েছিলাম সতুদার ক্যারম খেলার ঘরে।

সতুদা বলছিলেন—শুনেছিস তো হীরু, জন গিলপিন কি কাণ্ড করেছে, আর তার কি ফল হয়েছে?

হীরুদা বলেন—না।

সতুদা—মনভ্রমরার মাইনে বাড়িয়ে দেবার জন্য ছোট স্কুলের সেক্রেটারির কাছে গিয়ে কিসব আবোল-তাবোল কথা বলেছে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন হীরুদা—সর্বনাশ, জন গিলপিনের পেটে পেটে এত ফন্দিও ছিল।

কানুদা বলেন—দুঃস্বপ্ন! হরিটা একটা অন্ধ।

সতুদা বললে—ফলও ফলে গিয়েছে।

হীরু—কি হয়েছে ?

সতুদা—সেক্রেটারি চরণবাবু হরির গর্দানে হাত দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে তাঁর বৈঠকখানা থেকে সোজা বের করে দিয়েছেন হরিকে।

ভেবেছিলাম এই সব ব্যাপার সুধাদিকে কিছু জানাব না। কিন্তু হরিদা মার খেয়েছেন শুনে মনটা এত খারাপ লেগেছিল যে, পরের দিনই সন্ধ্যাবেলা গিয়ে সুধাদির কাছে সব বলে ফেললাম।

শুনে সুধাদি বড় বেশি রেগে উঠলেন আমাদেরই উপর। এ রকম শক্ত কথা বলতে আর এত ধমক দিতে কখনো তাঁকে দেখিনি।—বকাটে ছেলে সব, পরামর্শ করবার আর লোক পেলে না ? হরিদার কাছে এসব কথা বলতে গেলে কেন তোমরা ? যে লোকটা একটা ইয়ে, যার মাথার কোন ঠিক নেই, তার কাছে গিয়ে······।

বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে একেবারে চুপ করে গেলেন সুধাদি। আমরাও ভয়ে একেবারে বোবা হয়ে গেলাম।

যেন একটা যন্ত্রণায় ছটফট করে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন সুধাদি—ছি ছি ছি, শেষে লোকটাকে তোমরা মার খাওয়ালে ?

তার পরেই সুধাদির সুন্দর মুখেই মধ্যে চোখ দুটো কি ভয়ংকর দপ্ করে জ্বলে উঠল!—কি ভেবেছেন চরণবাবু, সামান্য কারণে একটা মানুষকে অপমান করবেন আর মারাবেন ?

স্কুল-বারান্দার থামের গায়ে হাত দিয়ে ফটকের দিকে তাকিয়ে রইলেন সুধাদি। আস্তে আস্তে খুব ক্লান্ত স্বরে বললেন—লোকটাই বা কি-রকম! কেন মিছামিছি পরের জন্য মাথা ঘামাতে গিয়ে গলা ধাক্কা খায় ?

আলো জ্বেলে দিয়ে গেল স্কুলের মালী। সুধাদি তেমনি থাম ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর বারান্দার উপর আমরা সব চুপ করে গুটিশুটি হয়ে বসে আছি। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, বাড়ি যাবার সময় সুধাদির কাছে ক্ষমা চাইব।

ফটক খোলার শব্দ শুনে ফটকের দিকে তাকালাম। বোধহয়, সন্ধ্যার ডাক-পিয়ন চিঠি নিয়ে আসছে। কিন্তু আসছিলেন যিনি, তাঁকে দেখামাত্র আমরা এমন চমকে উঠলাম যে, কি-যে করব কিছু ভেবে পেলাম না, থাকব, না যাব, কিংবা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াব।

আসছিলেন শান্তিদা। হাতে ছোট একটা ক্যামেরা ঝুলিয়ে আর রঙীন শালে তাঁর শৌখিন চেহারা জড়িয়ে হাসিমুখে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন শান্তিদা।

আমরা তো চমকে উঠলাম, কিন্তু সুধাদি যে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু একটু

আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন! কি আশ্চর্য, সুধাদি কি শান্তিদাকে চিনতে পারছেন না?

সুধাদি আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে আসছেন, চেন তোমরা?

—সে কি সুধাদি? শান্তিদা আসছেন।

চমকে উঠলেন সুধাদি, শান্তিদাও কাছে এসে পড়েছেন, আর এসেই হেসে হেসে বললেন—বোধহয় ভাবতে পারনি, আমি এইভাবে হঠাৎ এসে তোমাকে একদিন চমকে দেব।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুধাদি। বোধহয় সত্যিই ভাবতে পারেন নি যে, চিঠির মানুষ একদিন এসে কথা বলবে। এত রঙীন কথার মানুষকে এত কাছে চোখে দেখার পর এত অচেনা ও অজানা বলে মনে হবে তাও বোধহয় আগে বুঝতে পারেন নি সুধাদি।

আমরাই চেয়ার টেনে নিয়ে এসে শান্তিদাকে বসতে দিলাম। সুধাদি সেই রকমই কেমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শান্তিদা আমাদের দিকে তাকালেন, বোধহয় আমাদের বয়সগুলির দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তার পরেই সুধাদির দিকে তাকিয়ে বললেন—কলকাতা থেকে মা চেয়ে পাঠিয়েছেন তোমার একখানি ফটো।

উত্তর দিলেন না সুধাদি। যেন একেবারে অপরিচিত একটা মানুষ এসে সুধাদির সঙ্গে কথা বলছেন, তাই ভয় পেয়ে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছেন সুধাদি!

শান্তিদা হাসিমুখে বললেন—আজ শুধু জানিয়ে গেলাম, কাল আসব ফটো তুলতে। তারপর যা ব্যবস্থা করবার সবই করবেন মা।

সুধাদি বলেন—না, কাল আসবেন না।

শান্তিদা চেয়ার ছেড়ে ওঠেন। সুধাদির কাছে এগিয়ে যেয়ে গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলেন—না, আর দেরি করা উচিত নয়, আমি কালই এসে তোমার ফটো নিয়ে যাব। কেমন?

হাঁ বা না, কোন উত্তরই দিলেন না সুধাদি। শান্তিদা কিন্তু হাসিমুখেই চলে গেলেন।

দু'হাতে কপাল চেপে বারন্দার মেঝের উপর বসে পড়লেন সুধাদি বললেন—তোমরা এবার বাড়ি যাও।

দিনটা ছিল রবিবার। সকাল হতেই শহরের পুবের পাহাড়ের মাথা অন্ধ

দিনের মতো সেদিনও রঙীন হয়ে উঠল। চটপট তৈরী হয়ে নিয়ে আমরা ছোট স্কুলের দিকেই ছুটে চললাম। পলাশতলার ক্যামেরা আসবে আজ সুধাদির ঘরে। সুধাদিও বোধহয় সেই বাসন্তী পূজার মতো চাঁপা রঙের শাড়ি পরে বড় সুন্দর হয়ে উঠবেন। ফোটা পলাশের রঙ আবার ছড়িয়ে পড়বে সুধাদির মুখের উপর। নানারকম আশায় ছট্‌ফট্‌ করছিল আমাদের মন।

ছোট স্কুলের ফটকে ঢুকবার আগেই থমকে দাঁড়ালাম আমরা। রঙীন খড়ি দিয়ে ফটকের পাশের দেওয়ালে লেখা রয়েছে—শান্তি-সুধা-শান্তি-সুধা।

কে লিখল এই কথা? কে জেনে ফেলল পলাশতলার রঙীন চিঠির কথা? আমরা তো কোনদিনই সতুদার কাছে কিংবা কোন দাদার কাছে শান্তিদা আর সুধাদির চিঠির গল্প করিনি। তবে কি কাল সন্ধ্যাবেলা ছোট স্কুলের ফটক দিয়ে শান্তিদাকে ঢুকতে কিংবা বের হয়ে যেতে কেউ দেখেছে?

ভুতো বলে—এটুকুও বুঝতে পারলি না বোকা। যারা এতদিন ধরে জানবার চেষ্টা করছিল, তারাই জেনেছে আর লিখেছে।

এইবার বুঝলাম, এই রঙীন খড়ির লেখা কা'দের হাতের কীর্তি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল, রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রঙীন খড়ির শান্তি-সুধার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন হরিদা। দু'চোখের পলক পড়ছে না, পাথরের মতো চোখ নিয়ে দেখেছেন হরিদা। তার পরেই মনে হলো, হরিদার পাথুরে চোখ দুটো যেন চিক-চিক করছে। ডাকলাম—ও হরিদা, কি দেখছেন?

সাড়া দিলেন না হরিদা। শুনতে পেলেন কি না, তা-ও বুঝলাম না।

যাক গিয়ে, হরিদার পাথুরে চোখ আর চোখের চিকচিক। সুধাদির চাঁপা-রঙের সাজ দেখবার লোভে তখন আমরা ছটফট করছি। ফটক পার হয়ে সুধাদির ঘরের কাছে এসে দাঁড়লাম।

সুধাদি তখন তাঁর ঘরের ভিতর খাটের উপর বসে বই পড়ছিলেন। আমরা ডাক দিতেই বললেন—ভেতরে এস।

অসুখ হয়নি, কিন্তু ভয়ানক অসুখের মতো দেখাচ্ছিল সুধাদির চেহারাটা। হেসে হেসে বললেন সুধাদি—আমাকে আজ বাঁচাতে পারবে তো?

মুখ কালো হয়ে গেল আমাদের—আপনার কি অসুখ হয়েছে সুধাদি?

সুধাদি বলেন—অসুখ নয় ভাই।

ভুতো প্রশ্ন করে—তবে কি?

উত্তর দিলেন না সুধাদি। বইটা বন্ধ করে অনেকক্ষণ আবার আনমনার মতো চোখ নিয়ে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন—হরিদা'র খবর কি?

ভাল আছেন তো?

আমরা চুপ করেই ছিলাম। সুধাদিই আবার ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলেন—কি? হরিদার সঙ্গে তোমাদের কি আর দেখা হয়নি?

বলাই বলে—এই তো এখনি ফটকের কাছেই দেখা হল হরিদার সঙ্গে। ডাক দিলাম, কিন্তু কোন সাড়াই দিলেন না।

উঠে বসলেন সুধাদি—কি রকম? কি করছিলেন হরিদা?

খুলে বলতে সত্যিই সঙ্কোচ হচ্ছিল আমাদের সবারই। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে পরামর্শ করছিলাম, সত্যিই ব্যাপারটা বলে ফেলব কি না? বলাই বলল—তুই বল না ভুতো।

ভুতো বলে—ফটকের পাশের দেয়ালে কে যেন রঙীন খড়ি দিয়ে লিখে রেখে দিয়েছে।

সুধাদি—কি লিখেছে?

ভুতো—শান্তি-সুধা।

হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুধাদি চেঁচিয়ে ওঠেন—কে লিখল? কোন্ মুখ্‌খু এসব মিথ্যা কথা লিখল?

আমি বললাম—আমরা কি করে বলব সুধাদি।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সুধাদি। সত্যি যেন জ্বর হয়েছে, আর সেই জ্বরের জ্বালা সহ্য করতে পারছেন না। ছটফট করে বলে উঠলেন—কে জানে, তোমাদের হরিদাও বোধহয় এতক্ষণে ঐ মিথ্যা কথাটা দেখে ফেলেছেন।

ভুতো—হরিদা দেখে ফেলেছেন সুধাদি।

সুধাদি—ছি ছি ছি, কি ভাবল লোকটা!

আর একবার ছটফট করে ওঠেন সুধাদি। বলেন—যাও, এখনি গিয়ে লেখাটা মুছে দিয়ে এস।

রঙীন খড়ির লেখা মুছে ফেলবার জন্য আমরা দৌড় দিয়েই চলে যাচ্ছিলাম। পিছন থেকে সুধাদি ডাকলেন—শোন।

শোনবার জন্য ফিরে এলাম। সুধাদি আঁচল দিয়ে কপাল মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—হরিদাকে গিয়ে বলো, তিনিই যেন ঐ লেখাটা নিজের হাতে মুছে দেন। বলো, আমি বলেছি।

এক দৌড়ে ফটক পার হয়ে রাস্তার উপর এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, হরিদা সেখানে আর নেই। চলে এলাম হরিদার ঘরের কাছে। কিন্তু এখানেও নেই হরিদা। দরজায় কোন তালাও ঝুলছে না, পেয়ারা গাছের তলায় বুড়ো টাট্টুটাও

আর নেই। একেবারে খোলামেলা শূন্য হয়ে পড়ে আছে হরিদার ঘর। হরিদার সেই ছোট খাটিয়াও আর নেই।

খোঁজ নিলাম পাশের ঘরের দোকানী রতনলালের কাছে। রতনলাল বলে—চলে গিয়েছে হরি ডাক্তার, ঘর ছেড়ে দিয়েই চলে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করি—কোথায় গিয়েছেন?

রতনলাল বলে—জানি না।

সুধাদির কাছে ফিরে এসে খবরটা দিতে কেন যেন বড় ভয় করছিল। ভীরু বলাইয়ের চোখটা তো প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে উঠল। তবু বলে ফেললাম—হরিদা চলে গিয়েছেন সুধাদি।

সুধাদি—কোথায়? ডাক্তারি করতে?

ভুতো বলে না, একেবারে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন। রতনলালও জানে না কোথায় গিয়েছেন হরিদা।

চোখের তারা দুটো নিশ্চল করে তাকিয়ে রইলেন সুধাদি। যেন নিজের মনেই ভাঙা নিঃশ্বাসের ব্যথার মতো অস্পষ্ট স্বরে বললেন—চলেই গেল মানুষটা, রঙীন খড়ির একটা বাজে লেখাও সহ্য করতে পারল না।।

সুধাদির চোখ থেকে টপ করে বড় একটা জলের ফোঁটা ঝরে পড়ল সুধাদির হাতের চুড়ির উপর। দৌড়ে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন সুধাদি। কাগজ কলম টেনে নিয়ে একটা চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

আবার চিঠি? কার কাছে, কিসের চিঠি? বুঝতে পারছিলাম না কিছুই। লেখা শেষ করে একটা সাদা খামের ভিতর চিঠিটা পুরে খামের উপর নাম লিখলেন সুধাদি—হরিপদবাবু, শ্রদ্ধাস্পদেষু।

তারপর আমাদের বললেন—এখনি যাও, সব জায়গায় খুঁজে দেখ। যেখানেই লুকিয়ে থাকুক হরিদা, তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। দেখা পেলেই এই চিঠি হরিদার হাতে দেবে।

ভয়ে ভয়ে বললাম—যদি দেখা না পাই সুধাদি?

সুধাদি চেঁচিয়ে উঠলেন—নিশ্চয় দেখা পাবে, এরই মধ্যে কোথায় পালিয়ে যাবেন তোমাদের হরিদা?

সকাল থেকে সারা দুপুর পর্যন্ত শহরের সব জায়গায় খোঁজ করলাম। কোথাও দেখা পেলাম না হরিদার। মোটর বাস কোম্পানিতে এসে খোঁজ নিলাম। দারোয়ান বলল, হ্যাঁ, সকাল নটার মোটর বাসে চলে গিয়েছেন হরি ডাক্তার।

চকের কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে আমরা ভাবলাম, কি গতি করব এই

চিঠিটার ? হরিদার কাছে লেখা সুধাদির এই চিঠি, কি আছে এর মধ্যে কে জানে ?

ভুতোর একবার ইচ্ছা হয়েছিল, চিঠি খুলে নিয়ে পড়া যাক। বাধা দিল বলাই —ছিঃ, গুরুজনদের চিঠি পড়তে নেই।

সুতরাং সকলে মিলে ঠিক করলাম, একটা ডাক টিকিট লাগিয়ে চিঠিটাকে ডাক-বাক্সেই ফেলে দেওয়া যাক। কে জানে কপালে যদি থাকে, তবে একমাস দু'মাস বা কয়েক বছর পরেও হয় তো হরিদার হাতে পৌঁছে যাবে এই চিঠি। এই রকম ঘটনার গল্পও তো কত শুনতে পাওয়া যায়।

বিকাল হবার পর ছোট স্কুলের পাঁচিলের দিকে যেতেই চোখে পড়ল, শান্তিদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুধাদির ঘরের বারান্দায়। আর সুধাদি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ঘরের দরজায়। শান্তিদার হাতে ক্যামেরা ঝুলছে ঠিকই, কিন্তু সুধাদির গায়ে চাঁপা-রঙের শাড়ি তো দেখা যাচ্ছে না। বরং কি রকম আলুথালু চুল নিয়ে আর ধুতির মতো সরু পাড়ের একটা আধময়লা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন সুধাদি।

আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে সুধাদির আশে পাশে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। শান্তিদা তখন আশ্চর্য হয়ে বলছিলেন—কি বললে, আমাকে তুমি চেন না ?

সুধাদি—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কতটুকু পরিচয়ই বা আমি জানি ? কিছুই জানি না।

রঙীন খামের চিঠির মস্ত বড় একটা মালা সুধাদির ঘরের দেয়ালে তখনো ঝুলছিল। সেই দিকে আঙুল তুলে শান্তিদা বললেন—তবে ওগুলি কি ?

সুধাদি—কতগুলি রঙীন চিঠি ?

শান্তিদা—কি আছে ঐ চিঠির মধ্যে, জান না ?

সুধাদি—জানি, কি আছে।

শান্তিদা—কি আছে ?

সুধাদি—কবিতা, গান, রঙ, কথা, ছবি।

শান্তিদা বললেন—শুনে সুখী হলাম। তাহলে তোমার আর কিছু বলবার নেই।

সুধাদি—আছে।

শান্তিদা—কি ?

সুধাদি—ক্ষমা করবেন।

শান্তিদা কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

সুধাদি—বলুন।

শান্তিদা—বোধহয় আমাকে অপমান করবার জন্যই ইচ্ছে করে এরকম বিধবার মতো সাজ করেছ?

চোখ দুটো শক্ত করে উত্তর দিলেন সুধাদি—আজ্ঞে না।

শান্তিদা—তবে?

সুধাদি—বিধবা হয়েছি।

শন্তিদা ভ্রূকুটি করেন—কবে?

সুধাদি—আজ।

শান্তিদা বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করলেন—আজ ক'টার সময়?

চুপ করে রইলেন সুধাদি। শান্তিদা বিশ্রী রকমের চোখের দৃষ্টি তুলে তাকালেন সুধাদির দিকে—কি? একটা বাজে কথা বলে চুপ করে গেলে কেন? উত্তর দাও।

চট করে উত্তর দিয়ে দিল ভুতো—আজ সকাল ন'টার সময়।

চমকে ওঠেন শান্তিদা—তার মানে?

ভুতো বলে—আজ সকাল নটার গাড়িতে চলে গিয়েছেন হরিদা, আর ফিরে আসবেন না হরিদা।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছেন শান্তিদা।—ওঃ, এইবার বুঝলাম। ধন্যবাদ।

হন্ হন্ করে হেঁটে ফটক পার হয়ে চলে গেলেন শান্তিদা। সুধাদি ঘরের ভিতর ঢুকে খাটের উপর শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে পড়ে রইলেন। আমরা একেবারে মন-মরা হয়ে পাঁচিলের উপর গিয়ে বসলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে আর ছোট একটা ভাঙা চাঁদও উঠেছে পশ্চিমের আকাশে।

ভাল লাগছিল না কিছু। নিঝুম হয়ে রয়েছে স্কুলঘর। বড় মাঠের বুকে হাওয়া খেলছে খুব, আর ঘাসের উপর চাঁদের আলোও পড়েছে। পাঁচিল থেকে নেমে আমরা মাঠের ঘাসের উপর গল্প করতে বসলাম।

হঠাৎ তীরের মতো বেগে আর খুটখুট শব্দ করে যেন একটা ছায়া ছুটে এসে আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়াল। দেখলাম, ছায়া নয়, হরিদার বুড়ো। বুড়োর পায়ে আজ আর দড়ির বাঁধন নেই। বুড়োর পায়ের বাঁধন খুলে বুড়োকে যেন একেবারে মুক্তি দিয়ে চলে গিয়েছেন হরিদা।

কিন্তু আমাদের কি চিনতে পারছে না বুড়ো? যদি চিনতে পেরেই থাকে, তবে পালিয়ে যায় না কেন?

কি আশ্চর্য, এক-পা দু-পা করে আস্তে আস্তে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসতে থাকে বুড়ো। সাহসী ভুতো ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে।—ওরে বাবা!

এক দৌড় দিয়ে ছুটে এসে স্কুলের পাঁচিলের উপরে আমরা উঠলাম। হরিদার বুড়ো সেই খোলা মাঠের হাওয়াতে বোঁ বোঁ করে একটা চক্কর দিয়ে ঠিক আবার আমাদের এই পাঁচিলের কাছেই এসে দাঁড়াল। আমাদের দিকে মুখ তুলে একেবারে স্থির ও শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বুড়ো। আরও ভয় পেয়ে আর হুড়মুড় করে আমরা পাঁচিল থেকে নেমে সুধাদির ঘরের বারান্দায় এসে উঠলাম।

ঘরের ভিতর থেকে সুধাদি বললেন—কে?

—আমরা।

সুধাদি ভিতর থেকে বের হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন আবার পাঁচিলের কাছে গিয়ে কি করছ তোমরা?

—হরিদার বুড়ো আজ নিজের থেকেই ধরা দিতে আসছে সুধাদি।

কেঁপে উঠল সুধাদির উদাস চোখ দুটো। বললেন—থাক, কিছু বলো না।

খুব শান্ত হয়ে গিয়েছেন সুধাদি। বড্ড আস্তে আস্তে কথা বলছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার শরীর ভাল আছে তো সুধাদি?

সুধাদি বললেন—হ্যাঁ···এবার তোমরা বাড়ি যাও।

—আসি সুধাদি। সুধাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম আমরা। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ছোট স্কুলের পাঁচিলের মায়া আর খেলা এতদিনে শেষ হলো। আর খেলা কোনদিনই জমবে না। খেলা আর হবেই কিনা, ঠিক কি? হরিদাকে জব্দ করবার আর কোন চান্স নেই।

সুধাদি ডাকলেন—একটা কথা শুনে যাও।

কাছে আসতেই হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার চিঠিটা কই?

সাহসী ভুতো গলা কাঁপিয়ে বলে—ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছি সুধাদি।

দু'হাতে মুখ ঢাকেন সুধাদি। আমরাও সরে এলাম। ছোট স্কুলের ফটক পার হয়ে রাস্তায় পা দেবার আগেই শুনতে পেলাম, গুনগুন্ করে কাঁদছেন সুধাদি।

ক্যারম খেলার শব্দ শুনে সতুদাদের ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। উঁকি দেওয়া মাত্র শুনলাম, সতুদা বলছেন—শুনেছিস্ হীরু, মনভ্রমরার খবর?

হীরুদা বলেন—কি খবর?

সতুদা—কার ওপর মজেছে বল দেখি?

হীরুদা—কার ওপর?

সতুদা—শান্তিপদ নীলকমলে।

আমার পাশে দাঁড়িয়েই জানালার গরাদ ধরে ভুতো চেঁচিয়ে ওঠে।—হরিপদ নীলকমলে।

চমকে আর রেগে একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে সতুদা খপ্ করে ভুতোর একটা কান ধরলেন। বল্ ছোঁড়া, এর মানে কি ?

ভুতো আর্তনাদ করে—আঃ, মানে হচ্ছে, হরিদা চলে গিয়েছেন, তাই সুধাদি গুন্‌গুন্ করে কাঁদছেন।

ভুতোর কান ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে হীরুদা আর কানুদার মুখের দিকে বার বার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে থাকেন সতুদা।—এ কী বলছে রে হীরু !

সতুদাই কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবেন। মুখ কালো করে বসে থাকেন। তার পরেই বলেন—আমারও কি-রকম মনে হচ্ছে হীরু।

হীরুদা—কি মনে হচ্ছে ?

সতুদা—মনে হচ্ছে, ঠিকই বলেছে স্টুপিড ভুতোটা।

কানুদা বলেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে।

হীরুদা বলেন—আমারও তাই মনে হয়।

সতুদা কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন, তারপরেই বলেন—তবে চল্, লেখাটা মুছে দিয়ে আসি।

আ ত্ম জা

উপেনবাবুর ছেলে নেই, একথা তাঁরা সকলেই জানেন যাঁরা উপেনবাবুকে জানেন। সন্তান বলতে শুধু দুটি মেয়ে আছে উপেনবাবুর।

নিকট আত্মীয় অথবা বন্ধুস্থানীয় যাঁরা উপেনবাবু সম্পর্কে আরও বেশি খবর রাখেন, তাঁরা জানেন যে, উপেনবাবুর মেয়ে হলো একটি এবং আর একটি হলো মেয়ের মতো।

রমা আর অম্বি। একটি হলো উপেনবাবুর আত্মজা, আর একটি হলো পালিতা। একটি মেয়ে এবং একটি মেয়ের মতো, এই দুই সন্তানকে নিয়ে সপত্নীক উপেনবাবু একটা বহু পর্যটনার সার্ভিস খাটতে খাটতে সারা ভারতের প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ডের জল-বাতাস উপভোগ করে এখন কলকাতায় এসে অবসর উপভোগ

করছেন। পণ্ডিতিয়ার পশ্চিমে পুরনো বস্তি ভেঙ্গে যে নতুন রাস্তাটা হয়েছে, তারই পাশে উপেনবাবুর নতুন বাড়ি।

প্রতিবেশিনীদের মধ্যে যাঁরা নবাগত উপেন পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হননি, তাঁরা অনুমান করেন, এই দুটি মেয়ে নিশ্চয় যমজ মেয়ে। দু'জনেই মাথায় মাথায় সমান। দু'জনেই বেশ দেখতে, মুখের ধাঁচে দু'জনের মধ্যে কোন পার্থক্যও দেখা যায় না। দু'জনেরই চোখ দুটো একই রকমের টানা-টানা। তবে একজনের গায়ের রঙ হলো মায়ের গায়ের রঙের চেয়ে একটু বেশী উজ্জ্বল, এবং আর এক-জনের গায়ের রঙ মায়ের তুলনায় একটু কম ফরসা। কেমন একটা শ্যামল ছায়া দিয়ে মাখানো রঙ। বয়স দু'জেনর তো একেবারে সমানই মনে হয়, এবং স্বভাবও যে একই রকমের। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে সবচেয়ে নিন্দুক চক্ষুগুলিও দেখে খুশি হয়েছে, আলাপে আচরণে এবং চলায়-বলায় দু'জনেই বেশ শান্ত। যেমন লাজুক, তেমনি ভদ্র। এত মিল যখন, তখন এ'দুটি মেয়ে নিশ্চয় যমজ মেয়ে।

পরিচিত হবার পর প্রতিবেশিনীদের ভুল ভাঙ্গে। উপেনবাবুর স্ত্রী চারুবালাই আগন্তুক আলাপকারিণীর ভুল ভেঙ্গে দেন।

চারুবালা বলেন—রমা হলো আমার মেয়ে, আর অম্বিকে আমার মেয়ের মতোই মনে করতে পারেন।

প্রতিবেশিনীদের কৌতূহল আর মুখের প্রশ্নগুলির সামনে রমা হাসিমুখে বসে থাকে, আব অম্বি মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে আনমনার মতো দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে অম্বি।

প্রতিবেশিনীরা বললে—তাই বলুন! আমরা তো ভেবেই পেতুম না, দু'বোন হয়েও দু'জনের মধ্যে একটুও মিল নেই কেন।

রাজশাহীর পিসিমা প্রায় কুড়ি বছর পরে এলেন তাঁব ভাই উপুকে দেখতে। রমা পিসিমার পায়ে হাত দিয়ে সামনে বসে থাকে, আর অম্বি পাখা হাতে নিয়ে পিসিমার মাথায় বাতাস দেয়।

পিসিমা প্রশ্ন করেন—এটি কে রে উপু?

উপেনবাবু—ও হলো রমা, আমার মেয়ে।

পিসিমা—আর এটি কে?

উপেনবাবু—ওর নাম অম্বালিকা, আমার মেয়ের মতোই।

হঠাৎ ব্যথা পাওয়ার মতো অম্বির হাতটা চমকে ওঠে, হাতের পাখা তুলে মুখ ঢাকা দেয় অম্বি। কে জানে, নিজের পরিচয় শুনে এভাবে চমকে উঠে অম্বি, না ঐ পরিচয়টাকেই সহ্য করতে পাবে না? কিংবা একটা অহেতুক লজ্জা? চারুবালা

জানেন, অম্বির এই একটা বেয়াড়া অভ্যাস।

পিসিমা প্রশ্ন করেন—তোদের কাছেই মেয়েটা মানুষ হয়েছে বুঝি?

উপেনবাবু—হ্যাঁ।

পিসিমা—নামটা ওরকমের কেন?

উপেনবাবু—নামে কি আসে যায় বড়দি। মুখে একটা নাম চলে এল, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলাম, ব্যাস্।

এর বেশি কিছু আর বড়দিকে জানাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না উপেনবাবু। কাউকেই এর বেশি কিছু কোনদিন বলেনও নি। উপেনবাবুর এই অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়ে প্রায় কুড়ি বছর আগের যে-ঘটনার ছবি তাঁর মনের মধ্যে চকিতে উঁকি দিয়ে চলে গেল, সে ঘটনা শুধু জানেন উপেনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী চারুবালা। অম্বালিকা, এই নামের ইতিহাসের সঙ্গে অম্বির জীবনেরই ইতিহাস মিশে রয়েছে। সে বড় পুরনো ইতিহাস, আজ সেটা নিছক একটা আষাঢ়ে কাহিনীর মতোই অবাস্তব বলে মনে হয়।

পূর্ব গোদাবরী জেলার ভিতর তখন যে নতুন রেল লাইন তৈরী করা শুরু হয়েছিল, তার তদারকের ভার ছিল রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবুরই উপর। গোদাবরীর একটা শাখাস্রোতের ধারে রেল ইঞ্জিনিয়ারের বাংলো। কুলিরা মাস ছয়েক বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে এসে বাংলোর বারান্দায় শুইয়ে দিল।

উপেনবাবু বিরক্ত হন—কার মেয়ে? এখানে কেন?

কুলিরা বলে—আপনার ট্রলিম্যানের মেয়ে।

উপেনবাবু—কোন্ ট্রলিম্যান? সেই ভাল্লুকে আঁচড়ানো মুখ, রোগা-মতন লোকটা?

কুলিরা—হাঁ সাব।

উপেনবাবু—সে কোথায়?

কুলিরা—কলেরায় মরেছে। ওর বউও মরেছে। দুজনকেই নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু এই মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে, কিন্তু এটাকে তো আর ভাসিয়ে দেওয়া যায় না সাব।

উপেনবাবু—নিশ্চয় না, কিন্তু এ সব ঝামেলা আমার এখানে কেন? গাঁয়ের কোন লোকের বাড়িতে ওকে রেখে দিয়ে এস।

কুলিরা আক্ষেপ করে—এ জাতের মেয়েকে এই গাঁয়ের কেউ ঘরে রাখবে না সাব।

উপেনবাবু চুপ করে থাকেন। একটা কুলি বলে—ওকে তো শেয়ালে টেনে নিয়েই যাচ্ছিল। যদি আমরা ঠিক সময় মতো না পৌঁছে যেতাম, তবে এতক্ষণে ওর···।

ঘরের ভিতরে দু'মাসের রমাকে আয়ার কোলে তুলে দিয়ে চারুবালা বাইরে বের হয়ে আসেন।—শেয়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল? এই মেয়েকে?

কুলিরা বলে—হাঁ, মেমসাব।

চারুবালা বলে—মেয়েটা রইল, তোমরা যাও।

কুলিরা চলে যায়, এবং আবার ঘরের ভিতরে এসে দু'মাসের রমাকে আয়ার কাছ থেকে নিজের কোলে নিয়ে চারুবালা বলেন—ঐ মেয়েটাকে এখনি গরম জল আর সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে একটা জামা পরিয়ে দাও আয়া।

কাজে বের হয়ে যান রেল ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবু। দশ মাইল দূরের অফিস-তাঁবু থেকে ট্রলি করে ফিরে এসে যখন আবার এই বাংলো-বাড়ির বারান্দায় উঠলেন উপেনবাবু, তখন রাত মন্দ হয়নি। বারান্দায় চেয়ারে বসে ধুলোমাখা বুটের ফিতা খুলতে খুলতেই চেঁচিয়ে চারুবালাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—মেয়েটা ঘুমিয়েছে নাকি?

চারুবালা—কোন মেয়েটা?

উপেনবাবু—ঐ যে, সেই মেয়েটা! আজ সকালে যে অম্বালিকাটি এসেছে।

চারুবালা—হ্যাঁ, দুধ খেয়ে আয়ার ঘরে ঘুমিয়ে আছে।

যেমন আকস্মিক মেয়েটার আবির্ভাব, তেমনি আকস্মিক মেয়েটার নামকরণ। প্রায় কুড়ি বছর আগে ঐ ছয়-মাসের যে একটা প্রাণ শিয়ালেরও মুখ থেকে উদ্ধার পেয়ে রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবুর কোয়ার্টারের একটি ঘরে দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সেই প্রাণটাই আজ উপেনবাবুর নিজের মেয়ের মতো হয়ে গিয়েছে!

এই মেয়েকে নিজের মেয়ের মতো মনে করবার অথবা গড়ে তুলবার কোন ইচ্ছা ছিল না উপেনবাবুর, চারুবালারও না। শুধু একটা প্রাণকে ক'টা দিন আশ্রয় দিয়ে আর খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা, এইমাত্র। থাকুক কিছুদিন। আর এক বছর পরেই তো এদিকের কাজ শেষ হবে, নতুন সার্ভের কাজে গঞ্জামে বদলি হয়ে চলে যাবার আগেই এই মেয়েকে ওরই জাতের একটা লোকের হাতে সঁপে দিয়ে এবং কিছু টাকা দিয়ে চলে গেলেই হবে।

এক বছর পরেই, বদলি হবার আগে খোঁজ-খবর করায় মাইল দশেক দূরের এক গাঁ থেকে ক'জন জাতের লোকও এসেছিল। মাত্র পঞ্চাশটা টাকা পেলেই তারা সেই মেয়েকে মানুষ করবার ভার নিতে রাজি আছে।

ঘরের ভিতর থেকেই চারুবালা বলেন—দূর কর, দূর কর! কোত্থেকে কতগুলো অলক্ষুনে আপদ এসে জুটেছে।

লোকগুলির দিকে ভ্রূকুটি করে উপেনবাবুও বলেন—আগে নিজেরা মানুষ হও, তারপর পরের মেয়েকে মানুষ করবে।

চেয়ার থেকে উঠে সত্যসত্যই তাড়া দিলেন উপেনবাবু—ভাগো, ভাগো, ভাগো!

অমানুষগুলিকে তো ভাগিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু অম্বির মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা না করে পারেননি উপেনবাবু, চারুবালাও। যদি এই মেয়ে এভাবে বড় হয়ে উঠতে থাকে, এবং যদি এভাবে কারও কাছে এ মেয়েকে তাঁরা ছেড়ে দিতে না পারতে থাকেন, তবে এই মেয়ের পরিণামই বা কি হবে? সমস্যাটা কল্পনা করতে পেরেছিলেন উপেনবাবু। এ মেয়ে তাহলে যে বাড়ির মেয়ের মতো হয়ে উঠবে।

কিন্তু বাড়ির মেয়ের মতো হয়ে উঠলে ক্ষতি কি? কিসের ভয়? এই প্রশ্নগুলিকেও দূরদর্শী উপেনবাবু বিচার করে দেখতে আর বুঝতে ভুলে যাননি।

ক্ষতি, মেয়েটারই ক্ষতি। মেয়েটার মনটা হয়ে যাবে এ-বাড়ির মেয়ের মন, অথচ বিয়ে দেবার জন্য খুঁজতে হবে এ-বাড়ির চেয়ে অনেক নীচের জাতের একটা বাড়ি। সে বাড়িকে তখন এই মেয়েটাই বা সহ্য করবে কেমন করে?

উপেনবাবু আর চারুবালার ক্ষতিটাই বা কি কম হবে? একটা মমতার ভুলে মেয়েটাকে যদি একেবারে বাড়ির মেয়ের মতো করে ফেলা হয়, তবে যার তার হাতে আর যে-সে ঘরে মেয়েটাকে তুলে দিতেও যে মনটা কেমন কেমন করে উঠবে!

সতর্ক হয়েছিলেন, এবং একটা পরিকল্পনাও করেছিলেন উপেনবাবু। চারুবালাও সায় দিয়ে বলেছিলেন—তাই ভাল। গঞ্জামে থাকতে থাকতে একটা ব্যবস্থা করে ফেললেই হবে।

গঞ্জামে থাকতে থাকতেই কোন একটা চাপরাশি বা ভেণ্ডারের ছেলের সঙ্গে অম্বির বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। এই রকম শিশু বয়সেই তো এ জাতের বিয়ে হয়। শুধু খোঁজ করে বের করতে হবে, ভাল একটা ছেলের-বাপ। খেটে খুটে খেয়েপরে আছে, এই রকম একটি শ্বশুরের হাতে অম্বির ভাগ্যকে সঁপে দিতে পারলেই দায়মুক্ত হওয়া যাবে। মোটামুটি এই ছিল উপেনবাবুর পরিকল্পনা।

আশ্চর্যের বিষয়, গঞ্জামের তিনটি বছরের মধ্যে একটি দিনও অম্বির জন্য পাত্র খুঁজবার চেষ্টা করেননি উপেনবাবু। চারুবালাও স্মরণ করিয়ে দেননি। গঞ্জাম

থেকে বদলি হয়ে যাবার আগে উপেনবাবু বললেন—না, আর বেশি দেরি করা উচিত নয়। সাসারামে গিয়েই একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। মেয়েটাকে আর বেশি ভদ্র করে তুলে লাভ নেই। বয়স অল্প থাকতে থাকতে, আর মনটা পেকে উঠবার আগেই রেল-অফিসের কোন ছোকরা পিওন টিওনের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে।

চারুবালা বলেন —দিতেই হবে। একটু ভাল পণ দিলে ওরকম পাত্রও পেয়েই যাবে।

সাসারামের পাঁচ বছর কাটিয়ে দিয়ে ঝাঁসি যাবার সময় আক্ষেপ করলেন উপেনবাবু—এ তো বাড়ির মেয়ের মতোই হয়ে উঠছে দেখছি। এখন কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

চারুবালা বলেন—রমার মাস্টার পড়াতে এলে রমার দেখাদেখি অম্বিও আজকাল মাস্টারের সামনে গিয়ে বসতে আরম্ভ করেছে।

উপেনবাবু—কেন ?

চারুবালা -লেখাপড়া শিখতে চায় অম্বি।

উপেনবাবু—না না, কোন লাভ নেই, মাস্টারকে আড়ালে ব'লে দিও, অম্বিকে যেন কিছু না শেখায়।

চারুবালা—আমি অম্বিকেই বারণ করে দিয়েছি।

উপেনবাবু— ভাল করেছ। একটু এ-বি-সি-ডি আর কবিতা শিখে লাভ তো কিছু নেই, উল্টো মেয়েটার না-এদিক না-ওদিক একটা অবস্থা হবে। মুটে মজুরের ঘরকে ঘেন্না করবে অথচ কোন ভদ্রঘরে ঠাঁই পাবে না। সুতরাং

চারুবালা বলেন—ঝাঁসিতে থাকতে থাকতেই মেয়েটাকে পাত্রস্থ করার যাহোক একটা উপায় বের করতেই হবে।

বহু দূর অতীতের সে-সব চেষ্টার কাহিনী এখন অতীতের একটা স্মৃতি মাত্র। আজ দেখা যাচ্ছে, উপেনবাবু ও চারুবালার প্রত্যেকটি পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ করেই বড় হয়ে উঠেছে অম্বি। যে মেয়েকে বাড়ির মতোও মনে করতে চাননি উপেনবাবু, সেই মেয়েই আজ তাঁর নিজের মেয়ের মতো হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, ঐ মেয়ের-মতো পর্যন্তই। বাস্, আর না, আর বেশি নয়। অম্বিকে মানুষ করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে যেন থেমে গিয়েছেন উপেনবাবু আর চারুবালা। কারণ, সমস্যাটা এসেই পড়েছে। রমার বিয়ে দিতে হবে, অম্বিরও বিয়ে দিতে হবে। ভয় হয়, অম্বিও যেন রমার মতো, অর্থাৎ লেখাপড়া-জানা

ভদ্রলোকের মতো শখ আর মন না পেয়ে যায়। রমার জন্য যেরকম পাত্র পাওয়া যাবে সেরকম পাত্র তো আর অম্বির জন্য পাওয়া যাবে না। অম্বির জীবনটাই যে একটা সমস্যা। জাত-পাত-জন্মের ইতিহাস নিয়ে একটা পরিচয় তো আছে অম্বির। আর পরিচয়টা তো সুবিধার নয়। সুতরাং কে বিয়ে করবে অম্বিকে, জাত-পাত শিক্ষা-দীক্ষা আর অবস্থার দিক দিয়ে একটু নীচু গোছের লোক ছাড়া? তাই এবার একটু বেশি কঠিনভাবেই সতর্ক হয়েছেন উপেনবাবু আর চারুবালা। যতই খারাপ লাগুক, অম্বির মন আর মনের শখগুলিকে একটু নীচু করিয়েই রাখতে হবে।

বাইরের চোখে রমা ও অম্বির মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না। কিন্তু মেয়ে আর মেয়ের মতো, এই দুয়েব মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেটা চোখে পড়বে তাদেরই, এ বাড়ির ভিতরে চোখ দিয়ে দেখবার সুযোগ যাদের আছে।

রমা লেখা পড়া শিখেছে। কলেজে পড়ে। এই তো থার্ড ইয়ার চলেছে। ইংরাজীতে অনার্স নিয়েছে। আর নিরক্ষরা অম্বি, কোনকালেই লেখা-পড়া শেখেনি, শেখানোও হয়নি। ও শুধু বই-এর ছবি দেখে বইয়ের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করে। তাব বেশি কোন সাধ্য নেই।

রমার কাছে উপেনবাবু ও চারুবালা হলেন বাবা ও মা। কিন্তু ঠিক এক-রকমের সম্বোধনের অধিকার পায়নি অম্বি। অম্বির কাছে উপেনবাবুর হলেন আপ্পি এবং চারুবালা হলেন আম্মি। কে জানে কবে থেকে, বোধহয় গঞ্জাম থেকেই এই সম্বোধনের ইতিহাসের শুরু।

রমা শোয় চারুবালারই ঘরে, তাঁর পাশের খাটের বিছানায়। আর অম্বি শোয় পাশের ঘরের একটা খাটে, মাঝে একটা দেয়ালের ব্যবধান, যদিও দেওয়ালে একটা দরজা আছে এবং দরজাটা খোলাও থাকে।

এই মাত্র, এ ছাড়া রমাতে ও অম্বিতে আর কি পার্থক্য? কিছুই না।

পার্থক্য বলাও ঠিক নয়, বলা উচিত, সতর্কতার ছোট একটি প্রাচীর। বাপ-মা'র মন নামে কতকগুলি দুর্বলতা আর মমতা দিয়ে তৈরী একটা জগতের কোথায় যেন একটা ভয় আছে। তাই সতর্ক না থেকে পারেন না উপেনবাবু আর চারুবালা।

এখনো এক একদিন নিভৃতে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়, এবং আলোচনাটাও শেষ পর্যন্ত কথায় কথায় কি রকম যেন হয়ে যায়।

চারুবালা বলেন—সেই তো, সেই সমস্যাই দাঁড়াল। পবের মেয়ে নিজের মেয়ের মতো হয়ে উঠল, অথচ…।

উপেনবাবু—কি হলো ?

চারুবালা—কে এখন বিয়ে করবে এই মুখখু মেয়েকে ?

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করেন উপেনবাবু। তারপর বলেন—ঠিকই বলেছ, সমস্যাই বটে। তবে, ধর, বাঙালী সমাজেরই মধ্যে যদি এমন ছেলে পাওয়া যায়, জাতে যা-ই হোক, লেখা-পড়া কিছু শিখেছে আর ছোটখাট চাকরি বা দোকান-দারী করে খেয়েপরে থাকবার মতো রোজগারও করছে…।

চারুবালা—পাওয়া আর যাবে না কেন, খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

উপেনবাবু—যদি ভাল পণও দেওয়া যায়…।

চারুবালা—তাহলে কোন আপত্তিই করবে না। অম্বির মতো মেয়েকে খুশি হয়েই বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে।

—কিন্তু। উপেনবাবু কেমন যেন একটু চেঁচিয়ে এবং রুক্ষস্বরেই বলেন,—কিন্তু অম্বি রাজি হবে কি ?

চারুবালাও রাগ করে বলেন—তা, আমার ওপর চোখ রাঙাচ্ছ কেন ? দোষ তো তোমার। তুমিই ভুল করেছ, তাই।

উপেনবাবু—ভুল করেছ তুমি।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকেন। তারপর দু'জনেই শান্ত হয়ে আর বেশ গম্ভীর হয়ে আলোচনা করতে করতে একমত হয়ে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলেন—যাতে রাজি হয় অম্বি, তাই করতে হবে। আর ভুল করলে চলবে না।

সত্যিই দেখা যাচ্ছে, আর ভুল করতে চান না চারুবালা আর উপেনবাবু। এবার থেকে তাঁরা দু'জনেই আরও বেশি সতর্ক হয়েছেন।

কারণ, সেই সমস্যাটা এতদিনে এসে পড়েছে। রমার আর অম্বির বিয়ের জন্য ভাবতে হচ্ছে। রমাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই, বিয়ের খোঁজ খবর চেষ্টা করলেই করা যাচ্ছে। কিন্তু অম্বির জন্যে যে কোন চেষ্টাও করা যাচ্ছে না।

আগে অনেক ভুল করলেও অম্বিও এইবার যেন বুঝতে পেরেছে, আর ভুল করা চলবে না। সতর্ক হয়েছে অম্বিও। এখন তো সে আর গঞ্জামের সেই চার বছর বয়সের একটা জেদী অবুঝ আর আবদেরে মেয়ে নয়। কুড়ি বছর বয়সের টানা-টানা দু'টিচোখের দৃষ্টি দিয়ে সে আজ আপ্পি আর আম্মির মনের সমস্যাটাকে সহজেই বুঝতে পারে।

উপেনবাবু ডাকেন—অম্বি।

অম্বি উত্তর দেয়—যাই আপ্পি।

উপেনবাবু—রমা আর তুই তৈরী হয়ে নে তাড়াতাড়ি। পরেশনাথ মন্দিরে

আরতি দেখতে যাব।

বের হবার আগে অশ্বির সাজসজ্জার রূপ আর রকম দেখে রমা ভ্রূকুটি করে —এ কি একটা বাজে শাড়ি পরে বের হচ্ছিস? কানপাশা দুটো খুলে রাখলি কেন?

অশ্বি বলে—ঠিক আছে। তুই বাজে বকিস্ না।

উপেনবাবু আর চারুবালা তাকিয়ে তাকিয়ে সবই দেখতে পান এবং কানেও সব শুনতে পান। কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করেন না। যেন এটাই তাঁদের ইচ্ছা। অশ্বিকে একটা বাজে শাড়ী পরিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে তাঁদের আপত্তি নেই। উপেনবাবু অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নেন, আর চারুবালা অন্য একটা দরকারের কথা ব্যস্তভাবে ঘোষণা করেন—ফেরবার পথে একটা নতুন পঞ্জিকা কিনে আনবে, ভুলে যেও না যেন।

পঞ্জিকা কিনতে সেদিন ভুলেই গেলেন উপেনবাবু এবং ঘরে ফিরে হাতমুখ না ধুয়ে চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। চারুবালা জিজ্ঞাসা করেন—কি হলো?

উপেনবাবু কিরকম বিদ্রূপের স্বরে গম্ভীরভাবে বলেন—দেখা হলো তোমার ছোটমামার সঙ্গে?

চারুবালা—কি বললেন ছোটমামা?

—রমাকে দেখেই বললেন, এইটিই বুঝি তোমার সেই পালিতা মেয়ে?

চারুবালার কণ্ঠস্বরও তিক্ত হয়ে ওঠে—কিন্তু ওভাবে বাঁকা করে কথা শুনিয়ে আমাকে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?

উপেনবাবু অন্যমনস্কের মতো বলতে থাকেন—ছোটমামার কথা শুনে অশ্বি তো হেসে কুটি-কুটি। সারা রাস্তাটাই হাসতে হাসতে এসেছে, বোধহয় এখনো হাসছে।

বলতে বলতে উপেনবাবুর গম্ভীর মুখটাই শুকনো হাসি হেসে ফেলে।

উপেনবাবু হাত মুখ ধুতে চলে যান। চারুবালা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। মনে হয়, ছোটমামার প্রশ্নটা সত্যিই একটা কঠিন বিদ্রূপ। কিন্তু তারচেয়ে বড় বিদ্রূপ বলে মনে হয়, অশ্বির ঐ হাসি। এবং এই বিদ্রূপ মনে মনে সহ্য করতে গিয়ে অশ্বির উপর মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

কিন্তু বেশী দুশ্চিন্তা করতে হয় না চারুবালাকে, উপেনবাবুকেও না। কারণ, অশ্বিই সতর্ক হয়ে যায়।

বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের মেলামেশার আসরও এক একদিন বেশ জমে ওঠে। রমা গান গায়। এলাহাবাদে থাকতেই গানের মাস্টারের কাছে সুর সেধে গলা

মিষ্টি করেছে রমা। রমার গান শুনে সকলেই প্রশংসা করে—বেশ গান, বেশ গলা।

আর, অম্বি যেন ঘুরে বেড়ায় এই গানের আশে পাশে। গানের কাছে আসতে চায় না। গানের স্বরলিপি বইটা রমার কাছে এনে দিয়েই সরে যায়। একটু দাঁড়িয়ে গান শোনে, তার পরেই আরও দূরে সরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকে।

রমা হঠাৎ বলে ফেলে—অম্বিও তো গাইতে পারে।

আতঙ্কিতের মতো এক দৌড় দিয়ে অন্য ঘরে পালিয়ে যায় অম্বি, রমার ডাকাডাকি শুনতে পেয়েও আর এমুখো হয় না।

আত্মীয়-স্বজনের মেলা ভাঙবার পর ভিতরের বারান্দায় একদিকে চুপ করে বসে থাকেন উপেনবাবু। কাছে এসে বসেন চারুবালা। শোনা যায়, পাশের ঘরে একটা মুখচোরা সঙ্গীত যেন ভয়ে ভয়ে বাতাসের কাঁপন এড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গান গাইছে অম্বি।

উপেনবাবু জিজ্ঞাসা করেন—এলাহাবাদে থাকতে গানের মাস্টারের কাছে অম্বিও কি গান শিখেছিল?

চারুবালা বললেন—না।

উপেনবাবু বড় করুণভাবে হাসতে থাকেন—এটা আবার কিরকমের একটা ব্যাপার হলো? শেখানো হলো না, তবুও শিখল!

উত্তর দেন না চারুবালা। শুধু বুঝতে পারেন তাঁদের কথাবার্তার সাড়া পেয়ে মুখচোরা সঙ্গীতটা চুপ করে গিয়েছে, গান বন্ধ করে দিয়েছে অম্বি।

অম্বির এইসব সতর্কতা দেখে একটু খুশিও হন উপেনবাবু, চারুবালাও।

সেদিন দুপুরবেলা ভাঁড়ার ঘরের ভিতর হতে বিস্মিত হয়েই ডাক দিলেন চারুবালা।—অম্বি অম্বি।

—যাই আম্মি।

অম্বি কাছে এসে দাঁড়াতেই এক গাদা লেস হাতে তুলে নিয়ে চারুবালা বললেন—একি? এগুলি বুনলো কে? তোরই কীর্তি নিশ্চয়।

—হ্যাঁ।

—তোকে কে শিখিয়েছে এসব বুনতে? রমা?

—না।

—রমার দেখাদেখি শিখেছিস?

—হ্যাঁ।

—কি দরকার তোর এসব শিখে আর মিছিমিছি সময় নষ্ট করে ?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। চারুবালা গম্ভীরভাবে বলেন—কিন্তু এই সব শিশি-বোতলের পেছনে এগুলি লুকিয়ে রেখেছিস কেন ? নিয়ে যা।

লেসের গাদা হাতে নিয়ে নিজের ঘরের খাটের কাছে এসে দাঁড়ায় অম্বি। এ লেস সহ্য করতে পারল না আম্মি, ভাবতে গিয়ে অম্বির চোখ দুটো একবার চিক-চিক করে ওঠে। এই তো সেদিন আম্মি নিজের হাতে রমার হাতের তৈরী লেস নিয়ে পাশের বাড়ির বৌদিকে দেখাচ্ছিলেন। থাক্ সে কথা। লুকিয়ে রাখতেই তো চেয়েছিল অম্বি। কিন্তু লুকোবাব মতো জায়গা কই ?

সামনের আলমারিটার মাথার উপর লেসের গাদা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে অম্বি। বুঝতে পারে অম্বি, আরও বেশি সর্তক হতে হবে।

আপ্পি ও আম্মির সতর্কতা দেখে দুঃখ করে না অম্বি। এসবের জন্য কোন ভাবনা নেই অম্বির মনে। আপ্পি আর আম্মিকে সুখী করবার জন্য দুটো কান-পাশা খুলে রাখতে, আর সব গান ও লেস লুকিয়ে রাখতে কষ্ট হলেও এমন কি কষ্ট ? ও ছাই কষ্ট খুব সহ্য করা যায়।

কিন্তু একটা ভয় অম্বির ভাবনাগুলিকে মাঝে মাঝ অস্থির করে তোলে। বিছানার উপর শুয়ে ছটফট করতে করতে কেঁদেই ফেলে অম্বি। কি হবে উপায়, আপ্পি আর আম্মি যদি একদিন বলে ফেলেন—তুই আর নিজের হাতে খাবার জল-টল আমাদের দিস না অম্বি !

বাজার থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে চেয়ারের উপর বসবার পর আপ্পি যদি একদিন বলেই দেন—থাক, তোর পাখার বাতাসে আর দরকার নেই ; অম্বির এই হাত দুটো যে তাহলে চিরকালের মতো অসাড় হয়ে যাবে।

সেই যে কবে, স্মৃতি হাতড়ে খুঁজতে থাকে অম্বি, সেই যে বেরিলিতে থাকতে অসুখের সময় অম্বির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন আম্মি তারপর আর কই ? ভাবতে গিয়ে অম্বির মাথাটাই যে তৃষ্ণার্ত হয়ে বালিশের এপাশে আর ওপাশে আশ্রয় খুঁজতে থাকে। কিন্তু এটা তো অম্বির জীবনের ভয় নয়। এটা দুঃখ বলা যেতে পারে এবং সে দুঃখ গোপন করার মতো শক্তি আছে অম্বির।

ভয় হলো সেই ভয়। আম্মির যখন মাথা ধরবে, আর আম্মির মাথা টিপে দেবার জন্য যখন হাত বাড়াবে অম্বি, তখন যদি আম্মি মাথা সরিয়ে নিয়ে আপত্তি করে বলে ফেলেন—সর সর, তোর হাতের সেবার দরকার নেই ! তবে কি হবে উপায় ? আপ্পি ও আম্মির গা ছুঁয়ে পড়ে থাকবার অধিকারও যদি একদিন বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে দুঃখ গোপন করার মতো মনের জোর থাকবে তো ?

কেন থাকবে না? একটু শান্ত হয়ে ভাবতে থাকে অম্বি। তা হলেও সহ্য করতে হবে, আর আপ্পি ও আম্মি যেন একটুও বুঝতে না পারেন, কত কষ্টে সহ্য করেছে অম্বি সেই দুঃখকে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসে অম্বি। কাজ করতে হবে। কিন্তু কোন কাজ? রমার সঙ্গে যেন কোন তুলনার মধ্যে না পড়তে হয়, সেই সব কাজ। রমা যেসব কাজ করে না, সেই সব কাজেই এই হাত দুটোকে এবার উৎসর্গ করে দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয় অম্বি। রমা থাক লেখাপড়া গান আর লেস নিয়ে। আর অম্বি থাকবে শুধু··· ঐ তো দেখা যায় আপ্পির জুতোগুলিতে একেবারেই পালিশ নেই। মনে পড়ে, ঝিয়ের হাতের কাচা কাপড় দেখে একটুও খুশি হন না আম্মি।

বিছানা থেকে উঠে কাজে মন দেয় অম্বি। এ ঘর থেকে ও ঘর ঘুরে ঘুরে হাত দু'টোকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে আর কাপড় কাচিয়ে যেন জীবনের সেই ভয়টাকে একেবারে ক্লান্ত করে দিতে থাকে অম্বি।

উপেনবাবু বললেন—ভাবতে ভালও লাগছে, আবার আর একদিকে মনটা খারাপও লাগছে।

চারুবালা—কেন?

উপেনবাবু—রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ের জন্য যদি প্রস্তাব করি, তবে অধীর আপত্তি করবে না বলেই মনে হচ্ছে।

চারুবালা—আমারও তাই মনে হয়।

উপেনবাবু—রমাকে নিয়ে তো আর সমস্যা নেই। কথা হলো, তারপর অম্বির জন্য কি উপায় হবে? সেই জন্যই মনটা খারাপ লাগছে।

সম্পর্কে উপেনবাবুদের আত্মীয়ই হয় অধীর, এবং খুব বেশি দূরের সম্পর্কও নয়। বেশ ভাল ছেলে। গণিতের এম.এ, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে, এবং এক বীমা কোম্পানীতে আজ এক বছর হলো ভাল মাইনের একটা কাজও পেয়ে গিয়েছে। অধীরের খুড়িমাও এসে বলে গিয়েছেন—ভাল পাত্রী পেলে, এইবার ছেলেটাকে সংসারে বসিয়ে একবার কেদার-বদরী ঘুরে আসতেন।

এর মধ্যে অধীরও কয়েকবার এসেছে, পণ্ডিতিয়ার পশ্চিমে এই নতুন বাড়িতে। উপেনবাবু আর চারুবালার সঙ্গে গল্প করে চলে গিয়েছে অধীর। একটু তফাতে একটা সোফার উপর পাশাপাশি বসে গল্প শুনেছে রমা ও অম্বি।

উপেনবাবু বলেছেন—ঐ, ওদের মধ্যে ঐটি হলো আমার মেয়ে রমা, আর ঐটি হলো অম্বি, আমার মেয়ের মতোই।

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায় অম্বি, যেন নির্মম এক বিদ্রূপের আঘাত ওর মুখের রং মুহূর্তের মধ্যে কালো করে দিয়েছে।

একদিন এসে, কলেজ ম্যাগাজিনে লেখা রমার একটা প্রবন্ধের খুবই প্রশংসা করে অধীর। সুন্দর ভাষা এবং ইংরেজী কবিতা সম্বন্ধে এই সব নতুন নতুন কথা এত ভাল করে গুছিয়ে যে বলতে পারে, তাঁর মন ও মনের সুরুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

প্রশংসা শুনে রমা লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। উপেনবাবু ও চারুবালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। উপেনবাবু বলেন—রমার গান তো তুমি এখনো শোন নি অধীর!

অধীর বলে—হ্যাঁ, একদিন এসে শুনতেই হবে।

অম্বি রমার কানে-কানে কি যেন বলে। চারুবালা ও উপেনবাবু দু'জনেই উদ্বিগ্নভাবে ও ব্যস্তভাবে বলেন—কি? কি শেখাচ্ছে অম্বি?

রমা লজ্জিতভাবে বলে—এখনি গাইতে বলছে। কিন্তু...।

অধীর বলে—না, না, এত তাড়াহুড়োর কি আছে! আর একদিন হবে।

অধীর চলে যাবার পর চারুবালা অম্বিকে বলেন—বাইরের লোকের সামনে ছেলেমানুষি করিস না অম্বি।

দিন পার হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। ভাদ্রটাতো পার হতেই চলল। ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন উপেনবাবু আর চারুবালা। এইবার প্রস্তাবটা করে ফেলতেই হয়। অধীরের খুড়িমাকে হয় একবার নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে, নয় তো নিজেরাই গিয়ে···।

ট্যাক্সির হর্ণের শব্দে ফটকের দিকে তাকাতেই দেখা যায়, অধীরের খুড়িমা ধীরে ধীরে আসছেন।

উপেনবাবু উল্লাসের সুরেই বলেন—আপনার কথা চিন্তা করা মাত্র যখন আপনি এসে গিয়েছেন, তখন বুঝছি নিশ্চয় সুসংবাদ আছে।

খুড়িমা হাসেন—হ্যাঁ সুসংবাদ আছে। ছেলে বিয়ে করবে, পাত্রীও সে পছন্দ করে ফেলেছে। এখন তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলেই···।

আকস্মিক আনন্দে বিচলিত হয়ে চারুবালা বলেন—কোনই আপত্তি নেই। তবে উনি চাইছিলেন, পরীক্ষাটা হয়ে যাবার পরে কোন তারিখে যদি বিয়ের দিন···

খুড়িমা—কার পরীক্ষা?

চারুবালা—রমার।

খুড়িমা—রমার পরীক্ষা বমা দিক না। অম্বির তো আর কোন পরীক্ষাটরীক্ষা নেই!

চারুবালা চেঁচিয়ে ওঠেন—অম্বি?

উপেনবাবু প্রশ্ন করেন—আপনি কি অম্বির কথা বলছেন?

খুড়িমা—হ্যাঁ, অম্বিকেই তো বিয়ে করতে চায় অধীর।

নীরব হয়ে গেলেন উপেনবাবু ও চারুবালা।

খুড়িমা বলেন—কি হলো? তোমাদের দিক থেকে কি কোন অসুবিধা আছে?

উপেনবাবু বলেন—না, আমাদের আর অসুবিধা কি? কিন্তু…।

খুড়িমা—আমিও কিন্তু কিন্তু করেছিলাম, কিন্তু ছেলে সে-সব আপত্তি শুনতে চায় না।

উপেনবাবু বলেন—কার মেয়ে, আর কি জাতের মেয়ে, সে-সব কথা অধীর যদি জানতে পেত, তবে বোধহয় …।

খুড়িমা—জানতে চাই না। আমি কি আর কথাটা তুলিনি মনে করেছ? কিছু বললেই বলে, এখন তো অম্বি উপেনবাবুরই মেয়ে।

চমকে ওঠেন দু'জনেই। বোবার মতো তাকিয়ে থাকেন উপেনবাবু।

চারুবালা বলেন—অম্বি যে লেখা-পড়া কিছুই শেখেনি।

খুড়িমা—তাও জানি, আর ছেলেও সব শুনেছে। তবুও…।

কি কঠিন ও নির্মম খুড়িমার মুখের এই কথাটা—তবুও। উপেনবাবু ও চারুবালার সারা-জীবনের সতর্কতার সাধনা ব্যর্থ করে আর মিথ্যা করে দিয়ে সংসারে একটা ভয়ংকর তবুও জেগে উঠেছে। তাঁদের সব সংকল্প ও পরিকল্পনার পিছনে একটা বিদ্রূপের অম্বি যেন কুড়ি বছর ধরে আক্রোশ নিয়ে ছুটে ছুটে এসে এতক্ষণে চরিতার্থ হয়েছে।

চারুবালা খুড়িমার দিকে তাকিয়ে বলেন—আমাদের কোনই আপত্তি নেই, অম্বি যদি আপত্তি না করে।

খুড়িমা উঠলেন—তাহলে তাই কর, অম্বিকে জিজ্ঞাসা করে তারপর খবর দিও।

চলে গেলেন খুড়িমা।

বার বার মনে পড়ে খুড়িমার মুখের ঐ ভয়ানক কথাটা—তবুও। উপেনবাবুর মনের সব ভাবনা যেন ভয় পেয়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। এত বাধা এত নিষেধ, তবুও। এত সতর্কতা, তবুও আজ কুড়ি বছর ধরে সব অরণ্যের বাধা ভেদ করে আর পাহাড়ের বাধা ছাপিয়ে গোদাবরীর সেই শাখাস্রোতের আত্মাটা

ছুটে এসেছে, কেউ তার গতি রোধ করতে পারেনি।

—এ কি করে সম্ভব হয়? করুণ আক্ষেপের মতো উপেনবাবুর কথাগুলি কাঁপতে থাকে।

চারুবালা গম্ভীরভাবে বলেন—কি?

উপেনবাবু—এই যে রমাকে পছন্দ না করে অগ্নিকে পছন্দ করল অধীর!

চারুবালা—জানে তোমার ভগবান, আমি এ ছাই অনাসৃষ্টির কিছু বুঝি না।

—তাহলে কি···? কথাটা সমাপ্ত না করেই নীরব হয়ে রইলেন উপেনবাবু। যেন বিরাট একটা প্রশ্ন ভূমিকম্পের মতো তাঁর মনের অতলের ঢেউগুলিকে ছন্দ-হারা করে দিয়েছে। তাহলে কি রূপ গুণ কুল মান ও শিক্ষা ছাড়াও এবং এসবের উপরেও কিছু আছে? কুয়াশামাখা স্বপ্নের মতো রহস্যময় একটা কিছু! নইলে রমাকে পছন্দ না করে অগ্নিকে পছন্দ করে, এ কোন্ প্রেমের চক্ষু?

জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে উপেনবাবু বলেন—যাক্, এসব ফিলসফি চিন্তা করে আর কোন লাভ নেই। অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করে অধীরের খুড়িমাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দাও। লেঠা চুকে যাক্।

চারুবালা—অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করবার আর দরকারই বা কি? রাজি তো হয়েই আছে। এই কাণ্ডটি করবার জন্যই বোধহয় এ বাড়িতে মেয়ের মতো হয়ে ঢুকেছিল। খুব শিক্ষা দিল অগ্নি। শত্রুতেও যেন আর পরের মেয়েকে আপন মেয়ের মতো করে না পোষে।

চারুবালার ক্ষোভ যেন থামতে চায় না। উপেনবাবুও শুকনো হাসি হেসে বলতে থাকেন—কি অদ্ভুত অদৃষ্ট! নিজেরই মেয়ের মতো, তবু ওর বিয়ের কথা শুনে আনন্দ করতে পারছি না।

চারুবালা বলেন—বেরিলিতে থাকতে নিউমোনিয়া করে যে অগ্নি আমাকে একটা মাস রাত জাগিয়ে হাড় মাস কালি করে দিয়েছিল, সেই অগ্নিই কি না আজ···

বোধহয় বলতে চান চারুবালা, সেই অগ্নিই আজ তার আশ্রিত ও আশ্রিত স্নেহমমতার ঋণ শোধ দিল এইভাবে? এই রকম অপমান করে আর সব সতর্ক পরিকল্পনা মিথ্যা করে দিয়ে?

আরও স্পষ্ট করে এবং হিসাব করে আজ উপেনবাবু অনুভব করতে পারছেন—আজ এই প্রথম নয়; সেই গঞ্জাম থেকেই শুরু হয়েছে অগ্নির জয়ের আর তাঁদের পরাজয়ের ইতিহাস। পরাজয়টা শুধু এতদিনে চরমে এসে পৌঁছেছে। মেয়ের মতো হয়েও অগ্নি আজ কি জানি কিসের গর্বে তাঁদের নিজের মেয়েকে

ছোট করে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সহ্য করতে কষ্ট হয়, ভাবতেও ভাল লাগে না। উপেনবাবু আর চারুবালার এই কুড়ি বছরের যত স্নেহ ও মমতার সব শ্রী ও গৌরব চূর্ণ করে দিল অম্বি।

—যাক্ অনেক ভুল হয়েছে, আর ভুল করতে চাই না! উপেনবাবু বেড়াতে বের হবার জন্য চাদর কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁর শেষ সতর্কতার সংকল্প ব্যক্ত করেন—যাক্, পরের মেয়েকে কুড়ি বছর ধরে পোষা আর নিজের মেয়ের মতো মনে করাই ভুল হয়েছে! এখন ভালয় ভালয় পরকে পরের মতই বিদায় করে দাও।

সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। বাইরে থেকে ফিরে এসে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ উপেনবাবু বারান্দার উপর আরাম-চেয়ারে শুয়েছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন। পাশের ঘরের ভিতরে লুকিয়ে থেকে একটা করুণ শব্দ যেন বোবা হয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এ তো সেদিনের সেই মুখচোরা গানের শব্দ নয়, মুখচোরা কান্নার শব্দ।

ব্যস্তভাবে চারুবালাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন উপেনবাবু—কাঁদছে কেন অম্বি?

চারুবালা—ও কাঁদছে ওর মনের শখে, আমি কি করব বলো?

উপেনবাবু—বিয়ের কথা বলেছ ওকে?

চারুবালা—হ্যাঁ!

উপেনবাবু—কি বললে অম্বি?

চারুবালা—ঐ তো শুনতে পাচ্ছ, যা বলছে।

উপেনবাবু—এ তো কাঁদছে শুধু। হাঁ-না কিছু বলেনি?

চারুবালা—না, কোন কথা বলেনি।

উপেনবাবু—তার মানে হলো, রাজি আছে।

চারুবালা অপ্রসন্ন ভাবেই বলেন—তাই তো, রাজি না হবার কি আছে?

অস্বস্তি বোধ করছিলেন, এবং বিচলিতভাবে নিঃশ্বাসও ফেলছিলেন উপেনবাবু। চারুবালাও থেকে থেকে ছটফট করে উঠছিলেন। কিন্তু না, আর না, মনের দুয়ার বন্ধ করে এইবার বেশ একটু শক্ত হয়েই বসেছেন দু'জনেই। আর ভুল নয়। যে মেয়ে নিজের মেয়ে নয়, মেয়ের মতোও নয়, একেবারে আস্ত একটা পরের মেয়ে, তার কান্নার কাছে নিজেদের আর দুর্বল করে ফেলতে চান না উপেনবাবু আর চারুবালা।

—আপ্পি! দরজা খুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে একটা পাখা হাতে নিয়ে

উপেনবাবুর সামনে এসে দাঁড়ায় অম্বি। উপেনবাবুর ক্লান্ত শরীরের উপর বাতাস দেবার জন্য পাখা তুলতেই উপেনবাবু বলেন—থাক, পাখা রেখে দিয়ে বস।

চমকে ওঠে অম্বির হাত। অম্বির হাতের পাখা মেঝের উপর পড়ে গিয়ে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। উপেনবাবুর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। এতদিনের সেই ভয়ের চাবুকটা এসে এইবার সত্যিই অম্বির মনের সব কল্পনাকে একটি আঘাতেই একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। যেন সহ্য করার শক্তি খুঁজছে অম্বি। আপ্পি আর আম্মি যেন কিছুতেই বুঝতে না পারেন, অম্বির মনের ভিতর কোন দুঃখ অভিযোগ আর বিদ্রোহ আছে।

অম্বিই দেখে আশ্চর্য হয়, আর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, আপ্পি আর আম্মি বসে রয়েছেন মুখ করুণ করে, যেন দুটো শিশুর মুখ। কেউ যেন দু'জনকে অসহায়ের মতো ফেলে রেখে আর ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাই অভিমান।

উপেনবাবুর গায়ের উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অম্বি। উপেনবাবুর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে অম্বি বলে—আমায় বিয়ে দিও না আপ্পি।

উপেনবাবু—সে কি কথা!

অম্বি বলে—আমাকে পরের বাড়ি পাঠিও না। আমি চিরকাল এখানেই থাকব। যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন আমিও বেঁচে থাকব।

চারুবালা বলেন—আবোল-তাবোল কথা বন্ধ করে শান্ত হয়ে বস অম্বি।

অশান্ত, দুরন্ত, আর অবুঝ মেয়ের মতো চিৎকার করে বলতে থাকে অম্বি। —আমার বিয়ে হবে, রমারও বিয়ে হবে, তারপর তোমাদের দেখবার জন্যে থাকবে কে? আমি বিয়ে করব না আম্মি।

চমকে ওঠেন উপেনবাবু আর চারুবালা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। একি বলে অম্বি, পূর্ব গোদাবরীর একটা পাতার ঘরের ভিতর থেকে কুড়িয়ে-আনা আর শেয়ালের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা অতি অন্ত্যজ একটা পরের মেয়ের প্রাণ? এসব কথা কি একটা মেয়ের মতো মেয়ের প্রাণের উদ্বেগ? না, মেয়ের-চেয়ে-বড় একটা সত্তার ব্যাকুলতা?

চারুবালা বলেন—সে চিন্তা তোর কেন অম্বি?

অম্বি—চিন্তা না করে পারছি না আম্মি।

উপেনবাবু বিচলিতভাবে বলেন—হেসে হেসে কথা বল অম্বি, নইলে আমি তোর কোন কথাই শুনব না।

অম্বি—হাসতে পারছি না আপ্পি। আমি যে তোমাদের……।

চুপ করে অম্বি। ঘরের অন্তরাত্মা যেন ক্ষণিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে দু'কান সজাগ রেখে একটা কথা শুনবার প্রতীক্ষায় রয়েছে, যে কথা আজ পর্যন্ত অম্বির মুখে কোনদিন শোনা যায়নি।

অম্বি বলে—আমি তো তোমাদের ছেলের মতোই। চিরকাল তোমাদের কাছেই থাকব।

বুকের ভিতরে যেন একটা ধাক্কা লেগেছে, আবার চমকে ওঠেন উপেনবাবু ও চারুবালা। কুড়ি বছরের একটা নীরব বিদ্রোহ, একটা শান্ত অভিমান যেন এতদিনে মুখ খুলে ফেলেছে।

—আমাকে কথা দাও আম্মি। চারুবালার একটা হাত শক্ত করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চারুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অম্বি। অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে অম্বির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন চারুবালা।

অম্বির দিকে চকিতে একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করলেন উপেনবাবু। অকস্মাৎ একটা বিস্ময়ের ঝড় এসে যেন তাঁর মনের যত ভুলের আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মেয়ের-মতো তো নয়, তাঁদের আত্মারই মতো এই মেয়েটা আজ বিশ বছর ধরে তাঁদের সব ভুলগুলিকে হারিয়ে দিয়ে এসেছে। পরাজয় সম্পূর্ণ হলো এতদিনে, এবং এই পরাজয়েও এত আনন্দ ছিল ?

গলার স্বরের কাঁপুনি সংযত করে আস্তে আস্তে উপেনবাবু বলেন—তোর বিয়ে না দিয়ে পারব না অম্বি, তুই তো আমাদেরই।

চেঁচিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে অম্বি—বলো না, আর ওকথা বলো না আপ্পি। সহ্য করতে পারি না।

হেসে ফেলেন উপেনবাবু।—তুই তো আমাদেরই মেয়ে।

ঘরের বাতাস কয়েক মিনিট একেবারে নিস্তব্ধ হয়েই থাকে। চারুবালার কাঁধের উপর মুখ গুঁজে দিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে বসে থাকে অম্বি। যেন বিশ বছরের একটা অভিযোগ এতদিনে শান্ত হলো।

উপেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে চারুবালা বললেন—অধীরের খুড়িমাকে কালই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, তারপর·····।

চারুবালার কথা শেষ না হতেই ফুঁপিয়ে ওঠে অম্বি।—আম্মি!

উপেনবাবু আর চারুবালা এক সঙ্গেই বিচলিতস্বরে বলতে থাকেন।—ছি-ছি, ওরকম করতে নেই অম্বি। সব মেয়েরই বিয়ে হয়, আর বাপমাকে ছেড়ে থাকতেও হয়।

খিদিরপুরের সঙ্গে এই ছোট জগৎপুরের কোন মিল নেই। জায়গাটাকে সত্যিই ছোটখাট একটা ভিন্ন জগৎ বলেই মনে হয়েছে শুক্তির। পাঁচ ক্রোশ দূরে রেল-লাইন, আর তিন ক্রোশ দূরে টেলিগ্রাফের লাইন। তবুও ভাল।

এই তো মাত্র তিনটি দিন পার হয়েছে। মস্ত বড় একটা পালকি রেলস্টেশন থেকে খিদিরপুরের মেয়ে শুক্তিকে তুলে নিয়ে চলে এসেছে এখানে। আট জোড়া বেহারার পা তিন ক্রোশ কাঁচা সড়কের ধুলো আর দুক্রোশ ডাঙ্গা ও জাঙ্গালের ধুলো মাখতে মাখতে ছোট জগৎপুরের ভিতর ঢুকতেই চাষীদের ঘরের আঙিনা থেকে চিৎকার করে ছুটে এল এক পাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—বউরানী বউ-রানী। চলন্ত পালকির দরজার কাছে এগিয়ে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ছোট জগৎ-পুরের বউরানীকে দেখতে থাকে ছেলেমেয়ের দল। তারপরেই ব্যস্তভাবে পথের এক পাশে সবে গিয়ে দাঁড়ায়। কারণ, পালকির ঠিক পিছনেই ঘোড়ায় চড়ে আসছেন রাজাবাবু। ঘোড়ার গলার ঘুঙুর বাজে ঝুম ঝুম করে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে রাজাবাবুর, বউরানীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরছেন।

এরই মধ্যে একদিন বৌ-কথা-কও-এর ডাক শুনেছে শুক্তি। অনেক চেষ্টা করেছে পাখিটাকে দেখবার জন্য, কিন্তু দেখতে পায়নি। ঠিক বুঝতে পারা যায় না, কোন্ গাছের আড়ালে কোথায় বসে পাখিটা ডাকছে। মনে হয়, শুধু একটা ডাক এই বাতাসের মধ্যেই গা-ঢাকা দিয়ে আকাশের এদিকে-ওদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। তিন দিনের মধ্যেই শুক্তির বড় বেশি ভাল লেগে গিয়েছে ছোট জগৎ-পুরের পাখির ডাক।

তিন দিন ধরে নহবতের স্বর অশ্রান্তভাবে বেজে বেজে আজ থেমেছে। কুটুম্ব-আত্মীয় যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও সবাই বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। প্রজা-বাড়ির যত ছেলেমেয়ে এসেছিল মেঠাই নেবার জন্য, তাদেরও হুল্লোড় থেমেছে, চলে গিয়েছে সবাই। বিকাল হবার আগে একদল চাষী-মেয়েও এসেছিল বউ-রানীর মুখ দেখবার জন্য। মুখ দেখে খুশি হয়েছে তারা, তারপর আধ সের করে চিঁড়ে পেয়ে আরও খুশি হয়ে সবাই চলে গিয়েছে।

তিন দিন ধরে মুখ দেখাতে দেখাতে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল শুক্তি। অমুক পণ্ডিতমশাই, অমুক গুরুঠাকুর, আর অমুক বড়ঠাকুর, দূরের এই গ্রাম আর সেই গ্রাম থেকে নানা ধরনের মানুষ এসেছে আশীর্বাদ করতে। শুধু মুখ দেখাতে

দেখাতে নয়, প্রণাম করতে করতেও ঘাড়ে যেন ব্যথা ধরে গিয়েছে! তবুও ভাল, একটুও খারাপ লাগে না শুক্তির।

একটু হাঁফ ছাড়বার জন্যই, অথবা ছোট-জগৎপুরের আকাশটাকে একটু ভাল করে দেখবার জন্যই বাড়ির ছাদের উপর এসে দাঁড়ায় শুক্তি। যতদূর দেখা যায়, দূরের ও নিকটের সব দৃশ্যগুলিকেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে থাকে।

হঠাৎ চমকে ওঠে শুক্তি। দূরের ঐ নদীর পাশে গাছের ভিড়ের ভিতর থেকে সেই রকমের একটা মন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখা যায়। চূড়ার উপর আবার ঠিক সেই রকমই একটা ত্রিশূলও যে রয়েছে! অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে আর মুখ কালো-কালো করে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি।

একটু অশান্ত হয়ে ওঠে শুক্তির মন। একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো মনের ভিতর বিঁধতে থাকে। ঐ দুঃসহ দৃশ্যটা যে চার বছর আগের একটা আর্তনাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়! শুক্তির এই নতুন জীবনের শান্তি ও আনন্দকে বিদ্রূপ করার জন্যই দৃশ্যটা যেন একটা হিংসুক চোরা-দৃষ্টির মতো দূর খিদিরপুরের গাছ-পালার ভিতর থেকে বের হয়ে, আর আড়ালে পা টিপে-টিপে এগিয়ে এসে এখানে ঠাঁই নিয়েছে। খিদিরপুরে আর ছোট-জগৎপুরে কোথাও কোন মিল নেই। সেকেলে দুর্গের মতো গড়ন এই বাড়িটার সঙ্গে খিদিরপুরের একেলে বাড়িগুলির কোন মিল নেই, তবে এক জায়গায় এই মিল আর এত কুৎসিত মিল কেন?

চার বছর আগের একটি সায়াহ্নের একটা ঘটনা মাত্র, বুদ্ধিহীন কয়েকটা মুহূর্তের ভুল মাত্র। খিদিরপুরের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্যটার দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আর পাশের একটা পরিচিত মুখের কাছ থেকে গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ চমকে উঠেছিল শুক্তি, সেই ধরনের একটা দৃশ্যকে যে এখানেও তৈরী করে রেখেছে ঐ নদীর তীর, গাছের ভিড, মন্দিরের চূড়া আর ত্রিশূল। হাতধরা একটা লুব্ধ ও উন্মাদ অনুরোধের কাছ থেকে সরে যেতে পারেনি শুক্তি, যে ঘটনা মনে পড়তে কতবার মুখ কালো করেছে, আর সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে কতদিন কেঁদেও ফেলেছে শুক্তি, যে ঘটনার কথা স্মরণ করে আজ চার বছর ধরে নিজেকে ঘৃণা করেছে, অশুচি বোধ করেছে, আর হঠাৎ আতঙ্কে সুস্বপ্নও ভেঙ্গে গিয়েছে শুক্তির, সেই ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ঠিক সেই ধরনের একটা দৃশ্য এখানে আবার কেন?

কিন্তু এটা তো খিদিরপুরের বাড়ির ছাদ নয়, ছোট-জগৎপুরের রাজবাড়ির ছাদ। তবে আর কিসের ভয়? মিথ্যা ও অকারণ ভয়। আনমনার মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল শুক্তি, তা সে জানে না। হঠাৎ চোখে পড়ে, পুব দিকের

আকাশটা সত্যিই মেঘলা হয়ে উঠেছে। সেই রকমই একটা মেঘ ভেসে আসছে ঐ মন্দিরের দিকে। সূর্য প্রায় ডুবে এসেছে। পশ্চিমের আকাশ সেই রকমের লাল আর পুবের আকাশটা সেই রকমের কালো। ঐ মেঘটা মন্দিরের ত্রিশূলকে তো এইবার ছুঁয়েই ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ঝিলিক দিয়ে উঠবে সেই চার বছর আগের দিনটার মতো ও সেই রকমেরই একটা বিদ্যুৎ। সেই মুহূর্তে কানের কাছে বেজে উঠবে একটা ভয়ংকর অনুরোধ। তারপর···সে ঘটনার কথা মনে পড়লে এখনো শিউরে ওঠে শুক্তি। মনে পড়ে, তার কিছুক্ষণ পরেই তৃপ্ত ও সফল-কাম একটা সর্বনেশে পায়ের-শব্দ আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে নিচে চলে গিয়েছিল। মাগো!

চোখের উপর আঁচল চেপে ছটফট করে, ঠিক চার বছর আগে খিদিরপুরের বাড়ির ছাদে যেভাবে চোখে আঁচল দিয়ে একটা ভুলের জ্বালা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল শুক্তি।

আস্তে আস্তে একটা শান্ত পায়ের শব্দ সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে, তারপরেই ব্যস্তভাবে যেন ছুটে এসে শুক্তির কাছে দাঁড়ায়।

শুভেন্দু বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েই বলে—এ কি, তুমি কাঁদছো শুক্তি?

চোখের উপর থেকে আঁচল তুলে নিয়ে হেসে ওঠে শুক্তি—কে বললে কাঁদছি? চোখে জল দেখছো?

শুভেন্দু হাসে—না। তবে চোখে আঁচল চেপে কি করছিলে?

শুক্তি—তোমার পায়ের শব্দ শুনছিলাম।

শুভেন্দু—কি করে বুঝলে আমার পায়ের শব্দ? অন্য কারও পায়ের শব্দও তো হতে পারতো?

শুক্তির মুখের হাসি হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিটাও কেমন করুণ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তেই হেসে অস্থির হয়ে মুখের উপর আঁচল চাপে শুক্তি—ধেৎ।

শুভেন্দু—কি হলো?

শুক্তি—যা খুশি তাই বলা হচ্ছে, মুখে একটুও বাঁধছে না!

হাসিয়ে দেবার আর ভুলিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে শুক্তির! শুভেন্দু সত্যিই প্রসন্নভাবে হাসতে থাকে। সে-হাসির ছোঁয়া লেগে শুক্তির এতক্ষণের যন্ত্রণাটাও যেন নিঃশেষে মুছে যেতে থাকে। ও ছাই একটা দৃশ্য দেখে এত বিচলিত হবার কোনই দরকার ছিল না। কবেকার কোন্ এক অন্ধকারের দাগ, পৃথিবীর কারও চোখে ধরা পড়েনি, কোনদিন কেউ জানতেও পারবে না। তবে বৃথা আর

মনটাকে এত ভাবিয়ে তুলে লাভ কি ? শুক্তির মুখের হাসি দেখে যে ছোট জগৎ-পুরের মন এরই মধ্যেই ভুলে :গিয়েছে, সেই ছোট-জগৎপুরকে চিরকাল এমনি করেই হাসিয়ে ও ভুলিয়ে রাখলেই তো হলো। শুক্তি জানে, সে ক্ষমতা তার আছে।

শুভেন্দুরও ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগে, এই যে এত সুন্দর দেখতে একটি মানুষ—যার সঙ্গে জীবনে কোনদিন পরিচয় ছিল না, সে কি করে মাত্র সাতটা দিনের মধ্যে শুভেন্দুর সঙ্গে এত আপন হয়ে যেতে, আর শুভেন্দুকে এত আপন করে নিতে পারল ? অন্য মেয়ে হলে কি করত বলা যায় না, কিন্তু শুক্তি আশ্চর্য করেছে, এই ক'দিনের মধ্যে এই গেঁয়ো ছোট-জগৎপুরকেই ভালবেসে ফেলেছে শুক্তি। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা সন্ধ্যা আর ফেউ-ডাকা রাত্রিকেও অবাক হয়ে জানালার ধারে বসে, চোখ মেলে দেখেছে শুক্তি। এতটা আশা করেনি শুভেন্দু। বরং একটু আশঙ্কাই ছিল, শহরের শিক্ষিতা মেয়ে ছোট-জগৎপুরের মতো এমন একটা জগৎছাড়া গ্রামকে ভাল লাগিয়ে নিতে পারবে কি না। কিন্তু সে আশঙ্কা মিথ্যা করে দিয়েছে শুক্তি। আজই সকালে, একটা বাচাল বউ-কথা-কওকে দেখবার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে একেবারে দেউড়ির বাইরে গিয়ে, গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল শুক্তি, অনেকক্ষণ। ভুলেই গিয়েছিল শুক্তি, সে হলো এ বাড়ির বউ, নতুন বউ, আর জগৎপুরের বউরানী। তা ছাড়া, বাড়িতে এতগুলি কুটুম মানুষ যখন রয়েছে তখন···কিন্তু এই ছোট-জগৎপুরের আলোছায়া আর শব্দকে আপন করে নেবার টানে সে-সব ঘোমটা-ঢাকা নিয়মও ভুলে গিয়েছে শুক্তি।

আরও সুখের কথা, শুক্তিকে দেখে, তার চেয়ে বেশি শুক্তির ব্যবহার দেখে কুটুমেরা একটু মুগ্ধ হয়েই গিয়েছেন। এই তো চাই। এরই মধ্যে যে-মেয়ে এত আপন করে নিয়েছে শ্বশুরবাড়ির জীবনকে, সে মেয়ে সুখী হ'বেই হবে।

সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন শুভেন্দুর মা। তাঁর ইচ্ছা, নতুন বউ যেন এক মুহূর্তের জন্যও মনে না করতে পারে যে সে পরের বাড়িতে আছে। এরই মধ্যে শুভেন্দুকে সাবধান করে দিয়েছেন মা।—বউ আমার হাসবে খেলবে আর ঘুরে বেড়াবে। বাড়ির মেয়ের মতো থাকবে। যা, কালই সকালে দু'জনে গিয়ে জগৎ-লক্ষ্মীর মন্দিরে পূজো দিয়ে আয়।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু বলে—কাল তোমার একটা পরীক্ষা আছে।

শুক্তি—পরীক্ষা ? কিসের ?

শুভেন্দু হাসে—তুমি কত বড় লক্ষ্মী সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।

চুপ করে কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবে শুক্তি। শুভেন্দু ঠাট্টা করে—কি, ভয় পেয়ে গেলে নাকি?

শুক্তি—ভয়? ভয় করবার কি আছে?

শুভেন্দু—না করলেই হলো।

শুক্তি—আমি ভয় করবার মানুষ নই। নইলে এখানে আসতাম না।

শুভেন্দুর হাত ধরে টান দেয় শুক্তি।—চল কোথায় যাবে? কোথায় তোমার পরীক্ষা?

শুভেন্দু হাসে—আজ নয়, কাল সকালে।

এখন তো কোন ভয় নেই শুক্তির মনে, এখানে আসবার আগেও খুব বেশি কিছু ছিল না। বরং ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন বাড়ির আর সবাই।—স্টেশন থেকে দশ মাইল ধুলো আর চোরকাঁটা ডিঙিয়ে তবে পৌছতে পারা যায় ছোট-জগৎপুর, চিঠি পৌছয় তিন দিনে। এ তো প্রায় জগৎছাড়া একটা জায়গা!

মনের মধ্যে একটু কিন্তু কিন্তু ভাব নিয়েই ছোট-জগৎপুরের পাত্র সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন বাড়ির সকলেই। পাত্র ভালই, ছোট-জগৎপুরের ষোল-আনার মালিক। বয়স আর চেহারার দিক দিয়ে পাত্র ভালই। লেখাপড়ার দিক দিয়েও। ঐ জেলারই সদরে কলেজে পড়ত, বি-এ পাশ করেছে আজ চার বছর হলো। তবে এটা বোঝা যায়, শহরের জীবন আর চালচলন থেকে ছেলেটি যেন একটু দূরেই সরে থাকতে চায়। কলকাতায় একটা ভাল চাকরি পেয়েও নেয়নি। দুটো ট্র্যাক্টর কিনেছে এবং মাইনে দিয়ে একজন পাশ-করা কৃষি ওভারশিয়ারকেও রেখেছে। ছেলেটির মতিগতি দেখে মনে হয়, নিজের রাজ্যে রাজাবাবু হয়ে আর ছোট-জগৎপুরের মাটি ঘেঁটে ঘেঁটেই সে তার জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। ভালই তো।

কিন্তু ভয় ছিল, শুক্তি পছন্দ করবে কি না এই বিয়েব প্রস্তাব। যে-রকম মুখচোরা মেয়ে, মনে আপত্তি থাকলেও মুখে কিছু বলবে না। আজ চার বছর ধরে কত প্রস্তাবই তো এল আর গেল, কিন্তু শুক্তির মুখ থেকে পছন্দ-অপছন্দের একটা সামান্য হাঁ বা না, মুখের ভাবে আগ্রহ বা অনিচ্ছার সামান্য একটু ইঙ্গিতও কোনদিন দেখা গেল না। এই সম্বন্ধটা আবার একটু অন্য রকমের। একেবারে গাঁ-দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ, যে গাঁ-দেশের চেহারা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই শুক্তির। সুতরাং শুক্তির মনে আপত্তি থাকলে, এই বিয়ের অর্থ হবে মেয়েটাকে জোর করে বনবাসে পাঠানো।

কিন্তু মুখচোরা মেয়েই সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে মুখ খুলল।—এখানেই ভাল। হোক না গাঁ-দেশ, শহরের চেয়ে আর কত বেশী খারাপ হবে?

এমনিতে দেখে মনে হয়, যেন কিসের এটা ঘেন্নায় গাড়ি-ঘোড়ার শব্দে অশান্ত ও জনতাপীড়িত এই শহুরে জীবনের স্পর্শ থেকে বনবাসে চলে যাবার জন্যই একটা জেদ মনের মধ্যে পুষে নিয়ে চারটা বছর অপেক্ষা করছিল শুক্তি। যেই সুযোগ এল অমনি চলে গেল।

ছোট-জগৎপুরকে এত ভাল লেগে যাবে, এটাও কল্পনা করতে পারেনি শুক্তি। ভাবতে গিয়ে আরও আশ্চর্য হয় শুক্তি, ছোট-জগৎপুরকে চোখে দেখবার আগেই যেন জায়গাটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। কবে, কোন্‌দিন থেকে, তাও মনে করতে পারে শুক্তি। ছোট-জগৎপুরের মানুষটির সঙ্গে পাঁচ মিনিটের আলাপের পরেই, এই তো মাত্র পাঁচ দিন আগে, মাঝ-রাতের বাসরঘর যখন নিরালা হলো, তখন।

বলেছিল শুভেন্দু—আমি তো ভেবেছিলাম, গাঁয়ের মানুষকে দেখেই ভয় পেয়ে তুমি মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

শুক্তি—আমিও তো ভেবেছিলাম, শহরের মেয়েকে দেখেই কে-জানে কি-মনে করে তুমি চম্‌কে উঠবে।

শুভেন্দু—আমি চমকে উঠেছি ঠিকই, আমার এত সুন্দর ভাগ্য দেখে।

ছোট-জগৎপুরের একটা কৃতার্থ ও প্রসন্ন প্রাণ সেই যে শুক্তির হাত ধরল, কোথায় রইল শুক্তির ভয়! না-দেখা গাঁ-দেশ ছোট-জগৎপুরকে যেন সেই মুহূর্তে ভালবেসে ফেলেছিল শুক্তি।

ছোট-জগৎপুরই একটা ছোট জগৎ এবং বাড়ি বলতে এই একটি মাত্র বাড়ি, যার নাম রাজবাড়ি। আর সবই কুঁড়েঘর। পথে বের হয়ে শুক্তি অবাক হয়ে যায় গাঁয়ের চেহারা দেখে। এখানে-সেখানে ডোবা, এদিক-ওদিকে কাঁটার ঝোঁপ। এক জায়গায় ঘন সবুজ পাতায় ঠাসা হাজার হাজার বুনো লতা সাপের মতো দেহ জড়াজড়ি করে ছোট একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুরকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। বুঝতে পারা যায় না, সাপগুলিই লতার মতো হয়ে গিয়েছে, না লতাগুলি সাপের মতো হয়ে গিয়েছে।

—ওটা কি? দূরে উঁচু ইটের ঢিবির মতো একটা জায়গা, তার সারা গায়ে জংলা গাছের সাজ। শুক্তির প্রশ্ন শুনে উত্তর দেন শুভেন্দু—ওটা একটা রাসমঞ্চ।

রাসমঞ্চের রূপ দেখে চক্ষু স্থির হয়ে যায় শুক্তির। হঠাৎ কতগুলি শালিক কর্কশ স্বরে ডেকে ডেকে উড়তে থাকে, আর রাসমঞ্চের জংলা ঝোপের মধ্যে নড়া-

চড়া করে সাদা-কালো একটা জীব।

শুক্তি—ওটা আবার কি?

শুভেন্দু—বাঘডাঁস।

শুক্তি—অ্যাঁ?

শুভেন্দু হাসে—বাঘ নয়।

হেসে হেসেই পথ চলতে থাকে শুক্তি। হঠাৎ চমকে উঠলেও এরকমের ভয়কে একটুও ভয়াল বলে মনে হয় না শুক্তির, বরং ভালই তো লাগে।

ছোট-জগৎপুরের রূপ আর প্রাণের পরিচয় বর্ণনা করতে থাকে শুভেন্দু। যেন এক আশ্চর্য দেশের মেয়েকে এক অদ্ভুত দেশের পরিচয় শোনাচ্ছে। শুনতে শুনতে কখনো চক্ষুস্থির হয়, কখনো বা হেসে ফেলে শুক্তি।

শুভেন্দু বলে—ঐ মৌজাটার অর্ধেকটাই হলো চাকরান, আর তাঁর বাঁয়ে যে-সব ক্ষেত দেখছো, ওর বেশির ভাগ হলো মহাত্রাণ। এদিকের সবই ব্রহ্মোত্তর আর মৌরসী-মোকরবী। সবচেয়ে ভাল হলো ঐ যে, ঐ মেটে সড়কের দুপাশে…

হাত তুলে যেন পৃথিবীর চারদিকে ছড়ানো মাটি জল ও বাতাসের উপর কতগুলি অদ্ভুত ও বিচিত্র স্বত্বের আর স্বামিত্বের গর্ব বর্ণনা করে শোনাতে থাকে শুভেন্দু। শুনতে মন্দ লাগে না, যদিও একবিন্দু অর্থ বোঝা যায় না, নীরবে শুধু হাসতে থাকে শুক্তি। শুভেন্দু নিজের মনের উৎসাহেই বলতে থাকে—সবচেয়ে ভাল উসুল আর আদায় হয় ঐ দুটো বাজেয়াপ্তী আর খাবিজ মহাল থেকে।

শুক্তি তার ধুলোমাখা পায়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলে—ধুলোও লাল রঙের হয় নাকি?

শুভেন্দু—হয় বৈকি। বাঘা-এঁটেলের রঙই হলো লালচে, কোন-মতেই রবি ফলানো যায় না। তবে নদীর দিকে দু'হাজার বিঘের ওপর বেলে আর দোআঁশ আছে। ধান ফলে চমৎকার। এ ছাড়া ভাল মাটি বলতে ছোট-জগৎপুরে আর বিশেষ কিছু নেই। উত্তরে ওগুলি সবই হলো সাবেক পতিত, যত সব ঘাসি, কাঁকরে আর…।

হাসি থামাতে গিয়ে থেমে যায় শুক্তি। শাড়ির আঁচলটা শুভেন্দুর চোখের সামনে তুলে ধরেই শিউরে উঠতে থাকে—ইস্, কি বিশ্রী কতগুলো পোকা কাপড়টাকে কি-ভয়ানক কামড়ে ধরেছে দেখ।

শুভেন্দু বলে—পোকা নয়, চিড়-চিড়ে ফল।

শুক্তি অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে—বেশ সুন্দর ফল তো, নামটা আরও সুন্দর।

সত্যিই, এই ঝোপঝাপ গাছপালা আর লতাপাতার নামগুলিই বা কি অদ্ভুত! চলতে চলতে শুভেন্দু আরও নাম শোনাতে থাকে। এগুলি হলো হাড়জোড়া লতা, ভাঙ্গা হাড় জুড়ে দেয়। ওটা হলো একটা মাকড়া গাব। ঐ দেখ কাঁঠালের গাছটাকে কি ভয়ানক বাঁদরায় ছেয়ে ফেলেছে। আর ঐ যে একটা কাকডুমুরের জঙ্গল দেখছো, তার ওপাশেই হলো দীঘি। এগুলিকে বলে হাতি-শুঁড়ো, ওগুলি শোয়াল-কাঁটা। একটা কুকসীমের ঝাড় আর দুটো কেওঠেঙ্গার ঝোঁপের পাশ দিয়ে আঁচল বাঁচিয়ে সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে হেসে ফেলে শুক্তি—থাক্, এত সুন্দর সুন্দর নামগুলি আর শুনিও না, মনে রাখতে পারব না।

শুভেন্দু বলে—ঐ যে জগৎলক্ষ্মীর মন্দির।

ভাঙ্গা-চোরা আর বট-অশথের শিকড়ে জড়ানো একটা জীর্ণকায় পঞ্চরত্ন মন্দির। চারদিকের বনবাদাড়ে এখনো যেন অন্ধকার লুকিয়ে রয়েছে। মশার এক একটা ঝাঁক উড়ে যায় শব্দ করে। কি অদ্ভুত শব্দ! দিনের আলোকে চামচিকে উড়ে অন্ধের মতো দিগ্বিদিক বোধ হারিয়ে। শুক্তি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে, এই কি জগৎলক্ষ্মী মন্দিরের চেহারা?

মন্দিরের দরজা খুলে দিল পৈতে গলায় যে লোকটা, তার দিকেও হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে শুক্তি। লোকটা যেন এই কাঁটা-লতার ঝোপে পালিত একটা পাখির মতোই দেখতে। রোগা এইটুকু জীর্ণশীর্ণ দেহ নিয়ে জগৎলক্ষ্মীর পূজারী দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে, বুকের পাঁজরগুলি হাঁপায়।

মন্দিরের ভিতরে কোন মূর্তি নেই। শুধু পাথরের উপর একটি ধুনুচি রয়েছে, তার মধ্যে ধুনো পুড়ছে অল্প অল্প ধোঁয়া ছড়িয়ে। পূজোর ডালা থেকে ফুল আর সিঁদুরের কৌটা তুলে ধুনুচির সামনে রাখে শুক্তি। পূজারী লোকটা ধুনুচির গায়ে সিঁদুরের কৌটাটা একবার ছুঁইয়ে আবার ডালার ভিতর রেখে দেয়। তার পরেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে শুক্তির হাতে তুলে দেয় শুভেন্দু। টাকাটা ধুনুচির কাছে রেখে একটা প্রমাণ করে শুক্তি। পূজারী অস্ফুটস্বরে আর হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে কি যেন বলতে থাকে।

জগৎলক্ষ্মীর কাছ থেকে সরে এসে বাইরে দাঁড়িয়েই হাঁফ ছাড়ে শুক্তি।

—এ কি রকমের জগৎলক্ষ্মী, বুঝলাম না কিছু।

শুভেন্দু বলে—ঐ দীঘিটার ওপারে আরও মাইল দুয়েক উত্তরে যে গ্রামটা রয়েছে, তার নাম হলো বড়-জগৎপুর। সে গ্রামের কিছু আর এখন নেই। পুষ্করা লেগে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

শুক্তির স্থিরচক্ষুর কৌতূহল লক্ষ্য করে শুভেন্দু কাহিনীটাকে আরও তাড়াতাড়ি

মারতে থাকে।---এ সব অনেক দিনের আগের কথা। ছোটজগৎপুরেরও পুষ্করা লাগাতে চলেছিল। মড়ক আর মরণ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল বড়-জগৎপুরের দিক থেকে এই দিকে। এই মন্দিরে কোন বিগ্রহ ছিল না, তবু এখানেই এসে ছোট-জগৎপুরের সব মানুষ দিনরাত পুজো দিত আর প্রার্থনা করত, পুষ্করার কোপ থেকে বাঁচবার জন্য।

পাশেই ঝোপের ভিতর কিরকম একটা ঝনঝনে শব্দ বেজে ওঠে। শুক্তি চমকে ওঠে---কিসের শব্দ?

শুভেন্দু বলে---বোধহয় শজারু।···যাক, একদিন মাঝ রাতে, সেদিন পূর্ণিমা, দেখা গেল লালপেড়ে শাড়ি পরে এক মেয়ে, হাতে একটা ধুনুচি নিয়ে ছোট-জগৎপুরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধুনুচি থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ধুনোর গন্ধে ভরে উঠল গ্রাম। তারপরের দিনই দেখা গেল, এই মন্দিরের ভিতরে একটি ধুনুচি রয়েছে এবং তার মধ্যে ধুনো পুড়ছে।

শুক্তি---তার মানে কি হলো?

শুভেন্দু---তার মানে এই যে, স্বয়ং লক্ষ্মী নিজে এসে ধুনোর ধোঁয়া ছাড়িয়ে ছোট-জগৎপুরকে পুষ্করার কোপ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

শুক্তি---এ তুমি বিশ্বাস কর?

শুভেন্দু হাসে---বিশ্বাস করতে তো ভালই লাগে?

শুক্তি---সত্যি হলে তো ভালই ছিল।

শুভেন্দু---তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

শুক্তি---না।

শুভেন্দু---যাক্, কিন্তু মনে রেখ, তোমার একটা পরীক্ষা আরম্ভ হলো।

শুক্তি---কি?

শুভেন্দু---এইবার ছোট-জগৎপুরের সমস্ত মানুষ জানতে পারবে, নতুন বউরানী কত বড় লক্ষ্মী?

শুক্তি---তার মানে?

শুভেন্দু---ক'দিনের মধ্যেই এমন কোন ঘটনা ঘটা চাই, যাতে বোঝা যাবে যে তুমি একটি খাঁটি লক্ষ্মী।

চমকে ওঠে শুক্তি।---আমি কি করে ঘটনা ঘটাবো?

শুভেন্দু---তোমার পুজোর ফলেই ঘটনা ঘটবে। যদি ছোট-জগৎপুরের মানুষ আর রাজবাড়ির জীবনে কোন নতুন সৌভাগ্য দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে যে, তুমি সত্যিই লক্ষ্মী।

শুক্তির কণ্ঠস্বরে হঠাৎ বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে---এ রকম কোন সর্ত আমি করেছিলাম না কি ?

শুভেন্দু হাসে---তুমি সর্ত করবে কেন ? এটা হলো এই ছোট-জগৎপুরের সর্ত ? চিরকাল এখানে এই সর্তেই রাজবাড়ির নতুন বউরাণীরা পরীক্ষা দিয়েছে।

শুক্তি---সবাই পাশও করেছে নিশ্চয় ?

শুভেন্দু---হ্যাঁ, সে ইতিহাস মার কাছেই শুনতে পাবে।

কোন উত্তর দেয় না শুক্তি। ছোট-জগৎপুরের এই সব কাঁটাভরা ঝোপ, সাপের মতো হিংস্র লতা, পোকার মতো ফল, জন্তুর মতো গাছপালা, বিদঘুটে শব্দ আর নানা রকমের অন্ধকারের মধ্যে কোনই ভয় ছিল না। হঠাৎ কোথা থেকে এক অদ্ভুত গা-ছমছম করা কাহিনীটা এসেই যেন এই প্রথম ভয় পাইয়ে দিল শুক্তিকে।

গম্ভীর মুখে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় শুক্তি। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। তারপরেই হেসে ওঠে---আমার একটু দরকার আছে। আর একবার মন্দিরে চল।

একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না শুভেন্দু।---এখনই।

শুক্তি---হ্যাঁ।

চামচিকার দল আবার কিচমিচ শব্দ করে উড়তে থাকে। ধুনোর গন্ধেভরা মন্দিরের ভিতরে ঢুকে ধুনুচির কাছে মাথা উপুড় করে অনেকক্ষণ পড়ে থাকে শুক্তি। শুক্তির কাণ্ড দেখে হতভম্বের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে শুভেন্দু। যেন এক অজ-পাড়াগাঁয়েরই অসহায় ও দুর্বল একটা মেয়ের বিপন্ন আত্মার কাতর আবেদনের মতো পড়ে রয়েছে শুক্তি। কে জানে, কি প্রার্থনা করেছ শুক্তি, দু'ঠোঁটের কাঁপুনিতে অতি ক্ষীণস্বরে ফিস-ফিস করছে যে ভাষা, তার একটা কথাও শুনতে পায় না শুভেন্দু।

উঠে এসে শুভেন্দুর কাছে দাঁড়ায় শুক্তি---চল এবার।

আরও বিস্মিত হয়ে বেদনার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু। ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে শুক্তির চোখ !

শুভেন্দু বলে---গল্পটা বলে তোমাকে কষ্ট দিলাম মনে হচ্ছে।

শুক্তি হাসে---একটু না।

একটা সাড়া-ই পড়ে গেল ছোট-জগৎপুরে। বউরাণী লক্ষ্মী, বউরাণী লক্ষ্মী ! দু' পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। জগৎপুরের শক্ত এঁটেল মাটির ক্ষেত ভিজে নরম হয়ে গিয়েছে। এবার লাঙ্গল আর রোপাই আরম্ভ করে দিলেই হলো, আর কোন অসুবিধা নেই।

সদর থেকে খবর নিয়ে এসেছে উকীলের মুহুরী, তিন বছর ধরে ঝুলছিল যে মামলাটা, তার রায় বের হয়েছে এতদিনে। ষাট হাজার টাকার ডিক্রি পেয়েছে শুভেন্দু।

শাশুড়ী ডাক দিয়ে বলেন---বউমা, আজ হলো চতুর্দশী। আজই একবার গিয়ে হর্ষমতীর জল ছুঁয়ে এস।...ও শুভেন্দু, শুনেছিস।

শুভেন্দু বলে---হ্যাঁ শুনেছি, আজই যাব।

শুক্তি হাসি বন্ধ করে। হঠাৎ গম্ভীর হয়---হর্ষমতীর জল মানে?

শুভেন্দু---ঐ সেই দীঘিটা। ওর নাম হলো হর্ষমতীর সায়র।

শুক্তি---ওর জল ছুঁলে কি হয়?

হাসতে থাকে শুভেন্দু। শুক্তি তেমনি গম্ভীরভাবে বলে---আর একটা গল্প আছে বোধহয়?

শুভেন্দু---হ্যাঁ।

শুক্তি---আর একটা পরীক্ষা দিতে হবে নিশ্চয়?

শুভেন্দু---নিশ্চয়।

শুক্তি---আর পারি না! অপ্রস্তুতভাবেই আক্ষেপ করে অন্যদিকে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে শুক্তি। এইভাবেই কি অনন্তকাল এখানে শুধু পরীক্ষা দিতে হবে? ছোট জগৎপুর নামে এই রাজ্যিছাড়া রাজ্যিটা তো দেখতে বড নিরীহ। আসা মাত্র একেবারে বউরানী বলে আদর করে আর মাথায় তুলে রাখতে চায়। কিন্তু এত অভ্যর্থনার ভিতরে আবার এইসব পরীক্ষা করার ষড়যন্ত্র কেন?

শুভেন্দু সান্ত্বনার সুরে বলে---কি হয়েছে, কতটুকুই বা হাঁটতে হবে? বরং একবার বেড়িয়ে এলে ভালই লাগবে তোমার।

শুক্তি---হাঁটতে ভয় পাই না। বেড়ানোও অভ্যেস আছে।

শুভেন্দু---তবে কিসের ভয়?

শুক্তি ভ্রূকুঞ্চিত করে---ভয়? ভয় কেন করব? কি পাপ করেছি যে একটা দীঘির জল ছুঁতে ভয় করব?

খুশি হয়ে শুক্তির হাত চেপে ধরে শুভেন্দু বলে---চলো, পথে অনেক নতুন জিনিষ দেখাব তোমাকে।

দ্বিধা করে বা দেরী করে কোনও লাভ নেই। পরীক্ষাটার সম্মুখীন হবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে শুক্তি বলে---চলো।

মস্ত বড় একটা ডাঙ্গার উপর দিয়ে চলতে চলতে শুক্তির মনের ভার আস্তে আস্তে মিটে যেতে থাকে। ডাঙ্গার মাটি শক্ত, কিন্তু নরম ঘাসে ঢাকা। কাঁটার

ঝোঁপ-ঝাপ সরিয়ে ছোট-জগৎপুরের মনটা যেন এখানে বেশ খোলামেলা হয়ে উঠছে। মস্ত বড় একটা গাছের মৃতদেহ পাথরের মতো শক্ত ও মসৃণ হয়ে পড়ে রয়েছে ডাঙার এক জায়গায়। শ্রান্ত হয়ে গাছের উপর বসে শুভেন্দু ও শুক্তি।

গল্প করে শুভেন্দু।—এটা কি বলতে পার?

---গাছ বলেই তো মনে হচ্ছে।

---গাছ কি এ রকম পাথরের মতো হয়?

--তবে কি এটা?

---এটা হলো বকরাক্ষসের লাঠি। সেই যে ভীমের হাতে মার খেয়ে মরে গেল বক, সেই দিন থেকে তার লাঠিটা পড়ে আছে এখানে।

হেসে উঠে শুক্তি। শুনতে ভালই লাগে। এ রকম হাজার গল্প হাজার মনের ভিতর পুষে রাখুক না ছোট-জগৎপুর। কিন্তু··· । কিন্তু হর্ষমতীর গল্পটাও কি এই রকমের?

হর্ষমতীর সায়রের কাছে পৌছবার পর গল্পটা শুরু করে শুভেন্দু। দাম আর টোপা পানায় ভরা প্রকাণ্ড সায়র। ভাঙা ভাঙা এক একটা ঘাটের শ্যাওলা-মাখা ইট ছড়িয়ে আছে এলোমেলোভাবে। তালগাছের উপর এই ভরা দুপুরেই অলস হাড়গিলা নিঃস্পন্দ হয়ে ঘুমোয়। যেমন নির্জন জায়গাটা, তেমনি একটা নিস্তব্ধতা যেন থমকে রয়েছে।

শুভেন্দু বলে।—সে অনেক দিন আগেকার কথা। এই যে কলাইয়ের ক্ষেতটা দেখছো, এখানেই ছিল এক রাজার বাড়ি। রাজার বড় দুঃখ ছিল, কারণ রানী হর্ষমতী ছিলেন বন্ধ্যা।

শুক্তি হাসে—থাক, আর শুনতে চাই না। এ গল্প না শুনলেও চলবে।

শুভেন্দু—সায়রের জল ছুঁয়ে এই চতুর্দশীতে একবার মাথায় হাত না দিলে তো চলবে না।

শুক্তি—কেন?

শুভেন্দু—এখানকার নিয়ম।

শুক্তি হাসে—অদ্ভুত নিয়ম, বেহায়া নিয়ম।······তুমি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।

ঘাটের দিকে এগিয়ে যায় শুক্তি। শুভেন্দু বলে—গল্পটা আগে শুনে নাও। ···একদিন স্বপ্নে শুনতে পেলেন হর্ষমতী··· ।

থেমে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে শুক্তি—কি শুনতে পেলেন?

— চোখ বুঁজে শুধু স্বামীর মুখ মনে করতে করতে এক চতুর্দশীর দুপুরে এই

সায়রের জলে বার বার-তিনবার ডুপ দিয়ে পদ্মের শিকড় স্পর্শ করবি। তাহলেই তোর কোল আলো করা…।

শুক্তি মুখ কালো করে তাকায়—এটাও দেখছি একটা পরীক্ষা। বার বার তিনবার স্বামীর মুখ স্মরণ করে জল ছুঁতে হবে। এই তো?

শুভেন্দু—হ্যাঁ।

শুক্তি—যেন অন্য কোন মুখ ভুলেও মনে না আসে, এই তো?

শুভেন্দু হাসে—হ্যাঁ।

শুক্তি মুখ ভার করে বলে—চলো বাড়ি যাই।

শুভেন্দু বিষণ্ণভাবে বলে—সামান্য একটা গল্পের উপর এত রাগ করছ কেন তুমি?

চুপ করে ভাঙ্গা ঘাটের হিংস্র দাঁতের মতো শ্যাওলা-মাখা ইটগুলির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি।

শুভেন্দুও আনমনার মতো দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। চুপ করে যেন শুক্তির এই আপত্তির আঘাতটাকে সহ্য করবার চেষ্টা করছে শুভেন্দু। কিসের জন্য, কেন এ রকম করছে শুক্তি? কি বলতে চায় শুক্তি?

শুক্তি ডাকে—শুনছ?

শুভেন্দু—কি?

শুক্তি—আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

শুভেন্দু—কেন, কিসের এত ভয়?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হঠাৎ শুভেন্দুর হাত ধরে সাগ্রহে অনুনয়ের স্বরে শুক্তি বলে—কিছু মনে করো না। তুমি এস, আমার মাথা ছুঁয়ে আমার কাছে দাঁড়াও, তবে আমি তিনবার জলস্পর্শ করতে পারব।

শুভেন্দুর মুখের বিষণ্ণতা কেটে যায়।—তাই বলো, এ তো রাণী হর্ষমতীর চেয়েও এক ডিগ্রী বেশি হয়ে গেল।··চলো।

লক্ষ্য করে শুভেন্দু, সায়রের জল তিনবার মাথায় ছোঁয়ানো হয়ে যাবার পরেও আর একবার জল তুলে নিয়ে চোখ দুটোকেও ধুয়ে ফেলে শুক্তি।

ফেরবার পথে শুভেন্দু আর একবার জিজ্ঞাসা করে—এ সব গেঁয়ো নিয়মটিয়ম পালন করতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, শুক্তি?

শুক্তি বলে—না, তুমি যতক্ষণ সঙ্গে আছ, কোন কষ্টই হবে না।

ছোট-জগৎপুরকে ভাল লাগে, ভাল লাগে ছোট-জগৎপুরের এই মানুষটিকে,

কিন্তু ভয় করে ছোট-জগৎপুরের এই কাহিনীগুলিকে। কি ভয়ানক এক একটা কাহিনী, যেন বুক চিরে পরীক্ষা করে দেখতে চায়, ভিতরে কিছু লুকানো আছে কি না।

কিন্তু শুক্তির ক্ষুব্ধ মনের যত অভিযোগ আর আশঙ্কা শান্ত করে দিয়ে, আর শুক্তির জীবনে একটা নতুন ঘটনার সূচনা স-রবে ঘোষণা করে দিয়ে শাশুড়ির কণ্ঠস্বরের হর্ষ একদিন ধ্বনিত হয়, কারণ কৃপা করেছে হর্ষমতীর সায়র।—বউমা, এবার একদিন নাগেশ্বরতলায় গিয়ে ভয়নাশন করে এস।···ওরে শুভেন্দু, শুনেছিস্।

ছোট-জগৎপুরের গো-চর মাঠের পশ্চিমে মস্ত বড় একটা বৃদ্ধ অশত্থ, তার গোড়ার দিকে একটা ফোঁকর। ফোঁকরের ভিতরে আছেন এক অতিবৃদ্ধ নাগ। সে নাগকে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ চোখে দেখেনি, তবুও তিনি আছেন, দ্বিতীয় এক অনন্ত নাগের মতো চিরকাল এখানে আছেন। ছোট-জগৎপুরের একশো বছর আগের বউরাণীও প্রথম সন্তানের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এই নাগেশ্বরতলায় এসে ভয়নাশন করে গিয়েছেন। এ অবস্থায় মনে কোন ভয় রাখতে নেই। ভয় থাকলে সন্তান ভীরু হয়।

শুক্তি একটু উৎসাহিতভাবেই প্রশ্ন করে---ভয়নাশনটা আবার কি?

শুভেন্দু—ভয়নাশন পূজো। যে ভয়কে সবচেয়ে বেশি ভয় হয়, সেই ভয়ের কথা জানিয়ে দিতে হবে নাগেশ্বরকে। তাহলে জীবনে আর সে ভয় থাকবে না।

শুক্তি বলে—চলো।

চলতে দেরি হয়নি, পৌছতেও দেরি হয়নি। নাগেশ্বরতলায় এসে বুড়ো অশত্থের গোড়ায় মাটির ভাঁড়ে দুধ রেখে দিয়ে প্রণাম করে শুক্তি।

অশত্থতলার ধুলো লাগে কপালে, শুক্তি যেন কৃতার্থভাবে উঠে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে—নাগেশ্বর কৃপা করলেন কিনা কি করে বুঝব?

শুভেন্দু—সূর্য ডুববার পরেই ফিরে এসে যদি দেখতে পাও যে, ভাঁড়ের সব দুধ খেয়ে চলে গিয়েছেন নাগেশ্বর, তবেই বুঝবে যে···

শুক্তি—সূর্য তো ডুবতে চলল।

শুভেন্দু—তাহলে চলো, একটু ঘুরে ফিরে তারপর এসে দেখবে।

ঘুরে ফিরে বিকেলের শেষটা পার করে দিয়ে প্রথম সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে বুড়ো অশত্থের কাছে ফিরে আসে শুভেন্দু আর শুক্তি। শুভেন্দু বলে---ঐ দেখ!

আনন্দে শুভেন্দুর হাত ধরে হাসতে থাকে শুক্তি। প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন নাগেশ্বর। ভাঁড়ে এক ফোঁটা দুধ নেই, কখন এসে নিঃশেষে সব দুধ পান করে অশত্থের গহ্বরের আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

ফেরবার পথে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করে—কোন্ ভয়ের কথা নাগেশ্বরকে জানালে ?

শুক্তি হাসে—তা বলব কেন ?

শুভেন্দু—আমিও একদিন নাগেশ্বরের কাছে এসে ভয়নাশন করে গিয়েছি।

শুক্তি হেসে লুটিয়ে পড়তে চায়—তোমার আবার ভয়নাশন কিসের ? তোমারও কি··· ।

শুভেন্দু—হঁ্যা, পুরুষরাও এসে এখানে ভয়নাশন করে। ছোট-জগৎপুরের নিয়ম আছে বিয়ে করতে যাবার আগে নাগেশ্বরের কাছে মনের ভয়ের কথা বলে ভয় দূর করে নিতে হয়।

শুক্তি—তুমি কোন্ ভয়ের কথা বলেছিলে ?

শুভেন্দু—তা বলব কেন ?

শুক্তি—বলো না, আমি শুনলে দোষ কি ?

শুভেন্দু—গেঁয়ো মানুষের মনের একটা বাজে ভয়ের কথা, সে কথা শুনে তোমারই বা লাভ কি ?

সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারেই শুক্তি দেখতে পায়, শুভেন্দুর চোখ দুটো কেমন অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শুক্তি বলে—নাগেশ্বর তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন তো ?

শুভেন্দু—ভাঁড়ের দুধ তো সব চেটেপুটে খেয়ে চলে গিয়েছিলেন।

শুক্তি—তবে আর ভাবনা কিসের ?

শুভেন্দু—তবুও ভাবনা হয়। সন্দেহ হয় নাগেশ্বর আমাকে ঠকালেন না তো ?

শুভেন্দুর চোখে সেই অদ্ভুত ভঙ্গী, আর দৃষ্টিটাও তেমনি। শুক্তি বলে—তোমার সন্দেহের কোন অর্থ-ই হয় না। নাগেশ্বর কাউকে ঠকাতে পারেন না।

শুক্তির সান্ত্বনার ভাষা ও ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলে শুভেন্দু।—তুমি যখন বলছ, তখন বিশ্বাস করছি নাগেশ্বর আমাকে ঠকাননি।

পথ চলার ছন্দ যেন দু'জনেই আবার ফিরে পায়। আকাশে সন্ধ্যা-তারা একটু দূরে চাষীদের আঙিনায় ঘরেফেরা গরুর ডাক বাতাসে সাড়া জাগিয়ে তোলে। একটা মাটির দীপ জ্বলছে একেবারে নিকটেই। ঢিপির মতো একটা জায়গা, জংলা লতাপাতায় ঢাকা।

শুক্তি প্রশ্ন করে—এখানে আবার প্রদীপ জ্বলে কেন ?

শুভেন্দু—এই মাসটা প্রতি সন্ধ্যাতেই এখানে প্রদীপ জ্বলবে।

শুক্তি—কেন ?

শুভেন্দু—এটা হলো রুপো ঠাকরুনের ভিটা।

শুক্তি—এটাও গল্প বোধহয়?

শুভেন্দু—হ্যাঁ। রুপো ঠাকরুন ছিলেন একজন সতীসাধ্বী……।

পায়ে যেন হঠাৎ কি একটা ফুটেছে। বেদনার্তের মতো মুখ করে অন্য দিকে তাকিয়ে শুক্তি বলে—চলো, রাত হয়ে আসছে।

চলতে থাকে শুভেন্দু, কিন্তু রুপো ঠাকরুনের গল্পটা না বলে থাকতে পারে না।—রুপো ঠাকরুন ছিলেন এক গরীব বামুনের বউ। দেখতে পরমা সুন্দরী। এত গরীব যে দু'কড়ি খরচ করে সধবার সাধ একটু আলতা কেনবারও উপায় ছিল না রুপো ঠাকরুনের। এক দিন কোথা থেকে অচেনা-অজানা একটি মেয়ে এসে বলল, দুঃখ করো না রুপো ঠাকরুন, তুমি জল দিয়েই আলতা পরো। যদি সতী হয়ে থাক, তবে তোমার পায়ে লেগে জলই আলতা হয়ে যাবে।

শুক্তি—তাই হলো নিশ্চয়?

শুভেন্দু—হ্যাঁ, যতদিন বেঁচে ছিলেন রুপো ঠাকরুন, ততদিন জলের আলতাই পরতেন। জলের দাগ আলতার চেয়েও বেশি রাঙা হয়ে ফুটে উঠত রুপো ঠাকরুনের পায়।

শুক্তি বলে—বাঃ, চমৎকার গল্প।

শাশুড়ি ডাক দিলেন—ও বৌমা, প্রজাবাড়ির মেয়েরা এসেছে তোমার কাছে। শুনে নাও, কি বলছে ওরা?

আশ্বিন মাস, ছোট-জগৎপুর এই মাসে একটা ব্রত করে, তার নাম সতী-সোহাগ। এ বছর নতুন বউরাণীর পায়ে আলতা পরিয়ে সতীসোহাগ করবে প্রজাবাড়ির মেয়েরা, সেই কথা জানাতে এসেছে টগর কালী খাঁদি পটল সীতা ফুলকুঁড়ি ধবধবী বুড়ি আর চন্দনা। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা অস্থিসার কতগুলি রোগা-রোগা মেয়ে। আজ ওরা সিধে নিয়ে যাবে, কাল এসে আলতা পরিয়ে সতীসোহাগ করে যাবে।

প্রজাবাড়ির মেয়েদের প্রস্তাবটা চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনল শুক্তি। আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসল শুভেন্দু। আধ সের করে চিঁড়ে সিধে নিয়ে চলে গেল প্রজাবাড়ির মেয়ের দল।

সন্ধ্যা হতেই শুভেন্দুর সঙ্গে একটা ঝগড়ার মতোই ব্যাপার করে ফেলল শুক্তি।—তোমাদের এই রাজ্যিছাড়া গ্রামটা কি শুধু কতকগুলি গল্প দিয়ে তৈরী?

শুভেন্দু বলে—তাই তো দেখছি।

শুক্তি—পৃথিবীর কোথাও এমন সৃষ্টিছাড়া ব্রত আছে বলে তো শুনিনি।

শুভেন্দু—তাও সত্যি।

শুক্তি—সতীসোহাগ ব্রতটার অর্থ কি ?

শুভেন্দু—ঐ রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আলতার সঙ্গে গুলে পায়ে পরিয়ে দেবে।

শুক্তি—তাতে কি হয় ?

শুভেন্দু—অনেক কিছু ভাল হয়। আবার উল্টোটাও হয়। সে গল্প যদি শুনতে চাও তো বলি।

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে অনেক দূরের একটা অন্ধকারের দিকে তাকায় শুভেন্দু—ঐ বড়-জগৎপুরের ডাঙ্গাটা যেখানে আরম্ভ হয়েছে, তারই পুবে আছে চোখটেরির খাল। এক চোখটেরি একবার গাঁয়ের একশো মেয়েকে মেঠাই মণ্ডা খাইয়ে খুব ঘটা করে সতীসোহাগ করিয়েছিল। চোখটেরির পায়ে টুকটুকে লাল আলতা পরানো মাত্রই আলতা জল হয়ে গেল। লোকে বললে, একি ব্যাপার ? একটু পরেই খবর এল, চোখটেরির স্বামী সাপের কামড়ে মরে গিয়েছে। ধরা পড়ে গেল চোখটেরির জীবনের লুকানো দোষ। আর সেই লজ্জা সহ্য করতে না পেরে শেষে ঐ খালের জলে ডুবে মরে গেল চোখটেরি।

শুক্তি—গল্পটা মোটেই ভাল নয়। চোখটেরির পাপে চোখটেরি মরল, ভালই হলো। কিন্তু চোখটেরির স্বামী বেচারা মরবে কেন ?

শুভেন্দু হাসে—মরে তো গেল কি আর করা যাবে ?

কিছুক্ষণ পরে রাতটাও যেন কেমন-কেমন হয়ে গেল। কিছুতেই ঘুম আসে না শুক্তির। শুভেন্দুকেও ঘুমোতে দেয় না শুক্তি। ছোট-জগৎপুরের আজকের রাত্রিটাকে বড় ভয় করছে শুক্তির। এই রাতটা তো আর কিছুক্ষণ পরে ফুরিয়েই যাবে, তার পরেই সতীসোহাগের আলতা নিয়ে দেখা দেবে কি-ভয়ানক একটা সকালবেলা। শুক্তির সমস্ত আত্মাটাই যেন কিসের একটা ভয়ে ধুকধুক করছে।

শুভেন্দু বলে—আর কত গল্প শুনবে ? এবার ঘুমিয়ে পড়।

শুক্তি—কি করে ঘুম হবে ? একটা গল্পেরও কি মাথামুণ্ডু কিছু আছে। যত সব ভয়-দেখান বিদঘুটে গল্প।

বাস্তবিক, ছোট-জগৎপুরের প্রত্যেকটা ছায়া আর শব্দেরও যেন ইতিহাস আছে। যত সব অনুতাপের প্রায়শ্চিত্তের শাস্তির আর প্রতিশোধের ইতিহাস।

হুম্ হুম্ শব্দ করে একটা পেঁচা ডাকছিল এতক্ষণ। কিন্তু ওটা ঠিক পেঁচার ডাক নয়। শুভেন্দু বলে—অনেকদিন আগে এক ঘুমন্ত গেরস্থকে হত্যা করেছিল

এক ডাকাত, তার নাম বেন্দা। সেই গেরস্থের বউয়ের অভিশাপে চিরকালের মতো পেঁচা হয়ে গিয়েছে বেন্দা ডাকাত। ঘুম নেই বেন্দার চোখে। আশ্বিনের ঠিক এই দিনটিতেই একবার ছোট-জগৎপুরের অন্ধকারে উড়ে উড়ে চোখের জ্বালায় ডাকতে থাকে বেন্দা—ঘুমো ঘুমো। চাষী ছেলেরা জেগে উঠে একটা আমগাছের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়, তার পরেই আর পেঁচার ডাক শোনা যায় না।

এখানেই বসে দেখা যায়, শ্মশানের মাঠের দিকে একটা আলেয়া এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ওটা তো ঠিক আলেয়া নয়। শুভেন্দু বলে···ওটা হলো চিন্তে-মণির জ্বালা। রোগী স্বামীর উপর রাগ করে চিন্তেমণি একদিন বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। যেদিন ফিরল সেদিন স্বামীর চিতা জ্বলছে শ্মশানে। সেই যে চিন্তেমণি ঘর ছেড়ে চলে গেল, আর তাকে কোথাও দেখা গেল না। শুধু মাঝে মাঝে অনেক রাতে দেখা যায়, আলেয়া হয়ে শ্মশানের মাঠে স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে চিন্তেমণি।

অন্ধকার ছাপিয়ে কান্না মেশানো দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা ঝড়ের শব্দ অনেক-দূর থেকে ভেসে এসে আবার মিলিয়ে যায়, কিন্তু ঝড় নয় ওটা। শুভেন্দু বলে—ওটা হলো ভোলা বেদের দীর্ঘশ্বাস। যখ হয়ে মাটির নিচে গুপ্তধন আঁকড়ে পড়ে আছে ভোলা। এক দেবমন্দির থেকে বিগ্রহের গায়ের সোনা চুরি করে ভোলা বেদে কুয়োর নিচে নেমেছিল লুকিয়ে রাখার জন্য, হঠাৎ কুয়ো ধ্বসে সেই যে মাটি চাপা পড়ল তো পড়লই।

শুক্তি বলে—রক্ষে করো। আর গল্প শুনতে চাই না।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বিচলিত হয় শুভেন্দু—একি, তুমি এতক্ষণ ধরে মুখ আড়াল করে শুধু কাঁদছ?

শুক্তি—বড় ভয় করছে আজ।

শুক্তির মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে শুভেন্দু সমবেদনার স্বরে বলে—ছিঃ, এত ভয় করতে হয়?

শান্ত হয় শুক্তি।

—কই গো বউরানী? বউরানী কই?

আঙিনার উপর এক পাল মেয়ের উল্লাস সকালবেলাটাকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল। রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি নিয়ে সতীসোহাগ করতে এসেছে চন্দনা থাঁদি সীতা কালী পটলী ধবধবী ফুলকুঁড়ি টগর আর বুড়ি।

ও-ঘর থেকে সন্ত্রস্তের মতো ছুটে এসে এঘরে শুভেন্দুর কাছে দাঁড়ায় শুক্তি।

—ওদের চলে যেতে বল লক্ষ্মীটি, পায়ে পড়ি তোমার।

শুভেন্দু—ছিঃ, সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এরকম করছ কেন? মা শুনলে বড় রাগ করবেন।

অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে শুক্তি। চোখের দৃষ্টি একটা আতঙ্কে অস্থির হয়ে কাঁপছে। যেন কোন কথাই শুনতে পাচ্ছে না শুক্তি।

চুপ করে অনেকক্ষণ শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু। তারপর শুক্তির একটা হাত ধরে আস্তে আস্তে শুক্তিকে কাছে টেনে নিয়ে একেবারে চোখের উপর চোখ তুলে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে—কেন এত ভয়?

শুক্তির সব চঞ্চলতা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। ধীর স্থির ও শান্ত, গলার স্বর একটুও বিচলিত না করে শুক্তি আস্তে আস্তে বলে—তুমি তো সবই বুঝতে পার।

—ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু···।

—কিন্তু নয়, সত্যি।

—কবে?

—চার বছর আগে।

শুক্তির হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায় শুভেন্দু। ঘরের ভিতর পায়চারি করে বেড়াতে থাকে।

হঠাৎ একবার থামে শুভেন্দু, শুক্তির মুখের দিকে একটা কঠিন ও উদাস দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে বলে ওঠে—নাগেশ্বরের কাছে আমি এই ভয়ের কথাই বলেছিলাম শুক্তি।

এক একটা মুহূর্ত যেন ভয়ংকর নিস্তব্ধতার মধ্যে মরে চলেছে। শুক্তি দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি ধীর স্থির ও শান্ত। এই রাজ্যিছাড়া ছোট-জগৎপুরের সব কাহিনীর ভ্রূকুটি-ভরা চোখগুলিকে আজ বুক চিরে দেখিয়ে দিতে পেরেছে শুক্তি। আর অস্থির হয়ে উঠবার, মুখ লুকোবার, আর চোখ ফিরিয়ে নেবার তো দরকার নেই।

শুভেন্দু বলে—যাও, ওরা ডাকছে, দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি। শুভেন্দু আবার অনুরোধ করে—মাত্র একটা অভিনয় তো। যাও, সেরে দিয়েই চলে এসো, দেরি করে লাভ কি?

ভাঙা ভাঙা নিঃশ্বাসের শব্দের মতো স্বরে শুক্তি বলে—পারব না।

শুভেন্দু—কেন?

শুক্তি—রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আমি সহ্য করতে পারব না।

শুভেন্দু—হর্ষমতীর জল সহ্য করতে পারলে, জগৎলক্ষ্মীর সিঁদুর সহ্য করতে পারলে, এটা আর সহ্য করতে পারবে না কেন?

শুক্তি—না আর পারব না!

দু'হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে ঘরের মেজের উপরেই বসে পড়ে শুক্তি।

শুভেন্দু এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে—কেন পারবে না?

চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে শুভেন্দুর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলে শুক্তি।—তোমার অমঙ্গল হবে।

চমকে ওঠে শুভেন্দু, ঠিক যেমন হঠাৎ আলোর ঝলক লাগলে চমকে ওঠে মানুষের চোখ।

শুভেন্দু—এই তোমার ভয়?

শুক্তি—ঐ একটি ভয়।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায় শুভেন্দু। শুক্তির চোখ-বোঁজা মুখের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখতে থাকে। ছোট-জগৎপুরের অমঙ্গলের জন্য যার এত ভয়, আর একমাত্র ভয়, সে বেচারারই চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে শাস্তি দিচ্ছে ছোট-জগৎপুরের কতকগুলি নির্মম গল্প।

আর একবার তাকায় শুভেন্দু। শুক্তির কাছে এসে দাঁড়ায়। দেখতে অদ্ভুত লাগছে শুক্তির মুখটা। যেন শান্ত হয়ে আর মন ভরে ছোট-জগৎপুরের জন্য মঙ্গলের স্বপ্ন দেখছে দু'টি ঘুমন্ত চক্ষু। না, কথাটা ঠিকই। নাগেশ্বর কখনো কাউকে ঠকাতে পারেন না।

হঠাৎ শুভেন্দুর সারা মুখে যেন একটা কৃতার্থ কামনার হাসি ঝক করে ফুটে ওঠে। পা টিপে টিপে জানালার কাছে এগিয়ে যেয়ে আঙিনার উপর প্রজাবাড়ির মেয়েগুলির দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় কি যেন একটা কৌতুকের নির্দেশ জানায়। পা টিপে টিপে আর আস্তে আস্তে ফিরে এসে শুক্তির নীরব নিঃস্পন্দ ও চোখ-বোঁজা শান্ত মূর্তিটার পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

হুড়মুড় করে ছড়া গাইতে গাইতে ঘরের ভিতর এসে ঢুকে পড়ে মেয়ের পাল। টগর চন্দনা খাঁদি পটলী ধবধবী বুড়ি সীতা ফুলকুঁড়ি আর কালী।

—রক্ষে কর। তুমি কোথায়? ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি।

শুক্তির মাথায় উপর হাত রেখে শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলে—এই তো। পালিয়ে যাইনি।

ততক্ষণে দশ-বারোটা হাত একসঙ্গে হুটোপুটি করে রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আলতার সঙ্গে মিশিয়ে শুক্তির দু'পায়ে মাখাতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

চোখে আঁচল দিয়ে আর শরীরটাকে যেন প্রাণপণে কঠিন করে নিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে শুক্তি। সতীসোহাগের ছড়া আরও জোর গলায় বেজে উঠতে থাকে—

রুপো ঠাকরুনের পা গো
কি আশ্চর্যি মা গো।
জল হলো আলতে,
পা হলো লালতে।
কড়ি তুলসী কচি দুব্‌বো ধন্যি।
পতিসোহাগী সোনাপুতী ধন্যি।

অন্য ঘর থেকে শাশুড়ির ডাক শোনা যায়—থাম্‌লি এবার, ওরে ও মেয়ের দল, বউমাকে আর বিরক্ত করিস নি, সিধে নিয়ে ঘরে যা এখন।

মিছার মা

ঝুটুর মা, হরির মা, দাসুর মা আর পুঁটির মা। একই গাঁ থেকে ওরা এসেছে। একই বস্তির এক ঘরেতে একই সঙ্গে থাকে সবাই। তা ছাড়া আছে আব একজন। তার নাম হল মিছার মা।

ঢাকুরিয়া ষ্টেশন ছাড়িয়ে আব একটু এগিয়ে ডায়মণ্ড হারবারেব ট্রেন যেখানে একেবারে জোরে শিস ছেড়ে আর বেগ বাড়িয়ে দিয়ে চলতে শুরু করে, সেখানে রেল লাইনের বাঁ দিকে তাকালে দেখা যায় এই বস্তি। বর্ষার সময় বস্তির ঘরগুলি যেন জলের উপর ভাসে, আর গলে গলে পড়ে দেয়ালের মাটি।

একটি ঘরের মাটির মেজে মাত্র, লম্বায় দশ হাতের কিছু কম আর চওড়ায় দু'হাতের কিছু বেশি। ভাড়া দিতে হয় প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা! অর্থাৎ মাথা পিছু পাঁচ টাকা। মাটির মেজেটাকেই সমান সমান পাচটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছে সবাই। লম্বায় তিন হাত আর পাশে দু'হাত জায়গার এক একটি ভাগ। রাত্রি হলে সারাদিনের গতর-খাটা জীবনের ক্লান্তিকে তারই মধ্যে টান করিয়ে শুইয়ে নিতে পারা যায়। কেরোসিনের যে কুপিটা জ্বলে, সেটাও ভাগের জিনিস। মাথা পিছু এক পয়সা করে চাঁদা ধরতে হয়েছে, কারণ মোট পাঁচ পয়সা হলো কুপির দাম। ত্রিশটি রাত্রির উগ্রগন্ধ ধোঁয়া আর ময়লা আলোর জন্য মোট খরচ পড়ে পাঁচ আনা। সুতরাং, হিসেবে কোন গোলমাল হয় না। প্রতিমাসে মাথা পিছু এক আনা জমা করলেই কেরোসিনের খরচ কুলিয়ে যায়।

ঝুটুর মা, হরির মা, দাসুর মা, পুঁটির মা আর মিছার মা—সকাল থেকে

সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠিকা-ঝিয়ের কাজ করে জীবন কেটে যায় যাদের, তাদেরই পাঁচজন। পাঁচটা ছেঁড়া মাদুর, তার উপর এক-এক টুকরো চট, আর এক-একটা কাঁথা। একটি করে পেঁটরাও আছে প্রত্যেকের। ঐ মাদুর চট আর কাঁথা, আর পেঁটরার মধ্যে যা আছে, তাই নিয়েই হলো পাঁচজনের যথাসর্বস্ব। চোরের ভয় আছে, তাই কাজের বাড়িতে এসেও উদ্বেগ থাকে মনে। আর কাজের ফাঁকেই, কিম্বা কাজ ফাঁকি দিয়েই এক-একবার চলে আসে। দরজা খুলে ঘরে ঢোকে, পেঁটরা খুলে দেখে, তারপর নিশ্চিন্ত হয়। তারপর আবার দরজায় কুলুপ দিয়ে কাজে চলে যায়।

বর্ষার ভয় আছে, চোরের ভয় আছে, গ্রীষ্মের সময় আর এক রকম ভয় আছে। গতবছর এই যথাসর্বস্বও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বৈশাখের দুপুরে ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের ফুল্‌কি কয়েকটা ছুটে এসে পড়েছিল শুক্‌নো বিচালি-ছড়ানো চালের উপর। সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে দেখেছিল সবাই, পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ঘর। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই ছাই-এর স্তূপ ঘেঁটে পাঁচটি পেঁটরার কোন চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পোড়া কপালের ছাইটুকুও চুরি করে নিয়ে গিয়েছে চোর। কপাল চাপড়ে একই সঙ্গে কেঁদেছিল সবাই—নুটুর মা, দাসুর মা, হরির মা, পুঁটির মা, আর মিছার মা।

আবার নতুন চালা তুলে দিলেন বস্তির মালিক। কিন্তু ভাড়াও বাড়িয়ে দিলেন। এখন দিতে হয় মাথা পেছু পাঁচ টাকা, আর তখন দিতে হতো মাথা পিছু তিন টাকা, মাসে পনের টাকা।

আর একটা ভয়, সেই ভয় হল সবচেয়ে বড় ভয়। জ্বরের ভয়। যদি মাথাটা কেমন কেমন করে ওঠে, হাত-পাগুলি তেতে ওঠে আর কাঁপতে থাকে, নিশ্বাসের বাতাসটা জ্বলতে থাকে, তবেই হয়েছে! একদিন দু'দিনের টানা উপোসে যদি জ্বর ছাড়ে তো ভাল, তা না হলে হয় পাগল করে না হয় ভিখিরী করে ছাড়বে ঐ জ্বর। কাজে কামাই দিতে হবে আর মাইনে কাটা যাবে। তাই জ্বর গায়েই কাজে ছুটতে হয়।

আবার, সব বারেই কি জ্বর-গায়ের জ্বালা নিয়ে যেতে পারা যায়? পারা যায় না। ঘরের অন্ধকারে মাদুরের উপর শুয়ে হঠাৎ মরণভয় চেপে বসে বুকের উপর। ঢাকুরিয়ার কবরেজের কাছে গিয়ে চার আনার পাঁচন কিনে আনতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তবু পেঁটরার ভিতর হাত দিতে ইচ্ছা করে না। চারটি আনা পয়সা মিছামিছি খুইয়ে দিয়ে লাভ নেই। বুঝতে পারে, মিথ্যে এই মরণভয়, এত সহজে মরণ হয় না। আর মরণ যখন সত্যিই আসবে, তখন কি আর চার আনার

পাঁচনে তাকে ঠেকানো যাবে।—না গো হুটুর মা, তুমি কাজে যাও, পাঁচন কিনতে হবে না। হাঁপ ছেড়ে আবার পাশ ফিরে শুয়ে থাকে হরির মা।

মাঝে মাঝে, বছরে অন্তত তিন চার বার প্রত্যেকেরই জীবনে এইরকম পরীক্ষা দেখা দেয়। কোনবার হুটুর মা, আবার কোনবার হরির মা, দাস্থর মা, আর পুঁটির মা, আর মিছার মা, এইরকমই মরণভয় সহ্য করে, কিন্তু পাঁচন কিনে চার আনা পয়সা নষ্ট করতে পারে না।

হুটু হরি দাস্থ আর পুঁটি—নেহাৎ কতগুলি নাম নয়, মাত্র কতগুলি কল্পনা নয়। ওরা সত্যিই আছে। ওরা বেঁচেই আছে। যে-যার নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাবার খোরাক যোগাড় করার জন্যই পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। এই রকমই এক একটা বস্তির মধ্যে ঠাঁই নিয়ে আছে সবাই এবং এই বস্তিতেই মাঝে মাঝে তাদের দেখতেও পাওয়া যায়। আসে দাস্থ, আসে হরি আর হুটু। আলতা পায়ে দিয়ে আর হাতে কাঁচের চুড়ি বাজিয়ে পুঁটিও আসে তার বরের সঙ্গে।

সন্ধ্যাবেলা লেকের চারদিকে ঘুরে মসলা-মুড়ি ফেরি করে দাস্থ। হুটু যাদবপুরের এক মোটর বাসে খালাসীর কাজ করে, আর হরি হলো বড়বাজারের এক দোকানের চাকর। পুঁটি আর ঝি-এর কাজ করে না। তার বর বিড়ির দোকান দিয়েছে, আর দোকান চলছেও ভাল। মায়েতে ছেলেতে স্থখ-দুঃখের কথা হয়, আবার ঝগড়াও বাধে। সব মা'র মন এক রকম নয়, সব ছেলের প্রকৃতিও এক-রকম নয়। হরি আসে শুধু মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে। হুটু এসে কখনো একটা নতুন গামছা আর কখনো বা দু'চার আনা পয়সা দিয়ে যায় মাকে। দাস্থ এসে শুধু ঝঞ্ঝাট বাধায়, উল্টো দুটো টাকা চেয়ে বসে। দাস্থর মা চিৎকার করে গালি দেয়—টাকা কোত্থেকে পাব রে, আর পেলেই বা তোকে কেন দেব রে গাঁজাখেকো মুখপোড়া। পুঁটি আর একদিন এসে একগাল হেসে বলে—আজ কাজে কামাই দে না মা!

—কেন লো?

—আজ মুগ খিচুড়ি রেঁধেছি, চল দু'টি খেয়ে আসবি।

সবারই ছেলে বা মেয়ে আসে, আর এসে ঝগড়া করে, নয় হাসে, কিন্তু মিছার মার মিছা কেন আসে না?

আসবার কথা নয়, কারণ ঐ নামটাই যে মিছা। মিছার মা কারও মা নয়। একটা নাম ওর নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে নামটা এই বস্তির জীবনে এসে অনেকদিন আগেই অচল হয়ে গিয়েছে। হুটুর মা, হরির মা, দাস্থর আর পুঁটির মা'ও আজ

মনে করতে পারে না যে, ওর নাম হলো মুক্তো, ওদেরই গাঁয়ের সেই ভানু দাসের বউ মুক্তো। মুক্তো হলো নিঃসন্তান। কিন্তু সবাই যখন অমুকের মা আর তমুকের মা, তখন মুক্তোই বা কারও মা হবে না কেন? যেন চার জনের নামের চাপে পড়েই মুক্তোর নামও হঠাৎ বদলে গেল একদিন। আজ কারও মনেও পড়ে না, মুক্তোকে মিছার মা বলে কে ডাক দিয়েছিল প্রথম। ঠাট্টা করে নয়, সত্যই যেন একটা দরকারে পড়ে, যেন বস্তির এই চারজন সন্তানবতীর নামের আর গতরখাটা ঝি-জীবনের সঙ্গে মুক্তোকে মানিয়ে নেবার জন্যই ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। সন্তান নেই, হয়নি কোন দিন। তাই মুক্তো হলো মিছার মা।

—কি হলো তোর, আজ কাজে যাবি নি মিছার মা?

নুটুর মা'র ডাক শুনে বিরক্ত হয়, আর উত্তর দিতে গিয়ে যেন বিড়বিড় করে মিছার মার মেজাজ—কিছু হয়নি, ইচ্ছে হয়েছে কাজে যাব না, তুই চেঁচাস কেন?

রোজ নয়, মাঝে মাঝে সমব্যথিনীর এই রকম মিষ্টি কথারও তেতো জবাব দেয় মিছার মা। জবাবের ভাষা শুনে আর অকারণ রাগের রকম দেখে কখনো রাগ করে আবার কখনো হেসে চলে যায় নুটুর মা।

কারণটা কিন্তু কেউ অনুমান করবার কিংবা বুঝবার চেষ্টা করে না। মিছার মা হয়ে পড়ে আছে মুক্তো, সহজ হয়ে গিয়েছে এই নামটা, কিন্তু তবু যেন মাঝে মাঝে এই নাম সহ্য করতে পারে না মুক্তো।

সেদিন ঠিক হলো, রথের মেলা দেখতে যাওয়া হবে।—তুই যাবি নাকি মিছার মা? দাসুর মা'র কথার উত্তরে হেসে হেসেই জবাব দেয় মুক্তো—যাব বৈকি।

চুল বাঁধল, ধোওয়া শাড়ি পরল মুক্তো। আর, যাবার সময় হতেই ডাক দিল পুঁটির মা—চল মিছার মা।

হঠাৎ যেন ফোঁস করে উঠল মুক্তোর নিঃশ্বাসের শব্দ। মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তার পরেই ঝামটা দিয়ে বলে—তোরাই যা, আমি যাব না।

—তবে থাক, মেজাজ নিয়ে ধুয়ে খা।

তিন জন ছেলের-মা আর একজন মেয়ের-মা রাগ করে পাল্টা ঝামটা দিয়ে চলে যায়। ঘরের দাওয়ার উপর নিঃশব্দে একা বসে বিনুনি খুলতে থাকে মুক্তো, মিছার মা মুক্তো।

এই রকম প্রায়ই হয়, হয়ে আসছে আজ ক'বছর ধরে। নাম বদলে দিয়ে মুক্তোকে বেশ মানানসই করে এই ঘরের চার জনের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তবু যেন ঠিক মিলে যেতে পারেনি মুক্তো। ঐ অকারণ বিরক্তি, মুখভার, ফোঁস করে ওঠা আর ঝামটা দেওয়া, একটা কি যেন এলোমেলো

হয়ে রয়েছে মনের মধ্যেই। মনের দিক দিয়ে চার জনের মধ্যে বেশ একটা বে-মানান হয়েই রয়েছে মুক্তো।

শুধু মনের দিক দিয়ে কেন, বস্তির সকলে তো স্বচক্ষে দেখতেই পায়, বয়সে ও চোখ-মুখের চেহারায় ঐ চারজন নারীর মধ্যে বেশ ভিন্ন হয়ে আর বেমানান হয়ে রয়েছে এই নারী, যার নাম মিছার মা। চারজন প্রবীণা ও বর্ষীয়সীর মধ্যে মাত্র একজন, যার বয়স বেশ কাঁচা। পরিপাটি করে বিনুনি বাঁধে, যত্ন করে আলতা পরে, মিছার মা'র এই সব শখ ভাল চক্ষে দেখে না বস্তির মানুষ, যদিও মিছার মা দেখতে ভাল আর বিনুনিতে ও আলতাতে ওকে মানায়ও ভাল।

বস্তির আর সকলে যে চক্ষেই দেখুক, এই ঘরের চারজন প্রবীণা ও বর্ষীয়সীর কাছ থেকে বেশ একটু লাই আদর আর ক্ষমাই পেয়ে থাকে মিছার মা। সন্ধ্যা বেলা কাজের বাড়ি থেকে মিছার মার ফিরতে যদি একটু দেরি হয়ে যায়, তবে একটু ভয় পেয়ে আর উদ্বেগ নিয়ে দাওয়ার উপর এসে বসে থাকে চারজন, আর ফিরে আসার পর ধমক-ধামকও দেয়।—রাত করিস কেন, বয়স ভুলে যাস কেন লো বে-আক্কেল ছুঁড়ি?

অভিভাবিকাদের ভাবনার রকম দেখে হেসে ফেলে মুক্তো।—মানুষের ভুল কি শুধু রেতের বেলাতেই হয় হরির মা, দিনের বেলাতেও তো হতে পারে।

হেসে ফেলে হরির মা—দোহাই তোর ঠাকুরের, রেতে হোক আর দিনে হোক, ভুলটুল করিস না মিছার মা।

—চুপ কর। রুক্ষস্বরে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে মুক্তো। গম্ভীর হয়ে আর মুখ ভার করে হরির মা'র দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের ভাব দেখেই বোঝা যায়, ঠিক সেই, আবার ঠিক সেই রকম অকারণে হঠাৎ রাগ করেছে মুক্তো। কিন্তু আর কিছুই বলে না। আর বলবেই বা কেমন করে? নিজেও কি ঠিক বুঝতে পারে, এ ছাই অদ্ভুত রাগ কেন দপ করে জ্বলে উঠে মেজাজ খারাপ করে দেয়!

নুটুর মা বলে—ঐ দেখ, কিরকম করে তাকাচ্ছে দেখ!

দাসুর মা বলে—তোর মাথার মধ্যে কি সাপ লুকিয়ে আছে নাকি লো? এরকম হঠাৎ ফোঁস করে উঠিস কেন?

মুক্তোও আর কোন উত্তর না দিয়ে শান্তভাবেই ঘরের ভিতর ঢোকে।

এই ভাবেই জীবন চলে, রেল লাইনের পাশের এই বস্তিতে, চারজন বর্ষীয়সী সত্যিকারের মা, আর কাঁচা-বয়সের এক মিছার মা'র ঘরের জীবনে এর চেয়ে বেশি কোন ঝঞ্ঝাট দেখা দেয় না।

ঝঞ্ঝাট দেখা দিল একদিন।

কোথা থেকে মোটাসোটা আর কুচকুচে কালো চেহারার এক বছর বয়সের একটা বাচ্চা ছেলে নিয়ে এল মুক্তো।

চিৎকার করে হরির মা—এটাকে কোত্থেকে নিয়ে এলি মিছার মা?

মুক্তো হেসে হেসে বলে—তেতলা বাড়ির দারোয়ান দিল।

হরির মা—কার ছেলে?

মুক্তো—দারোয়ানেরই মেয়ে-মানুষের ছেলে।

হুটুর মা—তা মুখপুড়ী মেয়েমানুষটা কই?

মুক্তো—মরেছে।

দাসুর মা—কিন্তু তার জন্য তুইও মরবি না কি?

মুক্তো—মরব কেন? এটাকে পুষব।

পুঁটির মা রাগ করে একটু শান্তভাবেই বুঝিয়ে বলে—মানুষের ছেলে পোষা কি চারটিখানি ঝঞ্ঝাট মিছার মা? নিজের পেটের ধান্ধায় দু'বেলা ঘরের বাইরে খাটতে হয় যাকে, ছেলে পুষবার সময় কই তার?

মুক্তো—ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাব।

হুটুর মা ধমক দেয়—একা একা বন্ধ ঘরের ভেতর ছেলে পড়ে থাকবে, আর তুই বাইরে বাইরে ধেই ধেই করে নাচবি, কেমন?

হরির মা—ছেলে যে কেঁদে সারা হবে।

দাসুর মা—মনার মা'র সর্ব্বনাশের কথা শুনিসনি?

পুঁটির মা—বাচ্চাটার পায়ে দড়ি লাগিয়ে সেই দড়ি দাওয়ার খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রেখে রোজ কাজে চলে যেত মনার মা। একদিন ফিরে এসে দেখে, বাচ্চাটাকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ে, মেরে রেখে চলে গিয়েছে।

মোটাসোটা খুচকুচে কালো বাচ্চাটাকে কোলের উপরেই জোরে চেপে ধরে আঁৎকে ওঠে মুক্তো। তার পরেই কেঁদে ফেলে—এ কি সর্বনেশে কথা বলছিস, পুঁটির মা।

পুঁটির মা সান্ত্বনার সুরে বলে—বেড়ালের ছানা পুষলেও মায়া পড়ে যায় মিছার মা, তুই তো ইচ্ছা করে মায়া করবার জন্যেই এটাকে পুষবি। বাঁচবে কি মরবে কোন ঠিক নেই, যেচে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিস না মিছার মা।

হরির মা বলে—ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

দাসুর মা বলে—আমি বাপু এক কথা বলে দিচ্ছি, আমি ঘরের মধ্যে এসব নোংরামির বালাই সহ্য করব না।

ফোঁস করে উঠের মুক্তো—তোর দাসু কি একেবারে সেয়ানা হয়ে জন্মেছিল নাকি লো?

দাসুর মা—কিন্তু সে তো তোর ঘর নোংরা করতে যায়নি আঁটকুড়ি।

পুঁটির মা মাঝে পড়ে ঝগড়া থামিয়ে দেয়। দাসুর মা'ও একটু শান্ত হয়। তোমরাই বল, আমি চার বেলা নাওয়া-ধোওয়া করি, আমার একটু শুধু বাতিক আছে, এখন এই ঘরের ভিতর একটা অজাত-কুজাত ছেলের নোংরামি যদি···।

নুটুর মা—না না, সেসব চলবে না। ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে আয় মিছার মা।

ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে মুক্তোর কোলের উপর। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদল মুক্তো। তারপর ঘুমন্ত ছেলেটাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে ঘরের দাওয়ার উপর থেকে নেমে ধীরে ধীরে চলে গেল।

পুঁটির মা এগিয়ে যেয়ে মুক্তোর কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলে—ভুল করিস না মিছার মা। পরের ছেলেকে পরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চলে আয়। নিজের ছেলে হলে না হয়···।

চমকে ওঠে মুক্তো। পুঁটির মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় মুক্তো বলে—কি বললি পুঁটির মা?

—কিছু না, তুই এই ঝঞ্ঝাট ফেরত দিয়ে আয় এখন।

নিজের ছেলে হলে না হয়···কি জানি কি বলতে গিয়ে থেমে গেল পুঁটির মা। দাওয়ার উপর চুপ করে বসে আবোলতাবোল চিন্তা করে মুক্তো। ক'দিন থেকে কাজে বের হয়নি মুক্তো, আজও যাবে না।

ভানুদাসের বউ মুক্তো, কিন্তু কোথায় সেই ভানু দাস? আজ দশ বছরের মধ্যেও তার কোন সাড়া নেই। সেই যে ধানের ক্ষেতে দাঙ্গা করল আর পুলিশ আসবার আগেই পালিয়ে গেল, তারপর থেকে সেই মানুষটার ছায়াও আর দেখা দিল না। লোকটা ভেসে গেল, কিন্তু মুক্তোকেও ভাসিয়ে দিয়ে গেল। নইলে গাঁয়ের চাষীর বউকে কি আজ শহরের এই বস্তিতে এসে ঢুকতে হয়, আর পেটের ভাতের জন্য পরের বাড়ির থালা-বাসন ধুয়ে বেড়াতে হয়। আবাগা বেঁচে থাকলেও পুলিশের ভয়ে আর ফিরে আসবে না, মরে থাকলে তো ফিরবেই না। ঐ লোকটাই মুক্তোকে চিরকালের মতো মিছার মা করে রেখে সরে পড়েছে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে মুক্তো। উপায়ও তো আছে! আজ একবছর হল একটা অনুরোধ মরিয়া হয়ে ছায়ার মতো মুক্তোর পিছনে ঘুরছে! পয়সা আছে লোকটার। বাজারের কাছেই পথের উপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলুর দোকান সাজিয়ে বসে থাকে লোকটা। ওর নাম নন্দ।

নন্দর কোন কথার কোন উত্তর কোনদিন দেয়নি মুক্তো। ছায়ার মতো পিছনে পিছনে এসেছে নন্দ। রেল লাইনের কাছ পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বলেছে—কিন্তু আমি যদি তোকে স্ত্রী মনে করি, তবে তুই আমাকে স্বামী মনে করতে পারবি না কেন মুক্তো ?

চুপ করে শুনেছে, আর শুনেই রেল লাইন পার হয়ে বস্তিতে ঢুকেছে মুক্তো। নন্দর ছায়া কোন জবাব না পেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে শুকনো মুখ নিয়ে ফিরে চলে গিয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বস্তির ঘরে ঘরে কুপি জ্বলছে। ট্রেনের ইঞ্জিনের লাল ধোঁয়া অন্ধকারে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবতে গিয়ে আনমনার মতোই বস্তির কাদামাখা সরু পথের দিকে তাকিয়ে থাকে মুক্তো, আর কি আশ্চর্য, যেন মুক্তোর মনের সব ধোঁয়া ভেদ করে সেই কিস্তুর মূর্তিটাই একেবারে ঘরের কাছে এসে মুক্তোর চোখের কাছে দাঁড়ায়।

নন্দ বলে আমি কি বাঘ না ভালুক, এরকম করিস কেন মুক্তো ?

উত্তর দেয় না মুক্তো। এত দিন সত্যই বাঘ আর ভালুকের মতই মনে হয়েছিল লোকটাকে। কিন্তু আজ কেন জানি মনে হয়, মানুষটা মানুষেরই মতো।

নন্দ বলে—তুই ঘরে ঘরে এটো বাসন ধুয়ে বেড়াবি, এ যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না মুক্তো।

মুক্তোর একেবারে চোখের কাছে এসে নন্দ বলে—এত ভাববার কি আছে মুক্তো ? আমি খাটব আর টাকা আনব, তুই শুধু সেজে বসে থাকবি ঘরে।

চকিতে নন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে, তারপর সন্ত্রস্তের মতো চারিদিকে তাকায় মুক্তো। নন্দর কথার মধ্যে মস্ত বড় এক লোভের আশ্বাস বাজছে আর চারদিকে তেমনি কতগুলি কঠিন ধিক্কারও থমথম করছে। হ্যাঁ, একটি ছেলে কোলে নিয়ে ঘরের ভিতর সেজে বসে থাকতে চায় মুক্তো। কিন্তু সে কি করে সম্ভব ? তা হলে চিরকারের মতো এই ঘরের বার হয়ে যেতে হয়। গাঁয়ের নাম ডুবিয়ে দিয়ে, এই বস্তির ও এই ঘরের নাম ডুবিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে···তার পর···।

নন্দ বলে—এত ভয় করবার কি আছে মুক্তো ? এই তল্লাটেই আর থাকব না আমরা। জাতের লোক, চেনা লোক, গাঁয়ের লোক, কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের। স্বামী-স্ত্রী হয়ে সুখে ঘর করব আর···।

মুক্তো হাঁসফাঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলে—তুমি এখন যাও।

নন্দ—তা হলে কথা রইল, একদিন এসে···।

মুক্তো—যাও যাও, এখন শিগগির চলে যাও।

চলে গেল নন্দ—সঙ্গে সঙ্গে হরির মা এসে ঘরের দাওয়ার উপরে ওঠে। প্রশ্ন করে—আজও কি কাজে যাসনি মিছার মা?

মুক্তো বলে—না যাইনি, আর কোনদিনও কাজে যাব না।

হরির মা বিস্মিত হয়—এ কেমন কথা? কাজ করবি না তো খাবি কি?

মুক্তো—কপালে যা আছে, তাই খাব।

হরির মা ভ্রূকুটি করে—তোর কথাবার্তা তো ভাল মনে হচ্ছে না মিছার মা।

হুটুর মা, পুঁটির মা আর দাসুর মা আসে। তারপর আরও প্রবল এবং আরও মুখর হয়ে উঠে চারটি গতর-খেটে-বেঁচে-থাকা বর্ষীয়সীর মনের সন্দেহ। কাজে যাবে না আর খাটবে না, তবে খাওয়াবে কে এই মেয়েকে? ও কি এই দাওয়ার উপর বসে বেণী দুলিয়ে আর আলতা রাঙানো পা ছড়িয়ে দিতে ভাত-কাপড় গয়না রোজগার করতে চায়? সে হবে না, কখনো না! তার চেয়ে এখনই দূর হয়ে যাও। জাত-পাতের মুখে কালি দিয়ে, যে কোন নরকে চলে যাও। এখানে থেকে ওসব চলবে না।

হরির মা আক্ষেপ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলে—ওরে, তুই যে সম্পর্কে আমার জা হোস রে মিছার মা। তোর সোয়ামি ভানু যে হরিব বাবার আপন মেসোর ভাইয়ের ছেলে।

পুঁটির মা ভয়ে কেঁপে ওঠে—ভানু যদি কখনও ফিরে আসে, তবে তোকে যে ঝুঁটি ধরে তুলে নিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবে লো।

অভিযোগের উত্তাপ আর ধিক্কারের বর্ষণ একটু শান্ত হবার পর মুক্তো হঠাৎ বেহায়ার মতো হেসে ওঠে।

পুঁটির মা বলে—আবার কি হলো?

মুক্তো বলে—আমি যদি বিয়ে করি তবে কি দোষের হবে পুঁটির মা?

পুঁটির মা চোখ বড় করে তাকায়।—বিয়ে? তোর তো বিয়ে হয়েই আছে। আবার বিয়ে কেমন করে হবে?

মুক্তো—বিধবার তো বিয়ে হয়।

পুঁটির মা—তুই বিধবা নাকি?

মুক্তো—হ্যাঁ, মানুষটা এতদিন মরেই গিয়েছে নিশ্চয়।

হরির মা চেঁচিয়ে ওঠে—তবে এতদিন কপালে সিঁদুর রাখলি কেন মুখপুড়ী?

মুক্তো একটুও রাগ করে না। বরং খিলখিল করে হেসে ওঠে—আমি যেমন মিছার মা, তেমনি আমার ঐ মিছা সিঁদুর।

পুঁটির মা বুঝিয়ে বলে—ধর, বিয়েই না হয় করলি। তারপর, ভানু যদি ফিরে

আসে? কি হবে উপায়?

মুক্তো—তখন না হয় গলায় দড়ি দেব।

হরির মা বলে—এখুনি দে।

কিন্তু এত হুমকি আর এত উপদেশে কোন ফল হলো না। সত্যই আর কাজে গেল না মুক্তো। পেঁটরা খুলে পয়সা বের করে উনুন হাঁড়ি কাঠ আর চাল ডাল কিনে আনে মুক্তো। দাওয়ার একটি কোন চট টাঙিয়ে আড়াল করে নেয়। সেইখানে বসে রান্না করে মুক্তো। কখনো দুপুরে কখনো বিকেলে, আর কখনো সন্ধ্যায়, মাত্র একটি বার এক ঘণ্টার মধ্যেই তড়বর করে রান্না সেরে নেয়, আর খেয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর পড়ে থাকে। মাদুরের উপর অলস একটা দেহ ছটফট করতে থাকে। যখন কেউ থাকে না ঘরে, তখন শিয়রের পুঁটলির উপর মুখ গুঁজে দিয়ে অবাধে কেঁদে নেয় মুক্তো। চমকে ওঠে এক একবার, মনে হয় নন্দর ছায়া এসে উঠেছে দাওয়ার উপর।

হুটুর মা দেখে আশ্চর্য হয়, হরির মা দেখে হাঁক ছাড়ে আর আশ্বস্ত হয়, আর পুঁটির মা ও দাসুর মা দেখে কষ্ট পায়, এ আবার কোন্ রোগে ধরল মিছার মাকে। সত্যিই বেনী দুলিয়ে আর আলতায় পা রাঙিয়ে দাওয়ার উপর বসে না মুক্তো। বিয়ে-টিয়ে করবে বলে যে সব ফষ্টি-নষ্টি করল, তাই বা সত্য হল কোথায়? বরং, কি যেন এক মরণ গোঁ ধরেছে, যার জন্য অষ্টপ্রহর মাদুরের উপর গড়াচ্ছে আর ছটফট করছে। এক মাসের মধ্যেই কি ভয়ানক রুগিয়ে গেল ছুঁড়ি!

হুটুর মা মুক্তোর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দেয়—তোর কি হয়েছে বল দেখি?

বলতে বলতে হুটুর মা মনের আব একটা ভয়ানক সন্দেহ দূর করার জন্য দু' চোখ নিয়ে মুক্তোর একেবারে গায়ের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে!

দাসুর মা বলে—যদি হয়েই থাকে, তবে ক দিন লুকিয়ে রাখবে? ধরা তো পড়তেই হবে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে মুক্তো। শুনতে ভালই লাগে বুড়িদের ভীরু মনের আশঙ্কার কথা, আর গম্ভীর মুখের আলোচনা।

হুটুর মা—যাই করিস বাছা, ভুলেও নিজের এমন সর্বনাশটা করিস না।

—না গো না! বলতে গিয়েই ফুঁপিয়ে ওঠে মুক্তো।

কিন্তু মনে হয় মুক্তোর, এই সর্বনাশটা নেই বলেই খালি হয়ে রয়েছে বুকটা। হুটুর মাও যেন শান্ত করার জন্যই একটু আদর করার ভঙ্গীতে মুক্তোর মাথায় হাত দিয়ে ডাকে—মিছিমিছি কেন ইচ্ছে করে নিজের মনটাকে জ্বলিয়ে কষ্ট

পাচ্ছিস মিছার মা। কপাল মেনে চলতে হবে তো।

উত্তর দেয় না মুক্তো। ফোঁপানিও থামে না। আর চার বর্ষীয়সীও কোন কথা না বলে চুপ করে বসে থাকে। এতদিনে যেন বুঝতে পেরেছে সবাই, মিছাব মা'র এতদিনের খেপা মেজাজের সব রহস্য। কিন্তু উপায় কি? মিছার মা হয়ে তবু বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু জাত মান ডুবিয়ে দেওয়া যে মরণের বড় মরণ।

কেরোসিনের কুপি জ্বলে। ধোঁয়া-মাখা আলো মিটমিট করে দরজার কাছে। বুড়িরা যে যার মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে, সারাদিনের ক্লান্ত এক একটা বাসন-মাজা ঝাঁট দেওয়া আর কাপড়-কাচা জীর্ণ-শীর্ণ জীবন। ঘুমিয়ে পড়ে সবাই, শুধু মুক্তোর চোখে ঘুম আসে না। যেমন ভাল লাগে না মিছার মা নাম, তেমনি ভাল লাগে না বুড়িদের সন্দেহভরা চোখের সামনে এইরকম মিথ্যে পোয়াতির মতো মিছিমিছি কাতরাতে। মিটমিট করে একটা স্বপ্ন জ্বলে মুক্তোর দু'চোখে। চমকে ওঠে মুক্তো, কেরোসিনের কুপির আলো যেন দাওয়ার উপর একটা ছায়া দেখতে পেয়ে হঠাৎ ছটফট করে উঠেছে।

মাদুর ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুক্তো। দেখতে পায়, হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে।

নন্দ এসে দাঁড়িয়ে আছে। ফুঁ দিয়ে কুপিটা নিভিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় মুক্তো। ফিসফিস করে বলে—যাব তোমার সঙ্গে, কাল রাতে এস, অনেক রাতে।

চলে যায় নন্দ।

ভোর হয়। সবার আগে মাদুড় ছেড়ে উঠে বসে নুটুর মা, আর দেখতে পায়, আরও আগে উঠে বসে রয়েছে মিছার মা, ঘুম-কাতুরে আলসে মিছার মা। কি আশ্চর্য! প্রশ্ন করে নুটুর মা—আজ কি কাজে বের হবি?

মুক্তো বলে—হাঁ।

নুটুর মা—মনে রাখিস, আজ ঘরের ভাড়া দিতে হবে।

হ্যাঁ মনে আছে মুক্তোর, এই ঘরের ভাড়া জীবনে শেষবারের মতো চুকিয়ে দিতে হবে আজ।

কাছাকাছি দুটো বাড়িতে মুক্তোর প্রায় এক মাসের মাইনে বাকি পড়ে আছে। আর অনেকদিনের আগের দুটো বাড়ির কাছেও পাওনা আছে। সে প্রায় আজ দু'বছর আগের কথা। একটা বাড়ির গিন্নিমার কথার ঝাঁঝে অতিষ্ঠ হয়ে আর রাগ করে চলে এসেছিল মুক্তো। আর একটা বাড়ির গিন্নি পর পর তিন মাস মাইনে না দিয়ে শুধু মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখছে দেখে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিল মুক্তো। যাব যাব করেও আজ দু'বছরের পাওনা টাকা আদায় করতে

যেতে পারেনি মুক্তো।

কিন্তু আজ আদায় করে নিতে হবে। আজ যে এই তল্লাট ছেড়েই রাতের অন্ধকারে ভেসে চলে যেতে হবে চিরকালের মতো। ঘর ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে, আর কিছু কাপড়-চোপড় কিনে নিতে হবে। পেটরাতে আর একটি আনাও বোধহয় নেই। টাকার দরকার আছে।

দরকার নাই বা থাক, পাওনা ছেড়ে দেব কেন? গেলাসের গায়ে ছাই-এর একটা দাগ লেগে থাকলেও যারা চেঁচিয়ে উঠেছে, তিন বার করে সেই গেলাস না ধুইয়ে যারা ছাড়েনি তাদের কাছ থেকে পাওনা টাকা চেঁচিয়ে আদায় করে নেওয়াই তো উচিত। আর ভয় কিসের। মায়াই বা কেন আসবে এই তল্লাটের জন্য, যেখানে না খাটিয়ে নিয়ে কেউ এক ঘটি তেষ্টার জল দেয় না?

ঘর ছেড়ে বস্তির সরু রাস্তা, তারপর রেল-লাইন, রেল লাইনের পাশে শিউলি গাছ, তারপর ছোট মাঠটা পার হয়ে একটা পাকা সড়ক, সড়কের দু'পাশে নতুন নতুন দোতলা আর চারতলার ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ায় মুক্তো। এক এক করে তার কাজের বাড়িতে ঢোকে, আর পাওনা আদায় করে নিয়ে চলে আসে।

একটা বাড়ির শেষ দিনের এক বেলার মাইনে কেটে নিল আর একটা বাড়ি মাইনের হিসাবটাই কেমন যেন এলোমেলো করে দিল। করুক, কোন ক্ষতি নেই। বাড়ির গিন্নি কথা শুনিয়েছে, তেমনি গিন্নিকেও কথা শুনিয়ে দিয়েছে মুক্তো। আর এই তল্লাটের কোন চোখ রাঙানি আর চেঁচানিকে ভয় করবার গরজ নেই মুক্তোর।

বাকি রইলেন পুরানো বাড়ি দুটো। এখান থেকে একটু দূরে, ট্রাম লাইনের কাছাকাছি সেই দুটো বাড়িতে সেই মানুষগুলি এখনো আছে কি না কে জানে। একটা বাড়ির সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা নেই, কারণ সেটা হলো বড়লোকের বাড়ি, আর নিজেদেরই বাড়ি, ভাড়া বাড়ি নয়। ওরা নিশ্চয় আছে, ওদের কাছ থেকে আদায়ও করা যাবে নিশ্চয়। দু'বছর আগের পাওনা, বাড়ির কর্তা আর গিন্নি হিসাব ভুলে গেলেও ভুলতে দেবে কেন মুক্তো? চেঁচিয়ে বাড়ি আর পাড়া মাৎ করে বুঝিয়ে দিতে হবে, ভালয় ভালয় পাওনা মিটিয়ে না দিলে আরও অনেক ছোটকথা শুনতে হবে, যতই না বড়লোক হও।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো, বড় বাড়ির কর্তা ও গিন্নি কিছুতেই মনে করতে পারলেন না যে, ঝি মিছার মায়ের মাইনে বাকী পড়ে আছে। কিন্তু মিছার মা গলা খুলতেই মনে পড়ে গেল কর্তার, একুশ দিনের মাইনে বোধহয় দেওয়া হয়নি। মিছার মা বলে—একুশ দিন নয়, আটাশ দিন, আপনার মেয়ে-জামাই যেদিন এল আর

গিন্নিমা আমাকে যাচ্ছেতাই বললেন, সেদিনের তারিখটা মনে করে দেখুন।

বাড়ির গিন্নি চেঁচিয়ে ওঠেন—ছোটলোক হয়ে এত বড় কথা··· ।

মুক্তো—ছোটলোকের পাওনা পয়সা ফাঁকি দিতে চান, কেমনতর বড়লোক আপনি? ছোটলোকের চেয়েও···

বাড়ির গিন্নি হুংকার দেন—সাবধান!

কর্তা বলেন—থাক্ আটাশ দিনের মাইনেই হিসেব করে দিয়ে দিচ্ছি।

ঠিক ঠিক হিসাব করে টাকা দিলেন কর্তা, মুক্তোও চলে গেল, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এসে আবার বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মুক্তো, কারণ গেটের দরজা একেবারে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।—ঠগ ঠগ, তিনতলাওয়ালা ঠগ অচল নোট ধরিয়ে দিয়েছে।

পাঁচ টাকার একটা নোট হাতে নিয়ে পথচারী ভদ্রলোকদের ডেকে ডেকে দেখায় মুক্তো।—দেখুন তো বাবু, এই নোট কি বাজারে চলবে?

পথচারী ভদ্রলোক বলেন···না, এটা জাল নোট। কেউ বা জিজ্ঞাসা করে—কোথায় পেলে এ জাল নোট?

হাত তুলে তিনতালা বাড়িকে দেখিয়ে দিয়ে চিৎকার করে মুক্তো—ঐ যে তিনতলাওয়ালা জালিয়াত দিয়েছে।

কিন্তু মুক্তোর চিৎকারে তিনতলা বাড়ির ফটকের লোহার গরাদ একটুও বিচলিত হলো না। মুক্তোই শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে, ক্লান্ত হয়ে আর অভিশাপ দিয়ে চলে গেল।

বাকি আর একটা বাড়ি। সেটা হল ভাড়া-বাড়ি, আশঙ্কা হয়, হয় তো সে বাড়িতে গিয়ে কতকগুলি নতুন লোকের মুখ দেখতে পাবে মুক্তো। ঝি-এর তিন মাসের মাইনে বাকি রেখেছে যারা, তারা কি আর চার মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি রাখেনি, আর তারপর কি বাড়িওয়ালা না উঠিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তাদের?

পথ চলতে থাকে মুক্তো, কিন্তু মনে হয়, সে বাড়ির লোকগুলি দেনার চাপে আর পাওনাদারের তাগিদে এতদিনে পালিয়েই গিয়েছে নিশ্চয়। কম তো নয়, তিন মাসেব মাইনে ত্রিশটি টাকা পাওনা ছিল সেখানে।

মনে পড়ে সে বাড়ির লোকগুলির চেহারা। কর্তার বয়স অল্প, কিন্তু তবু টাক পড়েছে মাথায়। একটা মেয়ে আছে, আট-নয় বছর বয়স হবে। আর আছেন গিন্নি। বড় কাজের মানুষ, আর বড় বেশি মিষ্টি কথার মানুষ ঐ গিন্নি। লোক-গুলি মন্দ ছিল না, কিন্তু শুধু মিষ্টি কথার জোরে মাসের পর মাস মাইনে ফাঁকি দেওয়াও তো ভদ্রলোকের কাজ নয়। মনে পড়ে, সে বাড়ির গিন্নিকে বৌদি

বলে ডাকত মুক্তো। বয়স বেশি নয় গিন্নির।

সঙ্গে সঙ্গে তিন বছরের পুরনো স্মৃতির ছবি যেন চঞ্চল করে দিয়ে আর একটা কথা মনে পড়ে যায় মুক্তোর, বৌদির তখন সাত-আট মাস চলছে। মুক্তো কাজ ছেড়ে চলে আসার সময় বৌদি বলেছিলেন, আর অন্তত একটা মাস থেকে যাও মিছার মা।

থাক এসব পুরনো কথা, আর একটু এগিয়ে গিয়ে সেই বাড়িটারই কাছে গিয়ে থামে মুক্তো। এই বাড়িরই নিচের তলার ভাড়াটে হলো সেই টাকপড়া দাদাবাবু আর সেই বৌদি। দেখতে পায় মুক্তো, দরজার সামনে সেই কচি সুপুরি গাছটা আছে, আর বেশ একটু বড়সড়ও হয়েছে। তিন বছরটা তো কম সময় নয়।

বাড়িতে ঢুকে খুশিই হলো মুক্তো। কলতলায় বসে এঁটো বাসন মাজছিলেন বৌদি। মুক্তোকে দেখতে পেয়েই আশ্চর্য হলেন আর হেসে হেসে বললেন বৌদি —এ কি মিছার মা, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?

মুক্তো বলে—বেঁচেই ছিলুম গো বৌদি।

বৌদি—আমি কিন্তু মরতে চলেছিলুম!

মুক্তো—কেন?

বৌদির বাসন মাজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বলেন—আগ একটু জিরিয়ে নাও আর চা খাও, তারপর বলছি।

শুনে খুশি হয় না মুক্তো, বরং একটু গম্ভীর হয়েই বসে থাকে। এই ভয়ই করছিল মুক্তো, এবাড়ির এই সব মায়াকথার আর মিষ্টি ভাষার ফাঁদে পড়লে পাওনা টাকাগুলিই মারা পড়বে। টাকা আদায় করতে এসে এই চালাক বৌদির ভাল ভাল কথার সঙ্গে মন মাখামাখি না করাই ভাল। আজ মনে মনে শক্ত সঙ্কল্প এঁটে এসেছে মুক্তো, যদি টাকা না দিতে পারেন বৌদি, তবে টাকার বদলে বৌদির হাতের একটা আংটি চেয়ে নেবে মুক্তো। ফর্সা কাপড় পরবে, দু'কানে সোনাদানা চড়িয়ে বসে থাকবে, অথচ ঝি-এর মাইনে দেবার বেলায় টাকা হয় না, এটাও একটা চালাকি নয় তো কি?

চা খেল মুক্তো। বৌদি বলেন—তুমি তো আমাকে সেই অবস্থায় ফেলে চলে গেলে মিছার মা। তারপর সে কি দুর্দশা। নিত্যি মূর্চ্ছা যাই আর তারপরেই শরীরের গাঁটে গাঁটে অসহ্য ব্যথা। যা হোক, হাসপাতালে তো গেলুম, ফাঁড়াও ভালয় ভালয় কেটে গেল, কিন্তু বিপদে পড়লুম বাচ্চাকে নিয়ে।

চেঁচিয়ে ওঠে মুক্তো—বাচ্চা কই বৌদি?

বৌদি হাসেন—বাচ্চা এখন আর একেবারে বাচ্চা নয়। টুলুর বয়স তো এখন প্রায় দু'বছর হয়েছে মিছার মা।

উঠে দাঁড়ায় মুক্তো—কই, টুলু কই ?

এইবার বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে থাকেন বৌদি।—আজ মাস দুই হলো খুব অসুখে ভুগছে টুলু। জ্বরটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

বৌদির কোন নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে ব্যস্তভাবে ঘরের দিকে চলে যায় মুক্তো। এই ঘরের সবই চেনা। এই ঘরেব প্রত্যেকটি কোণের ধুলো ঝাঁট দিয়ে সরিয়েছে যে, তার কাছে কিছুই তো নতুন নয়।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকতেই ঘরের চেহারাটা কেমন নতুন নতুন লাগে মুক্তোর চোখে। অনেক কিছু ছিল এই ঘরের মধ্যে, তার অনেক কিছুই এখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দেওয়াল ঘড়িটা নেই, বড় আয়না আব আলমারিটা নেই। বড় পালঙ্কটাও নেই। দেওয়াল আলমারিতে আর্শির আড়ালে ঝক্ ঝক্ কবত পাঁচটা থাকে সাজানো কাঁসা আর তামার বাসন। কতকগুলি ছোট ছোট রুপোর থালা বাটি পানদানি আর পুতুল ছিল। সেসব কিছুই আর নেই। আলনার দু'টি পাট দাদাবাবুর ধুতিগুলিতেই ভরে থাকত। আজ সেখানে মাত্র একটি আধময়লা গেঞ্জি আর একটি ধুতি ঝুলছে। বৌদির চেহারাটাও চোখে পড়ে। কানে দুল নেই, আংটিও নেই। আর সেই মেয়েটা, সেই রমা, ঢেঙ্গা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কি রোগা!

তক্তাপোশের উপর বিছানায় শুয়ে রয়েছে ছোট্ট একটা শিশু। তারই মাথার কাছে পাখা হাতে বসে আছে বৌদির বড় মেয়ে রমা। এগিয়ে যায় মুক্তো।

দুই চোখ অপলক করে ঘুমন্ত টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মুক্তো! তারপর সরে যায়। ঘরের ভিতর থেকে চলে এসে বারান্দার উপর বসে পড়ে। একটা হাঁপ ছেড়ে মুক্তো বলে—তোমাদের এ কি রকম দশা হলো বৌদি, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

বৌদি বলে—চাকরি না থাকলে যা হয়। তোমার দাদাবাবুটির কপালে যে কোন্ গ্রহের কোপ পড়েছে, জানি না। তিন বছর হতে চলল, শত চেষ্টা করেও কোন চাকরি পাচ্ছেন না, অথচ কি কাজই না জানেন। এখন শুধু এখানে ওখানে ছেলে পড়িয়ে যা আনছেন, তাতে···।

হঠাৎ চুপ করে গেলেন বৌদি। মুক্তো বলে—ছেলের ওষুধ বিষুধ ঠিক চলছে তো, না তাও।

বৌদি বলেন—কেমন করে চলবে? এই তো দেখ, আজ তিনদিন হলো এক

বন্ধু ডাক্তার এসে ওষুধের নাম লিখে দিলেন, কিন্তু আজও ওষুধ আনতে পারা গেল না। পনেরটা টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তোমার দাদাবাবু।

আবার চুপ করেন বৌদি। তারপরেই যেন একটা দুঃসহ আক্ষেপ চাপতে না পেরে হঠাৎ ছটফট করে ওঠেন—ছেলেটা এল, কিন্তু কি দুর্ভাগ্যই যে সঙ্গে করে নিয়ে এল মিছার মা!

—ছি-ছি-ছি! বৌদির মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে পাল্টা ধিক্কার দেয় মুক্তো।— তোমার মিষ্টি মুখ যে একেবারে তেতো হয়ে গিয়েছে বৌদি। এমন কথা কি বলতে হয়? তোমাদের পোড়াকপাল দিয়ে ছেলেটার প্রাণটাকে পোড়াচ্ছ তোমরাই, উল্টো ছেলের ভাগ্যির নামেই কুকথা, ছিঃ।

এদিকে ওদিকে ঘুরে ফিরে কাজ করতে থাকেন বৌদি। ক্লান্ত ও অবসন্নের মতো চুপ করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বারান্দার উপর বসে থাকে মুক্তো অনেকক্ষণ। যেন এই অবসাদ থেকে উঠে দাঁড়াবার জন্যে একটা চেষ্টা করতে চায় মুক্তো। বলে—আমাকে আর এক বাটি চা দিতে পার বৌদি?

—নিশ্চয়।

যতক্ষণ চা তৈরী করেন বৌদি, ততক্ষণ চোখ বন্ধ করে যেন একটা স্বপ্ন খুঁজতে থাকে মুক্তো। বৌদির ডাকে যখন চমক ভাঙ্গে তখন চোখ মেলে তাকায় আর চা খায়। তারপরেই উঠে দাঁড়ায় মুক্তো। আর, বৌদির মুখের দিকে শক্তভাবেই তাকিয়ে বলে—ওষুধের নাম লেখা কাগজটা আমাকে দাও বৌদি।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বৌদি। মুক্তো যেন ভয় দেখিয়ে চিৎকারের মতই কর্কশ স্বরে বলে—দাও বলছি।

ওষুধের নাম লেখা কাগজটা নিয়ে এসে মুক্তোর হাতে তুলে দেন বৌদি। মুক্তো তার শাড়ির আঁচলের এক কোণের একটা গিঁট খুলে নোট আর টাকগুলি একবার গুণে নেয়। তারপরেই চলে যায়।

তারপর, দুপুর হবার আগেই এই নিচেরতলার টাক-পড়া দাদাবাবু ফিরে এসেছে, আর দুপুর হতেই আবার বের হয়ে গিয়েছে। রমা খেয়ে-দেয়ে কিছুক্ষণ বই পড়েছে, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আর, এক গাদা কাপড় কেচে, তারপর বারান্দার উপরেই ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন বৌদি।

বাড়ির মধ্যে শুধু জেগে থাকে একজন। ঘরের ভিতরে তক্তাপোশের পাশে পাখা হাতে নিয়ে ঘুমন্ত টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে মুক্তো।

যেমন যেমন বলে দিয়েছেন বৌদি, সব মনে আছে মুক্তোর। টুলু জাগলেই

ওষুধ খাইয়ে দেয়, আর মাথায় পাখার বাতাস দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়। টুলুর ছোট্ট বুকের উপর থেকে চাদর সরিয়ে, আর ছোট জামাটার বোতাম খুলে মালিশের ওষুধ লেপে দেয় টুলুর বুকের উপর। টুলু আরামে ঘুমোতে থাকে। তুলতুলে ও ছোট একটা বুক নিঃশ্বাসের বাতাসে কাঁপে, যেন একটা স্পর্শের মায়ায় থেকে থেকে ঝুঁকে পড়ে মুক্তোর বুক। টুলুর কপালে হাত বুলিয়ে, টুলুর কপালে চুমো খেয়ে আবার নিজেকে যেন কিছুক্ষণের মতো শান্ত করে রাখে মুক্তো।

সব মনে আছে মুক্তোর, বৌদি যেমন যেমন বলে দিয়েছেন। এক একবার টুলু হঠাৎ চোখ মেলে তাকায়। মুক্তো ডাকে—কি চাই বাবু?

টুলু বলে—মিষ্টি জল।

এক হাতে ওষুধের গেলাসে মিছরির জল ঢেলে নিয়ে টুলুর মুখের কাছে তুলে ধরে মুক্তো। আর এক হাতে টুলুর ছোট দেহটাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে মুক্তো। মিষ্টি জল খেয়ে শুয়ে পড়ে টুলু, তারপরেই ঘুমিয়ে পড়ে। আবার হাতে পাখা তুলে নেয় মুক্তো।

ঝন্ ঝন্। একটা শব্দ যেন হঠাৎ চমকে উঠল, বোধহয় বৌদির হাত থেকে পড়ে গিয়েছে একটা থালা। সেই সঙ্গে চমক ভাঙ্গে মুক্তোর, আর ঝন্ ঝন্ করে বেজে ওঠে তার বুকের ভিতরটা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এইবার যেতে হবে।

যেন এতক্ষণ ধরে একটা মূর্চ্ছার মধ্যেই পড়েছিল মুক্তো। এইবার জ্ঞান হয়েছে। আস্তে আস্তে দরজার কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় ডাক দেয় মুক্তো—বৌদি গো।

বৌদি এসে বলেন—কি?

মুক্তো ছটফট করে—এবার আমায় যেতে দাও বৌদি।

বৌদি বিষণ্ণভাবে বলেন—আমি তোমাকে যেতে দেবার কে মিছার মা। তুমি যে উপকার করলে, সে কাজ···

মুক্তো—চুপ কর বৌদি। আমি যাই।

বৌদি—কাল আসবে তো একবার?

মুক্তোর চোখ দুটো কাঁপতে থাকে ভীরু অপরাধীর মতো।—কাল? হ্যাঁ, দেখি কিন্তু কাল কি আসতে পারব বৌদি?

বৌদি—কাজের এক ফাঁকে চলে এস একবার।

বৌদির কথার উত্তর দেবার আগেই আর একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে মুক্তো।

—যাবে না। কচিগলায় এক অদ্ভুত আদেশের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে টুলুর দিকে তাকায় মুক্তো। দেখতে পায়, চোখ মেলে মুক্তোরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে টুলু। ব্যাপার দেখে হেসে ফেলেন বৌদি।

আবার দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে টুলুর বিছানার কাছে দাঁড়ায় মুক্তো।—কি বলছো বাবু ?

হাত বাড়িয়ে মুক্তোর শাড়ির আঁচল খপ্ করে ধরে ফেলে টুলু!

আবার সেই জ্বরে কাতর আর দুর্বল একটা শিশুকণ্ঠের স্বর বেজে ওঠে। —যাবে না।

বৌদি ফিসফিস করে বলেন—আপত্তি করো না মিছার মা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক একটু, এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে, তারপর যেও।

ঠিক বলেছেন বৌদি। এক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল টুলু। আস্তে আস্তে, অতি সাবধানে আর ভয়ে ভয়ে ঘুমন্ত টুলুর মুঠো থেকে আঁচল ছাড়িয়ে নিল মুক্তো।

কিন্তু বৌদির দিকে তাকাতেই ছলছল করে ওঠে মুক্তোর চোখ।—জেগে উঠে আমাকে আবার খুঁজবে না তো বৌদি ?

বৌদি বলেন—খুঁজতে পারে, আশ্চর্য কি।

আর একমুহূর্তও দেরি করে না মুক্তো। দরজা পার হয়ে হনহন করে চলে যায়। যেন ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরা একটি গভীর রাতে এক সিঁধেল চোরের মতোই এই ঘরের ভিতর ঢুকেছিল মুক্তো, কিন্তু হঠাৎ ভোর হয়ে গিয়েছে, তাই ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে হলো।

রাত্রির অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে রেল লাইনের পাশের বস্তি। একটি ঘরের ভিতর তখন একজন জেগে বসে আছে, আর কুপিতে কেরোসিনের আলো জ্বলছে। একটি ছায়া এসে ওঠে সেই ঘরের দাওয়ার উপর।

ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে মুক্তো! নন্দ বলে—চল মুক্তো।

মুক্তো বলে—না।

নন্দ আশ্চর্য হয়—না ?

মুক্তো—আমি যাব না।

নন্দ—তবে মিছে কথা বলে আমাকে এভাবে ঠকালি কেন মুক্তো ?

মুক্তো—হ্যাঁ, সত্যিই মিছে কথা বলেছি আর ঠকিয়েছি। কিন্তু তুমি মাপ করে দাও।

নন্দ সন্দিগ্ধভাবে বলে—ব্যাপার কি, একটু খুলেই বলনা মুক্তো ?

মুক্তো—ছেলে ফেলে রেখে চলে গেলে পাপ হবে।

নন্দ—তোর ছেলে আছে নাকি ?

মুক্তো—আছে।

নন্দ বলে—বেশ তো, ঘর ছেড়ে চলে আসতে না-ই বা পারলি, কিন্তু ঘরে থেকেই তো মাঝে মাঝে···।

মুক্তোর গলার স্বর যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে—আর কিন্তু টিস্তু নয়, সোজা চলে যাও, নইলে এখুনি হাঁক ডাক করে পাড়া জাগিয়ে তুলব বলে দিচ্ছি।

দাওয়ার উপর থেকে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে সেই মুহূর্তে যেন টুপ করে ঝড়ে পড়ে আর সরে পড়ে নন্দর ছায়া।

কোন সোরগোল জাগল না, কিন্তু তবু অকস্মাৎ দাওয়ার উপর একটা রহস্যপূর্ণ ছায়ার উৎপাতেই যেন বিচলিত হয়ে ঘরের ভিতরের মানুষগুলির ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে উঠল নুটুর মা, দাসুর মা, হরির মা আর পুঁটির মা।

নুটুর মা—কি লো মিছার মা, তুই এখনো জেগে রয়েছিস কেন ?

দাসুর মা—এখনো কুপি জ্বলছে কেন ?

কোন জবাব না দিয়ে হাসতে থাকে মুক্তো।

হরির মা বিরক্ত হয়ে বলে—বেশী রঙ ঢলাস্ নি মিছার মা।

কিন্তু মুক্তো সত্যিই হেসে হেসে চোখে মুখে রঙ ঢলিয়ে বেহায়ার মতো বলে—আমি মিছার মা নই গো হরির মা।

নুটুর মা—তবে তুই কি ? ছেলের মা ?

মুক্তো মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে আর হাসে—তা তোকে বলতে যাব কেন ? তুই বুঝবিই বা কি ?

নুটুর মা চিৎকার করে—কি বললি ?

মুক্তো বলে—তুই এখন ঘুমো, আর আমাকেও একটু ঘুমোতে দে।

নিমের মধু

খোলার চাল, মাটির ভিত আর মেটে দেয়াল, তার মধ্যে ছোট একটা জানালা, আর তারই উপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে নিকটের একটা নিমগাছের ছায়া। দেখামাত্র

ভবনাথের মনের এতক্ষণের একটা স্বপ্নই যেন তেতো হয়ে গেল।

মানুষের কল্পনার প্রাসাদ অনেক সময় ধুলিসাৎ হয়ে যায় আর ভবনাথের কল্পনার প্রাসাদটা ধুলিসাং না হলেও একটা কুঁড়ে-ঘর হয়ে গেল। সত্যই, ভবনাথের কল্পনাব মধ্যেই এতক্ষণ ধরে এই সকালবেলার আলোক ঝক্‌ঝক্ করছিল, প্রায় প্রাসাদের মতই বডসড় চেহারার একটা বাড়ি। কিন্তু নিমগাছের ছায়ায় ঢাকা ঐ ক্ষুদ্র আর দরিদ্র চেহারার মেটেময়লা বাড়িটার দিকে চোখ পডতেই যেন সে কল্পনার মাথায় বাড়ি পডল। ধুলোব মতই ঝুরঝুর করে ঝরে পডল ভবনাথের আশা ভরসা।

এই কি শশী এভিনিউ-এর একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি? কিন্তু আর প্রশ্ন করার ও সন্দেহ করারও কোন অর্থ হয় না। জানালাটাব নিচে মেটে দেয়ালের গায়ে কয়লার আঁচড়ে একেবারে স্পষ্ট করেই লেখা রয়েছে, একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি।

পথের উপরেই কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকে ভবনাথ, আর ভাবতে থাকে, ফিরে যাওয়াই ভাল। এ হেন হাভাতে ঘরের কবাটেব কডা নেডে কোন লাভ নেই।

শুধু একটা হয়রানিই লাভ হলো, আর পকেটের মধ্যে শেষ সম্বল এক টাকা সাত আনা থেকে দশটা আনা একেবারে বাজে খরচে বার্থ হয়ে গেল। বাড়িটা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লেগেছে, অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, আর ট্রাম-বাস ও রিক্সার ভাডা যোগাতে গিয়ে খরচ হয়ে গিয়েছে পুরো দশটা আনা।

এখন মনে হয়, ঠিকই বলেছিল কালীশ। কালীঘাটের চায়ের দোকানের কালীশ।—এ কেসটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না ভব, রিস্কি নিয়ে লাভ নেই।

ভবনাথেরই রিস্কি-জীবনের এক অন্তরঙ্গ সুহৃদ কালীঘাটের চায়ের দোকানের বয় কালীশ কোন উৎসাহ দেয়নি, কিন্তু তবু যেন অদ্ভুত এক উৎসাহের নেশায় অস্থির হয়ে ছুটে চলে এসেছে ভবনাথ, কালীঘাট থেকে এতদূরে বেহালার কাছে এই বিশ্রী এক জায়গায় কুশ্রী এক পথের উপর। শশী এভিনিউ-এর যা কিছু চটক তা হলো শুধু ঐ নামটার মধ্যেই। এবড়ো খেবড়ো একটা কাঁচা রাস্তা, এখানে গর্ত ওখানে কাদা, গরু-মহিষের খাটাল দু'পাশে, আর মাঝে মাঝে দু'একটা নারকেল আর তাল, আর ধুলোয় বিবর্ণদেহ বাঁশঝাড়। এই হলো শশী এভিনিউ।

আজই ভোরে কালিঘাটের চায়ের দোকানে বসে খবরের কাগজটার দিকে তাকিয়ে একটা বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে ভবনাথের চোখে হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল একটা কল্পনা। চটপট খবরের কাগজের সেই বিজ্ঞাপন থেকে ঠিকানাটা

একটা কাগজে লিখে নিয়েছিল ভবনাথ। সেই কাগজটা এখনো চার ভাঁজ হয়ে ভবনাথের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে।

একটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন। আজ তিন মাস হলো নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন শ্রীযুক্ত সুশোভন রায়, বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন, গায়ের রঙ বেশ ফরসা, মাথার চুল সাদা, বাম কানের কাছে একটি আঁচিল, গরদের ধুতি-চাদর পরা অভ্যাস। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান দেন, তবে সেই উপকারের জন্য তাঁর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে ছায়া রায়, একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি, শশী এভিনিউ, বেহালা।

বলেছিল কালীশ, এই কেসটার মধ্যে এত মাথা ঘামাবার কি দেখলি ভব? দশটা টাকাও পুরস্কার ঘোষণা করলে না হয় দেখা যেত যে ভাঁড়ারে কিছু আছে। রিস্কি নিস্ না ভব। না রে না, এ এক্কেবারে ফাঁকা ভদ্দোরতা।

ভবনাথ বলে—উঁহু, বেশ কিছু আছে, আর দিতেও পারে বেশ কিছু, তাই পুরস্কার-টুরস্কারের কথা চেপে গিয়েছে।

খবরের কাগজের দিকে আর একবার তাকায় ভবনাথ। বিজ্ঞাপনের লেখাগুলি পড়তে থাকে। শশী এভিনিউ, সুশোভন রায়, গায়ের ফরসা রঙ, গরদের ধুতি-চাদর, ছায়া রায়—প্রত্যেকটি কথার মধ্যে যে বড়লোক-বড়লোক একটা অবস্থা জল্‌জল্ করছে।

জল্‌জল্ করে ভবনাথের কল্পনা।—আমি তোকেই চ্যালেঞ্জ করছি কালীশ, মোটা মতন আদায় করে আর ট্যাঁক ভারি করে যদি ফিরে আসি, তবে তুই কি ফাইন দিবি বল?

কালীশ বলে—কিছু না। তুমি বাবা বরং আগের কেসটার আমার পাওনা শেয়ার শোধ করে দিও।

ভবনাথ—কোন্ কেস?

কালীশ—সেই চার থান সিল্ক।

ভবনাথ—সেগুলি তো আমি হাতড়েছিলুম।

কালীশ—আরে হ্যাঁ, তোর বাহাদুরি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমি যে খদ্দের যোগাড় করে দিলুম তার জন্যে লাভের অন্তত চার আনা শেয়ারও কি আমাকে দিবি না?

হেসে ফেলে ভবনাথ—সবই ফুরিয়ে দিয়েছি মাইরি। কিন্তু আজ দেব তোকে নিশ্চয় দেব। আর শোন, এখন চটপট ডবল ডিম ভেজে দে দেখি, খেয়ে-দেয়ে একটু তাজা হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু ঐ সেই একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি, নিমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে

রয়েছে একটা বিদ্রূপ। ডবল ডিমে ভাজা সেই আশা ও উৎসাহ এতক্ষণ ধরে ঘুরতে ঘুরতে আর শশী এভিনিউ-এর নোংরা চেহারা দেখতেই ফুরিয়ে গিয়েছে। তার উপর ঐ বাড়ি, খোলার চাল আর মেটে দেওয়াল। এত চেষ্টার পর, শশী এভিনিউ নামে এই অপদার্থ একটা কাঁচা রাস্তার পাশে এই বস্তির মধ্যে বাড়িটার কাছে এসেও যেন ঠিকানা হারিয়ে গেল, পথভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ

তার পরেই ছটফট করে চোখ ছুটো। কি যেন চিন্তা করে ভবনাথ। দেখাই যাক্ না, শুধু কুঁড়ে ঘর দেখেই হতাশ হয়ে চলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যদিও কুঁড়ে ঘর, কিন্তু ঘরের লোকগুলির নামগুলি ভদ্দোর। হয় তো সত্যিই ভদ্দোর-লোক। আর ভদ্দরলোক যদি গরীব হয় তবে তা ভালই হয়। ভীতু ভীতু, সহজেই বিশ্বাস করে, একটুতেই কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে, ধার করেও পূজোর খরচ যোগাড় করে, ভাত খেতে না পেলেও পান খায়, দুয়ার থেকে ভিখারী তাড়াতে পারে না, গরীব ভদ্দোরলোকগুলি সংসারের কেমন যেন অদ্ভুত জীব।

আর, ভবনাথই বা কি কম ভদ্দোর লোক! গায়ে সিল্কের কামিজ, হাতের ছুটি আঙুলে আংটি, মাথার ঢেউ-খেলান চুলগুলি একটু রুক্ষ সূক্ষ্ম, বছর পঁচিশ বয়সের ভবনাথ দুপুরের কলকাতার পথে যখন ব্যস্তভাবে হেঁটে যেতে থাকে, তখন মনে হবে যেন কলেজের ক্লাস কাট্ করে অত্যন্ত শিক্ষিত এক যুবক ম্যাটিনি শো-এর তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে কোন সিনেমা হাউসের দিকে চলেছে। ভবননাথের বাপ-মা ও ভাই-বোন এই বাংলা দেশের যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামটাও ভদ্রলোকের গ্রাম। সেই গ্রাম জানে, এক ভদ্রলোকের ছেলে ভবনাথ, সেই গ্রামেরই পাল বাবুদের দোকানে চুরি করে পালিয়ে গিয়েছে, ফেরার হয়ে গিয়েছে, ওয়ারেন্ট ঘুরছে তাকে সন্ধান করে। ভবনাথের এই ইতিহাস শুধু জানে তার অন্তরঙ্গ সুহৃদ কালী-ঘাটের চায়ের দোকানে বয় কালীশ, আর সেই কালীশও যে আর এক গ্রামের আর এক ভদ্রলোকের ছেলে।

সুতরাং, এখনি গিয়ে যদি ঐ দীনহীন একশো ছত্রিশের ঊনপঞ্চাশের সি-এর দরজা কাঁপিয়ে দিয়ে কড়া নাড়ে ভবনাথ, আর সেই শব্দে ঘরের ভিতর থেকে ছায়া, মায়া বা আর কেউ বের হয়ে আসে, তবে ভবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে তারাও কেউ সন্দেহ করতে পারবে না যে, ভবনাথ এখন আর সত্যি সত্যি ভদ্রলোক নয়। কেউ একবিন্দু সন্দেহও করতে পারবে না যে, ভবনাথ একটা ছদ্মবেশ, ভবনাথ একটা নিষ্ঠুর ভাঁওতা, ভবনাথ একটি অতিচতুর বাগ্‌জাল, সে এসেছে মানুষকে হঠাৎ মূর্খ করে দিয়ে আর কিছু হাতড়িয়ে নিয়ে সরে পড়ার জন্য।

ভদ্রবেশী চোর তো অনেকেই আছে, কিন্তু ভবনাথ হুবহু সে-রকম নয়। ভবনাথের চুরিরও একটা ভদ্রবেশ থাকে, অতি পরিপাটি ভদ্রবেশ। পথচারীর পকেটে হাত দিয়ে আর ঘুমন্ত মানুষের ঘরে ঢুকে যারা রিস্ক নেয় আর রোজগার করে, তাদের সম্পর্কে ঘৃণাই আছে ভবনাথের মনে। ওসব নিতান্তই ছোটলোকের রীতি। সুহৃদ কালীশের কাছেই তার এই ঘৃণার কথা মাঝে মাঝে ঠোঁট বেঁকিয়ে ব্যক্ত করে ভবনাথ—তুই তো জানিস্ কালীশ, কিছু লেখাপড়াও শিখেছি, কাজেই একটু বুদ্ধিসুদ্ধির কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে আমি রিস্কি নিতে পারি না।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত রিস্কি নেয় ভবনাথ। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।—এটা কি সুশোভনবাবুর বাড়ি? জোরে দরজার কড়া নেড়ে হাঁক দেয় ভবনাথ।

ঘরের ভিতর যেন কতগুলি পায়ের শব্দে দুর্‌দুর্ করে বেজে উঠেছে, শুনতে পায় ভবনাথ। হয় ভয় পেয়েছে, নয় আশার সাড়া পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ঘরের ভিতরের কতকগুলি মন। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভবনাথ।

কতকগুলি নয়, মাত্র দুটি। একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি-এর নড়বড়ে কপাটের কাঠ কেঁপে উঠল। খুলে গেল কপাট। আর ভবনাথের মুখের দিকে আগ্রহে ও কৌতূহলে অস্থির দুই জোড়া চক্ষু তাকিয়ে রইল। এক প্রৌঢ়া ও এক তরুণী। বোধহয় মা ও মেয়ে, দেখে তাই তো মনে হয়।

ভবনাথ বলে—সুশোভনবাবু কি আপনাদের কেউ?

তরুণী বলে—হ্যাঁ, আমার বাবা হন তিনি।

ভবনাথ—সুশোভনবাবুর সন্ধান চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে ছায়া রায় নামে…।

তরুণী—আমিই ছায়া রায়, আর এই আমার মা।

ভবনাথ—বুঝলাম। এখন তাহলে সুশোভনবাবুকে আনবার ব্যবস্থা করুন।

অত্যন্ত ব্যস্ত ও চঞ্চল হয়ে ওঠেন প্রৌঢ়া মহিলা।—বসো বাবা, বসো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। বেঁচে থাকো, বড় হও, সুখী হও বাবা।

ভবনাথ—মাপ করবেন, বসবার সময় নেই, আমাকে এখনি অফিস যেতে হবে। শুধু ঠিকানা জানিয়ে দিতে এসেছি, সেই ঠিকানায় আপনারা গিয়ে সুশোভন বাবুকে নিয়ে আসুন, কিংবা কোন লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিন।

ছায়া রায় ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর চলে যায় আর একটা বেতের মোড়া নিয়ে এসে দরজার কাছে রাখে। অনুরোধ করে ছায়া রায়—বসুন।

আপত্তি করে ভবনাথ—বসবার সময় নেই। ঠিকানাটা বলছি, লিখে নিন।

কেয়ার অফ ডাক্তার তিনকড়ি মুখার্জ্জি, বল্লবদাস কাটরা, এলাহাবাদ।

ঠিকানা শুনে শূন্য দৃষ্টি তুলে ভবনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে ছায়া রায় আর ছায়া রায়ের মা।

ভবনাথ বলে—আমার কাকা তিনকড়ি মুখার্জ্জি। এক পার্কের গাছের তলায় জ্বর গায়ে নিয়ে বসেছিলেন সুশোভনবাবু। আমার কাকা তাকে দেখতে পেয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। এখন আপনাদের কর্ত্তব্য।

কথা বলে না ছায়া রায় আর ছায়া রায়ের মা।

ভবনাথ বলে—হাওড়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত রেলে ইণ্টার ক্লাসের একটি টিকিট আর এলাহাবাদ থেকে হাওড়া পর্যন্ত ইণ্টার ক্লাসের তুটি টিকিটের দাম, তার ওপর পথের হাতখরচ বাবদ আর কিছু, এই নিয়ে বড়জোর টাকা সত্তর লাগবে, তার বেশী নয়। আজই কাউকে যদি পাঠিয়ে দেন তো ভাল হয়, কারণ সুশোভনবাবুর শরীরের অবস্থা ভাল নয়, তার ওপর মনের যা অবস্থা, কখন যে আবার কোথায় চলে যাবেন কোন ঠিক নেই।

কেঁদেই ফেললেন ছায়া রায়ের মা।

এইবার শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ। তার মনের শেষ ভরসাও যেন কাঁদকাঁদ হয়ে এইবার ভেঙ্গে পড়তে চলেছে। টাকার কথা শুনেই কেঁদে ফেলেছে, এ যে একেবারে হাভাতে ভদ্রলোকের বাড়ি। দেখতে পায় ভবনাথ, ছায়া রায়ের হাতে তু'গাছি প্লাসটিকের বালা আর ছায়া রায়ের মায়ের হাতে তু'গাছি শাঁখা। এই মানুষগুলি জীবনে সত্তরটা টাকা দেখেছে কি না সন্দেহ।

ভবনাথ বলে—কান্নাকাটি করে আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না।

কান্না থামায় ছায়া রায়ের মা।—তুমি বুঝতে পারছ না বাবা

ভবনাথ—কি বুঝতে পারছি না?

ছায়া রায়ের মা—সত্তর টাকা যোগাড় করা কি আমাদের মতো অবস্থার মানুষের পক্ষে ....

ভবনাথ—কি কাজ করতেন সুশোভনবাবু?

—দোকানে খাতা লিখতেন।

—কত মাইনে পেতেন?

—দৈনিক তু'টাকা।

—তবে গরদের ধুতি চাদর পরার শখ কেন?

—ওটা ওর ধর্মকর্মের শখ। সব সময়েই মনে মনে নাম জপ করেন। তাই সব সময়েই গরদ পরে থাকেন।

—ধর্মের বাতিক ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ঘর ছেড়ে চলে গেলেন কেন ?

—এটাও তার এক বাতিক। যখন চাকরি থাকে না তখন ধর্মের বাতিক বাড়ে, কিন্তু ঘরেই থাকেন। আর যখন আমার ওপর রাগ করেন, তখন একেবারে ঘর ছেড়ে চলে যান।

—তাহলে এরকম ব্যাপার আগেও অনেকবার হয়েছে ?

—হ্যাঁ, কিন্তু চলে গেলেও দু চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসেন কিন্তু এবার তিন মাসেরও বেশী হয়ে গেল, তবু ফিরলেন না দেখে বিজ্ঞাপন দিয়েছি।

বলতে বলতে আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন ছায়া রায়ের মা—কাগজে বিজ্ঞাপনের জন্য আটটা টাকা যোগাড় করতে গিয়ে সামান্য কাঁসা পেতল যা ছিল সবই বেচতে হয়েছে বাবা। এখন আবও সত্তর টাকা যোগাড় করতে হলে ।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে এইবার ছায়া রায়ের মা তার মেয়ের মুখের দিকে তাকান।

ছায়া রায় বলে—দেখুন, সত্তরটা টাকা যোগাড় করার উপায় আছে, কিন্তু ।

দপ্ করে আবার আশার বিদ্যুৎ চমকে ওঠে ভবনাথের চক্ষে—বলুন, কি অসুবিধে আছে ?

ছায়া রায়—কিন্তু মানুষ নেই।

ভবনাথ—তার মানে ?

ছায়া রায় বলে—এমন কেউ আপনজন নেই, যাকে আমাদের দুঃখের কথা বললে দুঃখিত হবে, আর নিজের কাজ বন্ধ করে এলাহাবাদের মতো দূরের জায়গায় যাবে বাবাকে নিয়ে আসার জন্য।

চুপ করে ছায়া রায়। তারপর ভবনাথেরই মুখের দিকে আরও বেদনার্ত ভাবে তাকিয়ে ছায়া রায় বলে—তা ছাড়া, এমন বিশ্বাসী জনও কেউ নেই, যার হাতে বিশ্বাস করে সত্তরটা টাকা ছেড়ে দিতে পারি। বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য খবরের কাগজের অফিসে গিয়েছিলেন যে চক্কোত্তি ঠাকুর, বাবারই বন্ধু, এত ভাল মানুষ চক্কোত্তি ঠাকুর, তিনিও ঐ সামান্য কাজের জন্য তাঁর খরচ বাবদ দু টাকা নিয়েছেন। কিন্তু তাতেও তিনি খুশি নন, আজ এসে আরও একটা টাকা চেয়ে গিয়েছেন।

হেসে ফেলে ভবনাথ—বেশ ভাল ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়েছেন দেখছি !

ছায়া রায় হাসে—কাজেই, এই উপকারটুকু করার ভার আপনাকেই নিতে

হয়।

ভবনাথ—কি আশ্চর্য, আমাকেই এলাহাবাদে যেতে বলছেন সুশোভববাবুকে আনবার জন্য?

ছায়া রায়—হ্যাঁ।

ভবনাথ চোখ বড় করে বিস্ময় প্রকাশ করে—অর্থাৎ আমিই আমার অফিস কামাই করে, সব কাজ ফেলে রেখে এখন এলাহাবাদ ছুটব?

ছায়া রায়—অনেক উপকার আপনিই তো করলেন। আপনিই যখন বাবার খবর এনেছেন, তখন তাঁকে নিয়ে আসার ভার আপনিই নিয়ে শেষ উপকার করুন।

সফল হয়েছে কল্পনা, সার্থক হয়েছে রিস্কি নেওয়া, দশ আনা খরচ আর সারা সকালের হয়রানি। বুকের উল্লাস কোনমতে চেপে চাপা চিৎকারের মতই স্বরে ভবনাথ বলে—দিন টাকা তাহ'লে এখনি রওনা হয়ে যাই।

ছায়া রায় বলে—কিন্তু একটু দেরি হবে।

ভবনাথ—কতক্ষণ?

ছায়া রায় বলে—বেশিক্ষণ নয়।

মায়ের মুখের দিকে আবার যেন কি-রকম এক ভঙ্গীতে তাকায় ছায়া রায়। ছায়া রায়ের মা বলেন—একটু বসো, দুটো ভাত মুখে না দিয়ে যেও না বাবা।

এইবার সত্যই চিকৎকার করে ওঠে ভবনাথ—না না, কখ্‌খ্‌নো না। আমার সময় নষ্ট করবেন না।

ছায়া রায় হাসে—বেশি সময় নষ্ট হবে না। টাকা যোগাড় করে আনতে আমার যতক্ষণ সময় লাগবে, ততক্ষণে ডাল-ভাত রান্নাও হয়ে যাবে।

নিমগাছের ছায়া দোলে। আর ছায়া রায়ের হাতে প্লাসটিকের চুড়িতে যেন ছায়া রায়ের মুখের হাসির ছায়া দোলে। বিশ্বাসে একেবারে মুর্খ হয়ে গিয়েছে আর গলে গিয়েছে কয়লার আঁচড়ে লেখা এই একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি। মাত্র আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। বাস, তারপর· ·তারপর কালীঘাটের চায়ের দোকানের কালীশের শেয়ার চুকিয়ে দিয়ে, মুর্গির দো-পেঁয়াজী ভরপেট খেয়ে সিনেমাতে গিয়ে একটা রঙ্গিলা ছবি দেখে···দূর ছাই, কি হবে সিনেমার ছবি দেখে। কালীশই তো কতবার বলেছে, তুই যে-রকমে প্লে করছিস ভব, সিনেমার কোন বেটা তারকারও সাধ্যি নেই যে ঠিক সে-রকমটি করতে পারে।

ঘরের ভিতর চলে গিয়েছে ছায়া রায় আর ছায়া রায়ের মা। বেতের মোড়ার

উপর বসে নিমগাছটায় দিকে তাকিয়ে থাকে আর বিস্মিত হয়ে ভবনাথ। গাছ ভরে ফুল ফুটেছে। গাছের তলায় ফুল ছড়িয়ে রয়েছে। তেতো করা বিস্বাদ যার পাতা আর ফল, সেই নিমগাছের সাদা সাদা ফুল। কিন্তু এ হেন তেতো ফুলের থোকার উপর মৌমাছির থোকা বসে রয়েছে। মাটির উপর গড়াচ্ছে যে ফুল, সেই ফুলের গায়ে গড়াচ্ছে মৌমাছি। তেতো নিমেরও মিষ্টি মধু হয় নাকি? আর সেই মিষ্টি কি এতই বেশি মিষ্টি?

হঠাৎ চমকে ওঠে ভবনাথ। একটা রঙীন শাড়ীর আঁচল যেন হঠাৎ ভবনাথের গা ছুঁয়ে চলে গেল। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে, দরজা পার হয়ে আর ভবনাথেরই পাশ কাটিয়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে ছায়া রায়।

ভবনাথ—এ কি, কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

ছায়া রায় হাসে, কিন্তু তার প্লাসটিকের চুড়ির হাসির ছায়া দেখা যায় না। হাত দুটি যেন আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে।

ছায়া রায় বলে—আসছি এখনি।

চলে যাচ্ছিল ছায়া রায়। কিন্তু বিচলিতভাবে আর সন্দিগ্ধস্বরে প্রায় চিৎকারই করে ওঠে ভবনাথ—তাহলে আমিও চললাম।

থমকে দাঁড়ায় ছায়া রায়। অসহায়ের মতো তাকিয়ে আর আহতস্বরে বলে—বুঝতে পারছি, খুবই বিরক্ত হচ্ছেন আপনি। কিন্তু…।

ভবনাথ—কিন্তু আবার কি? আপনাদের কাণ্ডকারখানা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলুন?

ছায়া রায়—টাকার যোগাড় করতে।

ভবনাথ—কোথায়?

ছায়া রায়—স্যাকরার দোকানে।

ভবনাথ—তার মানে, গয়না বেচতে?

ছায়া—হ্যাঁ।

ভবনাথ—দেখি, কি গয়না, কেমন গয়না?

আঁচলের আড়াল থেকে হাত বের করে ছায়া রায়। দেখা যায়, হাতের মুঠোয় কাগজের ছোট একটা মোড়ক।

ভবনাথ—কি আছে এর মধ্যে?

ছায়া—এক গাছি সোণার রুলি।

ভবনাথ—কার রুলি?

ছায়া—আমার।

ভবনাথ—আর এক গাছি কই ?

ছায়া—নেই, অনেক দিন আগেই বেচে দিতে হয়েছে।

মাটির উপর ধুলোমাখা নিমফুল আঁকড়ে পড়ে রয়েছে মৌমাছি। আনমনার মতো দুই চক্ষুর দৃষ্টি উদাস করে ধুলোমাখা নিমফুলের দিকে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ, যেন এই সংসারেরই বাইরের একটা অদ্ভুত বস্তুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে তার এলোমেলো মন, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ বলে ফেলে ভবনাথ—থামুন, কোথাও যেতে হবে না আপনাকে।

ছায়া—কিন্তু।

বস্তি থেকে অনেক দূরে, যেন শশী এভিনিউ-এর শেষ প্রান্তের দিকেই তাকিয়ে, হতাশ, ক্লান্ত ও হাঁপ-ধরা ভাঙা-ভাঙা স্বরে ভবনাথ বলে—সত্তরটা টাকা খরচ করার সামর্থ্য আমার নেই, এ তো মিথ্যে নয়, এটা আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন ছায়া রায়। আমি নিজের টাকাতেই এলাহাবাদে যেতে পারি, আর আপনার বাবার ট্রেন ভাড়ার টাকা দিতেও পারি। কথা হলো, সেটা করা উচিত নয়, আর আপনাদের সম্ভ্রমের পক্ষেও সেটা ভাল নয়, ভাল দেখায় না।

ছায়া—আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আপনার নাম তো জানি না।

লজ্জিত ছায়া রায়ের মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ভবনাথ বলে—ভবনাথ মুখার্জি।

পর মুহূর্তেই অন্যমনস্কের মতো আবার অন্যদিকে তাকিয়ে ভবনাথ বিড়বিড় করে বলে—কি আশ্চর্য, নাম পর্যন্ত জানেন না, কিন্তু খুব তো বিশ্বাস করেন!

কিছুক্ষণ যেন স্তব্ধ হয়েই থাকে নিমগাছের ছায়া। প্রশ্ন নেই, উত্তরও নেই। বেতের মোড়া ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভবনাথ।

বিচলিতভাবে প্রশ্ন করে ছায়া রায়—তাহলে কি করব বলুন ?

ভবনাথ—আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমি এখন আমার টাকা খরচ করেই এলাহাবাদে যাই। ফিরিয়ে আনি সুশোভনবাবুকে, তারপর একদিন সুবিধে মতো শোধ করে দেবেন টাকাটা।

ছায়া রায়ের শুকনো চোখে এইবার যেন একটু বাষ্পের আভাস ফুটে ওঠে।—এতটা আশা করি না, এতটা উপকার দাবি করা উচিত নয়, তাই হ্যাঁ বলতে পারছি না ভবনাথবাবু।

ছটফট করে ওঠে ভবনাথের নিঃশ্বাস, ছায়া দেখে ভয়-পাওয়া শিশুর মতই ভবনাথের চোখের চাহনিতে আতঙ্ক কাঁপে। ব্যস্ত হয়ে ওঠে ভবনাথ।—তবে আমি রওনা হলাম ছায়া রায়, আর এক মুহূর্তেও সময় নষ্ট করতে পারব না।

ছায়া রায়—মা যে আপনার জন্ত রান্না শুরু করে দিয়েছেন, না খেয়ে যাবেন না।

ভবনাথ—না, তা হয় না। অসম্ভব।

নীরবে, শুধু একটু বিস্মিত হয়েই তাকিয়ে থাকে ছায়া রায়। মনে হয়, যেন জাত যাওয়ার ভয়ে অচেনা লোকের বাড়িতে খাওয়ার নাম শুনেই পালিয়ে যাওয়ার জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ভবনাথবাবু, এলাহবাদের ডাক্তার তিনকড়ি মুখাজ্জির ভাইপো, যার হাতের দুই আঙুলে দুটি সোনার আংটি।

ছায়া রায় বলে—আমরাও ব্রাহ্মণ।

কিন্তু যেন প্রলাপ বলতে বলতেই এগিয়ে চললো ভবনাথ—বেশ তো···শুনে সুখী হলাম···ব্রাহ্মণ তো কতই আছে পৃথিবীতে···।

ছায়া রায় ডাকে—ভবনাথবাবু।

ভবনাথ মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দেয়—তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে দিও ছায়া রায়, আমি বিদায় নিলাম।

আবার ডাকে ছায়া রায়—ভবনাথবাবু, কবে আন্দাজ ফিরছেন বলে যান।

থমকে দাঁড়ায় ভবনাথ। কি ভয়ানক মূর্খ এই একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি! কিন্তু এত বেশী মূর্খ বলেই বোধহয় মমতা জাগে কঠোর তস্করতায় কঠিন ভবনাথের শুকনো হৃৎপিণ্ডের এক কোণে।

ফিরে আসে ভবনাথ, আবার সেই নিমের ছায়ার নিচে শান্ত হয়ে দাঁড়ায়। চিন্তিত ভঙ্গীতে ভুরু কুঁচকিয়ে বলে ভবনাথ—আমার মনে হয়, আমি ভুল করেছি, আর তোমরাও ভুল করেছ ছায়া রায়।

বলতে বলতে আর একটা যন্ত্রণা চাপতে চাপতে কি-রকম যেন হয়ে যায় ভবনাথের মুখের চেহারা।

ছায়া রায়—কিসের ভুল?

ভবনাথ—এলাহাবাদে যে সুশোভনবাবুকে দেখে এলাম, তিনি সত্যই এ বাড়ির সুশোভনবাবু কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

ছায়া রায়—বাঁ কানের কাছে আঁচিল নেই?

ভবনাথ—না।

ছায়া রায়—সব সময় নাম জপ করেন না?

ভবনাথ—তা তো মনে হয় না।

ছায়া—খুব ফরসা আর লম্বা চেহারার মানুষ?

ভবনাথ—না, মোটেই ফরসা নন আর লম্বাও নন।

ঝর্ ঝর্ করে ছায়া রায়ের দু'চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে।—তবে আপনি মিছিমিছি কেন এলেন?

ভবনাথ—হ্যাঁ, ভুল হয়ে গিয়েছে, এতটা ভেবে দেখিনি।

চুপ করে থাকে ছায়া রায়।

ভবনাথ বলে—এখন তবে তুমিই বলো ছায়া রায়, আমি কি করতে পারি।

ছায়া—আমার বাবাকে খুঁজে বের করুন।

ভবনাথ—কোথায় যেতে পারেন, কোথায় থাকার সম্ভাবনা, এ রকম কিছু একটু না জানা থাকলে কেমন করে কোথায় খুঁজব?

ছায়া রায়—বাবা গঙ্গায় স্নান করতে ভালবাসেন, কালীঘাটের মন্দিরে আরতি দেখতে ভালবাসেন।

ভবনাথ—গঙ্গার ঘাটে আর কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে তোমরাই খোঁজ কর না কেন?

ছায়া রায়—করেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ পাইনি। আর রোজই তো যাওয়া যায় না, সাধ্যিও নেই। তাছাড়া, এসব খোঁজাখুঁজি আর নানা জায়গায় দৌড়াদৌড়ির কাজ কি মেয়েদের পক্ষে সম্ভব?

ভবনাথ—চেষ্টা করব আমি?

ছায়া রায়—করুন।

ভবনাথ—বেশ, এবার চলি ছায়া রায়।

ছায়া রায়—আসুন।

খুবই শান্ত স্বরে, একটুও বিস্মিত ও দুঃখিত না হয়ে ভবনাথকে বিদায় বাণী শুনিয়ে দিচ্ছে একশো উনপঞ্চাশের সি। একেবারে ধীর স্থির আর শান্ত হয়ে রয়েছে ছায়া রায়ের ছায়া। কোন উৎসাহ আর বাজে না ছায়া রায়ের কণ্ঠস্বরে, কোন আশা আর চমকে ওঠে না ছায়া রায়ের চোখে।

চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় ভবনাথ। কিন্তু ভবনাথের বুকের ভিতরেই কাঁটার আঘাতের মতো তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা লাগে যেন। একেবারে ব্যর্থ হয়ে আর হেরে গিয়ে পালিয়ে যেতে হচ্ছে ভবনাথকে। কিন্তু একেবারে কিছুই না নিয়ে গিয়ে এত ভয়ানক ভাবে শূন্য হয়ে চলে যেতে চায় না মন। দাগী জীবনে না হয় আর একটা মিথ্যায় দাগ পড়ুক, ঐ মাটির দেয়ালে আঁকা কয়লার আঁচড়ের মতো একটা দাগ।

ছায়া রায়ের চোখ জলে ধোওয়া কাঁচের মতো চক্‌চক্ করে। আর ভবনাথ তাকিয়ে থাকে, আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকা মানুষের মতো অতি-দূরের মোহে মুগ্ধ দুটি চক্ষু তুলে, ছায়া রায়ের মুখের দিকে। হঠাৎ প্রশ্ন করে

ভ বনাথ—তোমার বাবাকে যদি খুঁজে নিয়ে আসতে পারি ছায়া রায় ?

ছায়া রায়—আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ভবনাথ—তার মানে ?

উত্তর দেয় না ছায়া রায়। ভবনাথ যেন তার এই অন্ধকারে ঢাকা রিক্তি জীবনেরই পাথরে চাপা পড়া এক দুর্লভ লোভের ব্যাকুলতা সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে ওঠে—বল ছায়া রায়।

ছায়া রায় বলে—আপনি যা মনে করেন তাই।

ভবনাথ—ঠিক তো ?

ছায়া—হ্যাঁ।

ভবনাথ—কোন আপত্তি নেই তোমার মনে ?

ছায়া—একটুও না।

ভবনাথ—তোমার মা যদি আপত্তি করেন ?

ছায়া—কেন আপত্তি করবেন মা ? আপনিও তো ব্রাহ্মণ

আর কোন প্রশ্ন নেই। যেন ছায়া রায়ের এই শেষ কথার মধুরতা মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভিতরে লুকিয়ে ফেলেছে ভবনাথ, পাকা চোর যেমন সোনার হার গিলে ফেলে।

আর মুখ ফিরিয়ে একবার তাকায়ও না ভবনাথ হনহন করে যেন এই পৃথিবীর কোন কাঁটার ঝোপে লুকিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্তভাবে চলে যায় ভবনাথ।

•

কালীঘাটের মন্দিরে আরতি যখন শেষ হলো, আর মন্দিরের বড় দরজা দিয়ে শেষ দর্শকও যখন বের হয়ে গেল, তখন আর একবার চমকে উঠলো ভবনাথ। ছায়া রায়ের নিরুদ্দিষ্ট বাবাকে সত্যিই যে খুঁজতে এসেছে ভবনাথ। কি আশ্চর্য, এ আবার কোন্ মূর্খতার খেলা অকারণে একটা ছায়ার অনুরোধের জন্য এত সময় নষ্ট করা ? শুনলে কালীশ যে হো হো করে হেসে উঠবে।

কিন্তু কালীশ নিশ্চয়ই জানে না যে, নিমেরও মধু হয়, নিমের বিসতেতো বুকের ভেতরেও… থাক্ গে। এসব কথা কালীশকে বলে কোন লাভ হবে না, বেটা বিশ্বাসই করবে না।

কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে ভবনাথের। গিলে-ফেলা সোনার-হারের মতো একটা আশা যেন থেকে থেকে কচ্ কচ্ করে কষ্ট দিচ্ছে গলার ভিতরটাকে। মনে হয়, এইভাবেই রোজ সন্ধ্যায় যদি এখানে আসা যায়, তবে নিশ্চয়ই একদিন আরতি আলোকে হঠাৎ দেখে ফেলবে ভবনাথ, ছায়া রায়ের বাবা সুশোভনবাবু,

গায়ে গরদের চাদর জড়ানো লম্বা ফরসা সুশোভনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

যাই হোক্, আজ এখানে কোন কাজ নেই। আবার কাল সন্ধ্যা। এখন বরং কালীশের কাছে গিয়ে, আর এক কাপ গরম চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়াই ভাল। কালীশটাও নিশ্চয় এতক্ষণে নানা দুশ্চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। চলতে থাকে ভবনাথ।

চায়ের দোকানে ভবনাথ ঢুকতেই কালীশ বলে—যাক্, খুব বেঁচে গেলি ভব। আর একটু দেরী করলেই নির্ঘাৎ হাতে হাতে ধরা পড়ে যেতিস।

ভবনাথ—ধরা পড়বো কেন রে বেটা!

চায়ের দোকানের টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে এসে কালীশ বলে—এই দেখ!

শূন্য দৃষ্টি তুলে খবরের কাগজেরই বুকের এক জায়গায় একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ। ছায়া রায়ের আবেদন, সেই ছোট সন্ধান চাই, বিজ্ঞাপনটা ছুরি দিয়ে পরিষ্কার করে কে যেন কেটে নিয়ে চলে গিয়েছে।

ভবনাথ—এ কি ব্যাপার কালীশ!

কালীশ—হেড মাস্টার আশুবাবু ঐ বিজ্ঞাপন কেটে নিয়ে গিয়েছেন। তারই বাড়িতে আছে হারানো লোকটা। এতক্ষণে বোধহয় লোকটাকে একেবারে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েই ফেলেছেন।

চুপ করে বসে থাকে ভবনাথ।

কালীশ প্রশ্ন করে—চা খাবি?

—না।

—কেমন দেখলি, বেশ বড় লোকের বাড়ি?

—মোটেই না।

—কিছু হাতড়াতে পারলি?

—কিচ্ছু না।

—তাহলে স্রেফ—।

—স্রেফ ঠকে এসেছি মাইরি।

সু নি কে তা

কলকাতার পল্লী। লেক দূরে নয়। কংক্রিটের 'নীলকমল'। বিরাট চারতলা। কাঁচা দুধের মতো রঙ। শেষ চৈত্রের সন্ধ্যা। গুলমোরের মাথায় দুরন্ত সোনা।

ছোট ছোট ঝড় উড়ে যায়।

বেড়িয়ে ফেরে সেই মহিলা আর সেই ভদ্রলোক। মহিলার বয়স পঁচিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকের বয়স কোনমতেই পঁয়ত্রিশের বেশি হতে পারে না। মহিলা দেখতে সুন্দর। কিন্তু ভদ্রলোক মহিলার তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর। আজ প্রায় এক বছর ধরে প্রতি সন্ধ্যায় ঠিক এই ভঙ্গীতেই দু'জনে নিবিড়ভাবে দু'জনের হাতে হাত বাড়িয়ে আর ধীরে ধীরে হেঁটে নীল-কমলের ফটকের সামনে এসে থেমেছে।

ফটকের কাছে এত কড়া একটা আলো জ্বলে, কিন্তু সেই আলোকের অস্তিত্বই যেন ওরা স্বীকার করে না। মহিলার পিঠের উপর একটা হাত আদুরে ভঙ্গীতে তুলে দিয়ে ভদ্রলোক চাপা গলায় কি যেন বলে। প্রত্যুত্তরে শুধু মৃদু একটি ভ্রূকুটি করে মহিলা। তারপরেই মহিলার কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিস ফিস স্বরে আরও কি-সব বলতে থাকে ভদ্রলোক। মনে হয়, ভদ্রলোকের দুই ঠোঁট যেন মহিলার কানের দুল ছুঁয়ে কথা বলছে।

ঝক্ করে হেসে ওঠে মহিলার চোখ। মাথা দিয়ে আস্তে একটা ধাক্কা দেয় ভদ্রলোকের কাঁধে। হো হো করে হেসে ওঠে ভদ্রলোক। মহিলা বেশ জোর গলা ছেড়েই বলে—হোপলেস? তার পরেই মুখের উপর রুমাল চেপে মহিলা তার নিজেরই মুখের হাসির উচ্ছ্বাসটাকে একটু লাজুক করে তোলে।

তারপরেই বাহুবদ্ধ দুটি পুলকিত মূর্তি তরতর করে নীলকমলের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে। এবং তারপরেই তিন তলার একটি ছোট ফ্লাটের একটি ঘরে দপ্ করে আলো জ্বলে ওঠে। গোলাপী রঙের আলো।

এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালায়, পাশের বাড়ির ছাতের রেলিংএর কাছে, এমন কি রাস্তার ওপারে দুটো বড় বড় দোতলা বাড়ির বারান্দায় সারি সারি সতর্ক ক্যামেরার মতো যে-সব জোড়া জোড়া চোখ এতক্ষণ ধরে ফটকের আলোকে আলোকিত দৃশ্যটাকে লক্ষ্য করছিল, সে-সব চোখের কৌতূহলও এইবার উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে আর গলা টান করে তিনতলায় ফ্ল্যাটের গোলাপী রঙের আলোকে আলোকিত দৃশ্যটাকে দেখবার চেষ্টায় ছটফট করতে থাকে। কিন্তু বিশেষ কিছু দেখা যায় না, বোঝা যায় না, অনুমান করা যায় না। শুধু দপ্ করে আর একবার আলোয় রঙ বদলায়। ফিকে বেগুনী রঙ।

কিছু বরং দেখা যায় আর বোঝা যায় রাস্তায় এ ফুটপাথে না দাঁড়িয়ে ও ফুটপাথে দাঁড়ালে। দুটো গুলমোর মাথা উঁচু করে নীলকমলের তিনতলার ঐ রঙীন ঘরের জানালা দুটো প্রায় ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসের উপদ্রবে

গুলমোরের মাথা এদিক ওদিক একটু কাৎ হলেই দেখা যায়, দেয়ালে দুটো রঙীন ফটো পাশাপাশি ঝুলছে, সাদা সরু ফ্রেমে বাঁধানো, বোধহয় হাতীর দাঁতের ফ্রেম। মেহগনির একটা শীর্ণ ও ঋজু স্ট্যাণ্ডের উপর একটা কাশ্মীরী সুরাহি, পিতলের উপর মীনার কাজ করা। তার মধ্যে রজনীগন্ধার লম্বা লম্বা ডাঁটা, ডাঁটার মাথায় ঘুমন্ত কুঁড়ি। কুঁড়িগুলি ফুটলেই ফটো দুদিকে ছুঁয়ে ফেলবে বোধহয়।

ঘরের মাঝখানে একটা খাট, খাটের উপর ঝকঝকে রঙীন সাটিনের ঢাকা। তার উপর পৃথিবীর কোন মানুষ কোনদিন বসবে বলে বিশ্বাস হয় না, এমনই নিখুঁত যত্নে সাজিয়ে-গুছিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে খাটের বিছানার কোমলতা। বড় নীরবের বুকে আলো-ঝলসানো। গুলমোরের সোনালী প্রতিচ্ছায়া কখনো কাঁপে কখনো দোলে। আরও আসবাব আছে এইটুকু ঘরের মধ্যেই। কিন্তু সবই যেন ছবির মতো আঁকা। নড়চড়-নেই, ওলটপালট নেই। প্রায় এক বছর ধরে ঠিক এইভাবেই সাজানো। কোন আগন্তুক এ ঘরের দরজার কড়া নাড়ে না, ঘরে প্রবেশও করে না। আজ পর্যন্ত তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে এ ঘরের ঘরের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। মনে হয় ঐ দুজনেরই প্রাণের রঙে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে এই ঘর, আর একটুও জায়গা নেই। তৃতীয় কোন প্রাণ প্রবেশ করলেই এই ঘরের সব রূপের ছন্দ এলোমেলো হয়ে যাবে।

যখন ঘরের পাখা খুব জোরে ঘোরে, তখন এ জানালার দিকে তাকালে দেখা যায়, রঙীন শাড়ির আঁচলের একটুখানি অংশ ফুরফুর করে উড়ছে। আর ও জানালার দিকে তাকালে দেখা যায় সিল্কের কামিজের আধখানা আস্তিন এবং ঘড়ি বাঁধা একটা কব্জি। যেন এক অর্ধনারীশ্বরের মূর্তির ডান আর বাম দেহভাগের আভাস মাত্র দেখা যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, দুই জানালার মাঝখানের ঐ দেয়ালটুকুর ওপাশে নিশ্চয়ই ভেলভেটে মোড়া ছোট একটি কৌচ আছে এবং সেই কোচের উপর অতিঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে সেই ওরা দু'জন, যারা প্রতি সন্ধ্যায় একখণ্ড অতিনাটকীয় প্রগল্‌ভতার মতো বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফেরে এবং জড়া-জড়ি আর ঢলাঢলি করতে করতে নীলকমলের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়।

প্রায় এক বছর হলো এই ফ্ল্যাটে রয়েছে ঐ মহিলা আর ঐ ভদ্রলোক, কিন্তু নীলকমলের কোন ফ্ল্যাটের কোন মানুষই ওদের পরিচয় জানে না। ভবনের দারোয়ান ছাড়া ওদের নামও বোধহয় কেউ জানে না। এক বছর ধরে এই পাড়ার সবারই চোখে এত প্রত্যক্ষ হয়েও পাড়ার কাছে ওরা দুজনে আজ পর্যন্ত অপরিচিত রয়ে গিয়েছে। সত্যিই দু'টি রঙীন ফটোই বাস করে তিনতলার এই ফ্ল্যাটের ঘরটিতে। এক বছরের মধ্যে এই ভবনের আর এই পাড়ার কোন মানুষের সঙ্গে

ওরা ত্ব'জনের একজনও কখনও একবার ভুলেও আলাপ করেনি।

পাড়ার সকলেই অবশ্য এইটুকু জানে যে, মহিলা কোথাও চাকরি করেন। প্রতিদিন সকাল দশটার সামান্য কিছু আগেই একটা স্টেশন ওয়াগন এসে থামে নীলকমলের ফটকে। কোন বড় সদাগরী অফিসেরই গাড়ি বলে মনে হয়, কারণ ড্রাইভারের উর্দি বেশ জমকালো ধরনের। তিনবার হর্ন বাজাতেই মহিলা নেমে আসেন। গাড়ির ভিতর আরও কয়েকজন অফিসযাত্রিণী মহিলাকে সুসজ্জিত বেশে বসে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এ মহিলা যেরকম জাঁকালো সাজে সেজে অফিসে যান, কোন রাজার বাড়ির বিয়ের উৎসবে যেতে হলেও সেরকম জাঁকালো সাজে সাজবার দরকার হয় না।

অফিসের গাড়ি আসামাত্র এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালায় কৌতূহলী কতগুলি নারীচক্ষুর সমাবেশ দেখা যায় এবং গাড়ি স্টার্ট নেওয়া মাত্র চারদিকের বাতাসে ফিসফিস স্বরে একটা মন্তব্য ধ্বনিত হতে থাকে।—শাড়ির গাছ আছে বোধহয়।

মন্তব্যটা অহেতুক নয়। অনেকেই লক্ষ্য করেছে এবং আশ্চর্য হয়েছে আজ পর্যন্ত এ মহিলাকে এক শাড়ি পর পর ত্বদিন পরতে কখনো দেখা গেল না।

ঐ ভদ্রলোক সম্বন্ধেও একটা তথ্য এখন আর কারও অজানা নেই। ভদ্রলোক কিছুই করে না। সারা ত্বপুর ঘরেই থাকে।

তিনতলায় ফ্ল্যাটের ঐ একটি মাত্র ঘর। ভিতরের দিকে সরু এক ফালি বারান্দা। কিন্তু কি তকতকে ঝকঝকে ও রঙীন একটি নীড়! একেবারে নিখুঁত পারিপাট্য। ধোঁয়ার চিহ্ন এ ফ্ল্যাটে কখনো দেখা যায় না, কারণ রান্নাবান্নার কোন নোংরা ঝঞ্ঝাট এখানে নেই। ত্ব'বেলাই হোটেল থেকে খাবার আসে। চাকর-বাকরও নেই। ভদ্রলোক সারা ত্বপুর ধরে ঘুমোবার পর, বিকেল হতে হতেই জেগে ওঠে এবং ঝাড়পোছ করে রঙীন নীড়ের নিখুঁত পারিপাট্য সজীব করে রাখে। মহিলা অফিস থেকে ফেরবার আগেই ভদ্রলোক একবার নীচে নেমে আসে। সিল্কের চীনা-কোট পায়জামা আর বাঘছালের চটি, এই সাজেই কত সুন্দর দেখায় ভদ্রলোককে। হেঁটে হেঁটে মাত্র রাস্তার ঐ মোড় পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং ফিরে আসে রজনীগন্ধার একগুচ্ছ ডাঁটাসুদ্ধ কুঁড়ি নিয়ে। এ ছাড়া আর কোন কাজ করতে ভদ্রলোককে কেউ কখনো দেখেনি।

তারপর, মহিলা অফিস থেকে ফিরে আসার পর, বেড়াতে যাবার পর্ব। ভদ্রলোক শার্ট ট্রাউজার আর টাই পরে এবং মহিলা বিচিত্রা হয়ে ওঠে তার খোঁপার বৈচিত্র্যে। অফিস যাবার সময় যেমন শাড়িতে, বেড়াতে যাবার সময়

তেমনি খোঁপাতে, দুটো দিন কখনো মহিলাকে একটি রকম হতে দেখা গেল না। কাল দেখা গিয়েছিল সরু স্প্রিং-এর মতো কি-একটা বস্তু দিয়ে খোঁপাটা জড়ানো। স্প্রিং-এর মুখগুলি হলো ফণাতোলা সাপের মুখ, শিউরে শিউরে দোলে! আজ দেখা গেল, মস্ত বড একটা রুপোর প্রজাপতি খোঁপা কামডে পডে আছে। যেন পরাগ খুঁজছে প্রজাপতি, তারই আনন্দে পাখা দুটো কাঁপছে।

কে ওরা? এই পাড়ার মধ্যে এটা একটা মস্ত বড় প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রায় এক বছরের মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। রহস্য, রহস্য হয়েই রয়েছে। মহিলার সিঁথিতে সিঁদুরের দাগও দেখা যায় না। এটাই বা কোন রহস্য? এ কি শুধু একটা স্টাইল?

কে জানে, প্রথম কে কথাটা বলেছিল, কিন্তু এখন এ পাডার সর্বত্রই কথাটা ভাল করেই রটে গিয়েছে যে, নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের ঐ ঘরে থাকে এক কিন্নর আর এক কিন্নরী।

দপ্‌ করে আর একবার আলোর রঙ বদলায়। তিনতলার ফ্ল্যাটের ঘর সবুজ হয়ে যায়। পাশের বাড়ির ছাদে রেলিং-এর কাছে অনেকগুলি ঘোমটা বেণী ও খোঁপা ব্যস্তভাবে আলোচনা করে—যারা স্বামী-স্ত্রী নয়, তাদেরই বলে কিন্নর আর কিন্নরী।

রাত আর একটু কালো হয়। আর একটু সাদা হয়ে ফোটে আকাশের তারা। একটা উতলা বাতাস। লেকের জলে আলো কাঁপে। গুলমোর চঞ্চল। তার চেয়ে আরও বেশী চঞ্চল আশেপাশের বাড়ির ছদে নানা বয়সের চোখের তারা। তিনতলার ফ্ল্যাটের ঐ রঙীন ঘরের কৌচ থেকে উঠে ঝকমকে সাটিনে ঢাকা খাটের উপর এসে বসেছে সেই দুটি মূর্তি, যাদের নাম আজও কেউ জানে না।

নাম হলো, বীথিকা রায় আর পরিমল রায়। আজ এক বছর হলো ওদের বিয়ে হয়েছে এবং বিয়ে হবার পর থেকেই নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের এই ঘরটিতেই রঙীন নীড় রচনা করে দু'জনে আছে। কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে কি না, এটুকু তাকিয়ে দেখবার গরজও যেন ওদের নেই। দু'জনের চোখ দু'জনের মুখ দেখে মুগ্ধ হবার জন্য সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে, অন্যদিকে তাকাবার সময় কই, দরকারই বা কি?

দু'জনেরই জীবনের কল্পনা সত্য হয়েছে। যেন ধুলোবালির পৃথিবীতে দুটো অজাগতিকী কল্পনা তৃষ্ণার্ত চক্ষু নিয়ে মনের মতো সাথী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই সে-দুটি কল্পনার একদিন মুখোমুখি দেখা হলো। এবং কল্পনা সত্য হয়ে আর জীবন্ত হয়ে উঠতে আর বেশী সময় নিল না। তার প্রমাণ, তিন-

তলার ফ্ল্যাটের এই রঙীন ঘরটি, বীথিকা রায় আর পরিমল রায়ের জীবনের নীড়।

স্বামী দেখতে সুন্দর হবে, এই ছিল বীথিকার মনের সবচেয়ে বড় দাবি। সেই যখন কলেজের পড়া শেষ হয়নি, তখন থেকেই। বিয়ের প্রস্তাব এসেছে অনেকবার, কিন্তু প্রত্যেকবারই সে প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে, বীথিকা তার জীবনের একমাত্র স্বপ্নের মতো সেই একনিষ্ঠ দাবিকে একটুও ছোট করতে রাজী হয়নি। পাত্রের চেহারা ভাল নয়, ও চেহারা চলবে না, স্পষ্ট করে প্রতিবাদ জানিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করেনি বীথিকা। তিন বছর আগে শেষবারের মতো একটা বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন বড়দা; এই চাকরিটা তখন সবেমাত্র শুরু করেছে বীথিকা। সেই প্রস্তাবও অনায়াসে একটি কঠিন ভ্রূভঙ্গির আঘাতে আর মুখ ঘুরিয়ে তুচ্ছ করেছিল বীথিকা। সেই শেষ, বড়দা আর কখনো বীথিকার বিয়ের কথা উচ্চারণও করেননি।

বড়বৌদি একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন—জয়ন্তের চেহারাও তোমার ভাল লাগছে না? জয়ন্ত দেখতে খারাপ? আশ্চর্যই করলে তুমি!

বীথিকা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—ওরকম চেহারা হাট-বাজারে অনেক দেখা যায়।

বড়বৌদি—শুধু চেহারাই কি সব? গুণ-চরিত্র রোজগারও তো দেখতে হয়।

বীথিকা—ওসব কিছু দেখতে চাই না।

একথা শোনার পর, বড়বৌদি বীথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে চুপ করেই গিয়েছিলেন। কে জানে, এই মেয়ের চোখের মধ্যে কোন পিপাসা লুকিয়ে রয়েছে! পৃথিবীর হাটে-বাজারে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না এমনই এক দুর্লভ রূপের পুরুষকে জীবনের সঙ্গী করতে না পারলে এই মেয়ের ঐ দুই বাঁকা ভুরুর কঠিন ভঙ্গি কখনো শান্ত হবে না। কিন্তু এত বড় স্বপ্ন পুষে লাভ কি? এমন রূপসী তুমি নও যে রূপেশ্বরেরা তোমার জন্য তপস্যায় বসে আছে। তোমার চেয়ে অনেক বেশি রূপসী পৃথিবীতে আছে, কলকাতার এই পাড়াতেই আছে, ঢের ঢের আছে।

বড়বৌদির নীরব অভিযোগটা যেন বড়বৌদির তাকাবার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারে বীথিকা এবং তার জীবনের সবচেয়ে বড় দাবির উপর পরের মনের এই উপদ্রব্যের একটা হেস্তনেস্ত করে দেয় সেই মুহূর্তেই।—আমার স্বামী হবার মতো মানুষ খুঁজে নেব আমি। পাই ভাল, না পাই তাও ভাল। তোমরা আর খোঁজা-খুঁজি করো না।

পরিমল রায়ের কল্পনাও ঠিক এমনটিই চেয়েছিল।

শুধু বড়লোকের একমাত্র ছেলে বলতে যে গুণ বোঝায়, সেই গুণ তিন বছর আগে পরিমল রায়েরও ছিল। বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই গুণের গৌরবও শেষ হয়েছে। হাই স্কুলের মাত্র কয়েকটা ক্লাশ পর্যন্ত বিদ্যাটা এগিয়েছিল পরিমলের, তারপরেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে সব অনেক বছর আগের কথা। দু'বছর আগে পরিমল রায়ের বাপের-দেওয়া বাড়িটা যেদিন দেনার দায়ে নিলামে বিকিয়ে গেল, সেদিন পরিমলকে দেখতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল বন্ধুর দল। সেদিনও চাকরে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল পরিমলকে। কাজ করে হাত-পা কে কষ্ট দিতে শেখেনি পরিমল। ও অভ্যাসটা পরিমলের বংশমর্যাদাতেই বাধে।

কিন্তু বন্ধুদের মেসে বন্ধুদেরই করুণার গলগ্রহ হয়ে একটি বছর পার করে দিতে পরিমল রায়ের বংশমর্যাদায় অবশ্য কিছুই বাধেনি।

বন্ধুরা অনুযোগ করত—এক বছর ধরে চেষ্টা করে একটা কাজ যোগাড় করতে পারলে না, এ কেমন কথা হে?

পরিমল বলে—চেষ্টা করতেই জানি না ভাই। তা ছাড়া, যা তা একটা কাজ নিয়ে ফেললেই তো হয় না। প্রেষ্টিজ বলেও তো একটা বস্তু আছে!

বন্ধুরা বিস্মিত হয়, সহ্যও করে এবং একদিন বিদ্রূপ করেই বলে তুই কোন-মতে একবার হলিউডে চলে যা।

—কি হবে গিয়ে?

—লুফে নেবে তোকে, ঐ রকম একটা চেহারা হলিউডে দেখতে পেলে কি আর রক্ষে আছে?

বন্ধুদের ঠাট্টা বুঝতে পারে পরিমল, কিন্তু এটাও বিশ্বাস করে যে, নেহাত মিথ্যা বলেনি বন্ধুরা। চেহারা আছে পরিমলের, এবং সে চেহারা তাকিয়ে দেখবার মতো। রূপই তো একটা গুণ, আর পরিমলের মুখের দিকে তাকালে মনে হবে শ্রেষ্ঠ গুণ! পরিমলের রূপের খুঁত অনেক খুঁজে বের করতে হয়। বন্ধুরা জানে, এবং পরিমলও এখনো ভুলে যায়নি, পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা পরিমলকে অ্যাপোলো'দা বলে ডাকে। চাঁপার কলির মতো নয়, চাঁপার কলির চেয়েও সুন্দর-গড়ন আঙুল যদি দেখতে হয়, তবে দেখতে হবে পরিমলের আঙুলকে। আঙুলের রূপের গুণে আংটিটাও কত সুন্দর দেখায়। পরিমল জানে, সে কত সুন্দর। এবং আশ্চর্য হয়, তার চেহারার উপযুক্ত মূল্য ও মর্যাদা দেবার মতো একটাও প্রাণ নেই এই পৃথিবীতে। এমন সম্পদ থাকতেও কি একটা কাজের চাকর হয়ে জীবন কাটাতে হবে? এই শ্যামল, বিধুভূষণ আর দেবব্রতের মতো?

পরিমল বলে—পাঁচ হাজার টাকা দাও, এখনি হলিউডে চলে যাচ্ছি।

বন্ধুরা বলে—হলিউড কি শুধু আমেরিকাতেই থাকে? এই কলকাতার পথে পথেই আছে। দোহাই তোমার, তুমি মেসের এই ঘর ছেড়ে পথে একটু বেও হও দেখি।

পরিমল—তাতে কি লাভ হবে?

বন্ধুরা বলে—খুব হবে, একদিন না একদিন কোন হলিউডের চোখে পড়ে যাবে, এবং তারপরেই নির্ঘাৎ…।

পরিমল—তোমাদের রসিকতা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বন্ধুরা তাদের রসিকতার রহস্য এইবার বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেয়।—তারপর আর কি? হলিউডই খাওয়াবে পরাবে, রাজার চেয়ে বেশি মজার হালে থাকবে।

গম্ভীর হয় পরিমল। বন্ধুরা রসিকতার ছলে যেন তার মনের সবচেয়ে বড় দাবির স্বপ্নটাকেই চেঁচিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নোংরা করে দিচ্ছে। এ স্বপ্ন যে তার সত্তার মধ্যে মিশে রয়েছে। পৃথিবীর এক নারী পরিমলের এই রূপধন্য পৌরুষকে যেচে বরণ করে তারই ঘরে নিয়ে যাবে। আর কোন ভাবনা থাকবে না পরিমলের জীবনে। সব ভার তার, সেই প্রেমিকা নারীর। কাজের চাকর হয়ে থাকার বদলে রূপের দেবতা হয়ে থাকা সে জীবনের গর্ব গৌরব ও পৌরুষ তার কল্পনার বুকে কান রেখে অনুভব করতে পারে পরিমল। কিন্তু থাক্, কল্পনার কথা বন্ধুদের রূঢ় ভাষায় আলোচনা থেকে দূরে রাখা আর গোপন রাখাই ভাল।

কিন্তু বন্ধুদের একটি অনুরোধ রক্ষা করেছিল পরিমল। মাঝে মাঝে মেসের ঘর থেকে বের হয়ে পথে এসে দাঁড়াত, তারপর যতটুকু হাঁটতে এবং যেখানে যেতে ভাল লাগত, তার বেশি ঘোরাফেরা না করে মেসে ফিরে আসত। এই ভাবেই একদিন এবং অকস্মাৎ চোখে দেখার ছোট একটা ঘটনা শুধু ঘটে গেল। বীথিকা আর পরিমলের সাক্ষাৎ। সে ঘটনার একমাত্র সাক্ষী হলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, এবং তার পরের ক'দিনের ইতিহাস মাত্র ওরা দু'জনই জানে। তারপরেই বিয়ে, যথারীতি বৈবাহিক রেজিস্ট্রারের খাতায় সই করে, সাক্ষী রেখে, আইন অনুসারে। এবং তারপরেই নীলকমলের তিনতলার ফ্লাটের এই রঙীন ঘর।

বীথিকা রায় আর পরিমল রায়। রূপের আর কামনার জীবনকে সুন্দর করে আর অনন্ত করে রাখার এক অপার্থিব শিল্প যেন ওরা জানে। ধুলো কাঁটা আর সমস্যায় ভরা এই পৃথিবীর কোন কুঞ্জে চিরবসন্ত জেগে থাকে কিনা কে জানে,

কিন্তু বীথিকা রায় আর পরিমল রায়ের হাসিতে নিঃশ্বাসে ও দৃষ্টিতে চিরবসন্তের আমোদ এসে বাসা বেঁধেছে। ওরা দু'জনেই সত্যিই বিশ্বাস করে, ওদের জীবনের এই রঙ কখনো ফিকে হবে না, ফুরোবে না, ঝরে পড়বে না। দু জনে প্রতিমুহূর্তে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে আর মুগ্ধ হয়ে এ-জীবনকে এক খণ্ড হলিউড করে রাখবে।

গুলমোর শান্ত। লেকের জলে তারার ছায়া। চারদিকের শব্দ প্রায় লুকিয়ে পড়েছে। ভদ্রলোক হঠাৎ যেন চমকে ওঠে, এবং পরমুহূর্তে মহিলার কাছ থেকে বেশ তফাতে সরে গিয়ে, মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে।

পাশের বাড়ির ছাদে আর সামনের বাড়ির বারান্দার উপর সতর্ক চক্ষুর ক্যামেরাগুলি বিব্রত হয়, বিস্মিত হয় এবং বিরক্ত হয়। এ আবার কোন্ দৃশ্য! আজ প্রায় এক বছরের মধ্যে কোন দিন কোন মুহূর্তও ঐ কিন্নর আর কিন্নরীকে তো এতটা তফাত হয়ে যেতে, আর ঐ ভঙ্গীতে স্তব্ধ হয়ে থাকতে কখনো দেখা যায়নি। নিতান্তই আকস্মিক, অভাবিত এবং বিসদৃশ। চোখের ক্যামেরাগুলি আশাভঙ্গের বেদনা নিয়েই ঘুমোতে চলে যায়।

বীথিকা বলে—ওরকম করে চমকে উঠলে কেন? ওভাবে বোবার মতো তাকিয়ে থেকেই বা কি লাভ হচ্ছে? ছিঃ।

পরিমল—শুনতে ভাল লাগল না তোমার কথাগুলো।

বীথিকা—আমার কথাগুলো শুনতে ভাল লাগল না? আশ্চর্য!

পরিমল—আজ ওসব কথা নাই বা আলোচনা করলে। কাল বলো। কারণ আমি এখনি কি বলব, ঠিক ভেবে পাচ্ছি না।

বীথিকা—তুমি ভাববে কেন? তোমাকে ভাবতে বলছেই বা কে? আমি শুধু জানতে চাইছি, এরকম কোন ডাক্তার তোমার জানা আছে কি না?

এক টান দিয়ে গলার রঙীন টাইটার গেরো ফস্ করে খুলে ফেলে পরিমল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে।

বীথিকা—উত্তর দিচ্ছ না যে?

পরিমল—জানা আছে, এন্টালির প্রকাশ ডাক্তার এসব করেন বলে শুনেছি।

বীথিকা—তাহলে প্রকাশ ডাক্তারকেই কাল ডেকে নিয়ে এসো।

পরিমল—তার জন্য এখনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠছ কেন? আর দু'একটা দিন ভাল করে ভেবে দেখ, তার পরেও যদি বোঝ যে…।

বীথিকা—ভেবে দেখবার আর কি আছে? যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই ভালো।

আর একবার চমকে ওঠে পরিমল। হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে এবং মুখে হাসি টেনে নিয়ে বলে—গান গাইবার সময় তুমি হঠাৎ এ কোন্ প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলে? এখন ওসব কথা থাক। নাও, এসরাজটা নিয়ে বসো।

এসরাজটা তুলে নিয়ে এসে বীথিকার কোলের উপরেই তুলে দেয় পরিমল। অন্যমনস্কের মতো এক হাতে এসরাজটাকে ধরে কোলের উপর থেকে তুলে নিয়ে পাশে রেখে দেয় বীথিকা। অপ্রস্তুত হয়ে আর ভীতভাবেই তাকিয়ে থাকে পরিমল। বীথিকার মুখ-চোখ আর চিবুকের গড়নটাই যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়েছে। ঐ নিবিড় দুটি ভুরুর মধ্যে কেমন একটা কঠিনতা আগেও দেখেছে পরিমল, কিন্তু এখন দেখে মনে হয়, যেন ইস্পাতের দুটি ছোট ছোট বাঁকা ফলকের মতো কঠিন দুটি ভুরু। যেন জগৎ-ছাড়া এক সংকল্পের মেয়ে। আজ এক বছরের মধ্যে বীথিকাকে কোনদিন দেখে এরকম মনে হয়নি, দেখতে এরকমও লাগেনি।

পরিমল অনুনয়ের স্বরে বলে—চুপ করে রইলে কেন বীথি? কথা বল। তুমি জান, তুমি গম্ভীর হলে আমার কত খারাপ লাগতে পারে।

বীথিকা—তুমি কি চাও যে আমি ছয়-সাত মাসের ছুটি নিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে চটাই আর একটা প্রমোশন নষ্ট করি?

পরিমল—এ কি কখনো আমি চাইতে পারি?

বীথিকা—তুমি কি চাও যে, আমি এই বয়সেই শরীরের রক্ত খুইয়ে কতগুলো হাড় আর কাঠ হয়ে যাই?

পরিমল এগিয়ে এসে বীথিকার একটা হাত ধরে—বড় ভুল প্রশ্ন করছ বীথি। তোমার মুখ শুকনো হয়ে গেছে, এ দৃশ্য আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখলেও বোধহয় সহ্য করতে পারব না।

বীথিকা—তুমি কি চাও যে, এরই মধ্যে আমাদের জীবনের সব ফুর্তি বন্ধ হয়ে যাক?

পরিমল—কখনো বন্ধ হতে দেব না। তুমি অনর্থক একটা আতঙ্ক কল্পনা করছ বীথি।

বীথিকা—তোমাকে ভালবেসেছি, একমাত্র তোমাকে নিয়েই চিরকাল বেঁচে থাকবার জন্য।

পরিমল—তোমার ভালবাসার তুলনা হয় না বীথি। তুমি আমাকে এত আপন ও এত নিশ্চিন্ত করেছ বলেই তো আমি নিজেকে নিয়ে গর্ব করি।

পৃথিবীতে ক'জনের এমন স্ত্রী আছে দেখাক তো কেউ ? তুমি তো আমার গর্ব।

বীথিকা—তুমিও তো আমার গর্ব। তবে আমার নিজস্ব গর্ব এই যে, তোমাকে সুখে রাখবার জন্য টাকা-পয়সার সব চিন্তা, সব ভার আর সব দায় আমি মেয়েমানুষ হয়েও সব সহ্য করছি, আর চালিয়েও যাচ্ছি।

পরিমলের উজ্জ্বল চক্ষু হঠাৎ একটু নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে, যেন হঠাৎ একটা ধোঁয়া এসে লেগেছে। কুণ্ঠিত ভাবে বলে—সেকথা এত স্পষ্ট করে কেন আর বলছ ? বলতেই বা হবে কেন ? একশোবার স্বীকার করি, তোমার তুলনা নেই।

বীথিকা—যাক, কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। মোট কথা হলো, এমন সুখের জীবনে যেন কোন ঝঞ্ঝাট না আসে। শুধু তুমি আর আমি, এর মধ্যে কোন ঝঞ্ঝাট আমি আসতে দেব না।

পরিমল—ঝঞ্ঝাট কেন আসবে। ঝঞ্ঝাটের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর্তনাদের মতই শোনায় পরিমলের কণ্ঠস্বর। আবার উঠে গিয়ে একটু তফাতে বসে, তারপরেই পায়চারী করে, জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়, গুলমোরের মাথার দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকে।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকায় পরিমল। খাবার সময় হয়েছে। জানালার কাছ থেকে সরে এসে এক হাতে কপাল টিপে ধরে আর মীরবের দিকে তাকায়। তারপরেই বীথিকার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে—শুনছ ?

—কি ?

—তুমি খেয়ে নাও। আমার আজ আর কিছু খাওয়া উচিত হবে না। কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করছি।

—কিসের অস্বস্তি ?

—মাথা ধরেছে, আর কেমন একটা বমি-বমি ভাব।

—তা হলে খেও না।

স্নানের ঘরে গিয়ে সাজ বদল করে আর ভিতরের বারান্দায় গিয়ে আলমারিতে রাখা হোটেলের খাবার খেয়ে, আবার রঙীন ঘরের ভিতরে ঢুকল বীথিকা।

জানালার কাছে একটা মোড়ার উপর স্থির হয়ে বসেছিল পরিমল, যেন নিঃশব্দে গুলমোরর কাছে একটু বাতাস প্রার্থনা করছে। কিন্তু গুলমোর বড় শান্ত।

দপ্ করে ঘরের আলোর রঙ বদলায়। সুইচ টিপেছে বীথিকা। ঘনঘোর মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোর মতো অন্ধকার-মাখানো একটা থমথমে কালো রঙের আলো।

একটা বালিশ জড়িয়ে খাটের উপর এলিয়ে পড়েই বীথিকা বলে—তাহলে কথা রইল, তুমি কালই একবার এণ্টালির ডাক্তার প্রকাশের খোঁজ নেবে।

—না, পারব না।

অত্যন্ত গম্ভীর ও উত্তপ্ত এক কণ্ঠের গর্জন। প্রত্যুত্তর দেয় পরিমল।

উঠে বসে বীথিকা।—কি বললে? আবার এত জোর গলা করে বললে? লজ্জা করে না ওভাবে ধমক দিয়ে কথা বলতে? তোমার ঐ ধমকের দাম কত?

উত্তর দেয় না পরিমল। শোনা যায়, পাশের ফ্লাটের দেয়াল ঘড়িটা শুধু টিক্ টিক্ করে এই রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদ্রূপ করছে।

বীথিকা বলে—তাহলে শুনে রাখ, আমিই প্রকাশ ডাক্তারের খোঁজ নেব।

কোন উত্তর দেয় না পরিমল। বীথিকাও আর কোন কথা বলে না। মোড়ার উপরেই চুপ করে বসে থাকে পরিমল, আর বীথিকা আবার বালিশ আঁকড়ে খাটের উপর পড়ে থাকে। বালিশটা অনেক রাতে ক্ষীণ কান্নার মতো শব্দ করে একবার। কিসের কান্না কে জানে।

সকাল বেলার খবরের কাগজ বলে, হলিউডে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে গিয়েছে। নীলকমলের তিনতলার ফ্লাটের এই রঙীন ঘরের ইতিহাসেও কি এক বছর পরে আজ হঠাৎ মাঝরাত্রি হতে না হতেই আগুন লেগে গেল? থমথমে কালো আলো, যেন বহু যত্নে সাজানো একটা সেট অঙ্গারমাখা হয়ে পড়ে রইল সারা রাত। সকাল হবার পর সেই কালো আলো নিভল।

রোদের ঝাঁজ বড় বেশি। পথের ধুলোর ঘুর্ণি ওড়ে মাঝে মাঝে। গুচ্ছ ভাঙ্গা গুলমোর মাটিতে ঝরে পড়ে ঝুরঝুর করে। জানালা বন্ধ।

বীথিকা গিয়েছে অফিসে। পরিমল আছে ঘরে। ঘরের আবছায়ার মধ্যে বন্দী একটা ছায়া যেন ছটফট করে।

জীবনে এই প্রথম যেন নিজেকে দেখতে পেয়েছে পরিমল। এক নারীর প্রতিমুহূর্তের ইঙ্গিতের ক্রীতদাস, একটা চেহারা মাত্র সে, একটা ভাড়াখাটা পৌরুষ। রোজগেরে গৌরবে গরবিনী এক নারীর করুণার পোষ্য। এমন মানুষের ধমকের দাম কত? সত্যিই তো, কোন দাম নেই।

কিন্তু কি ভয়ানক বীথিকার কথাগুলি। একটা খুনের কথাও এরকম হেসে হেসে বলতে পারে মানুষ? জীবনের কল্পনাগুলি সত্যিই বোধহয় কতগুলি ফুলের স্তবক, কখনো কখনো সন্দেহই হয় না যে, ফুলের আড়ালে একটা সাপও লুকিয়ে থাকতে পারে। পরিমলের ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ডে যেন হঠাৎ একটা সাপের ছোবল

পড়েছে। এটাও এর আগে বুঝতে পারেনি পরিমল, তার এই চেহারার ভিতরে একটা হৃৎপিণ্ড আছে, আর সে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে আবার একটা গর্ব ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ যেন একটা বিষের কামড় খেয়ে জ্বলে উঠেছে এই গর্ব। পরিমল সহ্য করতে পারছে না বীথিকার কথাগুলি।

গুণবতী ও শিক্ষিতা এক নারীর কাছে সে একটা সুন্দর ফটো মাত্র, স্বামী নয়। ফটোর ধমক গ্রাহ্য করবে কেন মানুষ? যে ফটো মানুষের স্বামী হতে পারে না, সে ফটো মানুষের বাপ হবে কেমন করে?

মাথার উপরে জোরে পাখা ঘোরে, কিন্তু কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে পরিমলের। আবর্জনা, বীথিকার কাছে সেই আগন্তুক প্রাণটা শুধু একটা আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। পরিমল নামে মাত্র একটা চেহারার মানুষকে স্বীকার করে বীথিকা, তার মনুষ্যত্বকে স্বীকার করে না। নইলে, যে-মানুষের দুই বাহুর বন্ধনে আত্মহারা হয়ে যাবার জন্য বীথিকার চোখ দুটো লুব্ধ হয়ে জ্বলজ্বল করে, সেই মানুষের সৃষ্টির আত্মাটা বীথিকার কাছে একটা আবর্জনা হয়ে যায় কি করে? কি ভয়ানক ঘৃণায় শিউরে উঠেছে বীথিকা! পরিমল যেন তার দেহের শোণিত দূষিত করে দিয়েছে।

চোখ-মুখ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, হাত-পা আলগা আলগা, পরিত্যক্ত মন্দিরের এক জীর্ণ পাথুরে মূর্তির মতো চেয়ারের উপর সুস্থির হয়ে বসে থাকে পরিমল। নিদারুণ এক অপমানের বাজ পড়ে তার জীবনের বহুদিনের লালিত সেই রূপের গর্বটা এতদিনে যেন চূর্ণ হয়েছে।

সিগারেটের পর সিগারেট পোড়ে। ছাই উড়ে পড়ে রঙীন ঘরের-মেঝেতে, আসবাবের পায়ে। রজনীগন্ধার বাসিডাঁটার মাথায় ফোটা কুঁড়ি নেতিয়ে পড়ে।

কিন্তু এ ঘরে আর একটা রাত্রিও থাকতে যে ভয় করে। আবার তো সেই একই অভিনয়ের পালা। সেই দু'টি বিহ্বল নারীচক্ষুর দৃষ্টির ইঙ্গিতকে আর মত্ত দু'টি ওষ্ঠের সঙ্কেতকে প্রতি মুহূর্তে সেবা করা। ভাবতে গিয়ে নিজের এই শরীরটার উপরেই ঘৃণা বোধ করে পরিমল। কিন্তু বীথি কি এই এক বছরের অভিনয়ের নিয়ম থেকে দূরে সরে থাকবার সুযোগ দেবে পরিমলকে? সেই পাউডার-ছিটানো একটা গলা আর স্নো-মাখানো একটা চিবুক পরিমলের মুখের উপর লুটিয়ে পড়ার জন্য কাছে এগিয়ে আসছে, কল্পনা করতে আজ শিউরে ওঠে পরিমলের অভিশপ্ত মন। দুঃসহ, কিন্তু মুখ সরিয়ে নিতে পারবে কি পরিমল? আর সরিয়ে নিলে বীথিই বা কি সেই অপমান সহ্য করবে?

ভাঙ্গা-ভাঙ্গা চোখ-মুখ আর আলগা আলগা হাত-পাগুলি যেন হঠাৎ জোড়া

লেগে শক্ত হয়ে ওঠে। এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পরিমল। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে হবে কি ? কি দরকার ? একটা ছায়া চলে যাবার সময় তো কথা বলে না, চিঠিও লিখে রেখে যায় না। এখনি এভাবেই এই রঙীন ঘরের কাছে কোন কথার কৈফিয়ৎও না রেখে, শুধু দারোয়ানের কাছে চাবি রেখে দিয়ে সরে যাওয়াই ভাল।

দরজা খুলে বের হয় পরিমল, দরজার বাইরের কড়ায় তালা লাগিয়ে চাবিটি হাতে নিয়ে দু'তিন ধাপ সিঁড়ি নেমেও আসে পরিমল। কিন্তু কি অদ্ভুত দুর্বলতা ! বুঝতে পারে, পা দুটো কি রকম ভারি হয়ে উঠেছে, চোখ দুটোও ভেজা-ভেজা লাগে। কিসের যেন একটা ইচ্ছা, যেন ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকেই একটা অন্ধ মমতার অনুরোধ তার হাত দুটো ধরে ঘরের ভিতর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। চলে গেলে আর কি হলো ? অন্ধকারে ঢাকা একটা অঙ্কুর,সূর্যের আলো দেখবার আশায় যার প্রাণ তৈরী হয়ে উঠেছে, তাকে বাঁচাবে কে ? এভাবে রাগ করে চলে গেলে সেই শিশু প্রাণটাও যে আবর্জনা হয়ে যাবে।

আবার তালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকেই পরিমল অসহায়ের মতো ছটফট করতে থাকে। কিন্তু থেকেই বা কি হবে ? উপায় কি ? এণ্টালির প্রকাশ ডাক্তারকে ঐ সিঁড়ির উপর থেকেই গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবার শক্তি কই তার ? সারাজীবন চাকরে তেল মাখিয়ে আর স্নান করিয়ে এই শরীরটাকে যে পক্ষাঘাত ধরিয়ে দিয়েছে ! আজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে পরিমল, এই দু'হাতে দু'মুঠো সোনার মোহর নিয়ে বীথির সামনে দাঁড়ালে, বীথির মতো মেয়েমানুষ তার ধমকের দাম বুঝত নিশ্চয়। শুধু ধমকের দাম কেন ? বীথি তার নিজের দেহের ভিতরে ঘুমন্ত সেই অঙ্কুরের দামটাও বুঝত। ধমক দেবারই দরকার হতো না।

কাজ ? কাজ কাকে বলে তাই জানে না পরিমল। চেষ্টা কাকে বলে তাও জানে না। কাজ দেবেই বা কে ? কাজ করার যোগ্যতাই বা কোথায় ?

উপায় ? চিন্তা করতে করতে পরিমলের চেহারাটা কি রকমের যেন হয়ে যায়। যেন একটা চোরের ছায়া, ধূর্ত অথচ অত্যন্ত কর্মঠ ও কঠোর। অকর্মণ্য হাত দুটোর পেশীগুলি যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন একটা সিঁদকাটা পরিকল্পনার দিকে পরিমলের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে তাকিয়ে আছে। একটা অকাজের পরিকল্পনা। বুদ্ধি নয়, ছোট একটা দুর্বুদ্ধি। সামান্য একটু অকাজের কৌশলে যদি মস্ত একটা সুকাজ হয়ে যায়, হোক না। বীথিকা বাঁচবে, বীথিকার ছেলে বাঁচবে, কাঁচা খুনের রঙ লাগবে না এই রঙীন ঘরে।

কিন্তু তারপর? তার পরের কথা আর চিন্তা করতে পারে না পরিমল। বুকের পাঁজরাগুলি হঠাৎ একবার দুর দুর করে কেঁপে ওঠে। আর বেশী দেরী করলে এন্টালির প্রকাশ ডাক্তারের পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় করে উপরে উঠে আসবে।

শুধু গেঞ্জি ও পায়জামা, একটা জামাও গায়ে দিতে ভুলে গেল পরিমল। আলনা থেকে একটা আদ্দির চাদর কাঁধে ফেলে, যেন একটা জ্বর-বিকারের জ্বালায় ঘর থেকে বের হয়ে, দরজার তালা বন্ধ করে, চৈত্রী দুপুরের তপ্ত পথের ধুলোর মধ্যে এসে দাঁড়ালো পরিমল।

এ ফ্ল্যাটে আর ও ফ্ল্যাটের জানালায় কতকগুলি বিস্মিত চক্ষু উঁকি ঝুঁকি দেয়। তিনতলার ফ্ল্যাটের কিন্নরকে এমন অসময়ে পথে বের হতে এই প্রথম দেখা গেল। বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি। আরও দুর্বোধ্য বিস্ময় হলো ঐ সাজ। গেঞ্জির উপর চাদর জড়িয়ে, অদ্ভুত চেহারা করে, যেন একটা ছেলেধরার মতো চোখ করে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে লোকটা কোথায় চলে গেল।

লেকের দিকে কোকিল ডাকে, চাঁদ ওঠে আকাশের পূবে, ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেন সিটি বাজিয়ে দূরে চলে যায়; বেড়িয়ে ফেরে বীথিকা রায় ও পরিমল রায়।

আজ রবিবার। এবং রবিবার ছাড়া আর কোনদিন দুজনের একসঙ্গে বেড়াবার উপায় নেই। কারণ রঙীন ঘরের জীবনটা ছন্দ বদল করেছে।

একটা কাজ পেয়েছে পরিমল। বিখ্যাত এক ইংরাজ কোম্পানির নতুন কারখানা হয়েছে বজবজের কাছে। এই কারখানার ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছে পরিমল। পরিমলেরই ছেলেবেলার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং কাজটা পেতে খুব বেশী অসুবিধা হয়নি পরিমলের। বন্ধুর সুপারিশে খুব সহজেই কাজ হয়ে গিয়েছে। এখন মাইনে হলো ছ'শো দশ টাকা। বছর খানেক পরে কোম্পানিরই খরচে মাস দুয়েকের জন্য বিলেতে গিয়ে একটা ট্রেনিং নিয়ে ফিরতে হবে, তারপর মাইনে হবে আটশো পঁচিশ।

বীথিকা অফিস যায় সকাল দশটায়, পরিমল বের হয় সকাল এগারটায়। ফিরে আসতে বেশ রাত হয় পরিমলের। কাছাকাছি তো নয় বজবজ, ট্রেনে যেতে হয়, ট্রেনে ফিরতে হয়। সন্ধ্যাবেলাগুলি তাই নিতান্ত উৎসবশূন্য, একেবারেই শূন্য মনে হয় বীথির, একমাত্র রবিবারের সন্ধ্যা ছাড়া।

পরিমলের সার্ভিসের মাত্র দশটি দিন পার হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র দুটি

রবিবারের সন্ধ্যাকে ওরা দু'জনে একসঙ্গে ধরতে পেরেছে। আজ হলো দ্বিতীয় রবিবার।

এই দশটি দিনের আগের দু'টি রাত্রির কথা কোন প্রসঙ্গে আর তুলতেই চায় না বীথি। সেই প্রথম রাত্রিটা, জানালার ধারে মোড়ার উপরে বসে পরিমল, আর খাটের উপর বালিশ আঁকড়ে বীথি যে রাতটা ভোর করে দিল। তারপরেই সেই দ্বিতীয় রাত্রিটা। দু'জনে ঘরের দুদিকে দু চেয়ারে বসেই রাত কাটিয়ে দিল।

অফিস থেকে ফিরে এসে বীথিকা দেখেছিল, গেঞ্জির উপর চাদর জড়িয়ে আর চেয়ারের উপর শক্ত একটা চেহারার মতো বসে গুলমোরের শোভা দেখছে পরিমল। দেখামাত্র সেই যে রাগ করেছিল বীথি, সেই রাগ সারারাত বীথিকে একেবারে বোবা করে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে রেখে দিল। পরিমলের দিকে একবার তাকিয়েই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল বীথি। মূর্তিমান একটা অকর্মণ্যতা যেন শুধু রূপের বড়াই নিয়ে বীথিকার ভালবাসার জগৎটাকে অশ্রদ্ধা করার জন্য বসে রয়েছে। কে ভেবেছিল, ঐ চওড়া বুকের ভিতর এত অকৃতজ্ঞতা লুকিয়ে থাকতে পারে? বীথিকার এই বয়সের সব আনন্দ অকালে ডুবিয়ে দেবার এই অভিসন্ধিই যদি ছিল লোকটার, তবে কেন……।

একটা অভিমান জ্বলে উঠেছিল বীথিকার বুকের ভিতর। তবে কেন ভালবাসার এত ভান করল লোকটা এই এক বছর ধরে? বিশ্বাস করে বীথিকা, এ মানুষ অন্তরে অন্তরে ভালবাসে তার একটা ছা-পোষা শখকে, বীথিকাকে নয়, বীথিকা ওর কাছে গৃহস্থালির একটা সামগ্রী মাত্র।

কিন্তু এতই যদি শখ ছিল, তবে……। তবে কি? ভাবতে পারে না বীথি, একেবারে পিছনের দেয়ালের দিকেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মোছে। সহ্য হয় না এই বোবা জ্বালা!

সকাল হয় বেশ একটু মেঘলা হয়েই। কতগুলি বৃষ্টির ফোঁটা গুলমোরের মাথা ভিজিয়ে দেয়। আর দরজার কড়া বেজে ওঠে।

চেয়ার থেকে উঠে দরজা খোলে পরিমল। কোন্ এক অফিসের পিয়ন সেলাম করে মস্ত বড় একটা লেফাফা পরিমলের হাতে তুলে দেয়। পিয়নবুক সই করে পরিমল। পিয়ন সেলাম করে চলে যায়।

লেফাফাটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে ব্যস্তভাবে স্নানের ঘরে চলে যায় পরিমল। যখন ফিরে আবার ঘরে ঢোকে তখন বীথিকা ছেঁড়া লেফাফা আর একটা চিঠি হাতে নিয়ে পরিমলের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠে—এ কি? এ আবার কি কাণ্ড করেছ?

পরিমল অতি মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বলে—ও কিছু নয়, রেখে দাও।

—কোথাও বের হবে নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

হেসে ফেলে পরিমল।—আগে প্রতিজ্ঞা কর, আর কোনদিন কথা বন্ধ করবে না, তবে বলব।

বীথিকাও হেসে ফেলে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পরিমলের কাছে দাঁড়ায়। পরিমলের হাতের উপর হাত রেখে বলে—সত্যিই প্রতিজ্ঞা করছি, কখনো কথা বন্ধ করব না। তবে তুমি অমন করে ধমক দিও না লক্ষ্মীটি।

পরিমল তার কাজের আর কাজের চেষ্টার কাহিনী বর্ণনা করে শুনিয়েছিল। শোনাতে বেশি সময় লাগেনি। এই রবিবারের দশ দিন আগের সেই মেঘলা সকালের এক পশলা বৃষ্টি আগের দু'টি কালরাত্রির সব অভিযোগের জ্বালা ধুয়ে দিয়েছিল।

নীলকমল ভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সেই দু'রাত্রির ঘটনাগুলিকে এখন একটা স্বপ্নে দেখা আতঙ্কের মতো নিতান্ত অসার বলেই মনে হয় বীথির। শুধু সন্দেহ হয়, মাথাটা দুটো দিন খারাপই হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। নইলে · ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় বীথি।

দপ্‌ করে আলো জ্বলে ওঠে তিনতলার ফ্ল্যাটের ঘরে। সাদা আলো। ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ মাত্র দাঁড়িয়ে থেকে তারপরেই দু'জনে আলোর বাইরে চলে যায়। ভিতরের বারান্দার অন্ধকারের মধ্যেই রেলিং-এ হেলান দিয়ে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করে। পাশের বাড়ির ছাদ আর সামনের বাড়ির বারান্দা রঙীন ঘরের কিন্নর ও কিন্নরীকে দেখতে না পেয়ে আবার বিস্মিত হয়।

বীথিকা বলে—তুমি আজকাল যেন কেমন হয়ে যাও মাঝে মাঝে। ডাকলেও শুনতে পাও না। এত কি ভাবো বলতো ?

চমকে ওঠে পরিমল। তার হাত দুর্বল সিঁদের-চোরের হাতের মতো রেলিং-এর উপর আস্তে আস্তে কেঁপে কেঁপে ঘষা খায়, রেলিংটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারে না। বুকের ভিতর সব নিশ্বাস যেন মরতে বসছে, শিরদাঁড়াটা থর-থর করে কেঁপে ওঠে।

বীথিকা আবার বলে—দেখ কাণ্ড, আবার সেই রকম চুপ করে কি যেন ভাবতে আরম্ভ করেছে।

সাড়া দেয় পরিমল, মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা নিশ্বাসের জোরে নিজেকে শক্ত

করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কি বলছ ?

—এত গম্ভীর হয়ে কি ভাবছিলে বলো।

হঠাৎ দু'হাতে বীথির মাথা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর টেনে নেয় পরিমল। বীথির কপালের উপর মুখ ছুঁইয়ে দিয়ে ব্যাকুলভাবে বলে—একটা কথা আমাকে দিতে হবে বীথি। এখনি শুনব। একেবারে স্পষ্ট করে শুনব।

—বল, কি শুনতে চাও ?

—এণ্টালির ডাক্তার-ফাক্তারকে কখনো কোনদিন ডাকা হবে না।

পরিমলের বুকের উপর মাথা গুঁজে দিয়ে নীরব হয়েই রইল বীথি, অনেকক্ষণ। পরিমলের কামিজের বুক আর আস্তিন ভিজিয়ে দিল বীথির দুই চোখ। ঢিপঢিপ করছে পরিমলের বুকের ভিতর একটা শব্দ। সে শব্দের অর্থ যেন এতদিনে বুঝতে পেরেছে বীথি। একটা অন্ধ স্নেহের উদ্বেগ যেন ঢিপঢিপ করছে এই বুকের ভিতর। এতদিন যেন তার এই পাথুরে দুল পরানো কান দুটোতে এ শব্দের অর্থ বুঝবার মতো শক্তিই ছিল না।

—বীথি ?

—বলো।

—বলো, ডাক্তারের দরকার নেই।

—না নেই। তুমি যখন ডাক্তার আনতে চাও না, তখন আমিও চাই না।

আর একটি রবিবার। বীথিকা আবার অভিযোগ করে বসে—তবুও তুমি কি যে ভাবো, বুঝতে পারি না।

মিথ্যা বলেনি বীথিকা। পরিমলের মনের ভিতর একটা প্রচণ্ড অভিপ্রায়ের পরিকল্পনা যেন লুকিয়ে রয়েছে, একটা প্রাণের অঙ্কুরকে সর্ব আপদ থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা। কথা দিয়েছে বীথি, কিন্তু সে কথায় নিশ্চিন্ত হতে পারেনি পরিমল। নিজের ইচ্ছাকে নয়, পরিমলেরই একটা ইচ্ছাকে সম্মান দেবার জন্য দশ মাসের যাতনা স্বীকার করবে বীথি। এই তো তার প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

চুপ করে মাঝে মাঝে অন্যমনস্কের মত পরিমল যা ভাবে, পরিমলই জানে যে, সে ভাবনা চুপ করে সহ্য করা কত কঠিন। মাটির মূর্তি তো নয়, জীবন্ত এক নারীর মূর্তিকে কি চক্ষুদান করা যায়, আর সে চোখে কি আবার স্বপ্ন দান করতে পারা যায় ? তাই দুশ্চিন্তা না করে পারে না পরিমল, নিজেকে প্রশ্ন করে চেতনার চোখ কবে পাবে বীথিকা ?

পরিমল হেসে হেসে বলে—আজকাল তোমার চোখমুখের চেহারা কি রকম

হয়ে গিয়েছে, খোঁজ রাখ কিছু ?

আতঙ্কিত হয় বীথি—তার মানে ?

পরিমল—জীবনে কোনদিন বোধহয় তুমি আজকের মতো এত সুন্দর ছিলে না।

বীথি হেসে ফেলে—আমার মুখের গুণে নয়, তোমার চোখের গুণে এই মুখকে আজ বেশি সুন্দর দেখছ।

পরিমল—আমার চোখের গুণে নয়, তোমার কোলে যে আসছে, তার গুণেই তুমি এত সুন্দর হয়ে উঠেছ।

মাথা হেঁট করে বীথি, জীবনে বোধহয় এই প্রথম একটা কথার কাছে মাথা হেঁট করল। প্রস্তুত ছিল না এমন কথা শোনবার জন্য। ভাবতেও পারেনি বীথি, শোনা মাত্র মাথাটা এভাবে ঝুঁকে পড়বে।

বোঝা যায় না, ঘরের মেঝের দিকে না তার নিজেরই কোলের দিকে তাকিয়ে আছে বীথি। যেন নিশ্চল ও নিস্পন্দ এক অভিবাদনের ভঙ্গী আঁকা রয়েছে এ ঘরের বাতাসে। যেন ছোট হাত-পায়ের খেলায় ভরা একটা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে বীথিকার বুকের সব নিশ্বাস আর চোখের সব বিস্ময়।

পরিমল ডাকে—বীথি !

বীথি মুখ তুলে তাকায়। উঠে গিয়ে পরিমলের হাত চেপে ধরে—তুমি আজ আমাকে একটা কথা দাও।

—বল, কি কথা চাও।

—তুমি আর কখনো ওরকম চুপ করে কিচ্ছু ভাববে না।

এক মহান সাফল্যের হাসি হো হো করে হেসে পরিমল বলে—আর ওরকম করে নিশ্চয় ভাবব না। এবার আমি নিশ্চিন্ত।

সফল হয়েছে পরিমলের প্রচণ্ড অভিপ্রায়ের পরিকল্পনা। বীথিকার চোখ স্বপ্ন-দান করা হয়ে গিয়েছে। ভাবনার ভার নেমে গিয়েছে পরিমলের।

এই রবিবারের সন্ধ্যাটা রঙীন ঘরের জীবনে যেন একেবারে নতুন একটা জ্যোৎস্না ঢেকে দিয়ে চলে গেল। তারপর থেকে প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন পরিণাম দেখা দিয়ে অপার্থিব এই রঙীন ঘরটাকে পার্থিব করে তুলতে হবে।

হোটেলের খাবার আনা বন্ধ হলো একদিন। বীথি বলে—তুমি যখন সন্ধ্যা-বেলাটা থাকই না, আর বেড়াতে যাওয়াও হয় না, তখন রেঁধে রেঁধেই সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দেব। আর সকালবেলা ? সেটাও এমন কি সমস্যা। আর একটা স্টোভ থাকলেই খুব তাড়াতাড়ি সকালের রান্নাও সেরে ফেলতে পারব।

আর একদিন, একটু বেশি রাত করে পরিমল ঘরে ফিরতেই বীথিকা বলে—তোমাকে বলি-বলি করেও একটা কথা এখনো বলতে পারিনি। ভয় হয়, বললে আবার কি ভেবে বসবে।

—কি কথা ?

—তোমার চেহারা এই ক'টা দিনের মধ্যে বড় বেশি খারাপ হয়ে গিয়েছে। এতটা শুকিয়ে গেলে কেন ?

একটু উদ্বিগ্নভাবেই আরও প্রশ্ন করতে থাকে বীথি—খাটুনি কি খুব বেশি ? অফিসের টিফিন কি রকমের ? খেতে পার তো ?

পরিমল হাসে—টিফিনটা মন্দ নয়।

ভিতর বারান্দায় টেবিলের উপর খাবারের প্লেট আর বাটি সাজাতে সাজাতে বীথিকা বলে—আর একটা কথা। আমি একটা লম্বা ছুটির জন্য দরখাস্ত করেই দেব ভেবেছি। তুমি কি বল ?

—এখনই ছুটি না নিলেও চলতে পারে। আর কিছুদিন পরে দরখাস্ত করো।

খাওয়ার পাট শেষ হবার পর বীথি আবার প্রশ্ন করে—হ্যাঁ, আর একটা কথা। বলে হঠাৎ চুপ করে যায় বীথি। তখনি বলতে পারে না, কথাটা কি। মুখ ঘুরিয়ে যেন লাজুক হাসি লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে বীথি।

পরিমল বলে—বল, কি বলছিলে ?

বীথি—এই ফ্লাটে আর বেশিদিন থাকা উচিত হবে কি ? এই একটুখানি একটা ঘর, আর এই ফালির মতো বারান্দা, এর মধ্যে কি করে যে জায়গা হবে, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

পরিমল—এ ঘরে থাকা আর চলবে না বলেই বুঝতে পারছি। অন্য জায়গা খুঁজতে হবে।

বীথিকার চিন্তাগুলিই যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। ফস্ করে বলে ফেলে বীথি—ছোট একটা দোলনা ঝুলবে, এমন একটু জায়গাও এখানে নেই।

পরিমল মুখ টিপে হাসে—কি বললে ?

বীথি অপ্রস্তুত হয়েও বলে—বলেছি, বেশ করেছি।

এঁটো প্লেট ও বাটিগুলিকে একটা থালার উপর তুলে নিয়ে জলের ট্যাপের নীচে রাখে বীথি। হাত ধুতে ধুতে বলে—এ ছাই চাকরিই ছেড়ে দেব। আর ভাল লাগে না। তোমার যখন একটা ভাল কাজ হয়েই গিয়েছে, তখন আর কেন···।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকায় পরিমল। যেন সিঁদেল

চোরের একটা ছায়ার বড় বড় দুটো চোখ পালিয়ে যাবার পথ ঠাহর করে রাখছে।

বৈশাখী সন্ধ্যা ঘনায় লেকের জলের আশেপাশে, বড় বড় নারকেলের মাথায়, আর আকাশে। পোড়া বাতাস একটু একটু ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ছাড়ে। সারা দুপুর আর বিকালের মূর্ছা থেকে মানুষের কলরবগুলি এতক্ষণে আবার জেগে উঠেছে। আর এক রবিবার।

বেড়িয়ে ফেরে বীথিকা রায় ও পরিমল রায়। এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালাগুলি, সামনের বাড়ির বারান্দা আর পাশের বাড়ির ছাদ দেখে অবাক হয়ে যায়, কিন্নর ও কিন্নরী আর হাত জড়াজড়ি করে বেড়ায় না, ফটকের আলোর কাছে দাঁড়িয়ে সেই লজ্জার মাথা-খাওয়া লীলাকলাও আর দেখা যায় না। দেখা যায়, কিন্নরীর হাতেই একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। দপ দপ করে ঘরের রঙীন আলোও আজকাল আর খেয়ালের আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদল করে না। কি আশ্চর্য, আজকাল ফ্ল্যাটের ভিতর বারান্দা থেকে ধোঁয়া উড়তেও দেখা যায়। রান্না-বান্না করে না কি কিন্নর আর কিন্নরী?

নীলকমলের সিঁড়ি ধরে এই বৈশাখী সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারের মতোই শান্ত দুটি মূর্তি গল্প করতে করতে উপরে ওঠে। দুই চোখ ভরা এক অদ্ভুত হাসির ঝলক তুলে বীথি পরিমলের দিকে তাকায়।—তোমার প্রথম মাসের মাইনেটা প্রথম কিসে খরচ করবে বল?

হঠাৎ পা দুটো যেন টলে ওঠে পরিমলের। দেয়াল ধরবার চেষ্টা করে। নিঃশ্বাস বিচলিত হয়। আস্তে আস্তে হেসে পরিমল উত্তর দেয়—তুমি যাতে যেভাবে খরচ করতে চাও, তাই করব।

ঘরের ভিতরে ঢুকে কাশ্মীরী সুরাহির ভিতরে রজনীগন্ধার গুচ্ছ সাজিয়ে রাখতে রাখতে বীথি বলে—একটা কথা।

পরিমল—বল।

বীথি—চাকরিটা ছেড়েই দেব ঠিক করেছি।

কথা বলে না পরিমল। আয়নার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে যেন তার চোখেরই একটা ভীরুতাকে জোর করে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে।

বীথি বলে—মন লাগিয়ে অফিসের কাজ আর করতে পারছি না, কাজে ভুলও হচ্ছে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ধমক ধামকও দিচ্ছেন।

কোন মন্তব্য করে না, উত্তর দেয় না পরিমল।

বীথি বলে—শরীরটাও কেমন হাঁসফাঁস করে। এখন থেকেই সাবধান না

হলে ভুল হবে।···না, আর অফিস যাওয়াই সম্ভব হবে না।

একটা বইয়ের ভিতর থেকে টাইপ-করা একটা চিঠি বের করে বীথি। পরিমলের কাছে এসে হাসতে হাসতে বলে—যে কথাটা তোমাকে এখনো বলিনি। আর অফিসে যাব না, চাকরির ইতি করে দিলাম, কালকেই বাই-পোষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দেব এই চিঠি।

আতঙ্কিতের মতো দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত করে হঠাৎ চিঠিসুদ্ধ বীথির হাত চেপে ধরে পরিমল।

বীথি বিস্মিত হয়—তুমি আপত্তি করছ?

পরিমল—হ্যাঁ।

যেন একটু অভিমান মেশানো ক্ষোভের সুরে বীথি বলে—কেন? তুমি থাকতে আমার আবার চাকরি করবার দরকার কি?

—আমি নেই, আমি নেই, আমার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু তুমি ভুল করো না বীথি।

বলতে বলতে একেবারে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় পরিমল। পাগলের মতো দুটো চোখ নিয়ে সিঁড়ির দিকে একবার তাকায়। যেন এই মুহূর্তে দরজার এই চৌকাঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার জন্য তৈরী হয়েছে একটা বিকারের রোগী।

সন্ত্রস্তের মতো তাকিয়ে বীথি বলে—এ কি? কি বলছ তুমি? কিসের ভুল?

পরিমল—আমি ভুল, আমার চাকরি ভুল। ঐ বজবজের কারখানা, ঐ চাকরির চিঠি, ঐ পিয়ন আর পিয়নবুক, ঐ ছ'শো-দশ টাকা মাইনে, সবই ভুল।

চীৎকার করে ওঠে বীথি—তবে ওগুলো কি?

পরিমল—আমার জোচ্চুরি।

বীথি—এ শয়তানি কেন করলে?

পরিমল—শয়তানের ছেলেকে প্রকাশ-ডাক্তারের বিষ থেকে বাঁচাবার জন্য। বুঝতে পেরেছিলাম, ছ'শো-দশ টাকার অনুরোধ তুমি না মেনে পারবে না।

বীথিরই দু'চোখে বিষের ধোঁয়া জ্বলতে থাকে।—তুমি মুখ্‌খু, কালই তোমারই চোখের সামনে প্রকাশ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসব, তারপর···।

যাত্রা-নাটকের দানবের ভঙ্গীতে হো হো করে হেসে ওঠে পরিমল—পারবে না বীথি, কখ্‌খনো পারবে না। সে সাধ্যি এখন আর তোমার নেই!

খাটের উপর লুটিয়ে পড়ে বীথি। বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে ছটফট করতে থাকে। মিথ্যে বলেনি শয়তান। তার সারা দেহের শোণিত যে আর কয়েকমাস

পরের মধুর এক আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। তার সারাক্ষণের ভাবনাগুলি যে এরই মধ্যে পীযূষময় হয়ে উঠেছে, অনাগত এক তৃষ্ণার্তকে কোলের উপর তুলে নেবার আশায়।

গুলমোরের মাথা দুলিয়ে দিয়ে বৈশাখী সন্ধ্যার একটা ঝড়ো বাতাস ঘরের ভিতর ঢোকে। হঠাৎ-ই শান্ত হয়ে যায় বীথি। কি কথা ভাবতে গিয়ে মনের রাগগুলি হঠাৎ যেন কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, অতি সুন্দর চেহারা আর অমন অকর্মণ্য জীবনের অভিশাপ নিয়ে যে লোকটা, তাকে ঘৃণা করতে গিয়ে কেমন একটা মমতাও এসে পড়ে। জোচ্চুরি করেছে লোকটা, কিন্তু কি করুণ জোচ্চুরি! বীথিকে অ-মাতা হবার কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার জন্যই জোচ্চুরি করেছে ঐ লোকটার বুকের ভিতর লুকানো একটা স্নেহান্ধ শখ।

কিন্তু কত ধূর্ত একটা জোচ্চুরি! বীথিকার চোখের দৃষ্টি আবার হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে দুঃসহ একটা লজ্জার ভিতর ছটফট করতে থাকে। জোচ্চুরিটা কত সহজে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে বীথিকে। মানুষের স্ত্রী নয় বীথি, ছ'শো দশ টাকার স্ত্রী, হৃদয়ের অনুরোধে নয়, টাকার অনুরোধে আর টাকার ধমকে শান্ত হয় যারা।

কিন্তু ঐ লোকটা যে টাকাও নয়, একেবারে ভুয়ো, ধূর্ত একটা টাকার গল্প মাত্র। লোকটাকে কি আর এ জীবনে শ্রদ্ধা করতে পারা যাবে? আবার একটা যন্ত্রণা করে ওঠে মাথার ভিতরে। দুর্ভাগ্যটা যেন ক্ষতের মতো মনের ভিতরে জ্বলতে থাকে। স্বামী থেকেও তার স্বামী নেই। আর লোকটারও কি দুর্ভাগ্য! স্ত্রী থেকেও স্ত্রী নেই। ঐ অকেজো জীবনের একটা মূর্তি, কোনদিন নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যটাকে চিনতে শিখবে না, সম্মান চাইবে না, পাবেও না, শুধু পুরুষের একটা ফটোর মতো এই দরজার চৌকাঠে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে, তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না, সহ্য করাও যাবে না, এ অভিশাপ কতকাল সহ্য করবে বীথিকা?

বালিশটাকে একটা ঠেলা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে, খাটের উপর উঠে বসে বীথিকা। পরিমলের দিকে তাকাতেই আবার চোখ জ্বলে ওঠে।—তোমার লজ্জা করছে না?

—করছে বৈকি।

—তবে আর ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে থাকছো কেন, যাবে?

—যাবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

—কি বললে?

—শুধু একটি কথা বলে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

—কি কথা?

—ছেলেকে বেনামী করে দিও না।

কটমট করে তাকায় বীথি—তার মানে?

পরিমল—তার আগেই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার খোঁজ করো, আমিই এসে ছেলেকে নিয়ে যাব।

চমকে ওঠে বীথি। পরিমলের কথাগুলি শুধু নয়, গলার স্বরটাও অদ্ভুত। শান্ত অথচ কঠিন এক কণ্ঠের ভাষা। মনে হয় ঐ সুন্দর চেহারাটা নিজের গর্বে শেষবারের মতো কতগুলি সুন্দর কথার ছলনা রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায়? ঐ রূপের চেহারা কি নতুন করে কোন ঠাঁই পেয়ে গেল? সন্দেহ হয় বীথির। কি দুঃসহ এই সন্দেহ!

খাটের উপর থেকে নেমে, আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পরিমলের চোখের সামনেই শক্ত হয়ে দাঁড়ায় বীথিকা।—চাকরিটা তো ভুয়ো; তবে রোজ রোজ কোথায় যাও, আর কেনই বা যাও?

উত্তর দেয় না পরিমল, বাইরের সিঁড়ির দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বীথিকার মুখের দিকে যেন আর তাকাতে চায় না পরিমল

বীথিকা বলে জায়গাটার নামটা বলতে দোষ কি?

উত্তর দেয় না পরিমল। নিঃশব্দে যেন এই এক বছরের রঙীন বন্ধন তুচ্ছ করে চলে যাবার জন্য একটা মুক্তিপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরিমলের বুকের ভিতরের একটা প্রতিজ্ঞা।

বীথিকা বলে—সে জায়গাটা বুঝি আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর?

মুখ ফিরিয়ে বীথিকার দিকে তাকায় পরিমল।—সে জায়গাটা হলো একটা দোকান।

—দোকান? দোকানে গিয়ে জায়গা নিয়েছ? কেন?

—নিতে হলো, নিতে হয়।

—কতদিন থেকে?

—এইতো তিনদিন হলো। বিশটা দিন ঘুরে ঘুরে তবে পাওয়া গেছে।

দপ্ করে বীথিকার সন্দেহটারই রঙ বদলে যায়। বিস্ময়ের স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে বীথিকা—কিন্তু দোকানে বসে কি কর তুমি?

উত্তর দেয় না পরিমল।

পরিমলের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে বীথি। এত ভাল

করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিমলের মুখের চেহারা জীবনে বোধহয় কোনদিন লক্ষ্য করেনি বীথি। অনেক ময়লা হয়ে গিয়েছে পরিমলের মুখের রঙ। কপালের উপর যেন রোদে-পোড়া একটা বিবর্ণতার ছাপ। হাড় দেখা দিয়েছে গলার দু'পাশে। হাত দুটোর মধ্যেও যেন পাথরঘাঁটা একটা কর্কশতা ফুটে উঠেছে।

দরজার পথ আটক করে দাঁড়ায় বীথিকা। পরিমলের একটা হাত দু'হাতে শক্ত করে ধরে। দুঃসহ কৌতূহলে অস্থির দু'চোখের তারা স্থির করে পরিমলের উদাস মুখের কাছে প্রশ্ন করে।—বলো, দোকানে বসে কি কর তুমি?

পরিমল—কাজ করি। আশি টাকা মাইনে।

আস্তে আস্তে নত হয়ে আসে বীথিকার মাথা। কিসের ভারে অথবা কিসের ঝোঁকে, বুঝতে পারে না বীথিকা। পরিমলের একটা হাতের উপর কপাল নামিয়ে দিয়ে অলস ও অবসন্নের মতো পড়ে থাকে বীথিকার মাথা। উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের সব আক্ষেপ ও অভিযোগ মিটে গিয়ে শুধু একটা তৃপ্তি যেন পড়ে আছে।

পাশের ফ্ল্যাটে দেয়াল ঘড়ি টিক্ টিক্ করে। মাথা তোলে না বীথি, তুলতে ইচ্ছাও করে না। বীথি নিজেই বুঝতে পারে না, এ কোন চেহারার গায়ে জীবনে এই প্রথম এরকম প্রণামের ভঙ্গীতে সে আজ মাথা ঠেকিয়ে রয়েছে।

—বীথি। বিচলিতভাবে ডাক দেয় পরিমল।

মুখ তুলেই বীথি জিজ্ঞাসা করে।—দোকানে বুঝি থাকবার জায়গা আছে?

—দোকানের কাছেই আছে।

—কেমন জায়গা?

—একতলার একটা ছোট ঘর।

একটা সুন্দর প্রতিধ্বনি যেন আছড়ে এসে পড়ে বীথিকার অন্তরাত্মার উপর। একটা ছোট ঘর! স্বামীর সঙ্গে থাকবার মতো ঘর! এতদিন ধরে ঘর চিনতে দেয়নি, ঘর করবার রীতি শিখতে দেয়নি বন্ধ্যা নাগিনীর মতো যে বিষাক্ত একটা সাধের ভুল, সে ভুলটা যেন নিজের লজ্জায় জ্বলে-পুড়ে মরে যায় এই ছোট একটি প্রতিধ্বনির স্পর্শে।

সব নিঃশ্বাসের চাঞ্চল্য সংযত করে মুখের উপর সূক্ষ্ম একটু তুষ্ট হাসির ছায়া ছড়িয়ে বীথি প্রশ্ন করে—তাহলে সেই ঘরেই যাচ্ছ?

—হ্যাঁ!

—আমাকে নিয়ে যাবে না?

—তুমি তো যেতে পারবে না।

—পারবো, যদি একটা কথা দাও।

—বলো।

গুলমোরের মাথা থেকে একটা ঝড়ো বাতাস ঘরের ভিতর আছড়ে এসে পড়ে। থর থর করে কেঁপে ওঠে বীথিকার তিরিশ-বছর বয়সের ভঙ্গি-মনোহর সুকঠিন ভ্রূলতা। হীরা-গলানো বেদনার মতো দুটো বড় বড় স্বচ্ছ ও তপ্ত জলের ফোঁটা টলমল করে ওঠে দু'চোখের কোণে। বীথি বলে—বলো, চিরকাল আমাকে ঘেন্না করবে, আর ছেলেকে ভালবাসবে?

দপ্ করে আলো····· কি আশ্চয, আলো নিভে যায়। ধাঃ, লোকটা ঝট্ করে সুইচ টিপে দিয়েছে। পাশের বাড়ির ছাদে আব সামনের বাড়ির দোতালায় এতগুলি দর্শক-চক্ষু হঠাৎ হতাশ হয়ে যায়। এত কাছাকাছি দু'টো ব্যাকুলতা চরম মীমাংসা খুঁজতে গিয়ে এই রঙীন ঘরটাকেই যেন হঠাৎ মিথ্যা করে দিল আর অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল।

সকালের আলো দেখা দিতে আরও মিথ্যা হয়ে গেল নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের রঙীন ঘর। এরই মধ্যে কে জানে কখন এসে ঘর, ঘরের ফার্নিচার আর ঘরের চাবির জিম্মা নিয়েছে দারোয়ান। ভদ্রলোক আর মহিলা নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন ফটকের কাছে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি, কেরিয়ারে জিনিসপত্র বাঁধা।

এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্লাটের জানালায়, পাশের বাড়ির ছাদে আর সামনের দোতালার বারান্দায় অনেকগুলি নারীচক্ষুর সমাবেশ কৌতূহলে ছটফট করে। কি আশ্চর্য, মহিলার সিঁথিতে যে সিঁদুর দেখা যায়! তার উপর আবার মাথায় কাপড়! এতদিন পরে? কি মনে করে?

ট্যাক্সি স্টার্ট নেবার সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ির ছাদ বলে ওঠে—স্বামী-স্ত্রী, নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী!

তিনতলার ফ্লাটের জানালা দুটো বন্ধ। গুলমোরের মাথায় বাসি রজনীগন্ধার একটা গুচ্ছ আটকে পড়ে রয়েছে। তার উপর পড়েছে পূব আকাশের একটুখানি আলো। দেখলে সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না, যেন কোথাকার এক বর-বধূ এসে ঐ রঙীন ঘরে মাত্র একটা বাসররাত কাটিয়ে দিয়ে, সকাল হতে না হতেই নতুন ঘরে চলে গেল।

মায়া মানিক

মানিক আর মানিক স্টোর্সের বয়স সমান। একই দিনে মানিক আর মানিক স্টোর্সের জন্ম। কিন্তু বয়সটা কত?

মাত্র তিন বছর। বিগত তিনটি বছরের বাতাসে একটু একটু করে বড় হয়ে মানিক আজ চার বছরে পা দিল। আজ মানিকের জন্মদিন।

কিন্তু মানিক স্টোর্সেরও কি জন্মদিন? বিগত তিনটি বছরের বাতাসে একটু একটু করে কেমনতর হয়ে শেষ পর্যন্ত কি হয়ে গেল মানিক স্টোর্স, সে কথা আপাততঃ থাক।

আজ আবার সেই এগারই চৈত্রটি দেখা দিয়েছে, আজ থেকে তিন বছর আগে যেদিনে মানিক আর মানিক স্টোর্স দেখা দিল পৃথিবীতে।

তিন বছর আগের সেই অদ্ভুত একটা দিনের ইতিহাসই সবার আগে বলে নিতে হয়। এই পাড়ার এবং এই ঘরেরই জানালার কাছে বসে তিন বছর আগের সেই এগারই চৈত্রকে দু চোখের বিস্ময় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিল নরেন, এবং বুঝতেও পেরেছিল।

আকাশের রঙটা যেন কেমন-কেমন মনে হয়, মল্লিকবাবুদের বাগানে মস্ত বড় অশথের মাথায় বুকে ও কোলে লক্ষ লক্ষ নতুন পাতা ঝিরঝির করে। দেখা যায়, ঘুঁটেওয়ালির ঘরের চালা ছাপিয়ে মালতীর লতা নরেনের বাড়ির উঠানের উপর এসে নেমে পড়েছে। বাতাসের গা থেকে দুপুরের জ্বালা পালিয়ে যায়, হঠাৎ কেমন মিষ্টি মিষ্টি আর ফুরফুরে হয়ে ওঠে। বড় অদ্ভুত এই দিনটা। আর অদ্ভুত, অশথের এই লক্ষ লক্ষ কচি পাতার ভিড়। যেন লক্ষ লক্ষ শিশুপ্রাণের কতগুলি পিপাসী ওষ্ঠ। যেমন কোমল, আর রঙটাও তেমনি, নতুন শোণিতের আভার মতো।

হঠাৎ শাঁখের শব্দ বেজে ওঠে পাশের ছোট ঘরটার ভিতর। সে শব্দে রঙীন হয়ে ওঠে নরেনের মুখ। ঐ শাঁখের শব্দে এগারই চৈত্রের সমস্ত আলো ছায়া আর শব্দগুলি যেন একটা ফুল হয়ে ফুটে উঠল।

ছোট বাড়ি, ছোট দুটি ঘর, এবং ছোট একটা উঠান। পাড়াটাও ছোট, এবং প্রতিবেশীরাও ছোট ছোট মানুষ। কিন্তু এই ছোটতার মধ্যেই মুহূর্তের ভিতরে মস্ত বড় একটা জগতের গর্ব এনে দিল ঐ শাঁখের শব্দ।

ছোট ঘরের ভিতর প্রতিবেশিনী মেয়েদের ভিড়। উঠান ভরা কলরব আর

চাঞ্চল্য। সব শব্দের স্নায়ুজাল জড়িয়ে একটা নবাগত প্রাণের কান্না থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

ধাই এসে ডাক দেয়—কই গো ছেলের বাপ? ছেলের কপালে সোনা ছুঁইয়ে মুখ দেখে যাও।

বাক্স হাতড়ে সোনা খোঁজে নরেন। সত্যিই তো, এই আনন্দকে সোনা ছুঁইয়ে অভ্যর্থনা করাই তো উচিত।

আরও বেশি আহ্লাদের সুর ছড়িয়ে ধাই ছড়া কাটে—মানিক এল ঘরে। এ মানিক যেমন তেমন নয়, মানিকের ছোঁয়া লেগে ধুলো সোনা হয়!

ধাইয়ের ছড়া বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করতে পারে নরেন। মনে হয়, একটুও বাড়িয়ে বলেনি ধাই। ছেলের কপালে সোনা ছুঁইয়ে ঘরের বাইরে এসে একবার দাঁড়ায় নরেন, যদিও আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সময় ছিল না। কারণ, আজ তার জীবনের আর একটা সোনা-ছোঁয়ানো আকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠার দিন।

এই ছোট পাড়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে, বাজারের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাবার পর, পথের পাশে সারি সারি অনেকগুলি টিনের একচালা ঘর দেখা যায়। এর মধ্যে একটি একচালা ঘর ভাড়া নিয়েছে নরেন। নরেনের দোকান। রকমারি পুতুল, লেস, ফিতা, আলতা, এসেন্স, বিস্কুট, লজেন্স ও চকোলেটের সম্ভার বাঁধা-বাজারের মহাজনের আড়ত থেকে চলে এসেছে। মহাজনের লোক এবং মুটে অনেকক্ষণ থেকে দোকানী নরেনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট একটি মাটির গণেশ, কিছু ফুল এবং একটি ধূপদান হাতে নিয়ে একচালা ঘরের কাছে এসে থামল নরেন। জিনিস-পত্র বুঝে নিয়ে মহাজনের লোককে বিদায় দিল। ধূপ জ্বালিয়ে সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ের কাছে সোনার একটা কুচি এবং ফুল রেখে প্রণাম করে নরেন। খেরো বাঁধানো একটা খাতার উপর চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বার বার তিনবার প্রণাম করে।

টিনের চালা এবং কাঁচা ইটের দেয়াল, ছোট্ট এই দোকান ঘরকে ভরে তুলতে খুব বেশি জিনিসের দরকার হয় না। সব জিনিস সাজিয়ে ফেলতে খুব বেশি সময়ও লাগে না।

দোকান সাজান হলো। হ্যাঁ, আর একটি কাজ বাকি আছে। দোকানের একটা নামকরণ।

খুব পয়া নাম দিতে হবে, যে নামের দৈবী প্রভাবে নরেনের জীবনের সব দীনতা ঘুচে যাবে। ভাগ্যের দুয়ার খুলে যাবে যে নামের অমোঘ গুণে, সেইরকম একটি সোনামাখানো নাম চাই। যে নাম নরেনের কারবারী আকাঙ্ক্ষাকে

লাভে-লাভে সোনা করে দেবে, সেইরকম একটি সর্বশুভ নাম।

এগারই চৈত্রের আত্মাটা যে আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে, সেই আনন্দেই কে যেন নরেনের বুকের ভিতরে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে গেল—ওর নাম মানিক।

জলন্ত ধূপকাঠি সৌরভ ছড়ায়। চুপ করে ভাবতে থাকে নরেন। তার পরেই প্যাকিং-বাক্স থেকে একটা তক্তা খুলে নিয়ে তার উপর আটা দিয়ে সাদা কাগজ সেঁটে দেয়। নীল-লাল পেন্সিল দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখে—মানিক স্টোর্স।

ছেলের নাম মানিক এবং দোকানের নাম মানিক স্টোর্স। নরেনের জীবনে দু'টি সৌভাগ্যের আবির্ভাব-দিবস হলো এই এগারই চৈত্র। দু'টি সোনা-ছোঁয়ানো ঘটনার নামকরণের দিবস হলো এই এগারই চৈত্র।

মানিক আর মানিক স্টোর্স যেন দু'টি যমজ ভাই। ভূমিষ্ঠ হয়েছে একই দিনের এক সকালে, একই সোনা-ছোঁয়ানো আশার শঙ্খধ্বনির সঙ্গে। সত্যি সত্যিই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নরেন, সুখের দিনের শুরু হলো এবার। না হয়ে পারে না। নইলে, দু'টি সম্পদের আবির্ভাব কেন এমন করে প্রায় লগ্নে লগ্নে মিলে যায়?

মানিক স্টোর্সও দেখতে মানিকের মতোই, ছোট্ট অথচ বড় সুন্দর করে সাজানো। সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বেলে মানিক স্টোর্সের রঙীন রূপের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় নরেন। কত জিনিস ধরেছে এইটুকু জায়গার মধ্যে! পাঁচ টাকা দামের চীনে মাটির ফুলদান থেকে শুরু করে এক পয়সা দামের রাংতার রিস্ট-ওয়াচ। রঙীন রবারের বেলুন দুলতে থাকে, দার্জিলিং পাথরের রঙীন মালা ঝুলতে থাকে, কাগজের বাঘের লাল জিভ লক্‌লক্ করে। রাত হলে বাতি নিভিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে যখন বাড়ি ফিরবার জন্য তৈরী হয় নরেন, তখন মনটাও কেমন যেন একটু ভার ভার বোধ হয়। ছোট্ট মানিক স্টোর্সকে এভাবে সারা রাত একা একা অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিয়ে চলে যেতে ভাল লাগে না। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখতে পায় নরেন, মানিক তার ছোট্ট নরম বিছানার উপর ঘুমিয়ে রয়েছে।

মানিক আর মানিক স্টোর্সের মধ্যে মায়ার পার্থক্য করতে চায়নি নরেন। করবার দরকারই বা কি? ওরা হলো নরেনের জীবনের একই লগ্নে আবির্ভূত একই ভাগ্যের দু'টি আশীর্বাদ।

ভবিষ্যৎটাকেও খুব সহজে হিসাব করে বুঝতে পারে নরেন। খুব বেশি করে নয়, খুব কম করেই লাভের অঙ্কগুলিকে কল্পনা করে। প্রথম বছরের বিক্রিতে

লাভ যা হবে, তাতে-শুধু খরচটাই উঠে আসবে। এর বেশি আশা করা উচিত নয়। দ্বিতীয় বছরটায় ভাল লাভ হবেই হবে। মাসে অন্তত এক মণ বিস্কুট কেটে যাবেই, এবং তাতে লাভের হিসাবে প্রতি মাসে চলে এল কুড়ি-বাইশ টাকা। এই রকমের আরও তো পঁচিশটি বড় রকমের চলতি মাল রয়েছে। রকম পিছু যদি মাসে দশ টাকা করেও লাভ আসে, তবে সারা মাসের লাভ হবে গিয়ে …ভালই তো হবে।

হবেই হবে, কোন সন্দেহ নেই নরেনের মনে। মানিক স্টোর্স, তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ও সুপ্রসন্ন দিবসের আত্মার নামে, তার ছেলের নামে নাম দেওয়া হয়েছে এই দোকানের। লাভ হবেই হবে, ঐ মানিক নামের মধ্যেই সব সাফল্য ও উন্নতির যাদু লুকিয়ে রয়েছে।

—কমলা, কমলা, ও ছেলের মা! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

চেঁচিয়ে ডাক দেয় নরেন। কমলা কাছে আসতেই নরেন বলে—আর ভাবনা করি না।

কমল—কিসের ভাবনা?

নরেন—টাকা-পয়সার ভাবনা।

কমলা—বড়লোক হয়েই গেছ নাকি?

নরেন—হইনি, হবো।

কমলা—হও।

নরেন—হবোই তো।

গলার স্বর একটু নামিয়ে ফিসফিস করে নরেন বলে—আমার কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গেছে কমলা, মানিকের নামে যখন দোকানের নাম দিয়েছি, তখন লাভ হবেই। এ দোকান জমে উঠবেই।

কমলা বলে—আমারও তাই মনে হয়।

মানিক স্টোর্সের প্রথম পাঁচ মাসের বিক্রির হিসেব করতে গিয়ে অনেক যোগ-বিয়োগ আর গুণ-ভাগের অঙ্কে খাতা ভরে ফেলল নরেন। বোঝা গেল, লাভ তেমন কিছু হয়নি, ক্ষতিও তেমন কিছু নয়। কিন্তু প্রথম পাঁচ মাসে এর চেয়ে আর কি বেশি আশা করা যায়?

এক গুচ্ছ ধূপকাঠি জ্বালিয়ে এবং মাটির গণেশের চার দিকে ধুনোর ধোঁয়া বার বার ছড়িয়ে নরেন তার খেরো বাঁধানো খাতাটার উপর বার বার মাথা ঠেকায়। মনে পড়ে, পূজা আসতে আর বেশি দেরি নেই। এইবার বাজার জমবে। বিক্রির জোর খুব বেশি হলে একটা চাকর না রেখে পারা যাবে না।

পাশের দোকানে আলুওয়ালা অমূল্যকে ডাক দিয়ে নরেন প্রশ্ন করে—ও অমূল্যদা, একটা লোক দিতে পার? শুধু সকালটা আর সন্ধ্যেটা আমাকে একটু সাহায্য করবে।

অমূল্য আশ্বাস দেয়—লোকের আর অভাব কি?

কিন্তু পূজাও এল, এবং পূজার বাজারও জমল। তবে মানিক স্টোর্সকে তার জন্য একটুও ব্যস্ত হবার কারণ দেখা দিল না। এদিকে নয়, এ রাস্তাতেও নয়, পূজার সাড়া জাগল গিয়ে একেবারে ঐদিকে, মোড় পার হয়ে, বড় বড় নতুন স্টলের লাইনে।

ছোট মানিক স্টোর্সে গ্যাসবাতি জ্বলে অনেক রাত পর্যন্ত। অনেক ধূপ-কাঠি পোড়া এবং ধুনোর ধোঁয়াতে ছোট দোকান-ঘরের বাতাস বড় বেশি পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু কোন গ্রাহকের পদধ্বনি এ দোকানের কাছে এসে থামে না। পথচারীর দল যেন সন্ন্যাসীর মতো নির্বিকার দৃষ্টি দিয়ে মানিক স্টোর্সের এত রঙীন সমারোহের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যায়। সবারই লক্ষ্য ঐ মোড়ের দিকে। সেই বড় বড় স্টল, যেখানে রেডিও বাজে, পাখা ঘোরে, এবং জিনিস তো নয়, জিনিসের পাহাড় যেন থরে থরে সাজানো রয়েছে।

কিন্তু এক পূজাতেই তো বাজারের ইতিহাস ফুরিয়ে যায় না। আসছে বছরও পূজা আসবে। মানিক স্টোর্সের এই ছয় মাসের পরিণামকেই ভাগ্যের চরম বলে মেনে নিতে রাজি নয় নরেন। দুর্বল নয় নরেন। আশা করবার সাহস এত সহজে ফুরিয়ে দেবার মানুষ নয় নরেন।

আর এক পূজা আসবার আগেই এগারই চৈত্র দেখা দিয়ে চলে গেল।

বড় হয়েছে, এবং আরও ফুটফুটে হয়েছে মানিক। এবং মানিক স্টোর্স আর একটু রঙীন হয়েছে, ধারে কেনা নতুন নতুন রাধাবাজারী মনোহারীর সম্ভারে। জন্ম দিনের উৎসবে চন্দনের ফোঁটা পড়েছে মানিকের কপালে এবং মানিক স্টোর্সের সাইনবোর্ডে।

লাভ-লোকসানের হিসাব খতিয়ে দেখেছে নরেন। হিসাবের অঙ্কগুলির দিকে তাকিয়ে যদিও বিষণ্ণ হয়েছে, তবুও আশা ছাড়েনি, বরং আরও বেশি করে ধূপকাঠি জ্বালিয়েছে। বিশ্বাস করে নরেন, এ লোকসানের বিভীষিকা আর বেশি দিন থাকবে না।

লোকসানের বিভীষিকাকে দূরে সরিয়ে দেবার একটা উপায়ও অনেক চিন্তা করে খুঁজে বের করেছে নরেন। এবার থেকে প্রতিদিন সকালে মানিককে

কোলে করেই দোকানে নিয়ে আসে। দোকানের মাঝখানে ছোট একটা বাক্সের উপর মানিককে বসিয়ে রাখে। একটা কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলা করে মানিক। ঘণ্টা খানেক পরে ঘুঁটেওয়ালি এসে মানিককে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে যায়।

বিশ্বাস করে নরেন, মানিক এসে এইভাবে একবার এই দোকানের বাতাস স্পর্শ করে গেলে, দোকানের বিক্রি বাড়বে। এবং বিশ্বাসের পরীক্ষাতেই আরও একটা বছর কেটে গেল। আবার এগারই চৈত্রের সকালবেলায় মানিকের কপালে এবং মানিক স্টোর্সের সাইন বোর্ডে চন্দনের ফোঁটাও পড়ল।

কিন্তু বিক্রি বাড়েনি। দোকান ভাড়া বাকি পড়েছে। মহাজন কড়া তাগিদ দিয়ে গিয়েছে। মহাজনের একটা কিস্তি শোধ করতে গিয়ে কমলার গলার হারটা বেচে দিতে হয়েছে।

আজকাল আর মানিককে সঙ্গে নিয়ে আসে না নরেন। কিন্তু আজকাল আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নরেন। ভোর হতে না হতে এসেই দোকানের ঝাঁপ খুলে ধূপ জ্বালে। দিনে দু'বার করে ধুলো-ময়লা মুছে মানিক স্টোর্সকে আরও তকতকে এবং ঝকঝকে করে রাখে। রোগী শিশুর পিতা যেমন মনের উদ্বেগে ঘুমোতে পারে না, প্রায় সেইরকমই দশা হয়েছে নরেনের। ছোট রঙীন মানিক স্টোর্স, শিশুর মতই তো দেখতে, এবং রোগেও ধরেছে। উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ ও ব্যস্ত না হয়ে পারে না নরেন।

কিন্তু কি নিষ্ঠুর রোগ! মুক্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ধারের উপর ধার বেড়েই চলেছে। মহাজন মামলার ভয় দেখিয়ে গিয়েছে। বাড়িওয়ালা অপমান করেছে। কমলার গায়ের সোনা এক এক করে বেচে দিয়ে কোনমতে আজও মানিক স্টোর্সকে রঙীন করে রাখবার খরচ যুগিয়ে চলেছে নরেন। আলুওয়ালা অমূল্যদাও বিরক্ত হয়ে বলে—ও নরেন, এমন দোকান কি না রাখলেই নয়?

কি আশ্চর্য, তবুও মানিক স্টোর্সের উপর একটুও রাগ হয় না নরেনের। দোষ মানিক স্টোর্সের নয়। কোথায় যেন একটা ভয়ানক ভুল হয়ে গিয়েছে, তারই জন্য মানিক স্টোর্সের এই দুর্ভাগ্য। যে বিশ্বাসটা বলতে গেলে এতদিন ধরে নরেনের বুকের প্রতি অস্থি জড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছিল, সেই বিশ্বাসটাই ভাঙতে আরম্ভ করেছে। তাই সন্দেহ, মানিক স্টোর্সের ভাগ্যের সঙ্গে একটা অপয়া স্পর্শ মিশে রয়েছে নিশ্চয়, নইলে···নইলে এমন করে সব আশা চূর্ণ হয়ে যাবে কেন?

সন্দেহটাই ক্ষণে ক্ষণে মনের ভিতর প্রশ্ন জাগায়—কিসের অপয়া স্পর্শ? কার স্পর্শ? কালো ছায়া দিয়ে তৈরী একটা কুৎসিত মুখ যেন ফিস্‌ফিস্ করে

বলে—নিজের ছেলে হলে হবে কি? ঐ তোমার ছেলেটিই যে অপয়া। হিসেব করে দেখ, সেই এগারই চৈত্রের পর থেকে আজ পর্যন্ত কপাল তোমার পুড়েই চলেছে। ক্ষতি আর ক্ষতি, লোকসান আর লোকসান। ছেলের নামে দোকান করেছ, ঐ নামটা যে অপয়া।

ভাবতে গিয়ে কপাল টিপে ধরে নরেন। কি দুর্ভাগ্য, এমন সন্দেহও মানুষের হয়! মাঝে মাঝে নিজের মাথাটাকেই সন্দেহ করে নরেন, খারাপই হয়ে গিয়েছে বোধহয়।

তবু, এমন সন্দেহের একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলাই উচিত। আবার এক দিন মানিককে কাজলের টিপ পরিয়ে আর মুখে পাউডার মাখিয়ে দোকানে নিয়ে গেল নরেন।

রঙীন মানিক স্টোর্স। একটা নতুন জগতের আস্বাদ পেয়ে নতুন করে চঞ্চল হয়ে উঠল মানিকের কৌতূহল-দুরন্ত দুটি চোখের দৃষ্টি আর দুটি ছটফটে হাত। প্রথমেই নাটাই-করা লালরঙা রিবন আর ফিতেগুলিকে খুলে তছনছ করে মানিক। তারপরেই সোনালী রঙের কাগজে জড়ানো লজেন্সের বয়ামের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। মানিকের চঞ্চল হাত ক্ষান্ত হয় না। তাকের উপর থেকে কতগুলি টিনের বাঁশি এক থাবা দিয়ে ঠেলে নিচে ফেলে দিল মানিক। নিষ্পলক ও সতর্ক দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে নরেন লক্ষ্য করতে থাকে, কোন্ কোন্ জিনিস স্পর্শ করছে মানিকের হাত, ঐ মিষ্টি মিষ্টি এবং মায়াকোমল দুটি কচি কচি হাত।

ঘুঁটেওয়ালি এসে মানিককে নিয়ে যায়। সারাদিন ধরে দোকানদারি করে নরেন। সন্ধ্যা পার হলো, রাতও বেশ হলো। এইবার তার সন্দেহের হিসাবটাও বেশ সাবধানে যাচাই করে নিল নরেন। ঠিকই হয়েছে, কোন ভুল নেই। যে জিনিসগুলি মানিক আজ সকালে ছুঁয়ে দিয়ে গিয়েছে, ঠিক সেই জিনিসগুলিই বিক্রি হয়নি। এক পয়সার একটা টিনের বাঁশিও বিক্রি হয়নি। এইটুকু ছেলের কতটুকু দু'টো হাত, কিন্তু কি ভয়ানক হাত।

ঝাঁপ বন্ধ করার আগেই বাড়িওয়ালা ও বাবাবাজারের তিন মহাজন দোকানের সামনে উগ্রমূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়! মহাজন গালি দিয়েই বলে—এ কে দোকানদারি বলে, না চুরিবাজি বলে? মহাজনের টাকা আটক করে কারবার ফলাচ্ছ, এ কেমন ধারা কারবার হে?

নরেন বলে—টাকা নেই তো দেব কেমন করে?

মহাজন—তবে মাল ফেরত দাও।

নরেন—তাই দেব।

মহাজন—কবে ?

নরেন—কাল সকালে। খুব সকালে।

আলো নিভিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করার সময় শো-কেসের কাঁচটা চিক্ মিক্ করে উঠতেই মুখ ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকায় নরেন। পার্কের মাঝখানে একটা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, তার উপর একটা ভাঙা চাঁদ, এবং তারই জ্যোৎস্না এসে ছুঁয়েছে মানিক-স্টোর্সের শো-কেসের কাঁচ। বাস্, এই তো শেষ। মানিক-স্টোর্সের জীবনকে আর কোন রাতের জ্যোৎস্না ছুঁতে আসবে না।

চাঁদটাও চেনা-চেনা। আজ তারিখটা কত ? এক মুহূর্তেই মনে পড়ে যায়, আজ হলো দশই চৈত্র এবং চাঁদটা হলো সেই এগারই চৈত্রের আগের রাতের চাঁদ।

রাত ফুরোতেই দেখা দিল সেই প্রত্যাশিত কাল! চৈত্র মাসের এগার। কমলাকে কোন কথা না জানিয়ে, এবং সূর্য ওঠবার আগেই বের হয়ে গেল নরেন।

বাধাবাজারের তিন মহাজন এবং বাড়িওয়ালা আরও ভোরেই এসে দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দ ও ঘুমন্ত মানিক-স্টোর্সের সম্মুখে। ঝাঁপ খুলে দোকানে ঢুকেই দু'হাত দিয়ে হিড়হিড় করে জিনিসসমেত একটা তাক নামিয়ে ফেলে নরেন।

মহাজন বলে—আহা, এলোমেলো করো না। আমরাই লিষ্টি করে ফেলেছি, তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ।

জিনিসপত্রের লিষ্টি করতে এবং দামের হিসাব করতে খুব বেশি সময়ও লাগল না। তিন মহাজন ও বাড়িওয়ালা হিসেব করে মাল ভাগাভাগি করে ফেলে। বাড়িওয়ালা বলে—তাহলে নরেন, এইবার তোমার কাছে পাওনা গিয়ে দাঁড়ালো মোটমাট বাষট্টি টাকা বার আনা।

উত্তর দেয় না নরেন। তাকিয়ে দেখে, 'মানিক-স্টোর্স' সাইন বোর্ডটা ঝুলছে। যেন চিতায় চড়ানো মানুষের মুখটা এখনো দেখা যাচ্ছে, পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি। এক লাফ দিয়ে একটা টুলের উপর উঠে দাঁড়ায় নরেন। এক টান দিয়ে সাইন-বোর্ডটাকে খুলে নিয়ে মাটির উপর ছুঁড়ে দেয়। সাইনবোর্ডের লোহার আংটাটা ক্ষীণ আর্তনাদ করে দূরে ছিটকে পড়ে।

আলুওয়ালা অমূল্যদা ডাকে—ও নরেন, এখানে এসে বসো।

বসল না নরেন, সোজা বাড়ির দিকেই ফিরে চলল। যেন জীবনের এক রঙীন আকাঙ্খার শব চিতায় তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যায় এক শোকার্তের মূর্তি।

ঘরে ঢুকেই মেঝের উপর মাদুর পেতে শুয়ে পড়লো নরেন।

কমলা কাছে এসে বিস্মিতভাবে বলে—শরীর খারাপ হলো না কি ?

নরেন—শরীর খুব ভাল।

কমলা—তবে ওঠো ?

নরেন—কেন ?

কমলা হাসে—কেন, মনে পড়ছে না ?

নরেন—না।

শুয়ে শুয়েই পাশ ফিরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় নরেন।

কমলা বলে—মানিকের জন্য নীল রঙের একটা কামিজ কিনে নিয়ে এস।

নিরুত্তর নরেনের গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে কমলা আবার বলে—আর, আধ সের বাতাসা।

নরেন ঘাড় ফিরিয়ে তিক্তস্বরে প্রশ্ন করে—কিসের জন্য ?

কমলা বিস্মিতভাবে বলে—আজ তোমার মানিকের জন্মদিন।

মাদুরের উপর উঠে বসে নরেন। কমলার দিকে আর একবার তীব্রভাবে তাকিয়ে বলে—আজ হলো আমার মানিক-স্টোর্সের মৃত্যুদিন।

আর্তনাদ করে নরেনের হাত চেপে ধরে কমলা—কি হয়েছে, বলো। বাড়িয়ে বলো না।

নরেন বলে—দোকান উঠে গেল।

আস্তে আস্তে চলে গিয়ে রান্নাঘরে উনানের কাছে এসে বসে কমলা। হাঁটুর উপর কপাল চেপে চুপ করে বসে থাকে। উনানের উপর হাঁড়িতে জল ফুটতে থাকে টগবগ করে। চাল ছাড়তে হবে, একেবারে মনেই পড়ে না। উঠানের দিকে তাকিয়ে কমলার উদাস চোখের দৃষ্টিটাও যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপরেই কেঁদে ফেলে কমলা।

যেন কাঁদছে এগারই চৈত্র। ছেলে-হারানো মায়ের কান্নার মতই করুণ।

ওদিকে উঠানের উপর ঘুরে ফিরে নিজের মনে খেলা করে মানিক। ঘুঁটে-ওয়ালির মালতী লতা ধরে একবার ঝাঁকুনি দেয়। প্রজাপতি আর ফড়িং ছটফট করে পাতার আড়াল থেকে উড়ে পালিয়ে যায়। দাওয়ার উপর খাঁচার ভিতর থেকে পোষা টিয়া কর্কশস্বরে মানিককে ধমক দেয়—ওরে ও ছেলে! খবরদার!

যেন একটা অপয়া আলক্ষুনে দিনকে কর্কশ স্বরে ধমক দিচ্ছে খাঁচার টিয়া। মাদুরের উপর শুয়ে শুধু ছটফট করে নরেন, যেন গাড়ির চাকায় চাপা পড়া একটা আহতের শরীর ছটফট করছে। সেই এগারই চৈত্রকে ভালবাসার শক্তি খুঁজে

পাচ্ছে না নরেন, যে এগারই চৈত্রের মায়ালী বাতাস সোনালী স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছিল নরেনের চোখে।

বেলা বাড়ে। রোদ তেতে ওঠে। এতক্ষণে কান্না থামিয়েছে কমলা। একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে এই বাড়ির বাতাস। যেন একটা কাঁটা বিঁধেছে এগারই চৈত্রের বুকের ভিতর, তাই তার সব মায়া ফুটো বেলুন-খেলনার বাতাসের মতো বের হয়ে গিয়েছে। মল্লিকবাবুদের অশথ ঝিরঝির করে, তবু কোন উৎসবের ইচ্ছা যেন জেগে উঠতে পারছে না নরেনের চোখের দৃষ্টিতে।

ওঘর থেকে মাঝে মাঝে কমলা উঠে এসে একবার এই ঘরের মাদুরের কাছে দাঁড়ায়। কোন কথা বলে না কমলা, নরেনও কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারে না। চলে যায় কমলা।

বিকেল হয়ে আসছে, ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যেতে চলেছে এগারই চৈত্রের দিনের আলোক। যেন এই বাড়ির বিষাদ দেখে ভয় পেয়ে চুপ করে দূরেই সরে রয়েছে মানিকের জন্মদিনের আনন্দ। নরেন আর কমলা, বাধাবাজারী খেলনারই মতো দুটি প্রাণ ভাগ্যের ফাঁকি সহ্য করতে না পেরে যেন এইবার নিজেকেই ফাঁকি দিয়ে মিথ্যে করে রাখবার চেষ্টা করছে। নাই বা হলো মানিকের জন্মদিন। না হলে ক্ষতি কি? আর হলেই বা লাভ কি?

মাদুরের উপর উঠে বসে নরেন। যেন নিজেরই বুকের ভেতরে একটা লজ্জার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছে নরেন। একটা দোকানকে ছেলের মতো ভালবেসে আর ছেলেকে দোকানের মতো ভালবেসে একি একটা যাচ্ছেতাই মনের অবস্থা হয়েছে, বুঝতে পেরে নিজেরই উপর রাগ করে নরেন।

কিন্তু এমন রাগেই বা লাভ কি? এমন একটা মিষ্টি শব্দও বাজে না এই ঘরের বাতাসে যে, নরেনের মনের এই অদ্ভুত রাগগুলিকে হাসিয়ে দিতে পারে। খাঁচার টিয়াটাও বোধহয় ঝিমোতে শুরু করেছে।

ইচ্ছা করে নরেনের, এখনি উঠে গিয়ে হৈ হৈ করে কমলাকে ব্যস্ত করে তুলতে, আর মানিকের জন্মদিনের আয়োজন করতে। চন্দন ঘষতে, ফুল আনতে আর বাতাসা দিয়ে পায়েস তৈরী করতে। কিন্তু কেমন যেন একটা বিশ্রী অভিমানে মনের ইচ্ছাটাই শক্তি হারিয়ে অবসন্নের মতো পড়ে রয়েছে। বড় অস্বস্তি। ঘর থেকে বের হয়ে ক্লান্তের মতোই ভিতরের দাওয়ার উপর এসে বসে থাকে নরেন।

চমকে ওঠে নরেনের চোখ। দাওয়ার উপর এক কোণে বসে খেলা করছে মানিক। কিন্তু ও কি রকম খেলা! এগারই চৈত্র যেন ঠাট্টা করে নরেনের মনের

বাজে লোকগুলিকে একেবারে হাসিয়ে দেবার জন্য খেলা জমিয়ে বসেছে। খাঁচার টিয়াও হঠাৎ চিৎকার করে—ওরে ও ছেলে, ওকি ?

টুক্‌রো-টুক্‌রো কাগজ, কতগুলি দেশলাইয়ের খোল, কতগুলি কাঁকর, মালতীলতার কতগুলি পাতা, দুটো ইট এবং আরও পাঁচ-সাত রকমের আবর্জনা সাজিয়ে বসে আছে মানিক।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে নরেন। তার পরেই গলা-ভাঙা স্বরে প্রশ্ন করে নরেন—এ কি হচ্ছে মানিক ?

মানিক উত্তর দেয়—আমার দোকান।

হাসতে গিয়ে চোখে হাত দেয় নরেন। মানিক আবার বলে—ভাল চকোলেট আছে বাবা।

নরেন বলে—দাও, দু'পয়সার চকোলেট দাও।

দুটো কাঁকর নরেনের হাতে তুলে দিয়ে মানিক বলে—খাও।

খাওয়ার ভঙ্গী করে নরেন বলে—খেয়েছি।

মানিক প্রশ্ন করে—মিষ্টি ?

নরেন বলে—খুব মিষ্টি বাবা।

চোখের কোণ দুটো মুছবার জন্য হাত তুলেই দেখতে পায় নরেন, কমলা এসে দাঁড়িয়েছে।

কমলার বিষণ্ণ মুখ স্মিত হয়ে ওঠে।—এ আবার কোন্ খেলা হচ্ছে ?

নরেন বলে—দোকান দোকান খেলছি।

তারপরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে নরেন। এলোমেলোভাবে ঘরের এদিক থেকে ওদিক যায় আর আসে। জামার পকেটে হাত দেয়।

কমলা আস্তে আস্তে বলে—বোধহয় ভুলেই গিয়েছে যে…।

নরেন বলে—মোটেই ভুলিনি। কি-যেন কি-রঙের জামার কথা বললে তুমি ? নীল রঙের ?

কমলা বলে—হ্যাঁ।

মানিকের কপালে জন্মদিনের আনন্দ এঁকে দেবার জন্য চন্দন খোঁজে কমলা, আর নীল-রঙের জামা কিনতে চলে যায় নরেন।

রামগিরি

—ঐ যে রামটেক পাহাড়, ওর আসল নামটা বলতে পার ?

—না।

প্রশ্ন করে ফর্সা ছিপছিপে ছোকরা বয়সের যে মানুষটি, সে হলো এই স্টেশনের তার বাবু।

আর উত্তর দেয়, দেখতে বেশ সুন্দর যে মেয়েটি, সে হলো স্টেশনমাস্টারের মেয়ে।

নাগপুর থেকে কিছু দূর উত্তরে সুলতানপুর নামে এই স্টেশনে প্রথম চাকরি নিয়ে এসেছে অনুপম। এই তো মাত্র মাস চারেক হলো এসেছে এখানে, টেলিগ্রাফি পাশ করে বছর খানেক ঘরে বসে থাকার পর।

স্টেশনমাস্টার পরেশবাবু সপরিবারে এখানে আছেন এক বছরেরও বেশি সময়। বদলি হবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চেষ্টার কোন ফল হয় না। বাংলা দেশের কাছাকাছি অঞ্চলের দিকেই বদলি হবার ইচ্ছা। কারণ, মেয়ের বিয়ে দেবার দরকার দেখা দিয়েছে, বয়স হয়েছে মেয়ের।

বাংলা দেশের কাছাকাছি থাকলে, ঝট করে একটা দিন কলকাতায় গিয়ে দু'একটা সম্বন্ধের খোঁজ-খবর আনা যায়। এমন কি, দরকার হলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ধীরেনের বাড়িতে একটা দিন থাকাও যায়, আর পাত্রপক্ষ এসে মেয়ে দেখেও যেতে পারে।

পরেশবাবু আর একটু দুশ্চিন্তিত হয়েছেন, ঐ ছোকরা তারবাবু অনুপম এখানে আসার পর থেকে। ছেলেটা দেখতে শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু · কিন্তু প্রশ্ন হলো এত অল্প মাইনের একটা মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রথম মেয়ে রেণুর বিয়ে ? না, সম্ভব নয়।

অনুপমের সঙ্গে রেণুর বিয়ের কথাই বা তাঁর মনে আসে কেন ?

মনে না এসে পারে না। কারণ, দুজনের মধ্যে বেশ একটা ভাব হয়েছে বলে মনে হয়।

পরেশবাবু জানেন, এ রকম ভাবের ব্যাপার ঐ বয়সে আপনা হতেই এসে যায়। শুধু একটু চোখে চোখে রাখতে হয়, যেন মাত্রার বাইরে না চাল যায়। রূঢ়ভাবে বাধা দিতে গেলে ফল ভাল হয় না। সবচেয়ে ভাল হলো, ভালয় ভালয় এবং যত শীঘ্র সম্ভব অন্য কোথাও সরে যাওয়া। কিছুদিন অ-দেখার পর এই

ধরনের ভাব আপনা হতেই আবার অ-ভাব হয়ে যায়।

অফিস ঘর থেকে বাইরে এসে পরেশবাবু দেখতে পান, হ্যাঁ, ঠিক তাই। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রামটেক পাহাড়ের গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে কি জানি কি দেখছে।

সন্ধ্যা হবার ঠিক আগে রেণু বেড়াতে বের হয়ে যাবার আগে একবার এখানে এসে এই প্ল্যাটফর্মের উপর কিছুক্ষণ ঘোরা-ফেরা করত। একটু পরেই পার্সেল-ক্লার্ক যোশির চারটে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে কোথা থেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসত রেণুর কাছে। রেল-ডাক্তার নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী ও বোনেরা হাততালি দিয়ে রেণুকে ডাকত। রেণু তার দল নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যেত। তারপরেই নাইডুর কোয়ার্টারে মেয়েদের আড্ডা জমে উঠত। এমন কি ওভারসিয়ার যশোবন্তর মা'ও এক জোড়া তাস হাতে নিয়ে চলে আসতেন, এবং আড্ডার গল্প নষ্ট করে দিয়ে খেলা জমিয়ে তুলতেন।

এই তো ছিল রেণুর প্রতি সন্ধ্যার নিয়মিত অভ্যাস। কিন্তু এ নিয়ম ভেঙ্গে গিয়েছে এবং অভ্যাসও বদলে গিয়েছে ঐ ছোকরা তারবাবু আসবার পর থেকে। নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী ও বোনেরা শুধু তাকিয়ে থাকে। হাততালি দিয়ে রেণুকে আর ডাকে না।

পরেশবাবু চুপ করে রামটেক পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর অফিসঘরের ভিতর থেকে একটা চেয়ার তুলে আনতে বললেন হেড-কুলিকে। অডিটরের জরুরি চিঠির ফাইলটাকেও অফিসঘরের টেবিল থেকে আনিয়ে নিয়ে চেয়ারের উপর বসেন পরেশবাবু।

ফাইলটা কোলের উপরেই পড়ে থাকে। পরেশবাবুর চোখের দৃষ্টি থাকে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো দুটি মূর্তির দিকে। সূর্য ডুবে আসছে। রামটেকের মাথাটা দেখায় জমাট মেঘের মতো, আর দু'পাশে লাল আলোকের ছটা দিয়ে তৈরী দুটো ডানা। কি দেখছে ওরা? এত মুগ্ধ হয়ে কি দেখছে? আর মুগ্ধ হলেও এতক্ষণ ধরে এত কথাই বা কি আছে বলবার মতো আর শুনবার মতো?

শুধু অনুমানই করতে পারেন পরেশবাবু, কিন্তু শুনতে পান না নিশ্চয়ই, কি কথা বলছে অনুপম আর রেণু।

অনুপম বলে—ঐ রামটেক পাহাড়ই হলো রামগিরি। সেই কালিদাসের সময়ের রামগিরি; ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে!

রেণু—রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের কালিদাস?

অনুপম—হ্যাঁ, কবি কালিদাস। মেঘদূত পড়েছ?

রেণু—না।

অনুপম—ঐ রামগিরিতে থাকত এক যক্ষ। মেঘের কাছে তার মনের ব্যথার কথা বলত।

রেণু—যক্ষের মনে ব্যথা ছিল কেন?

অনুপম হাসে—প্রিয়াকে দেখতে না পেয়ে।

হঠাৎ অন্যদিকে কথার মোড় ঘুরিয়ে কালিদাসের যুগ থেকে একেবারে রেলের যুগে এসে পড়ে অনুপম। কথাগুলি অবশ্য রেলের যুগেরই কথা, কিন্তু চোখের মধ্যে কালিদাসের যুগের বা তারও আগের কালের সেই মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকা দুটি চক্ষুর ব্যথাই যেন দেখতে পাওয়া যায়।

অনুপম প্রশ্ন করে—পরেশবাবু কি সত্যিই দূরের কোন স্টেশনে বদলি হয়ে যাবার চেষ্টা করছেন?

রেণু বলে—হ্যাঁ।

অনুপম—তাহলে?

কোন উত্তর দেয় না রেণু। আনমনার মতো রামটেক পাহাড়ের গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। জমাট মেঘের মতো দেখতে রামটেকের মাথার উপর দিয়ে যেন শ্বেতহংসের পালক দিয়ে তৈরী একটা মেঘ আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে। ডুবন্ত সূর্যের গায়ের রঙের গুঁড়ো গুঁড়ো আভা এসে পড়েছে সাদা মেঘের উপর।

অনুপম বলে—তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল ছিল রেণু।

উত্তর না দিয়ে রেণু আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা পূবের পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে থাকে। পাহাড়ের পায়ের কাছে যেন অদৃশ্য একটা রুষ্ট মেঘ গর-গর শব্দ করছে। ছুটে আসছে ডাউন এক্সপ্রেস। ইঞ্জিনের ধোঁয়া একটা ক্রুদ্ধ লালরঙা আলেয়ার মতো দপ দপ করে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে।

অনুপম বলে—দেখা হয়েছিল, কিন্তু কথা না হলেই বোধহয় ভাল ছিল।

রেণু হঠাৎ বলে—আপনি আমার উপর রাগ করেন কেন? বাবাকে বললেই তো পারেন।

অনুপম—বলতে পারি, যদি তুমি সাহস দাও।

রেণু—বলুন, কি সাহস দেব?

অনুপম—বলো, তোমার একটুও আপত্তি নেই।

রেণু—আপনার কি মনে হয় যে, আমার আপত্তি আছে?

অনুপম—আমার যে এই পঁচাশি টাকা মাইনের চাকরি, তার ওপর এখনো পার্মানেন্ট হইনি!

রেণু—ওসব কথা আমার মনেই আসে না।

অনুপম—বলো, সত্যিই আমাকে তোমার ভাল লাগে?

রেণু—বলবো না। যদি এখনো না বুঝে থাকেন, তবে বললেও কোনদিনই বুঝতে পারবেন না।

রেণুর একটা হাত ধরবার জন্য অনুপমের হাতটা হঠাৎ চঞ্চল হয়েই আবার শান্ত হয়ে যায়। চোখে পড়ে, অফিসঘরের বাইরে প্ল্যাটফর্মের উপরেই চেয়ারে বসে আর ফাইল হাতে নিয়ে পরেশবাবুও যেন রামটেক পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্য এইদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অনুপমের ডিউটির সময়ও হয়ে এসেছে, বড়জোর আর পাঁচ মিনিট বাকি।

বিব্রতভাবে অফিসঘরের দিকে ফিরে আসতে থাকে অনুপম। ওদিকে নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী অনেকক্ষণ থেকে রেণুকে ঘুসি দেখিয়ে ঠাট্টা করছিল। ছোট ওভারব্রিজের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে, বেড়াতে বেড়াতে নাইডুর কোয়ার্টারের দিকে চলে যায় রেণু।

এসেছেন ডিভিসনাল ডেপুটি, সুলতানপুর স্টেশনের জীবন ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে স্টেশনমাস্টার পরেশবাবু পর্যন্ত সকলেই উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠ, পরিচ্ছন্ন পোশাক, সময়-নিষ্ঠ ও কর্মব্যস্ত।

ডিভিসনাল ডেপুটি সাহেব হলেন মিস্টার মিটার অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মিত্র। বয়স পঁয়তাল্লিশ হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। দেখতে সত্যিই বেশ সদাশয়। বেশ হেসে হেসেই কথা বলেন, চোখে অফিসারী ভ্রূকুটি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত মিত্রকে উদারচেতাও বলা যায়। নিজের থেকেই ব্যবস্থা করে নাইডু, যশোবন্ত আর যোশিকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় ব্যাডমিণ্টন খেললেন। এবং নিজের থেকেই যেচে নেমন্তন্ন নিয়ে পরেশবাবুর বাড়িতে রাত্রিবেলা ভাত খেলেন। ডিভিসনাল ডেপুটি মিস্টার মিটারের আচরণে উপরওয়ালা অহমিকা একেবারে নেই বললেই চলে।

সুতরাং, পরেশবাবু তাঁর দাবি একটু মন খুলে বলতে সাহস পেয়ে গেলেন।
—বড়ই অসুবিধায় পড়বো, যদি আমাকে তাড়াতাড়ি, অন্তত খড়্গপুরের কাছাকাছি কোথাও বদলি না করে দেন।

—বদলি হবার জন্যে এত ব্যস্ততা কেন আপনার? খড়্গপুরের কাছা-

কাছিই বা যেতে চাইছেন কেন ?

—বড়মেয়েটি অনেক বড় হয়ে উঠেছে, এইবার বিয়েটা আর না দিলেই নয়। পাত্রের খোঁজ খবর নেওয়া অথবা মেয়ে-দেখানো, এই সব ঝঞ্ঝাটগুলো একটু সহজেই সেরে ফেলতে পারতাম, যদি বাংলা দেশের একটু কাছাকাছি জায়গায় থাকতে পেতাম।

হেসে ফেললেন শ্রীযুক্ত মিত্র—তাই বলুন।

ট্রের উপর চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট সাজানো, তু'হাতে ট্রে ধরে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর ঢুকে শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে ট্রে নামায় রেণু। তারপরেই হাত তুলে শ্রীযুক্ত মিত্রকে নমস্কার জানিয়ে পরেশবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরেশবাবু বলেন —এই হলো আমার বড়মেয়ে রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই হাত তুলে রেণুকেও একটা ছোট নমস্কারে পাল্টা অভিবাদন জানান।

. চা খেতে খেতে কেমন যেন হয়ে গেলেন শ্রীযুক্ত মিত্র। কখনো মনে হয়, একেবারে আনমনা হয়ে রয়েছেন, কখনো চিন্তাকুল। পরেশবাবু একটা প্রসঙ্গ তুলতেই কথার মাঝখানে তু'একবার হাসলেন শ্রীযুক্ত মিত্র, কিন্তু হাসিটাও যেন নিতান্ত খামকা একটা লজ্জায় এলোমেলো হয়ে গেল।

রেণু অন্য ঘরে চলে যাবার পরেও শ্রীযুক্ত মিত্র অনেকক্ষণ বসে রইলেন, পরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ উপভোগ করার জন্যই নিশ্চয়। কিন্তু আলাপটাই বাদ পড়ল সবচেয়ে বেশি। তু'বার জল চাইলেন শ্রীযুক্ত মিত্র। চাকরে এসে জল দিয়ে গেল। আর একবার সামান্য একটু মশলা চাইলেন শ্রীযুক্ত মিত্র- এই একটা এলাচ আর তু'টো লবঙ্গ হলেই হবে। পরেশবাবুর ছোটমেয়ে বুলি এসে মশলার কৌটা শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে রেখে দিয়ে চলে গেল।

ঘরের দরজার দিকে শ্রীযুক্ত মিত্রের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ এক একবার যেন তৃষ্ণার্তের মতো ছুটে যায়। কখনো বা একেবারেই আনমনা হয়ে যেন নিজের মুগ্ধ মনের একটা কল্পনার দিকেই তাকিয়ে থাকেন। তুটি বড় বেণী, বেণীর প্রান্তে নার্গিসের কুঁড়ি, একটা সুন্দর মুখ আর চোখের বড় বড় পাতা, আসমানী নীল একটা শাড়ি, আর অদ্ভুত ভঙ্গীতে রেশমী জালির একটা ওড়না জড়ানো গায়ে। কল্পনাকেও মুগ্ধ করে দেবার মতো একটি মূর্তি বটে।

ওঠবার সময় শ্রীযুক্ত মিত্র বললেন—মনে রইল আপনার অনুরোধের কথা।

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আমারও একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে। কিন্তু আজ আর কিছু বলতে চাই না। আমাকে এখনি

রওনা হতে হবে, এই প্যাসেঞ্জারেই নাগপুর পৌঁছে দুপুরের আগেই একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে।

এক সপ্তাহ পরেই আবার সুলতানপুরে দেখা দিলেন ডিভিসনাল ডেপুটি শ্রীযুক্ত মিত্র। এবার এসে ব্যাডমিণ্টনও খেললেন না, এবং একটা ফাইলও স্পর্শ করলেন না। সারাটা দিন ইনস্পেকশন বাংলোর ভিতরে বসে আর শুয়েই কাটিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা হবার আগেই বেড়াতে এলেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ডাক দিলেন পরেশবাবুকে এবং কিছুক্ষণ বেড়াবার পর প্ল্যাটফর্মের উপরেই দু'জনে দু'টি চেয়ারে বসলেন গল্প করার জন্য।

শ্রীযুক্ত মিত্র বললেন—সেই অনুরোধের কথাটাই বলতে চাইছি।

—বলুন।

—আপনাকে এখান থেকে বদলি না করেও যদি আপনার মেয়ের বিয়ের একটা সুযোগ এনে দিই, তাহলে কি আপনার আপত্তি আছে?

—কিছুই না।

—আপনি কি জানেন যে, পাঁচ বছর হলো আমার স্ত্রী বিগতা হয়েছেন।

—না, তা তো জানতুম না।

—আমার কোন ছেলেপিলেও নেই।

—তাহলে দেখছি আপনি নিতান্তই...একেবারে নিতান্তই একটা বেদনার মধ্যে রয়েছেন।

—ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আর এভাবে থাকতে চাই না।

—থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি।

—তাই অনুরোধ, আমার সঙ্গেই যদি আপনার মেয়ের বিয়ে দিতেন, তাহলে আমি সুখী হতাম।

পরেশবাবু বিচলিত হয়ে ওঠেন—আপনি অনুরোধ বলছেন কেন, এ আপনার অনুগ্রহ। আমি সত্যিই এতটা আশা করতে পারিনি। আমার কোনই আপত্তি নেই, থাকতেও পারে না।

শ্রীযুক্ত মিত্র—আপনার মেয়ের কি কোন আপত্তি থাকতে পারে?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়েন পরেশবাবু। কুণ্ঠিতভাবে বলেন—আমার তো মনে হয় না যে, রেণুর মনে কোন আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু...।

হঠাৎ যেন ভাষা হারিয়ে চুপ হয়ে রইলেন পরেশবাবু। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে,

পাওয়ার হাউসটাও ছাড়িয়ে মস্ত বড় দেওদারের ছায়ার মধ্যে যে কালো পাথরটা পড়ে রয়েছে, সেই দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে পরেশবাবুর।

কালো পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে আছে দুটি মূর্তি, ঠিক সেই রকমই পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে রামটেক পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। ছোকরা তারবাবু অনুপম, আর স্টেশনমাস্টারের বড়মেয়ে রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র প্রশ্ন করেন—চুপ করে গেলেন কেন?

পরেশবাবু বলেন—না না, রেণুর মনে কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। আমার মেয়ে সে রকমের মেয়ে নয়। তবে···।

শ্রীযুক্ত মিত্র—আবার চুপ করলেন যে?

পরেশবাবু—তবে, এইমাত্র কিছুদিন হলো একটি ছেলের সঙ্গে রেণুর আলাপ-পরিচয় হওয়ায় মাঝে মাঝে আমি দুশ্চিন্তা বোধ করেছি। যদিও ব্যাপারটা কিছুই নয়, সামান্য আলাপ-পরিচয় মাত্র, মনের ব্যাপার কিছু ঘটেনি।

শ্রীযুক্ত মিত্রের মুখটা হঠাৎ বড় বেশি বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—সে সব তো আপনারই হাত, আপনি ইচ্ছে করলেই তো আলাপ-পরিচয়ের সুযোগটা বন্ধ করে দিতে পারেন।

পরেশবাবু—পারতাম, কিন্তু পারিনি এই ভেবে যে, মিছিমিছি বাধা দিলে, যেটা চাইছি না সেটাই হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শ্রীযুক্ত মিত্র—এটাও ঠিকই বলেছেন।

পরেশবাবু—আর আলাপ-পরিচয়ের যে সুযোগ বন্ধ করে দেবার কথাটা বললেন, সেটার উপর আমার চেয়ে আপনারই বেশি হাত।

বিস্মিত হন শ্রীযুক্ত মিত্র—কি রকম?

পরেশবাবু—ছেলেটি হলো, সুলতানপুর স্টেশনেরই সিগন্যালার ক্লার্ক।

শ্রীযুক্ত মিত্র—নামটা কি?

পরেশবাবু—অনুপম বসু।

শক্ত একটি অফিসার ভ্রূকুটি নির্মম ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে শ্রীযুক্ত মিত্রের কপালের চামড়া কুঞ্চিত করে দিয়ে। তারপরেই বলেন—তিন দিনের মধ্যেই সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তিন দিন পরেই ডিভিসনাল অফিস থেকে অর্ডার এল, সিগন্যালার ক্লার্ক অনুপম বসুকে বদলি করা হয়েছে মথুরাগঞ্জ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মথুরাগঞ্জে এসে কাজে হাত দিতে হবে। জরুরী অর্ডার। মথুরাগঞ্জ হলো সুলতানপুর থেকে প্রায়

ছ'শো মাইল দূরের এক স্টেশন।

রওনা হবার আগে, এবং এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠবার আগে প্ল্যাটফর্মের উপর অনেকক্ষণ ছটফট করেছিল অনুপম। একটা কথা বলে যাবারও সুযোগ পাওয়া গেল না। কাল রাতেই রেণুকে সঙ্গে নিয়ে নাগপুর চলে গিয়েছেন পরেশবাবু, ডাক্তারের কাছে রেণুর চোখ পরীক্ষা করাতে হবে। কিন্তু চোখ পরীক্ষা করিয়েও আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তো অনায়াসে ফিরে আসতে পারতেন। যা কল্পনা করতেও পারছে না রেণু, এসে দেখবে তাই সত্য হয়ে গিয়েছে। না বলে কয়ে বিশ্বাস-ঘাতকের মতো লোকটা চলে গিয়েছে। জরুরি অর্ডার এসে গিয়েছে। কি হিংস্র অর্ডার!

এক্সপ্রেস ট্রেনের ভিতরে বসেও নিজেকে শান্ত করতে অনেকক্ষণ সময় লাগে অনুপমের। নাগপুরের দিক থেকে আগন্তুক প্যাসেঞ্জার ট্রেনটাও হু হু শব্দে এক্সপ্রেসের পাশ কাটিয়ে সুলতানপুরের দিকে চলে গেল। একবার শুধু চমকে উঠেছিল অনুপম। রেশমী জালির ওড়না গায়ে জড়ানো একটা মূর্তি কি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটা কামরার আলোর সঙ্গে চকিত বিদ্যুতের মতো দেখা দিয়ে উধাও হয়ে গেল? চোখ পরীক্ষা করিয়ে নাগপুর থেকে ফিরে যাচ্ছে রেণু? তাই তো মনে হলো। ইস, যদি আর তিনটে ঘণ্টা আগে ট্রেনটা সুলতানপুরে ফিরত!

যাই হোক, মথুরাগঞ্জ থেকে অনুপমকে আর সুলতানপুরে ফিরে আসতে হয় নি। সপ্তাহ পরে নয়, এক মাসের মধ্যেও নয়। এসেছিল প্রতি সপ্তাহে একটি করে চিঠি, সে চিঠির সদ্‌গতিও করে দিয়েছেন পরেশবাবু, ছিঁড়ে কুচি কুচি করে আর পায়ের পাশে বাজে-কাগজের ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করে।

অপরাহ্ণ-বেলায় প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরে আকাশের বুকে আস্তে আস্তে ভেসে-যাওয়া সাদা মেঘ আর কালো মেঘগুলিকে আরও দেখেছে রেণু। একদিন দুদিন তিনদিন। তারপর আর নয়। মেঘগুলিও তার নাগাল পাবে না, বোধহয় এমনই একটা দূরের জগতে গিয়ে বসে আছে মানুষটা? সহ্য করছেই বা কি করে? কালিদাসের যক্ষও তো মেঘের কাছে মনের কথা না বলে থাকতে পারেনি। কিন্তু এই মানুষটা নিজেকে এত নীরব করে রাখতে পারছে কেমন করে? এত সহজে আর এত শীগগির সবই ভুলে গেল, একটা চিঠিও যে লিখতে পারল না, সে মানুষ মেঘদূতের গল্প বলে কি আনন্দ পেত, এ রহস্য এখন আর বুঝে উঠতে পারে না রেণু।

জরুরি অর্ডার এল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চলে যেতে হবে,—এটাই বা কোন রহস্য? চিন্তা করে রেণু।

এক মাস, দুমাস, তিন মাস। এরই মধ্যে ঘটনাগুলি একে একে বদলে যেতে শুরু করে। শ্রীযুক্ত মিত্র প্রতি মাসেই অন্তত দুবার করে এসেছেন। পরেশবাবুর সঙ্গে অনেক আলোচনা আর অনেকবার আলোচনা হয়েছে তাঁর। এর মধ্যে বেশির ভাগই রেলের কাজের বাইরের বিষয় নিয়েই আলোচনা।

রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরেও আর মেঘ দেখা যায় না। নাইডুর কোয়ার্টারে মেয়েদের তাস খেলার আসর আবার জমে ওঠে। রেণুকে দেখা যায় সেই আসরে। সুলতানপুরের সন্ধ্যাগুলি সেই অনেকদিন আগের মতোই এদিক-ওদিকে বেড়িয়ে ঘোবার আনন্দে কেটে যেতে থাকে। এবং পরেশবাবু দেখে খুশি হন, রেণুর মনের ভিতরে কোন মেঘ যদি আগে দেখা দিয়েও থাকে, তবুও সে মেঘ এখন আর নেই। রামটেক পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড আকাশ কদিন থেকে একেবারে ঝকঝকে ও পরিষ্কার।

আর বেশিদিন দেরি হয়নি। এই আশ্বিনটা ফুরিয়ে যাবার আগেই, সুলতানপুরের স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টার ফুল আর পাতা দিয়ে একদিন সাজানো হলো। সারারাত আলো জ্বলল। ভাড়াটে বাঁশিওয়ালা দিনরাত বাঁশি বাজিয়ে সুলতানপুর স্টেশনের হৃদয়ে উৎসব জাগিয়ে তুলল। তারই মধ্যে বরবেশে দেখা দিলেন শ্রীযুক্ত মিত্র, এবং বধূবেশে তাঁর পাশে বসল পরেশবাবুর বড়মেয়ে রেণু।

বিয়ের রাত ভোর হতেই শ্রীযুক্ত মিত্র প্রসন্ন মনে তাঁর নবপরিণীতা রেণুর মুখের দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে বলেন।—চল, আজ এই সকালেই রামটেক পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি।

রেণু বলে—চলো, কিন্তু বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করে নাও।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—জিজ্ঞাসা করেছি।

রেণু—কি বললেন বাবা?

শ্রীযুক্ত মিত্র—বললেন, হাঁ, রেণুও রামটেক পাহাড়ের শোভা দেখতে খুব ভালবাসে।

রেণু হাসে—আশ্চর্য, বাবা দেখছি এখনো মনে করে রেখেছেন। কিন্তু তবে কেন···।

কি বলতে গিয়ে আর কি-যেন ভেবে চুপ করে গেল রেণু। মুখের হাসিটাও অন্য রকমের হয়ে যায়।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—কি বললে রেণু?

রেণু—তবে কেন বাবা বদলি হতে চেয়েছিলেন?

শ্রীযুক্ত মিত্র হাসেন—ভাগ্যিস আমি ওঁর বদলি বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

রেণু—বদলি করা বা না-করার কর্তা কি তুমিই?

শ্রীযুক্ত মিত্র—হ্যাঁ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—চল রেণু, আর দেরি না করে…

আরও কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকে রেণু। শ্রীযুক্ত মিত্রের হাতের আঙুলে হীরে-বসানো দুটো আংটির দিকে দুটো নিষ্পলক চক্ষুর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ চোখের তারা দুটো চমকে ওঠে, যেন অদ্ভুত একটা কিছু এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে রেণু।

আর কোন সন্দেহ নেই, বোঝা গেল এতদিনে, জরুরি অর্ডারের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ঐ হীরার আংটি পরানো আঙুলগুলির মধ্যে। ঐ হাতেই সই করেছে সেই ভয়ানক জরুরি অর্ডার, যে অর্ডারে রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরে আকাশের সব রঙীন মেঘ শুকিয়ে উবে গেল। যাক্…। ব্যস্তভাবেই রেণু বলে—না আর দেরি করেই বা লাভ কি?

রামটেক পাহাড়ে পৌঁছতে খুব বেশি দেরি হয়নি, আর উপরে উঠতে পা ব্যথা করলেও চারদিকের চোখ-ভোলানো শোভায় সে ব্যথাও ভুলে যেতে পারল রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—এই রামটেক পাহাড়ই হলো রামগিরি।

চমকে মুখ ফিরিয়ে নেয় রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—এই রামগিরিতেই তপস্যা করতো শম্বুক। সে গল্প জান তো রেণু?

রেণু—একটু একটু জানি।

শ্রীযুক্ত মিত্র উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করতে থাকেন।—বেচারা শম্বুক এখানেই তপস্যা করতো। এই মাত্র তার অপরাধ যে, সে শুধু তপস্যা করতো। মাত্র এই অপরাধেই রামচন্দ্র শম্বুককে একদিন হত্যা করলেন।

চুপ করে শুনতে থাকে রেণু। শ্রীযুক্ত মিত্রও কিছুক্ষণ যেন ভাবাভিভূত অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর আবার নিজের মনের উৎসাহেই বলতে থাকেন।—উঃ, ছেলেবেলায় দেখা সেই যাত্রা-গানের কথাই মনে পড়ছে, কি করুণ সেই কথাগুলি!

রেণু—কার কথা?

শ্রীযুক্ত মিত্র—শম্বুকের কথা। রামের বাণে আহত হয়ে মরে যাবার আগে

শম্বুক বলেছে—দোষী নাহি জানিল কি দোষ তাহার।

রেণু বলে—চলো, এবার নেমে যাই।

শ্রীযুক্ত মিত্র আরও উৎসাহিত হয়ে বলেন—কিন্তু রামগিরি আজও শম্বুকের সেই ব্যথার চিহ্ন লুকিয়ে রেখেছে।

হাতের স্টিক দিয়ে পাহাড়ের গায়ের মাটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলতে থাকেন শ্রীযুক্ত মিত্র। মাটির একটা বড় ঢেলা উপড়ে আসতেই দেখা যায়, কাঁচা আলতার মতো লাল রঙে মাখা রয়েছে রামটেক পাহাড়ের ভেজা-ভেজা মাটি।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—লোকে বলে, শম্বুকের রক্ত এখনো রামটেক পাহাড়ের মাটিতে লেগে রয়েছে, এখনো শুকিয়ে যায়নি!

শ্রীযুক্ত মিত্রের মুখের দিকে গভীর কৌতূহলের একটি দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে রেণু। তার মধ্যে শানিত একটা প্রশ্নের তীক্ষ্ণ মুখ যেন চিক্‌চিক্‌ করে জ্বলছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করে রেণু—তুমি কি এই গল্পটা বিশ্বাস কর?

অপ্রস্তুতভাবে শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—গল্প হলো গল্প, এর মধ্যে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কি আছে?

রেণু—গল্পটা ভাল না মন্দ?

শ্রীযুক্ত মিত্র—বড় করুণ।

রেণু—বলতে বেশ কষ্ট হয়?

শ্রীযুক্ত মিত্র—হ্যাঁ।

রেণু—তবে বলতে পারলে কি'করে?

বিব্রতভাবে প্রশ্ন করেন শ্রীযুক্ত মিত্র—অ্যাঁ? কি বললে?

রেণু বলে—চলো, নেমে যাই।

ভাট তিলক রায়

ভাট তিলক রায়ের কথা আমরা এখনো ভুলে যাইনি। তাকে আমরা ভাল করে চিনতাম, তার মুখে অনেক গান শুনেছি। মাঝে কিছুদিন সে বহুরূপীর পেশা ধরেছিল। সে সময়ের একটা ঘটনা আজও মনে পড়ে। গয়লানী সেজে তিলক রায় ব্রজবাবুর বাড়ির বারান্দায় এক হাঁড়ি দই নিয়ে এসে বসেছিল, আমরা

পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে জটলা করে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। ব্রজবাবুর মত গম্ভীর রাশভারী মানুষের কাছে এত বড় একটা ফস্টি নিয়ে তিলক রায় কোন্ সাহসে এসে দাঁড়িয়েছে? কিন্তু ব্রজবাবু গম্ভীরভাবে দরদস্তুর করলেন, দই চেখে দেখলেন, তারপর এক সের দই কিনলেন। দামটা হাতে নিয়েই সেই কৃত্রিম গয়লানী এক টানে তার মাথার পরচুলা আর নাকের নথ ফেলে দিয়ে তিলক রায়ের মূর্তিতে দেখা দিল। হাত পেতে বক্‌শিস চাইলো। ব্রজবাবু হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা প্রচণ্ড খুসীর উচ্ছ্বাসে তাঁর জমাট গাম্ভীর্য ধুলো হয়ে উড়ে গেল। একটি দশ টাকার নোট তিলক রায়ের হাতে ফেলে দিলেন।

বিষুয়া পরবের সময় ভাট তিলক রায় গেরুয়া পাগড়ী পরে কালীবাড়ীর চত্বরে এসে বসতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু ছড়া কেটে আর গান গেয়ে পার করে দিত তিলক রায়। গানের ভাষাটাও ছিল অদ্ভুত—না ভাখা না ঠেট হিন্দী, না খাড়ি বোলি, না বাংলা, না মগহি। মনে হতো ঐ সব ভাষা মিলিয়ে যেন তিলক নিজস্ব একটা ভাষা তৈরী করে নিয়েছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা মুণ্ডারী কুরুম্ কারুমও থাকতো। আজ তিলক রায় বেঁচে থাকলে তার কাছে ভাষা তত্ত্বের গবেষণা করার মতো একটা উপাদান পাওয়া যেত। এমনও হতে পারে, তিলক রায়ই আমাদের দেশের সেই অখ্যাত মনস্বী, যে প্রথম এই বহুবচনাবৃত ভারতের উপযোগী একটি এস্পারান্টো তৈরী করেছিল, কিন্তু কেউ জানতে পারলো না। তিলক যখন মাঝে মাঝে কাঁচা হিন্দী ও বাংলা মিলিয়ে তার গাথাগুলির ভাষ্য করে আমাদের বোঝাতো, তখন আমরা সবই বুঝতে পারতাম আর মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

ভাট তিলক রায়ের গানের মধ্যে কী না ছিল? বুন্‌ডুটুক্‌কুরু গুহার রাজার ছেলে মুলুটুংলা এক হরিণীর প্রেমে পড়ে সারা অরণ্য চুঁড়ে ফিরছে—চোখে ঘুম নেই, মুখে জল নেই। দূর্বা ঘাসের পোষাক গায়ে দিয়ে নদীর ধারে চুপ করে শুয়ে থাকে—যদি ভুলে ভুলে সেই ছলনাসুন্দরী হরিণী একবার কাছে চলে আসে। রাজা হাতীর দাঁতের কুড়ুল নিয়ে সদলবলে বের হয়েছেন। হয় সে হরিণী, নয় এই উদ্‌ভ্রান্ত কুপুত্র—দু'জনের একজনকে পেলেই হবে—নিজের হাতে সংহার না করে তিনি আর শান্ত হবেন না।

ভাট তিলক রায়ের গানের এই রূপকথার আস্বাদ আমাদের তখন কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবুদ্ধি করে দিত। তিলকের গানের সেই চরম অবাস্তব কত সত্য বলে মনে হতো। তার মধ্যে ভেবে দেখবার মতো কোন প্রশ্নই থাকতো না।

তিলকের গান আর ছড়ার প্রতিটি পদের সঙ্গে আমাদের বিস্ময় এক ইন্দ্রজালের জঙ্গলে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতো। আমরাও যেন মনে মনে ঘাসের পোষাক পরে সঙ্গে সঙ্গে নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকতাম, কতক্ষণে সেই হরিণী এসে পৌঁছয়। বুন্‌ডুটুক্ কুরু কথাগুলি এক একটি টোকা দিয়ে আমাদের বোধরাজ্যের কুয়াসার মধ্যে যেন ছোট ছোট এক-একটি সূর্য জ্বালিয়ে দিত।

আজ বড় হয়ে ভাট তিলক রায়ের রূপকথার একটা অর্থ বুঝতে পারি ; বিস্ময় আরও বেড়ে যায়। তিলক রায় কি সেই প্রাগৈতিহাসিক বেদের শ্রুতি-ধর। যখন মানুষ আর পশু একই অরণ্যের জঠরে প্রতিবেশীর মতো থাকতো ? তিলক কি সেই পুরাকল্পের মানুষের সংসারে প্রথম বিজাতীয় এই প্রণয়ের কাহিনীটি শুনিয়েছিল ? বুন্‌ডুটুক্‌কুরু গুহার যুবরাজ মুলুটুংলা কি সে যুগের ওথেলো আর সেই শৃঙ্গবতী হরিণী কি তার ডেসডেমোনা ? আজ অবশ্য অনেক মাথা ঘামিয়ে—এথ্‌নোলজী আর সাইকো-এনালিসিসের প্রয়োগ বিয়োগ করে এই তত্ত্বটা বুঝে খুসী হচ্ছি। কিন্তু প্রথম যখন শুনেছিলাম, তখন ভাট তিলক রায় ছিল হ্যামলিনের বাঁশীওয়ালা আর আমরা ছিলাম ছেলের দল।

আমাদের মুগ্ধাবস্থা হঠাৎ চম্‌কে উঠতো। তিলক অন্য একটা গাঁথা গাইতে শুরু করে দিত। এটা আবার অন্য ধরনের। এই গাথার কথা কাহিনী ও সুরে সেই নিশির ডাকের মতো আহ্বান ছিল না। কথাগুলি আমাদের হাতে হাতে যেন এক একটি তলোয়ার ধরিয়ে দিত।—কার্ণাইল ডালটন সাহেবের পল্টন পালামৌ কেল্লা ঘিরে ধরেছে। মুহুর্মুহু তোপ পড়ছে। ফটকের মুখে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। এক একটা শওয়ারের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে ফটকের ওপর। কালো কালো কোল তীরন্দাজ আর তলোয়াররাজ রাজপুতেরা দলে দলে ফটকের মুখে রুখে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ হটবে না। খাড়া দাঁড়িয়ে লড়ছে আর মরছে।

মিউটিনির সর্দ্দার রাজার খুড়ো। থুড়থুড়ো বুড়ো। ফটক সামলাতে যখন আর কেউ নেই, কার্ণাইল ডাল্টন যখন পল্টন নিয়ে কেল্লায় ঢুকতে চলেছে, ঠিক সেই সময় সমস্ত কেল্লাটা যেন শেষ বারের মতো হুঙ্কার ছাড়লো। দেখা গেল, এক আশী বছরের লোলচর্ম বুড়ো রাজপুত তার মাথায় পাগড়ীটাকে ঢালের মতো এক হাতে তুলে আর এক হাতে তলোয়ার ঘুরিয়ে মত্ত সিংহের মতো যেন কেশর ফুলিয়ে, নাচতে নাচতে, হুঙ্কার দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষণিকের জন্য যেন একটা মৃত্যুর হোলি খেলে নিয়ে রাজার খুড়ো, থুড়থুড়ো বুড়ো, সেইখানে ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে রইলো।

ভাট তিলক রায় মারা গেছে অনেকদিন। আজ মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে যেন ইতিহাসের প্রেতাত্মাটি সরে গেছে। যুগে যুগে কত ঘটনা দেখা দিয়েছে, শেষ হয়ে গেছে। আধুনিক মানুষ আমরা, ইতিহাসের জীব হয়েও আমরা তার খপ্পরে থাকি না। আমরা বদ্‌লে যাই। আজ যে ব্যথায় আমরা কাঁদছি, কাল তা শুধু স্মৃতি হয়ে যায়, পরন্তু সেই স্মৃতি হয়তো আমাদের শুধু হাসাতে থাকে।

কিন্তু ভাট তিলক ছিল যেন এক নিদ্রাহীন যখ। অতীতের যত পাপ তাপ, আনন্দ বিষাদ, প্রেম প্রণয় ও লজ্জা, শত্রুতা প্রতিহিংসা ও প্রতিজ্ঞাকে সতর্ক পাহাড়ায় সে আগ্‌লে ছিল। যা বিস্মরণীয়, তাকে সে ভুলতে দেয়নি। যা ক্ষমার্হ, আজও সে তাকে ক্ষমার যোগ্য হতে দেয়নি। যে গ্লানি আমরা ভুলে গেছি, সেই গ্লানিকে তিলক বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেই কবেকার সভ্যতার হরিণী-প্রেমবিধুর বনবাসের লজ্জা আর এই সেদিনের কর্ণেইল ডাণ্টনের হাতে রাজপুত বিদ্রোহীর চরম শাস্তির জ্বালা—তিলক রায় এক মৃত যুগের শবাধার থেকে প্রেতের মতো উঁকি দিয়ে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিত।

আমরা আর একটু বড় হয়েছি তখন, শুনতে পেলাম তিলক রায় সহর ছেড়ে দেশে চলে গেছে। আমরা শুনেছিলাম লাল্‌কি নদীর ওপর একটা প্রকাণ্ড বাঁধ তৈরী হচ্ছে, নিমিয়াঘাটের কাছে। তিলক রায়ের বাড়ি নিমিয়াঘাট থেকে কিছু দূরে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে গেলে মাত্র আধ ঘণ্টার সফর।

কলকাতার একটা কোম্পানী জ্যাকব এণ্ড জ্যাকব, সেই বাঁধটার কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে। জায়গাটার জরিপ হয়ে গেছে। মালপত্র আসছে, কুলি কারিগর আর ইঞ্জিনিয়ারেরা আসছে। তিলক রায়ের মনের মধ্যে সজীব ইতিহাসের প্রেতটা বোধহয় সতর্ক হয়ে উঠলো। বহুরূপীর পেশা ছেড়ে দিল তিলক। সহরে ছড়া গাইতে আর আসে না, নিমিয়াঘাটের আসে পাশে যত গাঁ আছে, সব জনপদের কানে কানে তিলক এক সাবধান বাণী শুনিয়ে বেড়াতে লাগলো।—ভয়ঙ্কর একটা অমঙ্গল আসছে, সময় থাকতে একটা বিহিত ব্যবস্থা করা চাই। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরী করতে যারা এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য কি? বাঁধ তৈরী এমনিতেই হয়, লাল্‌কি নদীর ঢল সাম্‌লাবে সিমেণ্ট আর লোহার কয়েকটা দরজা! কেউ বিশ্বাস করো না। একশোটি নরবলি না দিলে লাল্‌কি নদী কখনই তুষ্ট হবে না। ছেলে-ধরার দল ঘুরছে, বাঁধ-কোম্পানী টাকার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর একদিন মাঝরাত্রে হাত পা বেঁধে বলি দিয়ে লাল্‌কী নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। ঐ যে একটা নতুন থাম তৈরী করেছে, ঐখানেই বলি দেওয়া

হয়। বলির আগে আফিং খাইয়ে দেয়, কেউ বুঝতেও পারে না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কি পরিণাম হবে।

নতুন নতুন ছড়া বেঁধে তিলক রায় তার বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগলো। —ইঞ্জিন এসেছে, কত রকমের কলকব্জা আসছে। কিন্তু কী সাধ্য আছে তাদের লাল্‌কি নদীর ঢল বেঁধে দেবে? আগে নরবলি হবে, তবেই কল চলবে। তা ছাড়া আর কোন পথ নেই। অতএব সব গাঁয়ের মানুষ হুঁসিয়ার হয়ে যাও। কেউ কুলির খাতায় নাম লিখিও না, সোনার মোহর মজুরী দিলেও না।

এসব খবর আমরা তিলকের মুখেই শুনেছিলাম। বিয়ুয়া পরবের দিন একবার সহরে আসতো তিলক। তিলকের চেহারাটাও কেমন পাগ্‌লা গোছের হয়ে গিয়েছিল। চোখের দৃষ্টিটাও যেন একটা সংশয়ে উদ্বেল হয়ে থাকতো। চুপি চুপি বলতো—ভয়ানক কাণ্ড হচ্ছে খোকাবাবু। নিমিয়াঘাটে লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরী হচ্ছে। কখন যে গরীবের প্রাণটা চলে যায় ঠিক নেই!

আমরা বলতাম—কেন?

তিলক—এক একটি থাম উঠছে, আর পাঁচটা মানুষের প্রাণ যাচ্ছে।

আমরা—কেন?

তিলক—নরবলি দিতে হচ্ছে, নইলে মাটিতে থাম ধরবে কেন? লাল্‌কি নদীর রাগ কি এমনিতেই শান্ত হবে?

তিলক একটা ছড়া গেয়ে শোনালো। এই গাথা সে কোন উত্তরাধিকার হিসাবে পায়নি, এটা তার নিজেরই রচনা। তিলক রায়ের গাথার ঝুলিতে যুগ-যুগান্তের ক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে আছে। এইবার নতুন একটা ক্ষোভ তার সঙ্গে যোগ হলো।

আমরা গল্প শুনেছিলাম, গ্রাণ্ড কর্ড লাইন যখন নতুন তৈরী হয়, তখন কিছু-দিন হাতীর উপদ্রবে ট্রাফিক ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। হাতীরা তাদের জঙ্গলে এই কলকব্জার অনধিকার প্রবেশ ভাল মনে গ্রহণ করেনি। তারা দল বেঁধে লাইনের ওপর বসে থাকতো, কখনো বা এসে শুঁড় দিয়ে লাইন উপড়ে ফেলে দিত।

তিলক ভাট যখন তার সেই বড় বড় চোখ কুঁচ্‌কে আমাদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল, তখন আমাদের এই হাতীদের রাগের গল্পটা একবার মনে পড়েছিল। তিলক রায়ের চোখে যেন সেই রকম একটা আক্রোশ।

তার কিছুদিন পরে আমরা শুনে শিউরে উঠলাম, নিমিয়াঘাটের কাছে কোন্ একটা গাঁয়ে তিনটে ছেলে-ধরাকে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কারা মেরে ফেলেছে। একটা পুলিশ ফৌজ নিয়ে এস-পি সেই দিনই নিমিয়াঘাট রওনা হয়ে গেলেন।

তার দু'দিন পরে শুনলাম-ছেলে ধরা নয়, তিনটে কুলি-রিক্রুটারকে মেরেছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে সদরে আনা হয়েছে। আমাদের অনেকেরই কেমন একটা বিশ্বাস ও আশঙ্কা ছিল—এই প্রতিহিংসার ষড়যন্ত্রে তিলক রায়ও থাকতে পারে। তাই স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা সেসন জজের আদালতের ভীড়ের মধ্যে এসে ভিড়ে পড়তাম। উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতাম, আসামীদের মধ্যে তিলক আছে কি না। না, তিলক রায় নেই। চার-পাঁচজন গাঁয়ের লোক তারা, তাদের কাউকে আমরা চিনি না।

তিলক রায়কে আসামীদের মধ্যে দেখতে না পেয়ে আমাদের একটা উদ্বেগ শান্ত হতো, একটু খুশী হতাম। কিন্তু ঘটনাটা আবার একটু কেমন পানসে হয়ে যেত আমাদের কাছে। এর মধ্যে তিলক রায় থাকলেই যেন ভাল হতো। হিরো হিসাবে তিলক রায় কিছুক্ষণের জন্য আমাদের কাছে একটু খাটো হয়ে যেত।

আরও বড় হয়েছি। তিলক রায়কে আরও কয়েকবার দেখেছি। তখন লাল্‌কি নদীর বাঁধ রচনার মধ্যপর্ব আরম্ভ হয়েছে। বড়মামার সঙ্গে নিমিয়াঘাটের অফিস কোয়াটারে থাকি। সারাদিন ঘুরে ফিরে বাঁধের কাজ দেখতাম। স্মৃতি থেকে সেদিনের অনুভবের কিছুটা, আর আজকের বিচার দিয়ে তার পরিশিষ্টের কিছুটা বলতে পারা যায়।

তিলক রায়ের বাণী ব্যর্থ হয়নি। নিমিয়াঘাটের কাছাকাছি কোন গাঁ থেকে কোন কুলি তখনো এই বাঁধ তৈরীর কাজে খাটতে আসেনি। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তখনো তাদের কাছে শত্রু হয়ে আছে। কিন্তু তিলক রায় আসে মাঝে মাঝে। গুপ্তচরের মতো যেন সে ছদ্মবেশে বাঁধের কীর্তি দেখে যায়। দেশী মজুর কেউ নেই, সবই ছত্রিশগড় থেকে এসেছে। কেরাণীরা সবাই বাঙালী। ইঞ্জিনিয়ারেরা বেশীর ভাগ সাহেব। মিস্ত্রী আছে সব জাতের লোক—পাঞ্জাবী পাঠান আর চাটগেঁয়ে। তিলক রায় সবাইর সঙ্গে খাতির জমায়, নানারকম প্রশ্ন করে। তার সন্দেহ দূর হয় কিনা বোঝা যায় না। একনি করেই মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা দেয় তিলক—তারপর আবার চলে যায়।

আমাকে একদিন দেখতে পেয়ে চিনতে পারলো তিলক। তিলক খুশী হয়ে ও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।—আপনি এখানে কেন দাদাবাবু?

—বড়মামা এখানে আছে যে।

—আপনার বড়মামা? তিলক চিন্তিতভাবে তার স্মৃতি হাতড়ে বড়মামার

পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো।

আমিই সাহায্য করলাম।—লালকুঠির জিতেনবাবুকে মনে নেই, তিনিই আমার বড়মামা।

তিলক খুসী হয়ে উঠলো।—ওঃ হো, চিনতে পেরেছি। চলুন দাদাবাবু, তাঁকে একটা আদাব জানিয়ে আসি।

বড়মামাকে অভিবাদন জানিয়ে তিলক রায় মেজের ওপর বসে পড়লো। তারপর বললো—একটা কথা আমার মতো বোকাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন বড়-বাবু, এই বাঁধ তৈরী হয়ে কি হবে? কারও কোন ভাল হবে কি?

উত্তরে বড়মামা যা বললেন, তাতে তিলক শুধু হাঁ করে রইল, যেন গিলতে পারছে না কিছু।

—বলিস্ কি তিলক? দশ বছর পরে নিমিয়াঘাটকে আর চিনতে পারবি? এখান থেকে চারটে পাকা সড়ক বের হবে—চোস্ত ম্যাকাডাম করা সড়ক। মীটার-গেজ রেললাইন বসবে। এরই মধ্যে সিমেণ্টের কারখানা খোলার বন্দোবস্ত শুরু হয়ে গেছে। বাঁধটা একবার শেষ হয়ে নিক্ তো, তখন বিরাট একটা পাওয়ার ষ্টেশন হবে এখানে। তিনটে জেনারেটর বসবে, সঙ্গে এক জোড়া টার্বাইন। ছেষট্টি হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ ছুটে যাবে এখান থেকে দশ মাইল পর্যন্ত—ডবল সার্কিট ট্রাঙ্ক লাইন ধরে।

বড়মামার কথায় মধ্যে ভবিষ্যতের এক সুখী ও সম্পন্ন উপনিবেশের বিচিত্র মূর্তি ফুটে উঠেছিল। তিনি আরও জাঁকালো করে শুনিয়ে দিলেন।—কত কারখানা খুলে যাবে দেখবি। বাঁশের জঙ্গল পড়ে রয়েছে, কাগজের মিল বসবে। একটা কাঁচের কারখানা খুলবে—এই যে পড়ে রয়েছে টন টন সাদা বেলে পাথরের ধুলো, এসব তখন গলে গিয়ে স্ফটিক হয়ে যাবে রে তিলক।

আমরা ছেলেবেলায় যেভাবে সম্মোহিতের মতো তিলক রায়ের গান শুনতাম, তিলক নিজেই আজ যেন সেইরকম একটা কিশোর কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে বড় মামার কথাগুলি শুনছিল। মনে হচ্ছিল, বড়মামাই একজন ভাট, তিলক একজন শ্রোতা মাত্র। আধুনিক যুগের এক ভাটের মুখে ভবিষ্যতের কথা শুনছে স্বয়ং তিলক। তবুও তিলকের মুখে একটা বেদনার্ত ছায়া পড়েছিল যেন। ইতিহাসের প্রেতটা যেন ভবিষ্যতের এই ঔদ্ধত্য দেখে মনের দুঃখে মুস্ড়ে পড়ছে। তিলক চলে গেল।

তিলক আবার একদিন এল। জ্যাকব এণ্ড জ্যাকবের নিমিয়াঘাট বারেজ কন্স্ট্রাকশনের একটা প্রস্পেক্টাস হাতে নিয়ে বড়মামা তিলক রায়কে নানা তথ্য

পড়ে পড়ে শোনালেন। তিলক কি বুঝলো তা সেই জানে। বড়মামা পড়ছিলেন নিজের আগ্রহের আবেগে। নিজেকে উৎফুল্ল করার জন্যই যেন তিনি নতুন ধরনের একটি লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ছিলেন। কারণ আছে, বড়মামা কিছু শেয়ার কিনেছেন।

আজ তিলককে দেখে কেমন একটু শান্ত মনে হলো। সমস্ত শক্তি দিয়ে তার সব রোষ সংযত করে লাল্‌কি নদীর বাঁধকে যেন সে একটু সুনজরে দেখবার চেষ্টা করছে।

তারপরেই একদিন তিলক রায় এল। সেদিন সে আর একা নয়। শ'চারেক গাঁয়ের কুর্মি আর জোলা তার সঙ্গে এসেছে। সবাই সুবাধ্য ছেলের মতো কুলি আফিসের সামনে দাঁড়িয়ে নাম লেখালো। নম্বরের চাক্‌তি আর কোদাল হাতে নিয়ে দল বেঁধে নতুন একটা মাটির ধাওড়াতে গিয়ে সবাই উঠলো। আগামীকাল থেকেই ওদের কাজ শুরু হবে। শুধু আজকের দিনটা ওরা জিরিয়ে নিচ্ছে। শুক্‌নো পাতা পুড়িয়ে বড় বড হাঁড়িতে ভাত ফুটিয়ে ওরা খেল। তখনো ওদের মনের সন্দিগ্ধ ভাবটা বোধহয় একেবারে কেটে যায়নি। এই নতুন ঘরের সুখ আজ ওরা অস্বীকার করতে পারছে না, তবু চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন যেন ঘনিয়ে আছে —এই সুখ সইবে তো?

লাল্‌কি নদীর বাঁধটা সত্যিই একট কীর্তি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম উঁচু উঁচু ক্রেনগুলির মাথার ওপর রোদ পড়েছে। যেন বিশ্বকর্মার কিরীট। ছোট ছোট ক্রেনগুলি নিতান্ত অবলীলায় ছোঁ মেরে এক-একটা কংক্রীটের চাঙ্গড় তুলে নিচ্ছে—পরমুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে লাইনের ওপর স্তরে স্তরে। একটা প্যাডেল টাগ, একটা ড্রেজার আর একটা এক্সক্যাভেটার নদীর ওপর পড়ে উৎখাতকেলির আনন্দে অস্থির। হাজার টন জল মাটি আর পাথর উপড়ে ফেলছে। ডবল সিলিণ্ডার ডিজেল ইঞ্জিনগুলি যেন দর্পভরে আত্মহারা। পিনিয়নগুলির মুখে একটা শানিত দম্ভের হাসি। সমস্ত যন্ত্রযূথ যেন হাস্‌ছে।

ইঞ্জিনিয়ার ওভার্সিয়ার আর সার্ভেয়ারের সংখ্যাই হবে একশোর ওপর। তাছাড়া ফিটার টার্ণার লেদমিস্ত্রী, ওস্তাগর, বয়লারম্যান, ইঞ্জিন ড্রাইভার আর কুলিমজুর সব নিয়ে হবে হাজারের ওপর। দূর ছত্রিশগড় থেকে এসেছে রোগা রোগা পুরুষ কুলি আর বেঁটে মজবুত চেহারার মেয়ে কুলি।

নিমিয়াঘাটের এই বেলেমাটির তেপান্তরে লাল্‌কি নদীর ধারে এক বিরাট বাহিনী যেন এসে ছাউনী ফেলেছে। প্রতিদিন ভোর থেকেই সাজ-সাজ রব পড়ে

যায়। পরেশনাথের ডাকবাংলোতে বসে নীচের দিকে তাকালে এই কুয়াশায় ঢাকা জনপদ অল্প অল্প দেখা যায়—নিঃশব্দ ষড়যন্ত্রের মতো যেন গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে; কার বিরুদ্ধে যেন সংগ্রাম ঘোষণা করেছে।

সত্যি কথা, এও এক সংগ্রাম, জল পাথর আর মাটির জড়ত্বের বিরুদ্ধে। লাল্‌কি নদীর চওড়া খাত ধরে প্রতি মুহূর্তে এক বেগময় সলিলসম্ভার গড়িয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার পাশেই বসে শুকনো নিমিয়াঘাট যেন তৃষ্ণায় ধুঁকছে। সারা দুপুর ধরে এক নিদারুণ প্রদাহে চিক্‌চিক্ করে পুড়তে থাকে নিমিয়াঘাটের বেলেমাটির পরমাণু। কত শত বছর পার হয়ে গেছে কে জানে, শ্যাম বনভূমির শেষ অঙ্কুরটি এইখানে জলবাতাসের অনুদার চক্রান্তে মরে গেছে।

মানুষের বুদ্ধি আজ বুঝতে পেরেছে—আবাদ করলে ফলতো সোনা। নিমিয়াঘাটকে আর পতিত করে রাখা উচিত নয়। লাল্‌কি নদীর খাম্‌খেয়াল শান্ত করে দিতে হবে—এক হাজার ফুট লম্বা এক সুকঠিন কংক্রীটের বাঁধ দিয়ে। পনেরটি খিলান করা স্প্যান, প্রত্যেকটির সঙ্গে পঞ্চাশ টনের গেট ফিট করতে হবে। মৌশুমী বৃষ্টি এই লাল্‌কি নদীকে প্রতি বছর ফাঁপিয়ে তোলে, ফাল্গুনে হাজার মাইল দূরের হিমগিরির বরফগলা জল গড়িয়ে আসে কিন্তু সবই বৃথা হয়। এক অন্ধ বেগ সব জলভার লুটে নিয়ে চলে যায়, নিমিয়াঘাটের ডাঙ্গা তার এক কণা প্রসাদ পায় না। তাই গড়ে উঠছে বাঁধ—আট কোটি টাকার স্কীম। দেশ-বিদেশের মহাজনেরা সাত দিনে সাগ্রহে সব ডিবেঞ্চার লুটে নিয়ে গেছে।

এখান থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, কম করে, সাতটা খাল। জরিপ করা হয়ে গেছে, ভূস্তর ফুটো করে অন্তঃসলিলের রহস্য জানা হয়ে গেছে। এই খাল দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলভার চলে যাবে দিকে দিকে—উর্বরতার অর্ঘ্য নিয়ে। রুক্ষ নিমিয়াঘাট সবুজ হয়ে উঠবে। তাই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেন এক সুমহিম সংগ্রামের আয়োজনে, এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে এইখানে। যুদ্ধ হবে পদার্থজগতের বিরুদ্ধে—সমস্ত নিসর্গের ঔদ্ধত্যকে পরাজিত করে বুদ্ধির দাস করে রাখতে।

এরই মধ্যে বেনেদের জুয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে নয়, দূর কলকাতা ও লণ্ডনের এক একটি দালালী হৌসে নিমিয়াঘাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফাট্‌কা সুরু হয়ে গেছে। বেতারে খবর বিলি হয়—কাজ কত দূর এগিয়েছে। শেয়ার নিয়ে হানা-হানি চলে। নতুন এক ঘোড়দৌড়ের জুয়ার আস্বাদে নিখিল বিশ্ব দালালী মস্তিষ্কে নেশা জমে এসেছে।

স্ট্রাইক আরম্ভ হয়েছে। নিমিয়াঘাটের এই সুন্দর ইষ্টাপূর্ত রূপ হঠাৎ বীভৎস

হয়ে গেছে। সংগ্রামের সেই বুদ্ধির ঐক্য ঘুচে গেছে, দীপ্তি নিভে গেছে। এক আত্মবিচ্ছেদের বিষে শিবিরের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। শুনলাম, কণ্ট্রাক্টর জ্যাকব এণ্ড জ্যাকবের ক'জন সাহেব অফিসার, গোটা দশেক ইঞ্জিনিয়ার আর বড়মামা ছাড়া সবাই ধর্মঘট করেছে। দশদিন থেকে কাজ বন্ধ।

সেদিনের ঘটনাগুলি আজও খুব স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ে। দশদিন ধরে সেই ময়দানবের পুরী যেন নিঝুম হয়ে রইল। চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে মাঠের উপর একটা গুর্খা ফৌজ এসে ডেরা নিয়েছে। সাহেবের ফুলবাগানে রোজ একটা জটলা দেখা যায়। তার মধ্যে অফিসারেরা আছে, কয়েকজন মিস্ত্রী, টাণ্ডেল আর সর্দারও আছে। বোধহয় মীমাংসার জন্য একটা বৈঠক বসে সেখানে।

বড়মামার কাছে শুনতাম, স্ট্রাইক তাড়াতাড়ি না মিটলে একটা ভয়ানক ব্যাপার হবে। আরও মিলিটারী নাকি আসছে। নতুন লোক যোগাড়ের জন্য রিক্রুটারেরা বেরিয়েছে। কী বেয়াদব আর বেইমান এই মজুর মিস্ত্রী আর কেরানীগুলি! এমন ঠেঙানি দিয়ে হাত পা ভেঙে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোথাও যেন আর রোজগার করবার আশা না থাকে, এখানে তো নয়ই।

কলকাতার কয়েকটা খবরের কাগজকে বড়মামা কষে গালাগালি দিলেন। এই স্ট্রাইকের খবরটা তারা এরই মধ্যে রটিয়ে দিয়েছে। শেয়ারগুলির উঠতি ভ্যালু এরই মধ্যে ইনডিফারেন্ট হয়ে পড়েছে। এর পর নামতে আরম্ভ করবে। আমারও মনে হতো, এই স্ট্রাইক একটা বড় বেশী গোঁয়ার্তুমি। সামান্য কয়েক আনা মজুরীর রেটের দাবী গ্রাহ্য হয়নি বলেই একেবারে কাজটা নষ্ট করে দিতে হবে, এ কী রকম ব্যবহার? একটু কৃতজ্ঞতা নেই? এক-এক সময় ভাবতে খুবই খারাপ লাগতো, এত বড় একটা কীর্তি অসমাপ্ত থেকে যাবে। এত বড় একটা উন্নতির স্কীম এইখানে এই জঙ্গলের মাঝখানে জল বালি আর পাথরের ওপর মবচে ধরে পড়ে থাকবে। কোনারকের মন্দির দেখেছি—একটা অসম্পূর্ণতার ব্যথায় সেই মন্দিরের গায়ে ফাটল ধরে আছে। কিন্তু সেটা খুব বেশী দুঃখ দেয় না। কোনারকের স্থাপত্যগরিমা যৌবন পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল, তার পরেই কোন্ এক দুর্ভাগ্যে শুধু তার রূপসজ্জা পূর্ণ করার সময়টুকু আর হয়নি। ভগ্নস্তূপও কত দেখেছি, গোয়ালিয়রের প্রান্তরে উজ্জয়িনীর গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে, কাঁটার ঝোপে ছেয়ে গেছে। দেখে তবু খুব বেশী দুঃখ হয় না। এক বৃদ্ধের কঙ্কালের মতো মনে হয়—জীবনের সব ভোগের মুহূর্ত পার হয়ে আয়ুক্রমের শেষ পরিচ্ছেদে পৌঁছে তার মৃত্যু হয়েছে। এমন কিছু শোকাবহ ব্যাপার নয়।

কিন্তু নিমিয়াঘাট ব্যারেজ লাল্‌কি নদীর বাঁধ যদি আজ নষ্ট হয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতের কোন সার্ভেয়ার সত্যিই দুঃখে চমকে উঠবে—এক বিরাট কীর্তির শিশুদেহের এই চূর্ণাস্থি দেখে। অভিশাপ দেবে অতীতের এই মূঢ়দের যারা এই বাঁধকে অকালে হত্যা করলো—এই স্ট্রাইকওয়ালা মজুরদের।

স্ট্রাইকটা আমারও ভাল লাগছিল না। একটা দুর্বুদ্ধির চক্রান্ত বলেই মনে হতো। তারপর সত্যি করে একদিন আমিও বড়মামার মতো একটা প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন ছটফট করে উঠলাম। কারণ, যে-দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্ষমার অবকাশ রইল না। হোক না মজুর আর কেরানী, যতই গরীবই হোক না কেন—ওদের বুদ্ধিতে পাপ ঢুকেছে। দেখলাম দুটো গার্ড তিলক রায়কে কাঁধে তুলে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে নিয়ে এল। তিলকের গায়ের জামাকাপড় সব রক্তে ভিজে গেছে—মাথায় একটা পটি বাঁধা। ধর্মঘটীরাই তিলককে মেরেছে। এই সর্ববিভাগীয় ধর্মঘটে শুধু তিলক রায়ের কুলির দল যোগ দেয়নি। যোগ দেবে কেন? তিলক রায়ের দল খুশীই ছিল। দিন ছ'আনা হিসাবে তারা হপ্তা পায়, মেঠাই কাপড় কেনে, দৌড়ে দৌড়ে ঘন ঘন বাড়ি যায়, ছেলেমেয়েদের দেখে আসে। বাড়ি থেকে পুঁটুলি বেঁধে চিঁড়ে নিয়ে আসে। কাজ করতে করতে যখন একটু জিরিয়ে নেবার ইচ্ছা হয়, তখনি শাল-পাতা ভেঙে ঠোঙা তৈরী করে নেয়। লাল্‌কি নদীর বালি খুঁড়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল বার করে। খেতে খেতে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির তোয়াজে ওরা নিজেরাও যেন চিঁড়ের মতো ভিজে যায়। তিলক রায়ের দল এই মজুরীর দাবীর লড়াইয়ে সামিল হয়নি। সিটি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঠিক নিয়ম মতো কোদাল নিয়ে কাজে নেমে পড়ে।

কোম্পানীর গার্ডেরা আর একটি লোককে ধরে নিয়ে এল। একে আমরা আগে কখনো দেখিনি। ভদ্রলোকের ছেলে, বয়স চব্বিশ-পচিশের বেশী হবে না, চোখে চশমা আছে, গায়ে খদ্দরের চাদর।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার বললেন—তুমি কে হে জেন্টেলম্যান? কোত্থেকে এসেছ?

যুবকটি উত্তর দিল—আমি ডাক্তার, হোমিওপ্যাথিকচিকিৎসা আমার পেশা। এখানে আমার বহু পেসেণ্ট আছে।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার—আমাদের এখানে বুঝি ডাক্তার নেই? তুমি এখানে ট্রেসপাস করতে এসেছে কেন?

যুবক—আপনি চীফ জাষ্টিস্ নন যে আমার বিচার করতে আরম্ভ করেছেন। আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তবে পুলিশে খবর দিন। আদালতেই

বিচার হবে আমি ট্রেসপাস করেছি কিনা।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার একটা বেত দেখিয়ে বললেন—আপাততঃ এইটাই হলো আদালত। এখানে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার কর আর কখনো আমার এলাকায় ঢুকবে না।

যুবক—আমার রোগী দেখতে আমি আসবই।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার—অল রাইট!

ডাক্তারকে গার্ডেরা ধরে কোথায় নিয়ে গেল বুঝলাম না। সমস্তদিন একটা আশঙ্কায় গায়ে কাঁটা দিতে লাগলো। সন্ধ্যাবেলা বড়মামাকে বললাম—কি ব্যাপার বড়মামা?

বড়মামা—ওই ছেলেটাই এই স্ট্রাইক্‌টা করিয়েছে।

রাত্রিবেলা একটা গণ্ডগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বড়মামাকে একটা চাপরাশী ডাকতে এল। মজুরেরা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলো ঘিরে ফেলেছে। ইট পাথর ছুঁড়ছে। থেকে থেকে সেই ক্ষিপ্ত জনতা হুঙ্কার ছাড়ছে—ডাক্তার-বাবুকো ছোড় দো।

বড়মামা গিয়ে চীৎকার করে জনতাকে আশ্বাস দিলেন—ডাক্তারবাবু আমার কাছে আছে, ভাল আছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে বিশ্বাস কর।

মাঠের দিক থেকে গুর্খা ফৌজের বিউগ্‌লের শব্দ শোনা গেল। বড়মামা হাতজোড় করে জনতাকে বললেন—ডাক্তারবাবুর জন্য আমি তোমাদের কাছে জামিন রইলাম। আমার কথা শোন, এখনি সরে পড় সব।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলোর ফটকটা আর কয়েকটা ফুলের টব ভেঙে দিয়ে ধর্মঘটি জনতা একটু মনের ঝাল মিটিয়ে সরে গেল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত একটা মানসিক উত্তেজনায় ঘুম আসেনি। সকালবেলা উঠতে একটু দেরী হলো। একটা খবর শুনেই কিন্তু মনটা হাল্কা হয়ে গেল। স্ট্রাইক্ মিটে গেছে। বড়মামা সালিশী করে সব নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। চার আনা নয়, মজুরীর রেট দু'আনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তিনি আর কখনো এদিকে আসবেন না। ধর্মঘটি মজুরদের আর একটা দাবী স্বীকৃত হয়েছে—তিলক রায়ের কুলির দল নতুন রেটে মজুরী পেতে পারবে না। যা আগে পাচ্ছিল, তারা তাই পাবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার এই সর্ত মেনে নিয়েছেন।

তিলক রায় লোকটা আর তার ভাগ্যটা চিরকালই হেঁয়ালির মতো। এই

খানে একটু দুঃখ রয়ে গেল। আমাদেরই ছেলেবেলার ভাট তিলক রায়। ওর মনের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তা ছিল। তাই বড়মামার ব্যবস্থাটা ন্যায়োচিত মনে হলো না। বড়মামা আমার আপত্তি শুনে হেসে ফেললেন—তিলকটা একটা গবেট, ঠিক হয়েছে।

বাঁধের কাজ জোরে এগিয়ে চলেছে। বর্ষার আগেই পিলারের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শুনলাম, নতুন একটা এক্সক্যাভেটার এসেছে। বডমামা খুব প্রসন্ন, শেয়ারের দাম চডেছে।

কদিন পরেই তিলক রায় এসে মুখভার করে বললো—বড়বাবু, আমাদের সবাইকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বড়মামা—হ্যাঁ, আর তোমাদের দরকার নেই। নতুন মেশিনটা এসে গেছে এখন ফালতু লোক ছেটে ফেলতে হবে।

তিলক—আমরা তো মাত্র এই কটি দেশী কুলি। সবারই কাজ রইল, শুধু আমাদের থাকবে না কেন বডবাবু?

বড়মামা—ওরে বাবা, তোর মতো চার হাজার গেঁয়ো কুলির কাজ করে দেবে ঐ একটা এক্সক্যাভেটার। তারপর তোদের কত রকম মরজি আছে, স্ট্রাইক করবি, ঘুমোবি, ছুটি চাইবি। কিন্তু এক্সক্যাভেটার তা করে না। তাকে বিশ্বাস করা যায়। তোদের করা যায় না। যতদিন দরকার ছিল, ততদিন ছিলি। এই-বার তোদের ছুটি।

তিলক—আমরা তো কখনো স্ট্রাইক কবি নাই বড়বাবু।

বডমামা—করতে পারিস তো। হঠাৎ মতিচ্ছন্ন হতে কতক্ষণ?

তিলক রায়কে দেখতাম, সমস্ত দিন ছুটাছুটি করে বেড়ায়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলোর বাইরে বটগাছটার ছায়ায় সকাল বিকেল বসে থাকতো তিলক। বড় সাহেবের কাছে একবার ধর্ণা দেবে—এই তার উদ্দেশ্য।

আর একদিন এসে তিলক বড়মামার কাছে প্রায় কেঁদে পড়লো—বডবাবু আজ আমাদের চাকৃতি আর কোদাল কেড়ে নিয়ে গেল।

বডমামা—মিছামিছি পড়ে আছিস্ কেন তোরা? কতবার তো তোকে বলেছি এইবার তোদের চলে যাওয়া উচিত। যা ঘরে গিয়ে ক্ষেতখামার দেখ। একদিন তো যেতেই হতো।

তিলক—বিনা দোষে কোম্পানী আমাদের সর্বনাশ করে দিল বড়বাবু।

বড়মামা—কি বলছিস তিলক? তোরাই তো ভবিষ্যতের রাজা। এই খালগুলি দিয়ে যখন জল ছুটতে আরম্ভ করবে, তখন তোদের জমির দাম কোথায়

গিয়ে উঠবে, ভাবতে পারিস ? তোদের মাটিকে কোম্পানী যে সোনা করে দিল রে মূর্খ।

তিলক মাত্র আর একদিন এসেছিল। সেদিন ধাওড়া খালি করে দেবার জন্য ওদের ওপর অর্ডার হয়েছে। জোলা কুলিরা প্রায় সবই তখনই এলাকা ছেড়ে গাঁয়ের পথে মেলা দিয়েছে। কুর্মিরা কিছু কিছু রয়ে গেছে। ধাওড়ার সামনে একটা পাকুড়গাছের তলায় একটা পাঁঠা বলি দিল কুর্মিরা। মাংস রাঁধলো, হাঁড়ি ভরে ভরে পচাই মদ কিনে আনলো। দুপুর থেকেই মাদল পিটিয়ে বিদায় উৎসবকে মাতিয়ে তুললো।

রাত্রিবেলা গার্ডদের চীৎকার দৌড়াদৌড়ি আর জলস্রোতের শব্দে আবার একটা অতিপ্রাকৃত কোন কাণ্ড ঘটেছে মনে হলো। বড়মামা বেরিয়ে গেলেন। জেগে বসে আছি। প্রায় শেষ রাত্রে বড়মামা ফিরলেন।

বড়মামা বললেন—তিলক রায় খতম।

—কি হলো ?

বারুদ দিয়ে একটা পিলার ব্লো করে দিয়েছে তিলক। বাঁধের একটা সাইডে ভয়ানক জলের চোট এসে লাগছে। আজ সারা রাত কাজ হবে।

—তিলক কোথায় ?

—মরে পড়ে আছে, একেবারে থেঁতলে গেছে।

ভাট তিলক রায়ের জীবনী এইখানে শেষ। ভারতবর্ষের ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজেশন সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে, আজ এতদিন পরে তিলক রায়ের কথা প্রথমে মনে পড়ে গেল। ভাট তিলক যেন সত্যিই ইতিহাসের প্রেতের মতো। যখের মতো অতীতের যত অভিমান পাহারা দিত। বহুরূপী হয়ে সে আমাদের বর্তমানকে ব্যঙ্গ করতো। ভবিষ্যৎকে সে সইতে পারলো না। তার সংশয়টাকে শেষ পর্যন্ত সে চরম সত্য বলে জেনে গেল। তিলক রায় যেন সেই প্রচণ্ড বন্য আত্মা, ক্যাপিটাল আর ইণ্ডাস্ট্রির কলের মারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করে যে ফুরিয়ে গেল।

রূ প ন গ র

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেলেন 'ফুলের রাণী'।

আর যাঁরা প্রতিযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় আর

চতুর্থ পুরস্কার পেলেন যথাক্রমে, উৎসবের সজ্জে সাঁসতাল মেয়ে, কাঁখে গাগরী রাজস্থানী বধূ, আর ঐতিহাসিক মোগল হারেমের এক সুন্দরী।

চমৎকার সাজ, একেবারে নিখুঁত সাজ। ছদ্মবেশের এইসব রূপের কাছে একেবারে খাঁটি ও অকৃত্রিক রূপও হার মেনেছে। রঙীন রেশমী কাপড়, জরির ঝালর, ফুলের স্তবক আর তীব্র বিজলী বাতির মালা দিয়ে সাজানো ওই মঞ্চের উপর যে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেটা হলো ফ্যান্সি ড্রেসের আসর। ছদ্মসাজে বিচিত্ররূপিণী হয়ে যাঁরা এখন ওই আসরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা কোন বিচিত্র সংসারের মানবিকা নন। তাঁরা রায়গড নামে এই ছোট জনপদের যত অফিসারের গৃহিণী আর দুহিতা। কিন্তু কার সাধ্যি আছে, দশ মিনিট ধরে তাকিয়ে থেকেও বলে দিতে পারে, কে মিসের কাপুর, কে শ্রীমতী মাণিকা দাশগুপ্ত, কে মিস নিয়োগী, আর, কে-ই বা গীতা, চন্দ্রা ও জাহানারা ?

যাঁরা এই প্রতিযোগিতা বিচার করে নম্বর দিলেন, তাঁরাও কি কাউকে চিনতে পেরেছেন ? না, মিস্টার কাপুরও চিনতে পারেননি যে, তাঁরই গৃহিণী, যাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তিনিই এখন ওই মঞ্চে ঐতিহাসিক মোগল হারেমের এক তরুণী সুন্দরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বুড়ো মানুষ খোসলা সাহেবও চিনতে পারলেন না যে, তাঁরই নাতনী গীতা, যার বয়স ষোল বছর পার হয়নি, সে এখন এই বিচিত্র সাজের আসরে থুড়থুড়ি এক সন্ন্যাসিনী বুড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর মালা জপছে। খোসলাসাহেব চোখ টান করে বলে উঠলেন, বুঝেছি, নিশ্চয় চন্দ্রাকি দাদী এই সন্ন্যাসিনী সেজেছেন।

তিন বছর আগে এই রায়গড়ের এখানে মানুষের কোন বসতি ছিল না। ছিল শুধু জওয়ার ভুট্টা আর অড়হরের ক্ষেত। আর, খেজুরের জঙ্গল। কৃষির যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর একটি কারখানা, আর ট্র্যাক্টর ট্রেনিং-এর একটি কেন্দ্র স্থাপন করে সরকার এখানে দেড় কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছেন বলেই পুরনো গেঁয়ো রায়গড় এখন একটি আধুনিক জনপদে পরিণত হয়েছে। চীফ এঞ্জিনিয়ার খোসলা সাহেব ডাক বিভাগের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছেন, পোস্ট অফিসের নাম রায়গড় না রেখে রূপনগর করা হোক। অফিসারদের সকলেরই ইচ্ছে, এই ছোট্ট কারখানা শহরটির নাম রূপনগর হোক। আগ্রা রোড ধরে সেকেলে ইতিহাসের সুন্দর বিলাসপুর সেই মাণ্ডু যাবার পথে এই নতুন কারখানা শহরটিকে দেখতে পাওয়া যায়। রুক্ষ বিন্ধ্যগিরির মাথার উপরে যখন কালো মেঘ আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে ওঠে, সন্ধ্যার আঁধার আরও নিবিড় হয়, আর বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়তে থাকে, তখন এই শহরের শত শত বিজলী বাতির আলোও যেন ধারাস্নানের

আনন্দে গলে গিয়ে হাসতে থাকে। তখন সত্যিই যে শহরটিকে একটি অবাস্তব জগতের রূপনগর বলে মনে হয়।

তবু নিতান্ত বাস্তব ধুলো মাটি আর পাহাড়ের শহর। কারখানার ফার্নেস ধক-ধক করে তাপের জ্বালায় জ্বলে, লোহা গলে। যন্ত্রের অস্ত্রে লোহার চাপ কেটে কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, কঠিন লোহার আর্তনাদও বড় অদ্ভুত হয়ে বাজে। তার উপর আছে, ওদিকের ট্রাক্টরের কঠোর স্বরের হর্ষনাদ।

এরই মধ্যে দেখা যায়, অফিসারদের বাংলোর ফটকে রঙীন বুগেনভিলিয়া দুলছে, আর, একটু দূরে খেজুরবনেব নিরালাতে ট্রানজিস্টর রেডিওতে গজলগান উৎসারিত হয়ে ঝর্ণার জলের শব্দের সঙ্গে ছুটোছুটি করছে। বোধহয় গীতা আর ওর দুই ভাই এই রেডিও বাজিয়ে ওখানে ছুটোছুটি করছে।

অফিসারদের কাজের জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে অবসর থাকে, সে অবসর বেশ ভাল করে সার্থক করে নেবার একটা ব্যবস্থা তাঁরা নিজেরাই করে নিয়েছেন। মাণ্ডু বেড়াতে যাওয়া, খেজুরবনে পিকনিক আর বছরে তিনবার এই ফ্যান্সি ড্রেসের আসর।

পুরনো মাণ্ডু আজ একেবারে নীরব হয়ে তাব যত মহল চবুতরা আর টলমলে জলের বউলি নিয়ে নিরালার সমাধির মতো পড়ে আছে তবু দেখতে কত সুন্দব। পাথরের হিন্দোলা মহল সত্যই যেন দুলছে বলে মনে হয়। চম্পা বউলির জল মাথায় ছিটিয়ে গীতা কলকল করে হেসে ওঠে, সত্যিই যে এই জলে চাঁপা ফুলেব গন্ধ!

সত্যিই কি মাণ্ডুর সেই সুন্দরী নারী, বাজবাহাদুরের প্রেমের নায়িকা সেই রাজপুতানী রূপমতীর খোঁপার চাঁপার গন্ধ এই জলে আজও মিশে আছে? এই বউলির জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন রূপমতী। আর, ওই তো রূপমতীর চবুতরা। এখানে দাঁড়িয়ে আজও দেখা যায়, রূপমতী যেমন দেখতেন, নীচের সবুজ সমতলের বুকের উপর দিয়ে নর্মদার প্রবাহ রূপোর অজগরের মতো এঁকে বেঁকে গড়িয়ে গিয়েছে।

রূপমতীর গল্পটি বড় চমৎকার, বেশ মিষ্টি করুণ গল্প। রূপমতী নামটিও বেশ। অফিসারেরা তাই বোধহয়, গেঁয়ো রায়গড়ের এই কারখানা শহরটিকেও রূপনগর নাম দিয়ে একটু শখের ঐতিহাসিকতা করতে চাইছেন। কে জানে জলে ডুবে মরণ-বরণ-করা রাজপুতানী সুন্দরী সেই রূপমতী আর রাতের বৃষ্টির জলে ভেজা এই রায়গড়ের মধ্যে রূপের কী মিল থাকতে পারে!

ফ্যান্সি ড্রেসের প্রতিযোগিতা এই নতুন রায়গড়ের জীবনে, তার মানে

রূপনগরের জীবনে একটি বিপুল খুশির উৎসব! এই উৎসবের হর্ষ সবচেয়ে বেশি মত্ত হয়ে ওঠে তখন, যখন মিসেস খোসলা একে একে নামগুলি ঘোষণা করতে থাকেন। অর্থাৎ, ছদ্মবেশিনীদের পরিচয় প্রকাশ করে দেন।

প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে, সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে ফুলের রাণী! মিসেস খোসলা আসরের এক পাশে দাঁড়িয়ে নাম ঘোষণা করে দিলেন—চন্দ্রা নিয়োগী, ফুলের রাণী, ফার্স্ট!

হাততালি বাজে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা হই-হই করে লাফিয়ে ওঠে। কাপুর সাহেব ঘাড় দুলিয়ে হাসতে থাকেন। ডাক্তার দাশগুপ্ত চেঁচিয়ে ওঠেন—ওয়াণ্ডারফুল!

দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থের নামও ঘোষণা করা হয়ে যায়। সবই যেন এক-একটি বিস্ময়ের ঘোষণা। সভার মানুষ সকলেই খুশি হয়ে বলতে থাকেন—চমৎকার, চমৎকার!

কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, সবচেয়ে চমৎকার হলো ওই ফুলের রাণী। এবং সত্যিই একটি অভাবিত বিস্ময়। এই রূপনগরের অফিসারদের ঘরে ঘরে এত সুন্দরী মেয়ে থাকতে চন্দ্রা নিয়োগী ফুলের রাণী সাজতে সাহস করেছে! আর, সেই সাহসের জয়ও হয়েছে। এই ফুলের রাণীর রূপের কাছে মোগল হারেমের সুন্দরীর রূপও সেকেণ্ড হয়ে গিয়েছে।

অথচ চন্দ্রা নিয়োগী দেখতে একটুও সুন্দর নয়। স্টোরবাবু বলাই নিয়োগীর মেয়ে চন্দ্রা দেখতে বেশ কালো, কপালটাও বেশ চাপা, আর নাকের গড়নও বেশ মোটা। মিসেস খোসলা চন্দ্রাকে খুব বেশি ভালবাসেন বলেই একটা কথা বলেন—চন্দ্রার মুখের হাসিটি কিন্তু খুব সুন্দর।

এ কথার সরল অর্থ এই যে, চন্দ্রা মোটেই সুন্দর নয়। এই সত্য চন্দ্রাও যে বুঝতে পারে না, তা নয়। কিন্তু সেজন্যে চন্দ্রার জীবনে যেন কোন দুর্ভাবনা নেই।

অথচ আর সকলেই ভাবছেন। ভাবছেন চন্দ্রার বাবা আর মা। ভাবছেন চন্দ্রার মামার বাড়ির মানুষগুলি। এমন কি এই রূপনগরের মিসেস খোসলাও ভাবেন, চন্দ্রাকে পছন্দ করে বিয়ে করবে, এমন কোন ভাল পাত্র কি সত্যই পাওয়া যাবে?

কলকাতায় মামাবাড়িতে থেকে লেখা-পড়া শেখবার সুযোগ পেয়েও সে সুযোগ ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছে চন্দ্রা। আই, এ, পরীক্ষাটাও দিল না। তা ছাড়া, কলকাতায় থাকলে চন্দ্রার জন্যে পাত্রের খোঁজ নেওয়া, পাত্রপক্ষকে মেয়ে দেখানো, সবই আগের মতো চলতে পারতো। কিন্তু চন্দ্রা মেয়েটা নিজেই

যেন হঠাৎ অশান্ত হয়ে, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে, বড়মামার কথা অগ্রাহ্য করে এই রূপনগরে চলে এল। চন্দ্রার মা-র কাছে বড়মামী চিঠি লিখেছিলেন, চন্দ্রা কেন যে এভাবে ছটফটিয়ে পালিয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না।

সত্যিই, বড়মামীর মনে হয়েছিল, মেয়েটা যেন কলকাতার জীবনের মধ্যে একটা দুঃসহ শাস্তি কিংবা ভয় দেখতে পেয়ে ওভাবে ব্যস্ত হয়ে হঠাৎ একদিন রূপনগরে চলে গেল। মানুষ এভাবে কোথাও চলে যায় না, পালিয়ে যায়!

প্রায় দু'বছর হয়েছে রূপনগরে আছে চন্দ্রা। এখানে এসে বিন্ধ্যগিরির মাথার উপরে মেঘের ঘটা দেখে কলকাতার আকাশের কোন মেঘের কথা এই মেয়ের মনে পড়ে কিনা সন্দেহ। চন্দ্রার বাবা আর মা দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছেন, কলকাতায় যাবার জন্যে চন্দ্রার মনে কোন আগ্রহ নেই।

তাঁরা আশ্চর্য হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বুঝতেও পেরেছেন, কেন এই রূপনগরের আলো-ছায়ার সঙ্গে মনে-প্রাণে মিশে গিয়েছে চন্দ্রা। প্রথমে একটু সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু পরে বুঝে নিতে আর কোন অসুবিধে ছিল না, কেন চন্দ্রার মনে কলকাতাতে ফিরে যাবার কোন চাড় নেই। আজ শুধু চন্দ্রার বাবা আর মা নন, মিসেস খোসলাও জানেন, এমন কি ওই গীতাও জানে, তাছাড়া ডাক্তার দাশগুপ্ত আর কাপুর সাহেবও জানেন, চন্দ্রা কেন কলকাতায় ফিরে যেতে চায় না!

এখানে আসবার ঠিক এক মাস পরে কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিল চন্দ্রা। রওনা হবার দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেল না চন্দ্রা। মিসেস খোসলা জানেন, ওই ছোকরা বাঙালী এঞ্জিনিয়ার অরুণ মজুমদার এখানে সার্ভিস নিয়ে যেদিন এল, ঠিক সেদিনই চন্দ্রা বলেছিল—আমার বোধহয় এখন কলকাতা যাওয়া হবে না।

গীতা খোসলা কতবার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছে, নিয়োগীবাবুর বাংলোর দিকে তাকিয়েছে, আর মুখ টিপে টিপে হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। দেখতে পেয়েছে গীতা, অরুণ মজুমদার ওদিক থেকে আসছেন, আর চন্দ্রাদি বাড়ির বারান্দায় রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

অরুণ মজুমদার বলে—কেমন আছেন?

চন্দ্রা হাসে—ভাল।

অরুণ মজুমদার—কি করছেন?

চন্দ্রা আবার হাসে—কিছু না।

অরুণ মজুমদারও হেসে ফেলেন—ভাল।

চলে যান অরুণ মজুমদার। গীতা খোসলা ছুটে এসে চন্দ্রার কাছে দাঁড়িয়ে

হাসতে থাকে।—আমি বাংলা বুঝি চন্দ্রাদি।

বুঝতে কি আর সত্যিই কিছু বাকি আছে? চন্দ্রা নিয়োগীর মুখের হাসিটি খুব সুন্দর, মিসেস খোসলার কথাটা বোধহয় খুবই বিশ্বাস করে চন্দ্রা। তা না হলে, রোজই সকাল বিকেল ও সন্ধ্যায় এমন একটি স্মিত অভ্যর্থনার মূর্তি হয়ে আর বারান্দার রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে অরুণ মজুমদারের যাওয়া-আসার পথের উপর চোখ রাখবে কেন চন্দ্রা?

নিশ্চয় আশা করে চন্দ্রা, এই অভ্যর্থনা একদিন সফল হবে। সত্যিই একদিন থমকে দাঁড়াবেন অরুণ মজুমদার, আর, ওই দুটি কথার সঙ্গে অন্য কোন কথাও বলে ফেলবেন।

মিসেস খোসলার কাছে দুঃখ করে অনেক কথা বলেছেন চন্দ্রার মা—হলে তো ভালই হতো। আমার মেয়ে শুধু দেখতে কালো, তাছাড়া আর তো কোন খুঁত নেই। অরুণ মজুমদার আমার মেয়েকে বিয়ে করলে নিশ্চয় সুখী হতেন।

মিসেস খোসলা বলেন—নিশ্চয়, আমিও এই কথা একশো বার বলবো। কিন্তু কথা হলো, একজনের আশাতে তো কিছু হবে না। মজুমদারও যদি আশা করতো যে···।

ডাক্তার দাশগুপ্ত একদিন কাপুর সাহেবকে বলেছেন—আমি মজুমদারের কাকাকে চিঠি লিখেছিলাম। কাকা জবাব দিয়েছেন, হ্যাঁ, মেয়ে যদি সুন্দর হয় তবে বিয়ের কথা তুলতে পারি। কিন্তু আমাদের চন্দ্রা তো ··।

মিস্টার কাপুর বলেন—আমিও একদিন মজুমদারকে একটু বাজিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি। মনে হলো, চন্দ্রার জন্য মজুমদারের মনে কোন ইচ্ছে-টিচ্ছে নেই।

সেজন্যে মজুমদারকে দোষ দেওয়া যায় না। এখানে এসে অন্তত দশবার মাণ্ডু বেড়াতে গিয়েছেন অরুণ মজুমদার। রূপমতীর প্রেমের গল্পও শুনেছেন। রূপমতীর খোঁপার ফুলের গন্ধ আজও চম্পা-বউলির জলে ভাসছে, সেই ইতিহাসের দেশে এসে চন্দ্রা নিয়োগীর মতো মেয়ের মুখে রূপ দেখতে পাওয়া কঠিন বইকি। অসম্ভবও বলা যায়।

তাই অরুণ মজুমদারকেও বিস্মিত হতে হয়েছে, মিসেস খোসলা যখন নাম ঘোষণা করলেন—চন্দ্রা নিয়োগী, ফুলের রাণী, ফার্স্ট।

সত্যি কথা ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে ওই ফুলের রাণীর দিকে তাকিয়ে অরুণ মজুমদারের মনে রাজপুতানী সুন্দরী রূপমতীর কথাই বার বার মনে পড়েছে। মস্ত বড় একটা পদ্মস্তবকের গায়ে চিবুক ছুঁইয়ে বসে আছে ফুলের রাণী। অসম্ভব নয়, রাজপুতানী রূপমতীও হ্রদের জলে স্নান করতে নেমে ঠিক এভাবে ফোঁটা

পদ্মফুলের গায়ে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। কী অদ্ভুত হাসি, আর চোখের পাতার মধ্যে কী নিবিড় স্বপ্নালুতার আবেশ। অরুণ মজুমদার নিজেও ফুলের রাণীকে দশের মধ্যে দশ নম্বর দিয়েছেন।

কিন্তু এতক্ষণে জানতে পারা গেল, এ এক নিদারুণ ছলনা। স্টোরবাবু বলাই নিয়োগীর মেয়ে চন্দ্রা নিয়োগীই হলেন এই ফুলের রাণী।

এই দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম নয়, আরও কয়েকবার ঠিক এভাবেই চন্দ্রা নিয়োগীর নিখুঁত ছদ্মবেশের আর রূপ-ছলনার কীর্তি দেখতে পেয়েছেন অরুণ মজুমদার। বিস্মিত হয়েছেন, প্রশংসা করেছেন অরুণ মজুমদারও। সেবার তপোবনের শকুন্তলা হয়ে ফার্স্ট প্রাইজ নিয়েছিল যে, সে এই চন্দ্রা নিয়োগী। আর একবার অজন্তার পুরনারী হয়ে এই চন্দ্রা নিয়োগীই প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছিল। চন্দ্রা যেন রূপসী সাজতেই পছন্দ করে। আর, কি আশ্চর্য দেখতে একটুও ভাল নয় এমন একটা মেয়ে নিজেকে কী নিখুঁত রূপসীই না করে তুলতে পারে!

কিন্তু ওতে কি আসে যায়? অরুণ মজুমদার খুশি হয়ে যাকে বেশি নম্বর দেন, সে তো একটা মিথ্যার সুন্দরসাজ। অরুণ মজুমদার তাঁর কারখানা আর অফিস যাবার পথে রোজ যাকে দেখতে পান, সে মেয়ে হলো স্টোরবাবুর মেয়ে চন্দ্রা, বেশ কালো, কপালটা বেশ চাপা, আর নাকটাও বেশ একটু মোটা।

বুঝতে কি আর কোন অসুবিধে আছে, ওরকমের নকল রূপসীপনা করে কার চোখে রঙ ধরিয়ে দিতে চাইছে চন্দ্রা?

সত্যি কথা, অরুণ মজুমদার মনে মনে বেশ একটু বিরক্তও হয়েছেন, কারণ চন্দ্রা নিয়োগীর চোখের ভাষাটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। বুঝবার যে-টুকু বাকি ছিল, সেটা ডাক্তার দাশগুপ্ত আর মিস্টার খোসলার ভালমানুষী কথাবার্তার রকম-সকম দেখেই বুঝে নিতে পারা গিয়েছে।

গীতার শাসনের হুমকি দেখে চন্দ্রা নিয়োগী সাবধান হয় না। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই দেখা গেল, অরুণ মজুমদার খুব সাবধান হয়ে গিয়েছেন। দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রা নিয়োগী, অরুণ মজুমদার পথ হেঁটে চলে যান। কিন্তু আর ভদ্রতা করে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করে না। এমন কি চন্দ্রার দিকে তাকাতেও কুণ্ঠা বোধ করেন অরুণ মজুমদার। বোধহয় বুঝিয়ে দিতে চান অরুণ মজুমদার, যা কখনো হবে না, যেটা সম্ভব নয়, সেটার জন্যে মিথ্যে একটা গল্প সৃষ্টি করে লাভ নেই। অরুণ মজুমদার রূপনগরে এসে একটু স্বস্তিতে থাকতে চান।

কাপুর সাহেব একদিন অরুণ মজুমদারের সঙ্গে কথায় কথায় বেশ একটু স্পষ্ট

করে বলেই ফেললেন—আমাদের নিয়োগীবাবুর মেয়ে চন্দ্রা সত্যিই খুব ভাল মেয়ে।

অরুণ মজুমদার হাসেন—নিশ্চয়।

কাপুর সাহেব বলেন—আপনি তো ব্যাচিলর মানুষ।

অরুণ মজুমদার—হ্যাঁ।

কাপুর সাহেব—তবে বলুন।

হাসতে চেষ্টা করেন অরুণ মজুমদার, কিন্তু হাসতে পারেন না। বরং একটা ক্ষুব্ধ আপত্তির স্বর বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—ফ্যান্সি ড্রেস তো একটা আন-রিয়্যালিটি, তাকে হাততালি দিয়ে খুশি করা যায়, ভাল নম্বর দেওয়া যায়। কিন্তু…।

দুই

অরুণ মজুমদার যদি চোখ তুলে তাকাতেন তবে দেখতে পেতেন যে, স্টোরবাবু বলাই নিয়োগীর বাড়ির বারান্দার কাছে শুধু একা বুগেনভিলিয়া দুলছে তার কাছে চন্দ্রা নিয়োগীব ছায়াটাও নেই। তাকান না, তাই বুঝতে পারেন না, চন্দ্রা নিয়োগী ওখানে আর দাঁড়িয়ে থাকে না। পুরো ছ'টি মাস পার হয়ে গিয়েছে, চন্দ্রাকে এ বাড়ির বারান্দায় কোন সকালে বিকালে বা সন্ধ্যায় পায়চারী করতে গীতাও দেখতে পায়নি। গীতারও সন্দেহ হয়েছে, কি-যেন ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

চোখেও দেখতে পেয়েছে গীতা, চন্দ্রাদি যেন একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে। চন্দ্রাদির মুখে সেই হাসিটাই আছে, কিন্তু চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের উদাস হয়ে কোন্ দিকে যেন তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বেশ চিকচিকও করে।

অরুণ মজুমদার কিন্তু এপথে হাঁটতে গিয়ে বেশ একটু সাবধান হয়ে চলেন। নিয়োগীবাবুর বাড়ির এই বারান্দা কিংবা জানালার দিকে ভুলেও তাকান না। ওখানে সত্যিই কেউ নেই, কিন্তু অরুণ মজুমদার মনে করেন, সত্যিই কেউ এক-জন বড়-বড় দুটো অপলক চোখ তুলে অরুণ মজুমদারকে যেন একটা পিপাসা দিয়ে গ্রাস করবার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

একদিন গীতা খোসলার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল, তাই তাকাতে হলো। এই গীতা মেয়েটার চোখে সব-সময় যেন একটা ধূর্ততার মতলব হাসছে। গীতাই হঠাৎ বলে উঠল—ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন অরুণদা, কী চমৎকার বুগেন-ভিলিয়া ফুটেছে।

তাকিয়ে দেখলেন অরুণ মজুমদার। হ্যাঁ, সত্যিই ফুলের ভারে বেগুনি বুগেন-ভিলিয়ার ডাল নুয়ে নুয়ে দুলছে।

কথাটা বলেই চলে গিয়েছে গীতা। কিন্তু অরুণ মজুমদার তবু এক মিনিট থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন আর দেখলেন, শুধু বুগেনভিলিয়া, আর কেউ সেখানে নেই। চমকে ওঠেন নি, কিন্তু একটু আশ্চর্য হলেন অরুণ মজুমদার। নিয়োগীবাবুর বারান্দাটা যে সত্যিই শূন্য হয়ে গিয়েছে।

তারপর রোজই; একবার না একবার তাকিয়ে দেখতেই হয়, কেউ ওখানে আছে কিনা। শুধু একা বুগেনভিলিয়া, কিংবা তার সঙ্গে একটা মেয়ের মূর্তি?

না, পুরো একটি মাস পার হতে চললো, তবু আর কোন মুহূর্তে ওই বারান্দায়, কিংবা, জানালায়, অথবা ফটকের কাছে চন্দ্রা নিয়োগীকে দেখতে পেলেন না অরুণ মজুমদার।

একদিন মাণ্ডুর পুরনো রাজপ্রাসাদ জাহাজ-মহলে এসে অফিসারদের দল আর তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দল একটা চায়ের মজলিস করে আর হৈ-হৈ করে চলে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য, চন্দ্রা নিয়োগী আসেনি।

আরও অদ্ভুত কাণ্ড, এবারের ক্যান্সি ড্রেসের প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হলেন এক কাশ্মীরি মেয়ে-মাঝি, অর্থাৎ অহল্যা নিগম, সার্ভেয়ার বিজয় নিগমের স্ত্রী।

ছদ্মরূপের প্রতিযোগিনীদের নাম ঘোষণা করলেন মিসেস খোসলা। তাই বুঝতে পারা গেল, চন্দ্রা নিয়োগী নেই। এই প্রথম, চন্দ্রা নিয়োগী এই ছদ্মরূপের আসর থেকে দূরে সরে গিয়ে কোথায় যেন নিজেকে একেবারে একলা করে রেখে দিয়েছে।

রূপমতীর গল্পটা বেঁচেই আছে, নতুন রূপনগরও আছে। সবই আছে। বিন্ধ্যগিরির মাথার কালো মেঘ আর দূরের নর্মদার আঁকা-বাঁকা প্রবাহের সাদা রেখাটি, সবই ঠিক আছে। কিন্তু অরুণ মজুমদারের মনে তবু একটা অস্বস্তি. চন্দ্রা নিয়োগীর মতো মেয়ে এত অন্যরকম হয়ে যায় কেমন করে?

দেখতে পেয়েছে গীতা খোসলা, আর আড়ালে মুখ টিপে হেসেছে, অরুণ মজুমদার আজকাল এই পথ দিয়ে যাবার সময় বড়ই আস্তে আস্তে হাঁটেন। বার বার নিয়োগীবাবুর বাড়ির বারান্দার দিকে তাকান। আর, তাকাতে গিয়ে যেন অনেকদিনের চেনা একজনের মুখ দেখবার একটা আশা ভদ্রলোকের চোখে ছটফট করে।

ব্যর্থ আশা। কোনদিনও চন্দ্রা নিয়োগীকে দেখতে পান না অরুণ মজুমদার। কম দিন তো নয়, ন'টা মাস পার হয়ে গিয়েছে, রূপনগরের প্রায় সবারই সঙ্গে

কতবার দেখা হয়েছে। কিন্তু ওই একজন, শুধু একা চন্দ্রা নিয়োগী নামে একটা মেয়েকে দেখতে পেলেন না অরুণ মজুমদার।

রূপমতী নয়, ঠিক তার উল্টো, নিয়োগীবাবুর পঁচিশ বছর বয়সের এই কালো মেয়ে এইবার যেন জীবন দিয়ে রূপমতীর গল্পের মতো একটা গল্প হয়ে উঠতে চাইছে। রূপমতী জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল, আর চন্দ্রা নিয়োগী নামে এই মেয়ে যেন আড়ালে লুকিয়ে থেকে মিথ্যে হয়ে যেতে চাইছে। অরুণ মজুমদার এই পথে যাবার সময় বার বার তাকিয়ে দেখেন, সত্যিই কি চন্দ্রা আজও ওখানে নেই?

একদিন, সেদিন কোথা থেকে একটা ঝড়ের হাওয়া এসে রূপনগরের যত বুগেনভিলিয়ার ডালপালাকে উতলা করে দিল। ওয়ার্কশপ থেকে নিজের বাংলোতে ফিরছেন অরুণ মজুমদার।

সন্ধ্যা এখনও হয়নি, তবু নিয়োগীবাবুর বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। আর, ঘরের দরজায় একটা রঙীন রেশমী কাপড়ের পর্দা খুশি পতাকার মতো ফুর-ফুর করে উড়ছে।

চমকে উঠলেন অরুণ মজুমদার। ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে টেবিলের ফুলদানিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কে? ও কি চন্দ্রা নিয়োগী? হতেই পারে না। অসম্ভব। নকল রূপমতী সাজতে পারে, ফ্যান্সি ড্রেস্‌সের আসরে দাঁড়িয়ে নকল রূপসীপণা দিয়ে চমৎকার ছলনা জাগিয়ে তুলতে পারে, সে মেয়ে এ-রকমের একটা সাদা-সিধা সাজে এমন গরবিণীর মতো বসে আছে কেন?

কিন্তু বুঝতে অসুবিধে নেই, সত্যিই সে চন্দ্রা নিয়োগী। ঘাড়ের উপর রুক্ষ চুলের রাশ এলিয়ে দিয়েছে, কুমকুমের একটা টিপ পরেছে। শাড়িটা রঙীন নয়, গায়ের জামাটাও একেবারে ধবধবে সাদা। আর, চিকচিক করছে কালো চোখ দুটো। কী ভয়ানক ফ্যান্সি সাজ!

বুঝতে পারেন না অরুণ মজুমদার, বুকের ভেতরটা কেন দুরুদুরু করছে। চন্দ্রা নিয়োগীকে আজ এত অদ্ভুত রকমের সুন্দর, আর অদ্ভুত রকমের নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে কেন?

কোথা থেকে ছুটে এসে অরুণ মজুমদারের দিকে তাকিয়ে আর দু'হাত দিয়ে মুখ চেপে হাসতে থাকে গীতা খোসলা।

অরুণ মজুমদার বলেন—কি হলো? হাসছো কেন গীতা?

গীতা বলে—কি দেখছেন?

অরুণ—মিস নিয়োগী বসে রয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

গীতা—হ্যাঁ। কিন্তু…।

অরুণ মজুমদার—কি?

গীতা—ফ্যান্সি ড্রেস নয়।

অরুণ মজুমদার হাসতে চেষ্টা করেন।—তবে কি?

গীতা—কলকাতা থেকে দু'জন বাঙালীবাবু এসেছেন, রেস্টহাউসে আছেন।

—কেন?

—চন্দ্রাদিকে দেখতে এসেছেন।

—কেন?

—চন্দ্রাদির বিয়ের কথা চলছে?

—কেন? অরুণ মজুমদারের প্রশ্নটা যেন নিদারুণ একটা শূন্যতার আর্তনাদ হয়ে বেজে ওঠে।

গীতা বলে—আমি কেমন করে বলি? আপনি বুঝে দেখুন।

অরুণ মজুমদারের নিঃশ্বাসের বাতাসও যেন জ্বলতে শুরু করেছে। গীতা খোসলাকেই ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন অরুণ মজুমদার।—কি ভেবেছেন তোমার চন্দ্রাদি? উনি সত্যিই একটি রূপমতী?

গীতা বলে—সে কথা চন্দ্রাদিকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন?

—নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করব। জিজ্ঞাসা করবার অধিকার আমার আছে। বলতে বলতে এগিয়ে যান, নিয়োগীবাবুর বাড়ির বারান্দার সেই বুগেনভিলিয়ার ছায়া পার হয়ে একেবারে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন; তারপর সত্যিই একেবারে চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে কথা বলে ফেলেন অরুণ মজুমদার।

—আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম বলে তুমিও আমাকে ভুল বুঝবে কেন?

চন্দ্রা মাথা হেঁট করে হাসে—না, ভুল বুঝিনি।

অরুণ মজুমদার—তবে এই যে শুনলাম, কলকাতা থেকে ভদ্রলোকেরা এসেছেন, রেস্টহাউসে আছেন; তোমাকে ওঁরা দেখবেন।

চমকে ওঠে চন্দ্রা—কে বললে?

—গীতা।

—তবে গীতাকেই জিজ্ঞেস করুন, কেন এ রকম একটা অদ্ভুত মিথ্যে কথা বলল।

কিন্তু কোথায় গীতা? গীতা তখন সার্ভেয়ার বিজয় নিগমের বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে অহল্যার সঙ্গে গল্প করছে আর মুখ টিপে হাসছে।

সকলেই জানেন, মিসেস সেনের মতো একজন বড় দিদিমণি ছিলেন বলেই এই মেয়ে-স্কুলের এত উন্নতি হয়েছে। আট বছরের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা আটগুণ বেড়ে গিয়েছে। স্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট শৈলেশবাবু এখন ভাবছেন, আর একটু চেষ্টা করলে, আর চারটে নতুন ঘর তুলে ফেলতে পারলে, আরও ভাল হয়। তখন সরকারের গ্র্যাণ্ট আরও বেশী করে পাওয়া যাবে। হাই স্কুল হবার মতো আরও দুটো ক্লাশ বাড়িয়ে ফেলতে পারা যাবে।

বড় দিদিমণি মীরা সেন এখন কিন্তু এই মেয়ে-স্কুলের কেউ নন। একটানা আট বছর ধরে কাজ করবার পর আজ তিনি সরে গিয়েছেন।

না, ঠিক অবসর গ্রহণের ব্যাপার নয়। মীরা দিদিমণি রিটায়ার করেননি। তিনি শুধু কাজ ছেড়ে দিয়ে সরে গিয়েছেন। কিন্তু সকলেই জানেন, মীরা সেন এখনও এই মেয়ে-স্কুলের সব খবর রাখেন। উন্নতির খবর শুনলে খুশি হন। কোন অসুবিধার, কিংবা কোন নিন্দার কথা শুনলে দুঃখিত হন।

এই তো সেদিন, শুনতে পেয়েছিলেন মীরা সেন, ইনস্পেকট্রেস এসে ইংরেজীর টিচার লতিকাকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। ছাত্রীরা ইংরেজীতে খুবই কাঁচা, কোন ছাত্রীই ছত্রিশের বেশি নম্বর তুলতে পারেনি। খবর শুনে, বেশ দুঃখিত হয়ে, লতিকাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন মীরা সেন। কিন্তু যায়নি লতিকা।

না যাবার কারণ এই নয় যে, মীরা সেনের সম্পর্কে লতিকার মনে কোন তুচ্ছতার ভাব আছে। শুধু লতিকা নয়, টিচারদের সকলেই স্বীকার করে মীরাদির মতো খেটে পড়াবার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু স্কুলের জন্য এত খাটতে গিয়েই তো মীরাদি তাঁর নিজের জীবনের এমন ভয়ানক একটা ক্ষতি ডেকে নিয়ে এসেছেন।

মীরা সেন এখন এই মেয়ে-স্কুল থেকে প্রায় এক মাইল দূরের এক হাসপাতালের যক্ষ্মা-ওয়ার্ডে থাকেন। স্কুলের সেই বাগান আজও আছে, যে বাগানের সব ফুলগাছে মীরাদি নিজের হাতে জল ঢালতেন। মীরাদির আদরের রঙ্গন আজও স্কুলের বাগান ভরে ফুটে থাকে; বাগানের রোদও যেন লালচে হয়ে হাসতে থাকে।

যক্ষ্মা-ওয়ার্ডে মীরাদির ঘরের সামনে এক টুকরো ঘেসো জমি। ঘাসের ছোট ছোট সাদাটে আর নীলচে ফুলের উপর মৌমাছি বেড়ায়। তার পরেই মেহেদির

বেড়া। হাসপাতালের মালী মেহেদির এই বেড়াকে ছেঁটে-কেটে বেশ পরিচ্ছন্ন করে রাখে। বেড়ার উপর বসে দুপুরের বুলবুল বেশ চমৎকার শিস দেয়।

কতই বা বয়স মীরাদির? সেক্রেটারী শৈলেশবাবুর স্ত্রী মনোরমা আর মীরা সেন, দু'জনেই ভাগলপুরের মেয়ে; দু'জনেই এক স্কুলের এক ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন। মনোরমার বয়স এখন যদি পঁয়ত্রিশ হয়, তবে মীরা সেনের তেত্রিশের বেশি হতে পারে না।

শৈলেশবাবু মাঝে মাঝে বেশ একটু অনুযোগের সুরে কথাটা বলেন বলেই মনোরমা, সেই সঙ্গে আরও কেউ-কেউ, মীরা সেনকে একবার দেখে আসবার জন্য হাসপাতালে যক্ষ্মা-ওয়ার্ডে যান। কিছু ফল, কিছু ফুল, দু'তিনটে গল্পের বইও তাঁরা নিয়ে যান।

শৈলেশবাবু বলেন—কী আশ্চর্য, মহিলা একেবারে একা-একা অসহায়ের মতো যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের একটা ঘরে পড়ে রয়েছেন। তোমাদের কি মাঝে মাঝে মহিলাকে একটু দেখে আসা উচিত নয়? আমাদের মেয়ে-স্কুলের জন্যেও যিনি এত খাটলেন, তাঁর সম্পর্কে তোমাদের একটু কর্তব্য আছে তো?

শৈলেশবাবুর স্ত্রী মনোরমা, তাঁর সঙ্গে বেনুর কাকিমা সুনন্দা,, দু'জনেই গিয়েছেন। দু'জনেই দেখে খুশি হয়েছেন, আর বেশ একটু আশ্চর্যও হয়েছেন। মীরা সেন বেশ হেসে হেসে কথা বলছেন—না ভাই মনো, আমার কখনও মনে হয় না যে, আমি একা।

মানোরমা জিজ্ঞাসা করেন—মিস্টার সেনের চিঠি পেয়েছেন?

মীরা—না।

মনোরমা—তবে?

মীরা সেনের সাদাটে শীর্ণ ঠোঁটের ফাঁকে যেন একটা পরাভবহীন গর্বের হাসি ঝির ঝির করে কাঁপতে থাকে।—তাতে কী এসে যায়? সে তো আছেই। কাছে না হোক কোথাও তো আছে। তাহলেই হলো।

মনোরমা জানেন না, সুনন্দাও জানেন না, মীরার স্বামী এখন কোথায় আছেন! কিন্তু মীরাও কি জানে? না, মীরাও জানে না। দু'বছর আগে মীরার স্বামী একবার এসেছিলেন, এসে এই সহরের একটা হোটেলে উঠেছিলেন! রোজই একবার স্কুল-বাড়িতে গিয়ে মীরার সঙ্গে দেখা করতেন। মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই সেদিন দেখতে পেয়েছিলেন, বাগানের রঙ্গনের একটা কুঞ্জের কাছে দাঁড়িয়ে মীরা ওর স্বামী সুধাকর সেনের সঙ্গে গল্প করছে।

কিন্তু এ কেমন সম্পর্ক? এক বছর পরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু স্বামী

ভদ্রলোক যে স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

মনোরমার কাছে কথাটা গোপন রাখেনি মীরা সেন।—তোমার কাছে লুকোতে চাই না মনো। ডাক্তার সন্দেহ করেছে, আমার বুকে যক্ষ্মার দোষ লেগেছে। তাই আমি ইচ্ছে করেই ওর কাছ থেকে সরে এসে এই স্কুলের কাজ নিয়েছি।

—কেন?

—ওর ক্ষতি হোক, এটা আমি চাই না। ওর কাছে থাকলে, আমার এই ভয়ানক রোগের ছোঁয়াচ ওকে স্পর্শ করে ফেলতে পারে। পারে না কি? তুমিই বল, স্ত্রী হয়ে স্বামীর এমন ক্ষতি কি কেউ করতে পারে?

—মিস্টার সেন কি বলেন?

—উনি তো প্রথমে খুবই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আমি আমার জেদ ছাড়িনি।

—কিন্তু এরপর···।

মনোরমা তাঁর মনের কথাটা ঠিক স্পষ্ট করে বলতে না পেরে আমতা-আমতা করেন। মীরা সেন তখুনি হেসে ফেলেন।—বুঝেছি কি বলতে চাইছো?

—কি?

—তুমি বলতে চাও, মিস্টার সেন কি চিরকাল এভাবে একা হয়ে পড়ে থাকবেন?

সুনন্দা বলেন—সেটা কি একটা কথা নয়?

মীরা সেন—খুব ঠিক কথা। কিন্তু আমি তাকে বলেছি, তুমি বিয়ে কর, একা থেকো না।

মনোরমা—মিস্টার সেন কি বললেন?

মীরা—বললেন, না, কখ্‌খনো না।

কিন্তু এহেন প্রতিজ্ঞার মিস্টার সেন এই চার বছরের মধ্যে একবারও আর মীরাকে দেখতে আসেননি। মীরাও বলতে পারে না, কেন আসেননি। মীরা জানেও না, মিস্টার সেন এখন কোথায় আছেন।

এস ডি ও মহীতোষবাবু খুব সুপারিশ করেছিলেন, আর শৈলেশবাবুও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, তাই হাসপাতালের যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের একটি কেবিন ফ্রী পেয়ে গিয়েছেন মীরা সেন। তা ছাড়া স্কুল কমিটি মাসিক পনেরো টাকা সাহায্য দিয়ে থাকেন। মীরা সেনের জীবন আর রোগজীর্ণ রক্তহীন শরীরটা তাই একটা আশ্রয় পেয়ে গিয়েছে। মীরা সেন বলেন, ভাল আছি। ডাক্তার এসে যখন মীরা সেনের

নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে আতঙ্কিতের মতো তাকান, তখনও মীরা সেন বলেন, আমি ভাল আছি।

ডাক্তার—কিন্তু আপনার এই অবস্থায় এখানে এভাবে একা-একা পড়ে থাকা···

মীরা সেন হাসতে চেষ্টা করেন।—আমি তো নিজেকে একা মনে করি না, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার—না, আমি বলছিলাম, আপনার স্বামী যদি এখন একবার এসে···।

মীরা সেন—না এলেই বা কি? তবু আমি মনে করবো না, আমি একা হয়ে গিয়েছি।

দুই

যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের সামনে এক টুকরো ঘেসো জমির উপর ফড়িং উড়ে বেড়ায়। মেহেদি গাছের বেড়ার ওদিকেও বেশ বড় একটা ঘেসো জমি। সেখানে দু'সারি ঘরও আছে; পুরুষদের যক্ষ্মা-ওয়ার্ড।

গির্জাটাও বেশি দূরে নয়। মীরা সেনের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা-বেলাতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, গির্জার ঘরের ভিতরে পুলপিটের উপর বড়-বড় মোমবাতি জ্বলছে।

কিন্তু গির্জার গা ঘেঁষে ওই যে ছোট বড় যত সমাধির আঙিনা, সেটা না থাকলেই ভাল ছিল। শুধু সন্ধ্যাবেলাতে নয়, দুপুরেও ওই নীরব সমাধিভূমির সারি সারি যত গম্ভীর ক্রশগুলি চোখে পড়লে চোখের দৃষ্টিটা যেন ছমছম করতে থাকে। সমাধির আঙিনাটা যেন গম্ভীর হয়ে এই যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনেকদিন পর আজ আবার এসেছেন মনোরমা আর সুনন্দা। শৈলেশবাবুকে খবর দিয়েছিলেন ডাক্তার, মীরা সেনের অবস্থা ভাল নয়। লক্ষণ খুব খারাপ।

মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই জানেন, এরই মধ্যে একটা ঘটনার খবর পেয়ে গিয়েছে মীরা। মীরা যা চেয়েছিল, তাই হয়েছে। কাজেই মীরার পক্ষে অভিযোগ করবার কিছু নেই।

মীরার স্বামী সুধাকর সেন বিয়ে করেছেন! ভাগলপুরের প্রতাপবাবুর চিঠিতে জানতে পারা গিয়েছে, তিনি মীরাকেও এখবর জানিয়ে দিয়েছেন।

সুধাকর সেন এখন রেলওয়ের চাকরি করছেন। নতুন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দানাপুরে থাকেন।

একটা কথা না লিখলে ভালই করতেন প্রতাপবাবু। স্টেশন মাস্টার মল্লিক-বাবুর মেয়ে নমিতার সঙ্গে সুধাকরের চেনা-শোনা হয়েছিল। একবছর ধরে মেলা-মেশার পর বিয়ে হয়েছে। ভালই হয়েছে। কিন্তু এসব কথা মীরাকে না জানালেই ভাল করতেন প্রতাপবাবু।

আজ তাই সন্দেহ করছেন মনোরমা আর সুনন্দা, এসব খবর জানতে পেরেছে বলেই হয়তো মীরার অসুখ হঠাৎ এত খারাপের দিকে এগিয়েছে। যতই মনের জোর থাকুক, আর যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করুক, এ খবর শুনে দুঃখিত না হয়ে পারবে কেন মীরা? আজ কি ঠিক আগের মতো হেসে-হেসে বলতে পারবে মীরা, আমি একা নই?

স্বামী দূরে ছিল, তবু তো ছিল। মীরারই স্বামী সুধাকর, আর কারও স্বামী নয়। কিন্তু আজ যে সত্যিই একা হয়ে গিয়েছে মীরা। চার বছর ধরে স্ত্রীকে দেখতে যে স্বামী এল না, সে আজ অন্য নারীর স্বামী হবার পর মীরাকে মনে রেখেছে কিনা সন্দেহ।

কি আশ্চর্য, মনোরমা আর সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন মীরা সেন। মীরার চোখের কোটরের হাড় ঠেলে উঠেছে, কিন্তু চোখে কাজল দিতে ভুলে যায়নি মীরা। সত্যিই, মীরার চোখ দুটো দেখতে খুব সুন্দর। দুই হাতে দু'গাছা করে নীল কাঁচের মোটা চুড়ি। হাতের আঙুলগুলি শুকিয়ে গিয়েছে, তবু কত নরম বলে মনে হয়। ভাঙা গাল, চিবুকটা চুপসে গিয়েছে। তবু মীরার মুখটা কত সুন্দর দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ, বুঝছে পারা যায়, মুখটাকে যেন সাবান-জল দিয়ে ঘষা-মাজা করেছে মীরা। খোঁপার মধ্যে একটা সাদা ফুলও গোঁজা রয়েছে। গলার নালীটা ধুকধুক করে কাঁপছে; কিন্তু চোখে পড়েছে মনোরমার মীরার গলাতে পাউডারের গুঁড়ো লেগে রয়েছে।

মীরা সেন বলেন—বুঝেছি, তোমরাও খবরটা শুনেছ।

মনোরমা—হ্যাঁ।

মীরা—ভালই হলো।

সুনন্দা বলেন—আপনি কি তাই মনে করেন?

মীরা—নিশ্চয়। আমার মতো একটা মিথ্যে মানুষের জন্যে মায়া করে সে যদি চিরকাল একা-একা পড়ে থাকতো, তবে সেটা কি ভাল হতো?

মনোরমা—তুমি তাহলে…।

মীরা—আমি খুশি হয়েছি। আমি নিজেকে একটুও একা মনে করি না।

যেখানেই থাকুক আর যায় সঙ্গেই থাকুক, সে মানুষটা ভাল থাকলেই হলো।

ঘেসো জমির ওপারে মেহেদির বেড়ার কাছে পায়রার দল ছুটোপুটি করছে। চমকে ওঠে মীরা সেনের চোখ। গলা টান করে তাকিয়ে থাকেন মীরা সেন।

মেহেদির বেড়ার ওদিক দাঁড়িয়ে কে-যেন একজন তাঁর হাতের ঠোঙ্গা থেকে ছোলা তুলে তুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর লোভী পায়রার দল ছুটোপুটি করে খুঁটে খুঁটে ছোলা খাচ্ছে।

জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, গলায় কম্ফোর্টার জড়ানো, পরনে ফ্লানেলের পায়জামা, চোখে চশমা, এক ভদ্রলোক মেহেদির বেড়ার ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন।

কোন সন্দেহ নেই, ভদ্রলোক পুরুষ যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের একটি মানুষ।

মীরা সেনই বলে ওঠেন।—ওই ভদ্রলোকের অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ।

মনোরমা—কি বললে?

মীরা সেন—জমাদারনীর কাছে শুনেছি ওই ভদ্রলোক সপ্তাহে অন্তত তিন দিন রক্ত বমি করেন।

সুনন্দা—কে ভদ্রলোক? বাড়ি কোথায়?

মীরা সেন—তা জানি না। তবে রোজই দেখতে পাই, কখনও সকালবেলা, কখনও বা সন্ধ্যাবেলা ওই বেড়ার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর পায়রাকে ছোলা খাওয়াচ্ছেন।

মনোরমা আর সুনন্দা, দুজনেরই চোখের দৃষ্টি করুণ হয়ে ওঠে। সত্যিই তো, ভদ্রলোক যেন এই পৃথিবীর সব নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শেষবারের মতো একটা মায়ার খেলা খেলে নিচ্ছেন।

মীরা সেন বলেন—ভদ্রলোক ছবি আঁকতে জানেন। এক-একদিন ওই মাঠের ওপর চেয়ারে বসে আর ছবি আঁকার সরঞ্জাম হাতের কাছে নিয়ে···

মনোরমা—গির্জার ছবি আঁকেন?

মীরা হাসেন—না।

সুনন্দা—হাসপাতালের ছবি?

মীরা—না।

মনোরমা—গাছপালার? পায়রার? আকাশের ছবি?

মীরা—না।

সুনন্দা—তবে?

মীরা—কে জানে কিসের ছবি আঁকেন, বুঝতে পারি না। আমি শুধু চুপ করে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি।

মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই এইবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—আজ তাহলে চলি।

মীরা—হ্যাঁ এস, কিন্তু একটা মজার কথা কি জান ?

মনোরমা—কি ?

মীরা—আমার মনে হয়, ওই ভদ্রলোক শেষ হবার আগে আমিই শেষ হয়ে যাব।

মীরা সেনের চোখের তারা ঝিকঝিক করছে। মনোরমা বলেন—চলি।

তিন

পয়লা বৈশাখ। বৎসরের প্রথম দিন। শৈলেশবাবু বলেছেন, যাও মনো, মহিলাকে আজকের দিনে কিছু ফুল দিয়ে আর দুটো ভাল কথা বলে এস। শত হোক, আমাদের স্কুলটার জন্যেই তো উনি এত খেটেছিলেন।

তাই এসেছেন মনোরমা। এসেছেন সুনন্দা। মনোরমার হাতে ফুল। সুনন্দার হাতে সন্দেশের প্যাকেট আর ফলের ঠোঙা।

বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। মেহেদির বেড়ার ছায়ার উপরে পায়রার দল নিঝুম হয়ে বসে আছে। পায়রাদের এত মায়া করে ছোলা খাওয়ান পুরুষ যক্ষা-ওয়ার্ডের যে ভদ্রলোক, তিনি এখনও আসেননি।

মীরা সেনের ঘরের দরজা ভেজানো। দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে উঁকি দিলেন মনোরমা। ডাকও দিলেন—মীরা।

কিন্তু সাড়া দিলেন না মীরা সেন। বিছানার মাঝখানে একটা বালিশকে রেখে, সেই বালিশটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, আর শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে বিছানার উপর নিথর হয়ে পড়ে আছেন মীরা সেন।

কি আশ্চর্য ! মীরার হাতের সেই নীল কাঁচের চারটে চুড়ির মধ্যে তিনটেই ভেঙে গিয়েছে। ভাঙা চুড়ির টুকরোগুলি বিছানার উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। খোপা ভেঙে রুক্ষ চুলের ভার এলিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, রোগের কষ্টে অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করেছে মীরা। তাই এখন অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

—মীরা।

ডাক শুনে বিছানার উপর উঠে বসেন মীরা সেন।

দেখেই বুঝতে পারা যায়, মীরা সেন তাঁর ভেজা চোখ দুটোকে বিছানাতে বেশ ভাল করে ঘষে ঘষে শুকনো করে দিয়েছে।

—কি হলো মীরা ? শরীর খারাপ ? খুব কষ্ট হয়েছে ?

মনোরমার প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়েন মীরা সেন।—না। ভালই আছি।

সুনন্দা বলেন—এবার আপনার খবর বলুন।

মীরা—একটা খবর আছে।

মনোরমা—কি?

মীরা—সেই ভদ্রলোক আর নেই।

চমকে ওঠেন মনোরমা আর সুনন্দা।—অ্যাঁ, কে? পায়রাগুলোকে ছোলা খাওয়াতেন যে ভদ্রলোক?

মীরা—হ্যাঁ। ওই শুনুন, গির্জার ঘণ্টা বাজছে।

মনোরমা—হ্যাঁ, শুনছি। কিন্তু—।

মীরা—বুঝলে না? ওই ভদ্রলোক খৃষ্টান মানুষ। এই তো, মাত্র এক ঘণ্টা হলো, এখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলাম, পুরুষ-ওয়ার্ডের গেট দিয়ে কফিনের গাড়িটা চলে গেল।

সুনন্দা—কোথায় গেল?

মীরা—প্রথমে গির্জাতে, তারপরে ওই সমাধির আঙিনাতে।

মনোরমা জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।—এই তো মানুষের জীবন! আচ্ছা, আজ আমরা এখন চলি, মীরা! কেমন?

মীরা সেন—এস।

দরজার দিকে এগিয়ে যান মনোরমা আর সুনন্দা, কিন্তু চমকে ওঠেন, থমকে দাঁড়ান, পিছন ফিরে তাকান। মীরা সেনের ধুকপুকে বুকের একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস যেন ডুকরে উঠেছে।

—কি হলো মীরা? ওরকম করছো কেন? মীরা সেনের কাছে এসে প্রশ্ন করেন মনোরমা।

মীরা সেন বলেন—সত্যি মনো, বড্ড একা-একা বোধ করছি। একটুও ভাল লাগছে না।

মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই মীরা সেনের সেই শীর্ণ সাদাটে করুণ মুখটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপরই বলেন—আমরা এবার যাই।

তৃ ষি ত ম রু

তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, যাচ্ছেন কনখলে তাঁর আশ্রমে, অথচ একজনের অনুরোধের চাপে পড়ে মধুপুরেই ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। আর, নেমে পড়েই হেসে

ফেললেন—এঃ, এরকম যে একটা ট্রেন-দুর্ঘটনায় পড়তে হতে পারে, সেটা তো কখনও মনে হয়নি, শিবনাথ। আগে মনে হলে, এই লাইনের ট্রেনে উঠতাম না।

প্রতি বছর সাগর-স্নানের পর কলকাতা থেকে কনখলের আশ্রমে ফিরে যাবার সময় স্বামী পূর্ণানন্দ গয়া লাইনের ট্রেন ধরেন। এই প্রথম, হয় ভুল করে নয় তাড়াতাড়িতে, এমন এক এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট কিনে ফেলেছিলেন, যে ট্রেন সীতারামপুর থেকে ঘুরে যায়; তারপর মধুপুর হয়ে চলে যায়।

শিবনাথও হাসেন—আপনার পক্ষে ট্রেন-দুর্ঘটনা হতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে তো নয়। আমি তো বলবো, এটা আমার একটা হঠাৎ-সৌভাগ্যের ঘটনা।

অভাবিত একটা বিস্ময়, হঠাৎ দেখতে পাওয়া একটা সৌভাগ্যের ঘটনা বইকি। ট্রেনের কামরাতে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে শিবনাথ যেন তাঁর আধ-জাগা ঢুলু-ঢুলু চোখেই তিরিশ বছর আগের একটা চেনামুখের ছবি দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিলেন। তারপর ভাল করে চোখ মেলে আর অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখেছিলেন, ওদিকের সীটের এক কোণে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। বেশ বয়স হয়েছে সন্ন্যাসীর, সত্তর না হোক অন্তত পঁয়ষট্টির কম নয়। গায়ে ঢিলে-ঢালা গেরুয়ারঙের আঙরাখা, তেমনি গেরুয়ারঙের একটি চাদর দিয়ে গলাটা জড়ানো, চোখে চশমা। খুব মন দিয়ে একটা বই পড়ছেন সন্ন্যাসী। মনে হয়, এ বয়সেও এই সন্ন্যাসীর দৃষ্টিশক্তির জোর তেমন কিছু কমে যায়নি। তা না হলে, ট্রেনের এই ঝাঁকুনিতে আর এরকম মিটমিটে আলোতে বই পড়া সম্ভব হতো না। পাতার পর পাতা উলটিয়ে বই পড়ে চলেছেন সন্ন্যাসী।

উঠে গিয়ে একেবারে সন্ন্যাসীর সীটের মুখোমুখি সীটের উপর বসে শিবনাথ এইবার তাঁর চোখ দুটোকে আরও বড়-বড় করে নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু আর কি চিনতে কোন অসুবিধে আছে? আর কি বেশি তাকিয়ে দেখবার কোন দরকার আছে?

বইটা বন্ধ করে রাখবার পর সন্ন্যাসীও শিবনাথের মুখের দিকে এক বার তাকালেন। চোখ ফিরিয়ে নিয়েই তখুনি আর-একবার তাকালেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন।

যেন পাহাড়ের চূড়া তাকিয়ে আছে একটা পুকুরের জলের দিকে; আর পুকুরের জল একটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে। ওখানে ওই সীটে একজন বুড়ো সন্ন্যাসী মানুষ, আর এখানে এই সীটে একজন মাঝবয়সী কেরাণী মানুষ। কাছাকাছি হয়েও দুজনের জীবনের মধ্যে যে দুস্তর দূরত্ব দিয়ে গড়া একটা কঠিন ব্যবধান। কেউ কারও আপন হতে পারে না।

কিন্তু শিবনাথ ভুলবেন কেমন করে, ইনি যে সেই মণিকাকা,—মণিনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি শিবনাথের ছেলেবেলার জীবনে আপনজনের চেয়েও বেশি আপন একজন ছিলেন। শিবনাথের বাবার পিসতুতো ভাই মণিনাথ, এই মণি-কাকাই যে একদিন বলেছিলেন, ঘোড়া চড়তে শিখবি, শিবু? তাহলে পুজোর ছুটিতে রায়গঞ্জে চলে আসিস। আমার ছোট ঘোড়াটাকে তোর জন্যে ছেড়ে দেব। খুব শান্ত মেজাজের ঘোড়া, চমৎকার দুলকি চালে চলতে পারে।

কী না ছিল মণিকাকার! রায়গঞ্জে অত বড় দালান বাড়ি ছিল। দীঘি, পুষ্করিণী' বাগান আর খামার, সবই ছিল। বাপের এক ছেলে মণিকাকা, এম-এ পাস করেছিলেন, আইন পাস করেছিলেন। কিন্তু বিয়ে করেননি, যদিও মণি-কাকার বিয়ে দেবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন মণিকাকার জ্ঞাতি-কাকা কেষ্টবাবু। মণিকাকার বিয়ের জন্যে চিন্তা করবার মতো কাছাকাছি মানুষ তখন ওই একজনই ছিলেন, রায়গঞ্জের কেষ্টবাবু। মণিকাকার বাবা আর মা দুজনের কেউই তখন বেঁচে ছিলেন না।

শিবনাথের গাঁয়ের বাড়ির পুকুরটার একটা সুনাম ছিল; এত বড় আর এত লালচে চেহারার মিরগেল এই জেলার কোন বড় দীঘিতেও পাওয়া যায় না। রায়গঞ্জ থেকে বিরামপুর, কতই বা দূর? ঘোড়া চড়েই চলে আসতেন মণিকাকা, আর, সেই বিখ্যাত পুকুরের মিরগেল ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন।

—না রে শিবু, দিনের বেলাতে মাছ ধরে কোন সুখ নেই। মাছ ধরবো রাত্রিবেলা। দেখবি, কেমন মজা হয়।

রাত্রিবেলা পুকুরের জলে ছিপ ফেলে বসে থাকতেন মণিকাকা। আর শিবনাথ বসে থাকতো তাঁর পাশে। ফাত্নার মাথায় একটা জোনাকীকে আঠা দিয়ে সেঁটে দিতেন মণিকাকা। আর বলতেন,—বসে বসে দেখ শিবু, আমি বিনা চারেই কত বড় মিরগেল তুলছি। চার ফেলে মাছ ধরা তো এমন কিছু বাহাদুরীর ব্যাপার নয়।

শিবনাথকে সঙ্গে নিয়ে আর মস্ত একটা লগি হাতে নিয়ে যখন দুপুরবেলায় আমবাগানের ভিতর ঘুরে বেড়াতেন মণিকাকা, তখন তাঁর অমন ধবধবে ফর্সা মুখের রঙ যেন খুশি হয়ে আর লালচে হয়ে টুকটুক করতো। মনে আছে শিব-নাথের, লগি তুলে উঁচু ডালের একটা পাকা আমের নাগাল না পেয়ে সেদিন কী কাণ্ড করেছিলেন মণিকাকা।—আমি গাছের গোড়ায় শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছি, শিবু। তুই আমার কাঁধের উপর চড়ে আর বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়া। তারপর লগি দিয়ে ঐ আমটাকে বেশ জোরে একটা খোঁচা দিবি। নে, ওঠ, উঠে পড়।

সেই মণিকাকা একদিন সবার চোখের নাগালের বাইরে চলে গেলেন। সবই শুনতে জানতে আর বুঝতে পেরেছিলেন সেদিনের সেই ছেলেমানুষ শিবনাথ। অনেক দূরে কোথায় যেন বেড়াতে বের হয়েছিলেন মণিকাকা। দুমাস পরে রায়গঞ্জে ফিরে এলেন। তারপর মাত্র একটা মাস তাঁকে দেখতে পেয়েছিল রায়গঞ্জের মানুষ। সব সম্পত্তি বিক্রী করে দিয়ে আর রায়গঞ্জ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন মণিকাকা। তার কিছুদিন পরেই বুঝতে পেরেছিলেন শিবনাথ, সেদিনের সেই ছেলেমানুষ শিবু, বিরামপুরের পুকুরে আর মিরগেল ধরতে আসবেন না মণিকাকা। একদিন রায়গঞ্জ থেকে বিরামপুরে ফিরে এসে এবাড়ি সে-বাড়ির সবাইর কাছে একটা আশ্চর্যের খবর জানালেন বাবা—সম্পত্তি বিক্রীর সব টাকা কনখলের একটা আশ্রমকে দান করে দিয়েছে মণি, আর নিজেও সন্ন্যাসী হয়ে সেই আশ্রমেই আছে।

তিরিশ বছর আগে পনর বছর বয়সের চোখ দিয়ে দেখা একটি মানুষকে আজ দেখেই চিনতে পারা তো চারটিখানি স্মৃতিশক্তির কথা নয়। তবু যে চিনতে পেরেছেন শিবনাথ, সেটা শুধু স্মৃতির জোরে নয়। মণিকাকার একটা কানের নীচে নীলরঙের একটা আঁচিল ছিল। মণিকাকার ডান ভুরুর উপরে ছোট্ট একটা কাটা-দাগ ছিল। ঘোড়া থেকে একবার পড়ে গিয়ে মণিকাকার ডানভুরুর উপরের কাছে ছুঁচালো একটা ইট-খোয়ার টুকরো বিঁধে গিয়েছিল। কিন্তু এই দুটো চিহ্ন না থাকলেই বা কি হতো? মণিকাকার চল্লিশ বছর বয়সের সেই মুখটা তো ভিন্ন-রকমের কোন রূপ ধরে ফেলেনি। সেই টিকালো নাক, সেই বড়-বড় চোখ, আর সেই ধবধবে লালচে-ফর্সা রঙ, সবই আছে। সারা রাতের শিশিরে ভিজে গিয়ে ফুলের চেহারা যে-রকম হয়, মণিকাকার মুখের চেহারাতে শুধু সেরকমের একটা পরিবর্তন দেখা যায়। সবই ঠিক আছে, শুধু একটা স্নিগ্ধ শিথিলতার প্রলেপ পড়েছে।

কিন্তু সন্ন্যাসী মানুষের প্রায় সত্তর বছর বয়সের চোখ দুটোরও দৃষ্টির অদ্ভুত জোর আছে বলতে হবে। তা না হলে আজ এই ট্রেনের কামরাতে এত মিটমিটে একটা আলোর মধ্যে ব'সে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের শিবনাথের মুখের মধ্যে তিরিশ-বছর আগের দেখা একটি ছেলেমানুষের মুখটাকে চেনা-চেনা বলে সন্দেহ করলেন কি করে? আর বলবেনই বা কেন—আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি?

চমকে ওঠেন শিবনাথ—দেখেছেন বই কি, কিন্তু মনে করতে পারছেন না বোধহয়।

—তা মনে করতে অসুবিধে হচ্ছে ঠিকই। আর···। হঠাৎ হেসে ফেললেন

সন্ন্যাসী।—আর মনে করেই বা লাভ কি?

শিবনাথ চমকে ওঠেন।—কিন্তু আমি যে সবই মনে করতে পারছি। আমার ভুল হচ্ছে না বোধহয়?

—কি মনে করতে পারছেন?

শিবনাথের গলার স্বর কাঁপে।—আপনি যদি মণিকাকা হন, তবে আমি সেই শিবু, বিরামপুরের শিবনাথ।

চমকে উঠলেন সন্ন্যাসী। স্নিগ্ধভাবে হাসলেন, তারপর আবার হাতের বইটা খুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

কী বই পড়ছেন সন্ন্যাসী? ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য। ট্রেনের থার্ড ক্লাসের এই কামরাতে মিটমিটে আলোতে বাক্স তোরঙ্গ পেটরা পুটলি আর ঝুড়ি-ঝোড়া-বস্তার এত কাছে, আর যাত্রীদের এত মুখরতার মাঝখানে কত শান্ত হয়ে বসে আছেন সন্ন্যাসী। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের মধ্যে যেন তাঁরও জীবনের সব ভাষা মিশিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু শিবনাথের চোখদুটো যেন মুগ্ধ হয়ে দেখছে, বিরামপুরের পুকুরে ছিপ ফেলে বসে আছেন মণিকাকা। শিবনাথ ডাকেন—মণিকাকা।

চমকে উঠলেন, বোধহয় একটু অপ্রসন্নও হলেন সন্ন্যাসী। কিন্তু তারপরেই হাতের বইটা বন্ধ করে দিয়ে হাসলেন—ও নামে আমাকে এখন আর ডাকতে নেই।

শিবনাথ—আজ্ঞে, আমি যে আপনার নতুন নামটা জানি না।

—পূর্ণানন্দ।

শিবনাথ—আজ্ঞে, আমার পক্ষে আপনাকে এরকম শুধু একটা নাম ধরে ডাকা কি উচিত হবে? আমি যে আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আপনি যে আমার গুরুজন।

পূর্ণানন্দ আবার হাসেন।—এঃ, তুমি সত্যিই যে আমাকে বিপদে ফেললে। আমি কি তোমার সুবিধার জন্যে ট্রেনের এই শুধু কয়েক ঘণ্টার দরকারে সেই পুরনো নামটা ধরবো? তা হয় না শিবনাথ।

শিবনাথ কুণ্ঠিতভাবে বলেন—তা আপনি যদি আপত্তি করেন, তবে না হয় পুরনো নামে আর ডাকবো না, সাধুকাকা।

এইবার বেশ জোরে মাথা দুলিয়ে হেসে ফেলেন পূর্ণানন্দ।—এ নামটা মন্দ নয়। একটা কম্প্রোমাইজ। যাই হোক, কিন্তু, তোমাকে তো জিজ্ঞাসা করবার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

হঠাৎ যেন বেশ কঠিন একটা ফাঁপরে পড়ে গেলেন পূর্ণানন্দ। সত্যিই তো, শিবনাথের কাছে আজ আর তাঁর বলবার মতো কী কথা থাকতে পারে? বিরামপুরের সেই আমবাগানে এখনও যদি সেই রোদ আর ছায়া থেকেও থাকে, তবু তাঁর মনের কাছে তো নেই। এসব রোদ আর ছায়া যে পুর্বজন্মের একটা জগতের মতো ক্ষণিকতার ছবি, কনখল আশ্রমের পূর্ণানন্দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

শিবনাথ বলেন—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ—যাচ্ছি কনখলে, আমার আশ্রমে।

শিবনাথ—কিন্তু মধুপুরে অন্তত একটি দিনও কি থেকে যেতে পারবেন না?

পূর্ণানন্দ—কেন? মধুপুরে আমার কি আছে?

শিবনাথ—আপনার কিছু নেই, সাধুকাকা। আমার আছে।

—কি আছে তোমার?

—সবই আছে। একটি বাড়ি আছে। স্ত্রী ছেলে মেয়ে আছে। আমি এখন মধুপুরের স্কুলে মাস্টারী করি।

—বেশ তো, ওর মধ্যে আমাকে ডেকে লাভ কি?

—আপনার কোন লাভ নেই। আমাদের আছে।

—তোমাদেরই বা কি লাভ?

—আপনার গল্প যে সেদিনও ছেলে-মেয়েদের কাছে বলেছি। সেই লগি দিয়ে আম পাড়বার গল্প, কাত্‌নাতে জোনাকী গেঁথে রাত্রিবেলা মিরগেল ধরবার গল্প, আপনার সেই ঘোড়া-চড়া আর বেহালা বাজাবার গল্প। আপনার বিয়ের গল্প।

পূর্ণানন্দ এইবার একটু কুণ্ঠিতভাবে, যেন একটু লজ্জিতভাবে, হাসলেন—ওসব তোমার মণিকাকার গল্প। আমার গল্প নয়।

শিবনাথ—আজ্ঞে আমার কাছে তো আপনিই মণিকাকা।

পূর্ণানন্দ এইবার তার চোখ থেকে চশমাটাকে খুলে নিলেন। গেরুয়া চাদরের একটা কোন তুলে নিয়ে চোখ দুটো আর কপালটাকে আস্তে আস্তে মুছলেন। মনে হয় একটু চিন্তিত হয়েছেন। কিংবা, সত্যি একটু ভয় পেলেন নাকি পূর্ণানন্দ? পূর্ণানন্দের এই শান্ত প্রাণের ভিতরে কোথাও খুব গোপন হয়ে একটা অদ্ভুত নিঃশ্বাস বোধহয় ছটফট করছে। শিবনাথের কিন্তু মনে হয়, সাধুকাকার খুব তেষ্টা পেয়েছে। বুড়ো মানুষ সাধুকাকা, এতক্ষণ ধরে বই পড়ে পড়ে তাঁর জিভটা বোধহয় একটু শুকিয়ে গিয়েছে। শিবনাথ বলেন—জল খাবেন সাধুকাকা, ঠাণ্ডা জল।

—হ্যাঁ।

ট্রেনটা একটা স্টেশনে তখন থেমেই ছিল। কাজেই চেঁচিয়ে পানিপাঁড়েকে ডাক দিয়ে এক গেলাস জল জোগাড় করতে শিবনাথের কোন অসুবিধাও হয়নি। জল খেয়ে নিয়ে পূর্ণানন্দও পরিতৃপ্তভাবে আর আস্তে একটা হাঁপ ছাড়লেন।

শিবনাথ বলেন—বাড়ির সবাই আপনাকে দেখলে যে কত খুশি হবে, সেটা আর আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না, সাধুকাকা। আমার প্রার্থনা, মধুপুরে অন্তত একটি দিনের জন্য থেকে যান।

পূর্ণানন্দ এবার মুখ টিপে হাসেন—বুঝেছি শিবনাথ, তুমি আমাকে একটা রিপ-ভ্যান-উইংকল পেয়েছো? আমাকে দেখে সবারই একটা মজার আশ্চর্য মনে হবে। তাই না?

শিবনাথ—না না না, কখ্খনো না। আপনার পায়ের ধুলো পেলে একটা ভাগ্যি মনে করবে সবাই। সত্যিই, একটা পুণ্যি ছিল নিশ্চয়, তা না হলে হঠাৎ এভাবে আপনার দেখা পেয়ে যাব কেন?

এরপর আর মাত্র পনের মিনিট সময় লেগেছিল। মধুপুরে পৌঁছে গেল ট্রেন। বইটাকে ঝোলার ভিতরে রেখে দিলেন পূর্ণানন্দ। আর, শিবনাথ নিজেই ব্যস্ত হয়ে পূর্ণানন্দের কম্বলটাকে গুটিয়ে নিয়ে হাতে তুলে নিলেন।

মধুপুরের স্কুলের মাস্টার শিবনাথের বাড়ি। সে বাড়ির চারদিকে ফণীমনসার বেড়া। আর, বারান্দাতে ওঠবার সিঁড়ির কাছে একটা লতানে গোলাপ বাঁশ বেয়ে টালির চালার উপর উঠেছে। বড় বড় হলদে গোলাপের পাপড়ি সিঁড়ির উপরেও ঝরে পড়েছে।

হলদে গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো সেই সিঁড়ির উপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন পূর্ণানন্দ। আর, শুনে শুনে চমকে ওঠেন, ঘরের ভিতরে ঢুকে কী ভয়ানক চিৎকার করে কথা বলছে শিবনাথ—শুনছো, শিগগির দেখবে এস, আমাদের সেই মণিকাকা এসেছেন। শুনছিস নীলি, শিগগির দেখবি চল, মণিকাকা এসেছেন।

বের হয়ে আছে প্রীতিকণা, শিবনাথের স্ত্রী, কোলে একটা বাচ্চা, যার নাম ডাকু। ব্যস্ত হয়ে মাথার কাপড় টানে প্রীতিকণা। বের হয়ে আসে নীলিমা, শিবনাথের মেয়ে, এবছরেও স্কুল ফাইন্যাল ফেল করে আবার মন দিয়ে পড়াশোনা সুরু করেছে। ছুটে এসে পূর্ণানন্দের মুখের দিকে তাকায় সাধু, শিবনাথের বড় ছেলে, পনর বছর বয়স, নীলিমার চেয়ে তিন বছরের ছোট।

সকলেই একসঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে আর হাত বাড়িয়ে পূর্ণানন্দকে প্রণাম করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতেই পূর্ণানন্দ চমকে ওঠেন, দুপা পিছিয়ে গিয়ে সরে দাঁড়ান—না না, আমি কারও প্রণাম নিই না, এসব করলে আমি কিন্তু বেশ বিরক্ত হব

শিবনাথ।

শিবনাথ—ঠিক আছে। বুঝেছি সাধুকাকা, আপনাকে আর বলতে হবে না। এই নীলি ··এই শুনছো·· তোমরা সরে যাও।

এরপর শিবনাথের বাড়ির বারান্দায় উঠে একটা বেতের মোড়ার উপর বসলেন পূর্ণানন্দ। ঝোলাটাকে নামিয়ে মেজের উপর রাখলেন। আর, বেশ শান্ত-গম্ভীর স্বরে একটা কথা বললেন—রাত্রিবেলা আমি কিন্তু মেপে চার মুঠো যবের ছাতু ছাড়া আর কিছু খাই না, মনে রেখ শিবনাথ।

শিবনাথ ব্যস্তভাবে বললেন—যে আজ্ঞে, আমাদের মধুপুরের বাজারে বেশ ভাল যবের ছাতু পাওয়া যায়। আমি এখনই কিনে আনছি।

মাত্র একটি দিন মধুপুরে থাকবেন। তারপর কনখল আশ্রমে চলে যাবেন পূর্ণানন্দ। শিবনাথের এই অনুরোধ যেন পূর্ণানন্দের পূর্বজন্মের জগৎটারই একটা করুণ মিনতির ক্ষণ-আহ্বান। অনিচ্ছা থাকলেও প্রত্যাখান করেননি পূর্ণানন্দ।

কিন্তু এই একটি দিনের থাকা যেন একটা ঝড়ের মধ্যে থাকা। সে ঝড়ের এলোমেলো যত পীড়ন আঘাত আর উপদ্রব সহ্য করতে করতে যেন হয়রান হয়ে গেলেন, হাঁসফাঁস করলেন আর হাঁপিয়ে পড়লেন পূর্ণানন্দ।

সকালবেলাতে বাইরের বারান্দাতে যখন কম্বলটা পেতে নিয়ে বসলেন আর একটু স্বস্তি বোধ করলেন পূর্ণানন্দ, তখনই আবার একটা অস্বস্তিতে তাঁর এত শান্ত চোখদুটোও ছটফট করে ওঠে। পূর্ণানন্দ ডাকেন—শিবনাথ তুমি কোথায়? এদিকে একবার এস আর দেখে যাও।

স্বস্তি এই যে, ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি। শিবনাথের বাড়িটা ছেলেপুলের বাড়ি হয়েও খুব বেশি চেঁচামেচির বাড়ি নয়। ঘরের জানালাগুলিও বেশ বড় বড়; ঘরে খুব হাওয়া ঢুকতে পারে। তা ছাড়া, এই ঘরটাও অন্য সব ঘরের লাগাও একটা ঘর নয়; একটু দূরের ঘর। মাঝে বেশ চওড়া এক টুকরো জমি বেশ ভাল একটা ব্যবধান হয়ে পড়ে আছে। সে জমিতে শুধু দূর্বাঘাস ছাড়া আর কিছু নেই। দেখতে অনেকটা কনখলের আশ্রমবাড়ির দক্ষিণ দিকের সেই ঘরের সামনের জমিটার মতো, যে ঘরের মেজেতে পূর্ণানন্দের বিছানার একটি সতরঞ্চি আর দুটো কম্বল পড়ে থাকে।

শেষ রাতে যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখনও পূর্ণানন্দ বেশ শান্তি আর বেশ স্বস্তি বোধ করেছিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্তের সেই গভীর মৌন এখানেও বসে অনুভব করতে কোন অসুবিধে হয়নি। সত্যিই কোথাও কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। গাছের মাথায় একটা পাখীও উসখুস করে সামান্য একটা শব্দও জাগিয়ে তোলেনি।

খোলা জানালার কাছে বসে পূবের আকাশে সূর্য উঠতেও দেখেছিলেন পূর্ণানন্দ। দেখতে কোন অসুবিধে হয়নি, কনখলের আশ্রমবাড়ির সেই ঘরের জানালার কাছে বসে যেমন দেখা যায়, প্রথমে কয়েকটা লাল রেখা ফুটে উঠলো আকাশে, তারপর, সত্যিই জবাকুসুমসংকাশ আভা ছড়িয়ে পড়লো। তারপর দেখতে দেখতে জ্যোতি ফুটে উঠলো।

কিন্তু তারপর থেকে এই বারান্দাতে এই বেতের মোড়ার উপর বসে থাকতে, কিংবা বই পড়তে খুবই অসুবিধে বোধ করেছেন পূর্ণানন্দ। এ রকম করে এক-একটা বাধা দেখা দিতে থাকলে আনন্দগিরির টীকা একটু মন দিয়ে পড়বার আনন্দটুকু আর পাওয়া যাবে না।

একটি বাচ্চা ছেলে, এটি নিশ্চয় শিবনাথের সেই ছেলেটি, যাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শিবনাথের স্ত্রী; সে বাচ্চাটা মাঝে মাঝে তড়বড় করে হামা দিয়ে বারান্দার ওদিকের কিনারার একেবারে কাছে চলে যাচ্ছে। বারান্দার নীচে ওখানে একগাদা ভাঙ্গা টালির টুকরো পড়ে আছে। নিতান্ত কচি একটা বাচ্চা, ও কি করে বুঝবে যে, কোথায় ভয় আছে বা বিপদ আছে? ধুপ করে যদি পড়ে যায় বাচ্চাটা, তবে তো একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে। নাকে মুখে চোখে কিংবা মাথায় ভয়ানক চোট লাগবে; চেঁচিয়ে কেঁদে উঠবে। সে একটা দুঃসহ অস্বস্তির উপদ্রব হয়ে পূর্ণানন্দের এই সকালবেলার মনের শান্তি নষ্ট করবে। পূর্ণানন্দ আবার ডাকেন—শিবনাথ শুনছো, এদিকে একবার এস। এই বাচ্চাটিকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

ঘরের ভিতর থেকে ব্যস্তভাবে বের হয়ে আসেন শিবনাথ। এসেই ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—এই পাজি ছেলে! এই ডাকু! খবরদার!

বলতে বলতে আরও এগিয়ে এসে শিবনাথ ওই হামা-দেওয়া ডাকুর একটা ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে আর ঝুলিয়ে কাঁধের উপর তুলে নিলেন। পূর্ণানন্দের চোখ দুটো হঠাৎ একটু কুঁচকে যায়। পূর্ণানন্দ বলেন—আঃ, কী করছো শিবনাথ!

শিবনাথের স্ত্রী প্রীতিকণাও একবার এক পেয়ালা গরম চা হাতে নিয়ে পূর্ণানন্দর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই চা খেয়েছেন পূর্ণানন্দ। কিন্তু আবার কেন এসে সামনে দাঁড়ায় শিবনাথের স্ত্রী?

প্রীতিকণা বলেন—আপনাকে সামান্য একটু খাবার এনে দিই, সাধুকাকা।

—খাবার? এখন আবার খাবার কিসের? পূর্ণানন্দের গলার স্বরে বেশ স্পষ্ট একটা বিরক্ত ভাব ফুটে ওঠে। বেশ জোরে মাথা নেড়ে আপত্তি জানান পূর্ণানন্দ—এ সময়ে আমি কিছুই খাই না। আমার জন্যে দুপুরবেলাতে শুধু দু'মুঠো আতপ

চালের ভাত আর একটু দুধ রেখে দিও, তাহলেই যথেষ্ট।

প্রীতিকণা চলে যেতেই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন শিবনাথ।—দেখুন তো, লুচি ভেজেছে আর আলু-পটলের একটা ডালনাও তৈরী করে ফেলেছে প্রীতি। এখন আবার উল্টো চাপ দিচ্ছে।

পূর্ণানন্দ—কি হয়েছে?

শিবনাথ—এখন বলছে, সাধুকাকার জন্যে যে খাবার তৈরী করলাম, সে-খাবার তো আর কাউকে খেতে দেওয়া চলবে না। ফেলে দেওয়াও খুব খারাপ হবে।

পূর্ণানন্দ আশ্চর্য হন—কি বলছো তুমি?

শিবনাথ হাসতে চেষ্টা করেন।—সাধুমানুষের প্রসাদ হবে বলে আশা করে যে-খাবার তৈরী করা হলো, সেটা তো এখন আর যাকে তাকে দেওয়া চলবে না।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু আমি তো লুচি-টুচি আশা করিনি। তোমাদের অসুবিধে কোথায়?

শিবনাথ—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক কথা। প্রীতিরই একটা আশা ছিল যে···।

পূর্ণানন্দ বোধহয় আবার একটা বিরক্তভাব চাপতে চেষ্টা করেন।—তোমরা যদি আশা কর যে, আমার উপর একটা উপদ্রব করলে ভাল হয়, তবে তো আমাকে এখনই···।

—না না, কখ্‌খনো না সাধুকাকা। আপনি একটুও ভাববেন না। শিবনাথ যেন ক্ষমা চাইবার একটা আকুলতা নিয়ে কথা বলেন।—আমি এখনই নিজেই ওই খাবারকে আপনারই প্রসাদ মনে করে খেয়ে ফেলবো। প্রীতিও আর একটিও বাজে কথা বলতে পারবে না।

পূর্ণানন্দ এইবার হাসেন।—তোমাদের এই জায়গাটাকে আমি দেখবার আগেই সন্দেহ করে যতটা ভয় পেয়েছিলাম, ততটা ভয় করবার কিছু নেই।

শিবনাথ—হ্যাঁ, সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—বোধহয় টাউন থেকে খুব কিছু দূরে নয় তোমার এই বাড়িটা?

শিবনাথ—আজ্ঞে না।

পূর্ণানন্দ—তবু বেশ নিরিবিলি বলে মনে হয়। তা ছাড়া হইহল্লা গোলমালও নেই বলে মনে হয়।

শিবনাথ—আজ্ঞে না, একটুও না।

পূর্ণানন্দ—তাই তো আমার বিশেষ কোন অসুবিধে হলো না। বুঝতেই তো পার, একটু নিরিবিলি জায়গা না হলে, একটু শান্ত নীরব পরিবেশ না থাকলে

আমার মতো মানুষের পক্ষে স্বস্তিবোধ করা তো সম্ভব নয়।

শিবনাথ—খুব সত্যি কথা। কিন্তু সাধুকাকা⋯ ⋯।

পূর্ণানন্দ—কি ?

শিবনাথ—আপনি যদি আরও দুটো দিন থাকেন, তবে আরও বুঝতে পারবেন, এখানে আপনার কোন অসুবিধে নেই। আপনার একটুও অস্বস্তি বোধ করতে হবে না।

পূর্ণানন্দ হাসেন—ব্রিচ অব প্রমিস! এটা ভাল কথা নয় শিবনাথ। যা কথা হয়েছে, তাই হবে। আমি আজই সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা হব।

শিবনাথ একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসেন আর মাথা চুলকোতে থাকেন—তাহলে, তাহলে তো আমার আর কিছুই বলবার সাহস থাকে না।

দুপুরবেলাতে কুয়োতলার কাছে যখন স্নান করতে বসলেন পূর্ণানন্দ, তখন শিবনাথ আবার ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন।—আপনি চুপ করে বসুন সাধুকাকা, আমি এই বালতি করে আপনার গায়ে আস্তে আস্তে জল ঢেলে দিই।

পূর্ণানন্দ বলেন—তুমি যাও, শিবনাথ। বিরক্ত করো না।

একটা মগ হাতে তুলে নিয়ে বালতি থেকে জল তোলেন আর গায়ে ঢালেন পূর্ণানন্দ, আর মনে মনে সেই প্রিয় স্তোত্রটাও আবৃত্তি করেন।—ভাগীরথি সুখ-দায়িনি মাতস্তব জলমহিমা⋯ ⋯।

দু' মুঠো আতপ চালের ভাত, আর একটু দুধ, পূর্ণানন্দের জীবনের দুপুর-বেলার সেই সামান্য আহারের শান্তিটা আবার নষ্ট হয়ে যেত, যদি ঠিক সময়ে সাবধান না হতেন শিবনাথ। ভিতরের বারান্দার মেঝের উপরে একটা আসনে বসে সবেমাত্র ভাতের ছোট থালাটার দিকে তাকিয়েছেন পূর্ণানন্দ, তখুনি তাঁর চোখ দুটো চমকে উঠেই স্থির হয়ে যায়। ভাতের থালার দিকে যেন আর হাত এগিয়ে দিতে চান না পূর্ণানন্দ। আবার একটা অস্বস্তি যেন তাঁর এই হাতের উপর একটা ভার হয়ে চেপেছে। কারণ একটা পাখা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে শিবনাথের স্ত্রী প্রীতি।

কিন্তু শিবনাথ তখনি চোখের ইসারায় প্রীতিকে সরে যেতে বলেন। আর এদিকে এগিয়ে না এসে ঘরের ভিতরে চলে যায় প্রীতি। তারপর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায় আর চুপ করে দেখতে থাকে, দুধ ভাত খাচ্ছেন সাধুকাকা। একটুও পরিপাটি করে খেতে জানেন না। ছোট্ট ছেলেমানুষের মতো কেমন যেন এলো-মেলো করে কিছু ভাত দুধ দিয়ে মাখলেন আর খেলেন, কিছু ভাত এমনিই শুকনো-শুকনো খেলেন। বাটির তলায় থিতানো দুধটুকুও এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে

তারপর মিছিমিছি আরও কয়েকটা চুমুক দিলেন।

শিবনাথ বলেন—আপনার বোধহয় দুপুরে একটু ঘুমোবার অভ্যেস আছে সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ হাসেন—ঠিক অভ্যেস নয়, তবে শরীরের যেদিন যেমন অবস্থা হয় —হয় ঘুমিয়ে পড়ি, নয় জেগে বসে বই পড়ি। কিন্তু…।

শিবনাথ—বলুন।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু কোন হই-হল্লার উৎপাত থাকলে ঘুমিয়ে পড়াও হবে না, আর বই পড়াও অসম্ভব হয়ে উঠবে। কি করবো বল? এটা যে আমার একটা অভ্যাস হয়ে উঠেছে। তিরিশটি বছর ধরে নিরিবিলি শান্তির মধ্যে থাকবার অভ্যেস।

শিবনাথ—হ্যাঁ সাধুকাকা। কিন্তু এখানেও কোন হই-হল্লা আপনাকে বিরক্ত করতে পারবে না। আমি তবে আছি কি করতে?

কিন্তু কি আশ্চর্য, যেন শিবনাথের এই প্রতিজ্ঞার কথাটাকে একেবারে মিথ্যে করে দেবার জন্যেই এই দুপুরে যত ফেরিওয়ালার হাঁক ডাক ছুটে ছুটে আসছে। চাই গয়ালী থালা বাটি ঘটি! চাই মোটিয়া চাদর! চাই গুলাবছড়ি তিলকুট আওর দেওঘরকা পেড়া!

বার বার ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন শিবনাথ। ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়ান। ফিসফিস করে কথা বলে ফেরিওয়ালাকে বুঝিয়ে দেন, চেঁচিও না, ওদিকে যাও; সাধুজীর শান্তির ঘুম নষ্ট করে দিও না।

পূর্ণানন্দ আজ দুপুরে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েননি। ঘরের জানালার কাছে চুপ করে বসে শুধু বই পড়েছেন। তবু মাঝে মাঝে দেখতে পেয়েছেন, শিবনাথ ঘর থেকে বের হয়ে আর ছুটে গিয়ে রাস্তায় উপর দাঁড়াচ্ছে, আর, হাঁকমুখর যত ফেরিওয়ালাকে নানাকথা বলে বলে নীরব করিয়ে দিচ্ছে, সরিয়েও দিচ্ছে।

বই পড়া বন্ধ করে ডাক দিলেন পূর্ণানন্দ—একবার এদিকে এসে শুনে যাও, শিবনাথ।

কে জানে কেন, শিবনাথের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পূর্ণানন্দ। তারপর বললেন—তুমি না বলেছিলে, তুমি এখানে একটা স্কুলের মাস্টার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সাধুকাকা।

—আজ কি তবে কাজ কামাই করলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি দরকার ছিল?

—দরকার ছিল বই কি। আমি স্কুলে যাই, আর এদিকে যত উপদ্রব এসে আপনাকে বিরক্ত করুক, তা কি কখনও হয়?

—না না, বিরক্ত হবার মতো তেমন কোন উপদ্রব তো দেখলাম না। একটা দিন তোমার এখানে আমার বেশ ভালই কাটলো।

—কিন্তু আমার যে এই একটা দিন কত ভাল কাটলো, সেটা আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না।

পূর্ণানন্দ হাসেন—তোমার আবার এত ভাল লাগবার কি আছে!

শিবনাথ—বলেন কি? আপনাকে যখনিই দেখছি, তখনই মনে পড়ছে, এই তো আমাদের সেই মণিকাকা। মিরগেল ধরবার জন্যে রাত জেগে যাঁর সঙ্গে বসে পুকুরে ছিপ ফেলে…।

পূর্ণানন্দ—আঃ, তুমি আর ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটবে না শিবনাথ।

শিবনাথ—আমার কিন্তু একটু দুঃখ রয়ে গেল সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—কিসের দুঃখ?

শিবনাথ—আপনার তেমন কিছু যত্ন করতে পারলাম না। আপনিই আপত্তি করলেন বলে…।

পূর্ণানন্দ—থাম শিবনাথ। যত্নের কি আর বাকি রাখলে? আমিই বা আপত্তি করলাম কোথায়?

শিবনাথ—ওই যে, আপনার স্নানের সময় নিজের হাতে আপনার গায়ে একটু জল ঢেলে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আপত্তি করলেন। অথচ…।

পূর্ণানন্দ—কি?

শিবনাথ—আমার যে এখনও মনে আছে, আমিই তো এক দিন বাঁদরের মতো ধুলোমাখা পায়ে আপনার কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আর লগি নেড়ে আম পেড়েছিলাম।

পূর্ণানন্দ এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন—এই কথা! তোমার কি ধারণা যে তোমার সেই ধুলোমাখা পায়ের দাগ আমার গায়ে এখনও লেগে আছে? তুমি কি আমার গায়ে জল ঢেলে দিয়ে সে দাগ ধুয়ে দিতে চাও?

হাসছেন সাধুকাকা, কিন্তু তাঁর মাথাটা যেন বড় বেশি কাঁপছে। শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে তাঁর চোখের চাহনিটা।

শিবনাথ—না সাধুকাকা, আমার মনে ওরকমের কোন বাজে ধারণা থাকতেই পারে না। জল ঢেলে দিয়েই কি সবকিছু ধুয়ে দেওয়া যেতে পারে? পারে না।

শিবনাথ যেন একটা বাচাল প্রতিধ্বনি। ভয়ানক অদ্ভুত কথা বলছে শিবনাথ।

পূর্ণানন্দের দুই কান বোধহয় শিউরে উঠেছে। দুই চোখের চাহনিও শিথিল হয়ে গিয়েছে। পূর্ণানন্দের গলার স্বর ঘড় ঘড় করে।—এখন কটা বেজেছে, শিবনাথ?

শিবনাথ—চারটে বেজেছে বোধহয়। সাড়ে চারটের বেশি নয় নিশ্চয়।

পূর্ণানন্দ—তা হলে তো আমার রওনা হবার সময় হয়ে এল।

শিবনাথ—আজ্ঞে না, এখনও প্রায় আড়াই-ঘণ্টা বাকি। আপনার ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা সাড়ে ছ টায়।

পূর্ণানন্দ—ওই একই কথা। আর মাত্র দুই আড়াই ঘণ্টা।

শিবনাথ—আপনি কি যাবার আগেও একটু কিছু মুখে দেবেন না?

হেসে ফেলেন পূর্ণানন্দ—তুমি দেখছি, সত্যিই আমাকে খুব ভয়-ভয় করে কথা বলছো? মুখে দেব বইকি। অন্তত এক পেয়ালা গরম চা তো খাব।

শিবনাথ—আর একটু…।

পূর্ণানন্দ—না শিবনাথ, লুচি-টুচি আমার সহ্য হবে না।

শিবনাথ—তা হলে একটু মুড়ি-টুড়ি…।

পূর্ণানন্দ—তোমাদের এখানে মুড়ি পাওয়া যায় নাকি?

শিবনাথ—খুব পাওয়া যায়। আরও মজার ব্যাপার, এখানকার মুড়ি ঠিক আমাদের বিরামপুরের মুড়ির মতো খুব মিহি চালের মুড়ি, জুঁইকুঁড়ির মতো ধবধবে সাদা।

পূর্ণানন্দ—সে মুড়ির শেষ চেহারা তো তিরিশ বছর আগে দেখেছিলাম. তারপর আর নয়। তোমার মনে নেই যে, সেদিন…।

বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন পূর্ণানন্দ। শিবনাথ বলেন—আমার নিশ্চয় মনে আছে।

পূর্ণানন্দ—মনে আছে কি, তোমাদের বাড়ির পুকুরঘাটে বসে একদিন বিকেলবেলা একটা ডালা ভরতি করে বিরামপুরের সেই মুড়ির সঙ্গে কচি শশার টুকরো মিশিয়ে …।

শিবনাথ—হ্যাঁ, মা এসে আবার একগাদা নারকেল বরফিও দিয়ে গেলেন। মনে আছে বইকি, ভুলবো কেন?

হঠাৎ যেন সাবধান হয়ে আর জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বিরামপুরের গল্পের সব মুড়ি উড়িয়ে দিলেন পূর্ণানন্দ। একবার চশমাটাকে খুলে নিয়ে হাত দিয়েই মুখটাকে মুছে নিলেন। তারপর বেশ নিবিড়-শান্ত স্বরে কনখল আশ্রমের কথা বলেন।—চমৎকার জায়গা। এমনই নিস্তব্ধ একটা জায়গা যে, নিজের মনের কথাগুলিরও যেন শব্দ শোনা যায়। অবশ্য তোমাদের এখানকার বিকেলবেলার

মতো ওখানেও বিকেলবেলার পাখি ডাকে। তবে সে-পাখির ডাক শুনতে একেবারে অন্য রকমের লাগে। এখানেও তো শুনছি, ওই তো, ময়নার মতো দেখতে একটা পাখি তখন থেকে ডাকছে ; কিন্তু কই ? এই ডাকে তো সেই স্বর নেই !

চা নিয়ে আসে প্রীতিকণা। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা ডালা ভরতি করে মুড়ি। আর সেই বাচ্চাটা, যার নাম ডাকু, সেটাও প্রীতিকণার পিছু পিছু হামা দিতে দিতে চলে আসে।

পূর্ণানন্দ যেন চমকে ওঠেন, আর বেশ একটু বিরক্তি-বিচলিত স্বরে কথা বলেন—আঃ, তুমি এটা কি করছো বউমা ? মুড়ির ডালা রেখে দিয়ে বাচ্চাটাকে আগে একটু ধর ; কোলে নাও।

চায়ের পেয়ালা আর মুড়ির ডালা পূর্ণানন্দের কাছের জানালাটার তাকের উপর রেখে দিয়ে বাচ্চা ডাকুকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নেয় প্রীতিকণা।

চা খান পূর্ণানন্দ ; মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে ডালা থেকে মুড়ি তুলে নিয়েও খেতে থাকেন।

ডাকুকে কোলে নিয়ে প্রীতিকণাও পূর্ণানন্দের চোখের সামনে যেন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রীতিকণার মুখে অদ্ভুত এক খুশির হাসি। কে জানে কিসের খুশির এত হাসি !

পূর্ণানন্দও হঠাৎ হেসে ফেলেন।—আমি বলেছিলাম কিনা, শিবনাথ ?

শিবনাথ—আজ্ঞে ?

পূর্ণানন্দ—তোমার এখানে এলে আমাকে সবার চোখে একটা রিপ ভ্যান উইংকল বলে বোধ হবে ?

শিবনাথ—বলেছিলেন তো, কিন্তু কত ভুল কথা বলেছিলেন।

পূর্ণানন্দ—একটুও ভুল বলিনি। এই দেখ, বউমা কেমন করে তাকিয়ে আমার খাওয়া দেখছে।

শিবনাথ—প্রীতি আবার কি দেখবে ? ও আর আপনার খাওয়ার কতটুকু দেখেছে ? প্রীতি তখন ছিল কোথায় যে দেখবে ?

এইবার প্রীতির মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে শিবনাথ।—তুমি তো দেখনি প্রীতি, এই মণিকাকা লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন রায়গঞ্জ থেকে ঘোড়া চড়ে আমাদের বিরামপুরের বাড়িতে আসতেন। আর, মা বাটি ভরতি করে ক্ষীরের পুলি এনে মণিকাকার পাতে ঢেলে দিতেন। এক বাটি, দু'বাটি, তিন বাটি ; মণিকাকা আর না করতেন না। মা শেষে ক্ষীরপুলির হাঁড়িটাকেই নিয়ে এসে মণিকাকার পাতের কাছে রেখে দিতেন।

প্রীতি বলে—কিন্তু সেই মণিকাকা আজ এ কী করছেন? শুধু দুটো মুড়ি চিবিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমার একটুও ভাল লাগছে না।

পূর্ণানন্দ—আহা, তুমিও এরকম একটা ভুল কথা বলে ফেললে, বউমা। আমি কি আজ সেই মানুষ, না আমার আজ সেই বয়স? তা-ছাড়া আমার মনেও কি আর সেই পুরনো জীবনের কোন লোভ-টোভ আছে?

সাধুকাকার এই কথার উপর তো আর প্রশ্ন চলে না। চুপ করে প্রীতিকণা। কিন্তু প্রীতিকণার এই নীরব মুখটা একটুও গম্ভীর নয়। প্রীতির সারা মুখে যেন অদ্ভুত এক খুশির হাসি থমথম করছে।

পূর্ণানন্দ বলেন—আমার খাওয়া হয়ে গেছে বউমা, তুমি এবার যাও। তোমার তো অনেক কাজ-টাজ আছে।

প্রীতি—কাজ-টাজ তো রোজই আছে, রোজ থাকবেও।

শিবনাথ—কিন্তু আপনাকে তো আর রোজ দেখতে পাবে না। এই তো, বড়জোর আর দেড় ঘণ্টা।

পূর্ণানন্দ হাসেন—যাই হোক, তুমি এখন এস, বউমা। আমি শিবনাথের কাছে শেষ বারের মতো আবোল-তাবোল আরও দুটো কথা শুনে নিই। কিন্তু তুমি আবার শিবনাথের মতো বলো না যেন, মনে একটা দুঃখ রয়ে গেল।

প্রীতি—না, বলবো না। আপনি তো আমাকে বউমা বলে ডেকেই ফেলেছেন।

এইবার প্রীতিরই মুখের দিকে তাকিয়ে পূর্ণানন্দ স্নিগ্ধ চোখ দুটো একেবারে উদাস হয়ে যায়। এ যেন আর-একটা বাচাল প্রতিধ্বনি! কনখলের তিরিশ বছরের আশ্রমিক এক সন্ন্যাসীর সতর্ক অন্তরাত্মা কোন্ মুহূর্তে যে অসতর্ক হয়েছে আর জব্দ হয়ে গিয়েছে, সেটা তো তিনি বুঝতেই পারেন নি।

ছটফট করেন পূর্ণানন্দ।—না শিবনাথ, আর ঘরের ভিতর বসে থাকতে ভাল লাগছে না। আমি বাইরের বারান্দায় বসি।

শিবনাথ—তাই ভাল।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু আর বসেই বা কি হবে? সময় তো হয়ে এল। এখন রওনা হলেই বা মন্দ কি।

শিবনাথ—না সাধুকাকা, একটু অপেক্ষা করুন। সন্ধ্যার আলো না জ্বেলে আপনাকে চলে যেতে দিতে খুব খারাপ লাগবে।

বারান্দায় মোড়ার উপর চুপ করে একলা হয়ে বসে রইলেন পূর্ণানন্দ। ঘরের ভিতরের যত কাজের কাছে চলে গেল প্রীতি। আর, শিবনাথ চলে গেলেন কুয়ো-তলার কাছে, হয় জল তুলতে, নয় ঘাসের উপর মেলে-দেওয়া যত কাচা কাপড়-

জামা তুলে আনতে!

কিন্তু পূর্ণানন্দ যেন হাঁসফাঁস করেন। এভাবে একটা বেতের মোড়ার উপড় চুপ করে বসে থাকতে খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন পূর্ণানন্দ। সত্যিই তো, এ যে একটা শাস্তির মতো ব্যাপার। এই বাড়ির সন্ধ্যাদীপের একটা আশার কাছে বন্দীর মতো পড়ে থাকবার কোনো দরকার ছিল না। সে সন্ধ্যাদীপ জ্বালবে তবে ছাড়া পাবেন পূর্ণানন্দ? শিবনাথের দাবিটা যে বড় বেশি সাহস করে বসে আছে।

বোধহয় বুঝতে পারেননি পূর্ণানন্দ, তাঁরই চোখের সামনে বিকেলের শেষ রোদের আভা কখন ফুরিয়ে গিয়েছে আর সন্ধ্যা দেখা দিয়েছে।

ভিতরের ঘরে হঠাৎ কে যেন একটা আলো জ্বেলে দিল। কী ভয়ানক চমকে উঠলেন পূর্ণানন্দ। এ আলো যে একটা সংকেত। শিবনাথের এই বাড়ির বারান্দা থেকে এইবার স্বচ্ছন্দে নেমে চলে যেতে পারবেন পূর্ণানন্দ। আর তাঁকে দেরি করিয়ে দিতে সাহস করবে না কোন বাধা।

ঘরের ভিতরে কারা যেন কথা বলছে। সে কলরবের কিছু ভাষা পূর্ণানন্দের কানের কাছেও ভেসে আসে। শিবনাথের বউ প্রীতি যতই আস্তে কথা বলুক না কেন, শুনতে পেয়েছেন পূর্ণানন্দ।—উনি আমার খুড়শ্বশুর। আমি আগে কখনও দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম; কখনও ভাবতেই পারিনি যে, কোনদিন দেখতে পাব। উনি তো আর ঠিক এ-জগতের কেউ নন।

একজন মহিলার গলার স্বর বেশ স্পষ্ট করে প্রীতিকে আবার বুঝিয়ে দিচ্ছে —কিন্তু মাত্র একটি দিন থেকেই চলে যাচ্ছেন কেন?

—কি করে বলি? আমরা তো খুব চেষ্টা করেছি, যাতে সাধুকাকার কোন অস্বস্তি না হয়। কাউকে চেঁচামেচি করতে, একটা টুঁ শব্দ করতেও দিইনি। নীলি আর মাধুকে বলে দিয়েছি, তোরা আজ নেপুদের বাড়িতে গিয়ে পড়গে যা। এখানে এত চেঁচিয়ে পড়া চলবে না।

—তুমি নিজে একবার বলে দেখলে পার।

—আর বলার সময় কোথায়? এখনি চলে যাবেন। যাবার সময় পিছু ডেকে কি ভাল হবে?

প্রতি বছর সাগর-স্নানে যাবার সময় ট্রেনের ভিড়ের মধ্যে বসেও কত রকমের ভাষায় কলরব শুনতে পান পূর্ণানন্দ। কিন্তু সেই শোনা তো পূর্ণানন্দের কানের কাছে এসেই শেষ হয়ে যায়। সে কলরবের আওয়াজ যত তীব্র হয়ে বেজে উঠুক না কেন, পূর্ণানন্দের মনের ধারে কাছে এসে সামান্য একটা ভাবনাও সৃষ্টি করতে

পারেনি! কিন্তু শিবনাথের বাড়ির এই সন্ধ্যার এই চাপা-স্বরের ভাষা যেন ভিন জগতের একটা উপবনের ঝড়ের শব্দ; পূর্ণানন্দের বুকের ভিতরে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছে।

কিন্তু বুঝতে পারন না পূর্ণানন্দ, শিবনাথের স্ত্রী মিছিমিছি এরকমের আক্ষেপ করে কেন? কনখল আশ্রমের এক বুড়ো সন্ন্যাসীকে পিছু ডেকে আরও দুটো দিন এখানে থামিয়ে রেখে দিয়ে এদের লাভ কি?

কিন্তু শিবনাথ আর শিবনাথের স্ত্রী, দুজনেই একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছে। পূর্ণানন্দ যেন মঙ্গলগ্রহের একটা মানুষ, এই মধুপুরের কাছে একটা ভয়ানক স্ট্রেঞ্জার! আশ্চর্য! তা না হলে এ ধারণা ওদের কেন হয় যে, ছেলেমেয়েদের পড়ার শব্দ শুনে পূর্ণানন্দ একেবারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠবেন?

পূর্ণানন্দ ডাক দিলেন—বউমা, তুমি কি একবার এদিকে আসতে পারবে?

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে প্রীতি—কি সাধুকাকা!

পূর্ণানন্দ—কাল যে আরও দুজনকে দেখলাম, তারা কোথায়?

প্রীতি—কারা?

পূর্ণানন্দ—তোমারই ছেলে আর মেয়ে বলে যাদের মনে হলো?

প্রীতি—হ্যাঁ, আমার মেয়ে নীলি আর ছেলে মাধু।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু কোথায় ওরা? বলতে গিয়ে পূর্ণানন্দের এই প্রায়-সত্তর বছর বয়সের গলার স্বরে যেন বেশ কঠোর একটা ধমক ফুটে ওঠে।

প্রীতি—ওদের ওদিকে সরিয়ে দিয়েছি।

পূর্ণানন্দ—বুঝেছি। আর এইমাত্র শুনেছিও, তুমি ঘরের ভিতরে একজন মহিলাকে যে-কথা বললে।

ভয় পায় প্রীতি—আমি কি ভুল করে কোন অন্যায় কথা বলে ফেলেছি, সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ—ভুল করেছ বইকি। নিশ্চয় অন্যায় করেছো। কে তোমাকে বললে যে, ওরা এখানে ঘরে বসে ওদের পড়া পড়লে আমার অস্বস্তি হবে?

নীরব হয়ে শুধু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি।

পূর্ণানন্দ—কোথায় ওরা?

প্রীতি—ডাকবো ওদের?

পূর্ণানন্দ—ডাকা তো আগেই উচিত ছিল। আমার কাছে ওদের একবার আসতে দেওয়া উচিত ছিল।

প্রীতি—আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি নীলিকে আর মাধুকে এখনই

ডেকে পাঠাচ্ছি।

শিবনাথ একটা দৌড় দিয়ে এসে বারান্দায় উঠলেন—এঃ, সত্যিই যে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো।

পূর্ণানন্দ—বৃষ্টি? হঠাৎ বৃষ্টি? এ কী ব্যাপার? এখন বৃষ্টি হলে তো চলবে না? হলেই বা কি? আমাকে এখনই বের হতে হবে।

শিবনাথ—তা তো হবেই; বেশি সময়ও তো আর নেই যে, অপেক্ষা করা চলবে।

প্রীতি—অন্তত আর আধ ঘণ্টা তো অপেক্ষা করেতে হবে।

শিবনাথ—মোটেই না। আর অপেক্ষা করা চলবেই না। রঘু বললে, ছ'টা বেজেছে। এখনই হাঁটা দিলে আর খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলেও স্টেশনে পৌছতে অন্তত পঁচিশ মিনিট লাগবে।

প্রীতি—কিন্তু সাধুকাকা যে নীলিকে আর মাধুকে দেখবেন।

শিবনাথ—আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন—তা হলে কি করে হয়? রঘু যদি এখনই ওদের ডেকে আনতে যায়, তবে ওদের এসে পৌছতেও তো অন্তত চল্লিশ মিনিট সময় লাগবে।—আপনি একটা বুদ্ধি দিন সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—আর বুদ্ধি দিয়েছি? আমিই যে ভুল করে একটা ঝোঁকের মাথায় নির্বুদ্ধির কাণ্ডটা করে বসে আছি। যাক···। বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন পূর্ণানন্দ—তোমাদের মনে যা ছিল, তাই হলো।

শিবনাথ—আজ্ঞে?

পূর্ণানন্দ—সাড়ে ছ'টার পর কি আর কোন ট্রেন নেই?

শিবনাথ—আছে, রাত্রি দশটায়।

পূর্ণানন্দ—তবে সেই ট্রেনেই যাব। এখন···এখন এক পেয়ালা গরম চা দাও দেখি, বউমা।

ঘরের ভিতরে চলে গেল প্রীতি। আর বাইরের গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন শিবনাথ—বৃষ্টিটা বোধহয় বন্ধ হয়েই গেল।

পূর্ণানন্দ হেসে ওঠেন—এখন তো বন্ধ হবেই। কাজ হাসিল হয়ে গেছে কিনা পিছু ডেকে আমার যাত্রা দেরি করিয়ে দেবার জন্য যা যা দরকার ছিল, তার সব হলো। কিন্তু, আর পিছু ডেক না, শিবনাথ।

শিবনাথ—না সাধুকাকা, ইচ্ছে থাকলেও আর পিছু ডাকবো না।

পূর্ণানন্দ—তোমার তো ওই একটি মেয়ে আর দুটি ছেলে?

শিবনাথ—হ্যাঁ।

পূর্ণানন্দ—দেশের খবর-টবর বোধহয় কিছুই রাখ না!

—কিছু কিছু রাখি। আমাদের সেই দালানবাড়িটা অবশ্য আছে, কিন্তু ওটা আর আমাদের কেউ নয়।

—কেন?

—বাবার তো অনেক দেনা দিল, তার উপর কঠিন অসুকের চিকিৎসায় জলের মতো টাকা খরচ করতেও হলো। বাড়িটা বিক্রি না করে দিয়ে কোন উপায় ছিল না।

—তা হলে তুমি এখন···।

—আমি এখানেই আছি, একরকম আছি, চলেই যাচ্ছে।

—চলে গেলেই হলো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাস্টারি করে যা পাই তাতে ডাল-ভাত কোনমতে হয়ে যায় বটে। সেজন্য কোন ভাবনা করি না। তবে ওই একটা চিন্তা; আমার নীলি তো বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বিয়ে দিতে হলে কিছু টাকার দরকার তো হবেই।

—বিয়ের চেষ্টা দেখছো তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশ ভাল দুটি পাত্রের খোঁজ পেয়েছিলাম। তার মধ্যে একটির সঙ্গে কোন কথাই চললো না। বড় বেশি দাবি। আর একটির সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে পাঁচ ভরি সোনার ব্যাপার নিয়ে সম্বন্ধ ভেঙে গেল।

—কিরকম?

—আমরা দশ ভরি পর্যন্ত রাজি হয়েছিলাম; প্রীতি ওর বিয়েতে পাওয়া বার ভরির মধ্যে ওই দশ ভরিকে এখনও কোনমতে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু ওঁরা বললেন, পনর ভরির সোনার গহনা দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে না দিলে আত্মীয়-কুটুম্বের কাছে ওঁদের অসম্মান হবে। কিন্তু আর পাঁচ ভরি সোনা দেবার মতো আমার সামর্থ্য ছিল না।

—এখন সামর্থ্য হয়েছে তো?

—আজ্ঞে না সাধুকাকা? কি করে হবে?

—তবে?

—তবে আর-একটি পাত্রের খোঁজ পেয়েছি। এদের সোনা নিয়ে দাবি-দাওয়ার ব্যাপার নেই। এরা মেয়ে দেখেই খুশি হয়েছে। কিন্তু বলছে, বরযাত্রীর সংখ্যা কিছু বেশি হবে। সেটাও তো যেমন তেমন খরচের ব্যাপার নয়, সাধু-কাকা।

—কেন ? তোমার যা সামর্থ্য তাই করবে। চা-সিঙাড়া খাইয়ে দেবে, বাস্।

—তা হয় না, সাধুকাকা। শেষে এই নিয়ে গণ্ডগোল বাধবে। অপমান হতে হবে।

—কিন্তু একটা উপায় তো করতে হবে। এই পাত্রকেও তো হাতছাড়া করা চলবে না।

—অগত্যা, কিছু ধার-কর্জের চেষ্টা দেখতে হবে।

—ধার-কর্জ ? একি ? এইতো ওরা এসেছে। কাছে এস দেখি। তুমি বুঝি নীলিমা ?

—হ্যাঁ।

পূর্ণানন্দ—আর তুমি বুঝি মাধু ?

—হ্যাঁ।

পূর্ণানন্দ—বাস্, আর কোন কথা নয়। এখন দিদি আর ভাই দু'জনে পড়তে বসে যাও। আমি তোমাদের পড়া শুনবো।

নীলিমা ঘরের ভেতর থেকে একটা মাদুর টেনে নিয়ে এসে বারান্দার মেজেতে পাতে। মাধু নিয়ে আসে একটা ল্যাম্প তারপর দু'জনেই বইয়ের দুটি স্তূপ হাতে তুলে নিয়ে এসে পড়তে বসে।

বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে পায়চারী করে ঘুরে বেড়ান পূর্ণানন্দ।—বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়ে পড়, যেন আমি শুনতে পাই।

শিবনাথ—আপনার রাত্তিরের খাওয়া কি কালকেরই মতো শুধু চার মুঠো যবের ছাতু···।

পূর্ণানন্দ হাসেন—তোমাদের ইচ্ছেটা কি ?

শিবনাথ—রুটি একটু ডাল সেদ্ধ আর একটু পায়েস যদি করা হয় তবে···।

—হ্যাঁ, কর। তবে বউমাকে বলে দাও, পায়েস যেন বেশি মিষ্টি না হয়।

চলে গেলেন শিবনাথ। আর, পূর্ণানন্দ শুধু বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করেন। মাঝে মাঝে নীলি আর মাধুর কাছে এসে দাঁড়ান। নীলি চোখ তুলে পূর্ণানন্দর মুখের দিকে তাকায়। বড় বেশি কালো আর চকচকে দুটি চোখ।

পূর্ণানন্দ হাসেন—এখনই কি-যেন একটা কথা তুমি পড়লে নীলিমা ? আর একবার পড় তো, শুনি ?

নীলিমা—ভারতের ঋষিদের উপলব্ধির বাণী এই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ একদিন ···।

পূর্ণানন্দ—তোমার বই একটু ভুল করেছে নীলিমা। ও কথাটা ভারতের কোন ঋষির বাণী নয়। ওটা হলো ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত ভিক্টর কুজাঁ'র বাণী।

নীলিমা চোখ বড় বড় করে তাকায়—তা হলে আমি এখন কি করি সাধুদা?

পূর্ণানন্দ—আমি যা বললাম সেটা বইয়ের পাতার একপাশে লিখে রেখে দাও।

আবার পায়চারি করেন পূর্ণানন্দ আবার হঠাৎ থমকে দাঁড়ান। মাধুর দিকে তাকিয়ে বলেন—কি বললে মাধু? উত্তমাশা অন্তরীপ?

মাধু—হ্যাঁ, সাধুদা।

পূর্ণানন্দ মাধুর কাছে এগিয়ে আসেন—তবে শোন, একটা গল্প বলি। পর্তুগীজ নাবিক যখন প্রথম ওই অন্তরীপ আবিষ্কার করেন, তখন জায়গাটাকে দেখে হতাশ হয়েছিলেন। সমুদ্রের অবস্থা খুব অশান্ত। তেমনি সব সময় ভয়ানক ঝড়। তাই অন্তরীপের নাম রাখা হলো, হতাশ অন্তরীপ। কিন্তু পর্তুগালের রাজা বললেন, না, ওর নাম হোক, উত্তমাশা অন্তরীপ। অশান্ত সমুদ্র দেখে হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

মাধু হাঁ করে, খুব আশ্চর্য হয়ে, আর যেন একটু মুগ্ধ হয়েও পূর্ণানন্দর মুখের কথাগুলি শুনতে থাকে। তারপরেই বই বন্ধ করে দেয়। —আপনি আর-একটা গল্প বলুন সাধুদা।

পূর্ণানন্দের মুখের হাসিটা এইবার যেন গলে পড়ে—এই সেরেছে! মাধুকে তো খুব চালাক বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু তখনি বেশ ক্লান্তভাবে মোড়ার উপর বসে পড়েন পূর্ণানন্দ।—আর গল্প বলা হবে না, মাধু। আর হবে না। আমি তোমাদের গল্পবলা দাদু নই।··· কিন্তু, ও শিবনাথ, তুমি কোথায়?

শিবনাথ আসতেই পূর্ণানন্দ যেন ছটফট করে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ান।—আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে শিবনাথ, রাত দশটার ট্রেনটাও বোধহয় ধরতে পারা যাবে না।

শিবনাথ—খুব পারা যাবে। এখনও একঘণ্টা সময় আছে।

পূর্ণানন্দ—থাকুক একঘণ্টা সময়। এখনই রওনা হয়ে যাওয়া ভাল।

ঘরের ভিতর থেকে প্রীতি যেন একটা উতলা-মূর্তি হয়ে বের হয়ে আসে; আর বেশ রাগ করেই কথা বলে···এখনই যাব-যাব করলে চলবে না, সাধুকাকা। আমি এইমাত্র পায়েস চড়ালাম।

প্রীতির মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে পূর্ণানন্দর দুই চোখ যেন ভীরু ভীরু হয়ে

শেষে একেবারে করুণ হয়ে যায়। বিড়-বিড় করে কথা বলেন পূর্ণানন্দ—আমারই ভুল হয়েছে, বউমা। তুমি কিছু মনে করো না।

কিন্তু পারলেন না পূর্ণানন্দ। শিবনাথের বাড়ির এক কঠোর অভিমানের ভর্ৎসনার কাছে যেন আরও অসহায় হয়ে পড়লেন। প্রীতিকণা বলে ওঠে।—কিছু মনে না করে পারবো কেন সাধুকাকা? আমি এত দৌড়দৌড়ি করে, তিন বার শ্যামবাবুর বাড়ি গিয়ে, ওঁদের চাকর রঘুকে গয়লাবাড়ি পাঠিয়ে দুধ জোগাড় করলাম, আর আপনি বলছেন···।

নীলিমা উঠে এসে পূর্ণানন্দর চোখের সামনে দাঁড়ায়—আপনি না খেয়ে যাবেন না, সাধুদা।

মাধু উঠে এসে পূর্ণানন্দর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ায়—ট্রেনেতে শেষে ক্ষিধের চোটে আপনার ঘুম হবে না, সাধুদা।

পূর্ণানন্দকে সত্যিই যে ভিন জগতের কতগুলি অদ্ভুত ছায়া ঘিরে ধরেছে। দেখতে ছায়া বটে, কিন্তু যেন লোহার মতো শক্ত ওদের কায়া। চলে যাবার আর সরে যাবার মতো একটা ফাঁক খুঁজে পাচ্ছেন না পূর্ণানন্দ। পূর্বজীবনের সব লোভ-টোভ তো কবেই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। তবে কেন, কিসের ভুলে শিবনাথের বাড়ির পায়েস খেতে চেয়ে ফেলেছে, এ কী ভয়ানক এক গোপনচর লোভ!

পূর্ণানন্দ বলেন—তবে আর কি বলবো? কিন্তু দেরি করিয়ে দিও না, বউমা! একটু তাড়াতাড়ি কর।

চলে যায় প্রীতি—খুব তাড়াতাড়ি করছি, সাধুকাকা। আপনি একটুও ভাববেন না।

নীলিমা আর মাধু আবার পড়তে বসে। মোড়াটাকে হাতে নিয়ে বারান্দার একেবারে ওদিকে চলে যান পূর্ণানন্দ। শিবনাথ বলেন—বলেন তো একটা মাদুর এনে পেতে দিই, সাধুকাকা। অন্তত কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিতে পারবেন।

পূর্ণানন্দ—না। আমি যে কথা বলছিলাম, হ্যাঁ, শেষে একটা ধার-কর্জ কি করতেই হবে?

শিবনাথ—নীলির বিয়ের কথা বলছেন?

পূর্ণানন্দ—তবে, আর বলছি কি?

শিবনাথ—আজ্ঞে, টাকা ধার করা ছাড়া তো উপায় নেই। ব্যাঙ্ক থেকে ধার পাওয়া যেতে পারে, যদি আমার এই বাড়িটাকে বন্ধক রাখা হয়।

পূর্ণানন্দ—তবে তাই করো। লোকে তো কত বাজে কাজে ভিটে বাড়ি সম্পত্তি বেচে দেয়; তুমি না হয় নীলির বিয়ের জন্যে বাড়িটাকে বাঁধা রাখলে।

শিবনাথ—আমিও তো তাই ভেবে রেখেছি। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন বুদ্ধি দিতে পারেন কি, সাধুকাকা ?

—বুদ্ধি দেব আমি ? হেসে ফেললেন পূর্ণানন্দ।—আমার বুদ্ধি তো তিরিশ বছর আগে গঙ্গাজলে ভেসে গিয়েছে, শিবনাথ।

আবার হাসতে গিয়ে পূর্ণানন্দর মাথাটা দুলে ওঠে; আর গলার স্বর যেন কেঁপে কেঁপে দূরের ঢেউয়ের শব্দের মতো মিলিয়ে যায়।

কে জানে সামান্য একটু পায়েস তৈরী করতে গিয়ে কী কাণ্ড করছে প্রীতিকণা। রান্নাঘর থেকে এত ধোঁয়া বের হয়ে আসছে কেন ? তবে কি দুটো উনান জ্বেলেছে প্রীতি ? সাধুকাকার রুটি আর ডালসেদ্ধ কি এখনও হয়নি ?

ডাকু জেগেছে ! ওর কান্নার স্বর শোনা যায়। শিবনাথ বলেন—এই সেরেছে !

পূর্ণানন্দ—কি হলো ?

শিবনাথ—একে তো এমনিতেই আপনার খাবার তৈরী করতে এত দেরি করে ফেলেছে প্রীতি, তার ওপর ডাকু জেগেছে। রক্ষে নেই। এখন দু'দিক সামলাতে গিয়ে প্রীতি, শেষে একটা কাণ্ডই করবে বলে মনে হচ্ছে।

পূর্ণানন্দ—না না, আর যেন দেরি না হয় শিবনাথ। তুমি বরং ডাকুকে তুলে নিয়ে এসে এখানে বসো।

শিবনাথ—ওকে এখানে নিয়ে এলেও কি ওর কান্না থামবে ? আপনার খুব অস্বস্তি হবে, সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—হোক। বউমাকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে বলে দাও।

ঘরের ভিতরের বিছানা থেকে ডাকুকে কোলে করে তুলে নিয়ে এসে আবার ঠিক পূর্ণানন্দর সামনে এসে দাঁড়ায় শিবনাথ। ডাকুর কান্না শান্ত করতে চেষ্টা করে।

রান্নাঘরের ধোঁয়া, বাচ্চা ডাকুর কান্না, নীলি আর মাধুর পড়ার গলার স্বর, শিবনাথের গলার ঘুমপাড়ানি গান, আর প্রীতিকণার ছটফটে ছায়াটার উঁকি-ঝুঁকি। পূর্ণানন্দ যেন একটা চমৎকার ক্ষণছলনার জগতের মধ্যে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছেন, উনি কে ? শ্যামবাবু নাকি ? চমকে উঠলেন শিবনাথ। ঠিক, একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে আগে আগে হেঁটে চলেছে শ্যামবাবুর অফিসের চাপরাশি, হাতে কাগজপত্রের ফাইল আর খাতা। পিছনে শ্যামবাবু। তবে কি সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে ? সাড়ে ন'টার আগে তো কোনদিনই বাড়ি ফিরতে পারেন না শ্যামবাবু।

—আমার সন্দেহ হচ্ছে, সাধুকাকা, বোধহয় বেশ দেরিই হয়ে গেল। বেশ একটু ভয়ে-ভয়ে কথা বলেন শিবনাথ।

পূর্ণানন্দ চমকে ওঠেন—কটা বেজেছে?

শিবনাথ—শ্যামবাবুকে বাড়ি ফিরতে দেখে মনে হচ্ছে, সাড়ে ন'টা হয়ে গিয়েছে।

পূর্ণানন্দ তাঁর দুই চোখ টান করে শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর, কথা বলতে গিয়ে তাঁর এতক্ষণের শান্ত ধৈর্য যেন বেশ রুক্ষ একটা গলার স্বর নিয়ে গরগর করে ওঠে—খুব অন্যায়। বউমা কি আমাকে সোনার বাটিতে করে সিংহীর দুধের পায়েস খাওয়াবে? এত দেরির কোন মানে হয়! ছিঃ।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে প্রীতি।—সত্যি, দেরি হয়ে গেল। আর একটু দেরি হবে। কিন্তু ইচ্ছে করে দেরি করছি না, সাধুকাকা। আপনি রাগ করবেন না।

পূর্ণানন্দ—অনিচ্ছা করেও কি এত দেরি হতে পারে?

শিবনাথের দিকে তাকিয়ে প্রীতি আক্ষেপের স্বরে একটা অদ্ভুত কথা বলেন—গয়লাবাড়ি থেকে রঘুয়া যে দুধ এনে দিল, সেটা জ্বাল দেওয়া মাত্র ফেটে গেল।

শিবনাথ—অ্যাঁ! সে কি?

প্রীতি—কাজেই, ঘরের বাটিতে যেটুকু দুধ ছিল, এখন তাই দিয়ে···।

পূর্ণানন্দর চোখে ভয়ানক দুরন্ত একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।—কি বললে বউমা? ঘরের বাটির দুধ মানে কি? সেটা তো এই বাচ্চাটার জন্য তুলে রাখা দুধ। নয় কি? সত্যি করে বল।

প্রীতি—হ্যাঁ, সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—তোমাদের সঙ্গে আমার আর একটা কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না, বউমা। মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে একটা মহাপুরুষ ঠাউরেছো। আমি বুঝতে পারিনি যে, বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে তোমরা আমাকে শেষে এরকম একটা অপমান করবে। তোমাদের এখানে আর জলস্পর্শ করতেও আমার ইচ্ছা নেই। ···হ্যাঁ, শিবনাথ? ট্রেনের সময় আছে কি নেই, ঠিক করে বল?

শিবনাথ—এই ট্রেনের সময় আর নেই, সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—তবে কোন্ ট্রেনের সময় আছে?

শিবনাথ—ভোরের ট্রেন। ভোর পাঁচটার ট্রেন

পূর্ণানন্দ—তা হলে, আমি চলি।

প্রীতিকণা প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠে—সাধুকাকা!

শিবনাথ ডাকেন—সাধুকাকা!

নীলি আর মাধু উঠে এসে ডাক দেয়।—সাধুদা!

পূর্ণানন্দ—কি বলতে চাও, তোমরা!

প্রীতি—আপনি খেয়ে-দেয়ে, আর এই রাতটার মতো এখানে কোনমতে…

শিবনাথ—একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দিন, সাধুকাকা। তারপর…।

পূর্ণানন্দ—আমার খাওয়া-দাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। তোমার ওই পায়েস আমি মুখে দেব না, বউমা।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি। কেঁদে ফেলবে নাকি প্রীতি? তা না হলে ওরকম ছটফট করে কাঁপছে কেন প্রীতির চোখের তারা দুটো?

পূর্ণানন্দের গলার স্বরের রুক্ষ কঠোরতা হঠাৎ যেন চুপসে যায়—পায়েস কি তৈরী হয়েছে, বউমা?

—হয়েছে। আপনার রুটি আর ডালসেদ্ধও হয়ে গিয়েছে।

—তবে নিয়ে এস। হেসে ফেলেন পূর্ণানন্দ।

এই বারান্দাতেই মাদুরের উপরে যেন মন-প্রাণ-শরীরের সব জোর নিয়ে আর শক্ত হয়ে বসেন পূর্ণানন্দ। রুটির টুকরো দিয়ে মুড়ে মুড়ে ডাল সেদ্ধ খেতে থাকেন।

পূর্ণানন্দ যা বলে দিলেন, তাই করে প্রীতি। পূর্ণানন্দর সামনের থালাতে দু'চামচ পায়েস তুলে দেয় প্রীতি। আর পূর্ণানন্দর পাশেই মাদুরের উপর ডাকুকে বসিয়ে রেখে, ডাকুর মুখে একটু-একটু করে পায়েস তুলে দেয়।

পূর্ণানন্দ বলেন—কই নীলি, কই মাধু, তোরাও আয়। ওদেরও একটু একটু দাও, বউমা।

জল খেয়ে, হাত ধুয়ে তারপর একটা হাঁক ছেড়ে উঠে পড়লেন পূর্ণানন্দ—ব্যস্, আর কিন্তু আমি একটি কথাও বলবো না। তোমরা আমাকে আর একটিও কথা বলবে না। না, আর…।

কি-যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন পূর্ণানন্দ। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেই ফেললেন।—আর কেউ যেন আমার কাছে আসে না।

লণ্ঠনটা নিজেই হাতে তুলে নিলেন, পূর্ণানন্দ। আস্তে আস্তে হেঁটে একটু দূরের সেই ঘরের দিকে চলে গেলেন, যে-ঘরের নিভৃতে একলা হয়ে থেকে মধুপুরের এই রাত্রির মুহূর্তগুলিকে শুধু জেগে জেগে ক্ষয় করে দিতে হবে। আর ঘুমোতে চান না পূর্ণানন্দ। ভোরের ট্রেন ফেল করলে যে মাথার উপরের ওই আকাশে একটা ঠাট্টার অট্টহাসির ঝড় ছুটে চলে যাবে।

ঘুমোতে পারেন না পূর্ণানন্দ। ঘুমোবার জন্য পূর্ণানন্দের চোখে কোন চেষ্টাও

নেই। ঘরের বাইরে লণ্ঠনটাকে রেখে দিয়ে, ঘরের ভিতরের মেজেতে কম্বলের উপর চুপ করে বসে থাকেন পূর্ণানন্দ। যেন শেষ ধ্যান সেরে নিচ্ছেন পূর্ণানন্দ।

তখনো ভোর হয়নি। মধুপুরের আকাশের কোন তারা নিবেও যায়নি। উঠে পড়লেন পূর্ণানন্দ। কম্বল গুটিয়ে নিলেন। ঝোলাটাকে হাতে তুলে নিলেন। শব্দহীন অন্তর্ধানের একটি ব্যস্ত ছায়ার মতো এগিয়ে চললেন। কিন্তু শিবনাথের বাড়ির বারান্দার সিঁড়ির পাশে সেই লতানে গোলাপের কাছে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। কি আশ্চর্য, এই শেষরাতেও সিঁড়ির উপর হলদে গোলাপের পাঁপড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে।

পূর্ণানন্দর শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। শুধু চোখ দুটো নয়, মনটাও যেন ছটফট করছে। এভাবে একলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে যেন দুঃসহ একটা অস্বস্তি বোধ করছেন পূর্ণানন্দ।

পূর্ণানন্দ ডাকেন।—শিবনাথ, আমি চললাম।

শিবনাথ নিশ্চয় জেগেই ছিলেন। তা না হলে পূর্ণানন্দর এক ডাকে সাড়া দিয়ে চলে আসবেন কেন শিবনাথ—তা হলে, সত্যিই চললেন সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—হ্যাঁ, শিবু সত্যিই যাচ্ছি।

শিবনাথ—হ্যাঁ, আমিও নিশ্চয় আপনার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যাব; আপনার আপত্তি নেই তো সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ—না। সেইজন্যেই তো তোমাকে ডাকলাম।

শিবনাথ—চলুন তবে।

পূর্ণানন্দ তবু দাঁড়িয়ে থাকেন।—হ্যাঁ, চল। কিন্তু ওরা সব কোথায়? ওদের একবার ডাক। তা না হলে যাই কি করে?

শিবনাথের ডাক শুনেই চলে আসে প্রীতি। প্রীতির কোলে ডাবু, সেটাও জেগেই আছে।

চলে আসে নীলি আর মাধু। নীলি ওর দুই কালোচোখ বড় করে পূর্ণানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে; আর মাধু ভাল করে তাকাবার জন্য হাত তুলে ওর ঘুমকাতর দুই চোখ ঘষতে থাকে।

পূর্ণানন্দ বলেন—ডাকুর কিন্তু খুব ঠাণ্ডা লেগেছে, বউমা। অনেকবার ওকে হাঁচতে দেখেছি। তুমি বুঝতে পেরেছো কিনা জানি না। সরষের তেল গরম করে ওর দুই পায়ের তলায় খুব ভাল করে ঘষে দিও।

প্রীতি বলে—দেব।

নীলিমার মুখের দিকে তাকান পূর্ণানন্দ—নীলি ইংরেজীতে একটু কাঁচা আছে,

শিবনাথ। তুমি নিজে ওকে একটু দেখিয়ে-বুঝিয়ে দিও।

শিবনাথ—তা দেব।

পূর্ণানন্দ হাসেন—মাধুর উত্তমাশা অন্তরীপও কেমন গোলমেলে মনে হলো। মুখস্থ করে কিন্তু মনে থাকে না বোধহয়। তুমি একটু মন দিয়ে ভূগোল পড়বে, মাধু। কেমন?

মাধু—হ্যাঁ।

পূর্ণানন্দ—হ্যাঁ, চল শিবনাথ।

রওনা হলেন পূর্ণানন্দ। রাস্তার উপরে এসেই দুই চোখ তুলে একবার আকাশের চেহারাটা দেখে নিলেন। শিবনাথ বলেন—এই তো···যাকে বলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত, তাই না সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ—হুঁ।

শিবনাথ—এ সময়ে আমাদের মধুপুরের আকাশটাও বেশ চমৎকার শান্ত পবিত্র···।

পূর্ণানন্দ হাসেন—থাম শিবনাথ। এরকম পবিত্র শান্ত আকাশ আমি অনেক দেখেছি। চোখ বন্ধ করেও দেখেছি। কিন্তু···।

শিবনাথ—আজ্ঞে।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু নীলির বিয়েতে যেন কোন গণ্ডগোল না হয়, শিবু। বিশেষ করে বরযাত্রীদের খাওয়ার কোন ত্রুটি যেন না হয়। সরু চামরমণি চালের পোলাও, দু'রকমের ডাল, একরকমের ভাজা হলেই চলবে, কিন্তু মিষ্টি হরেক রকমের হলেই খুব চমৎকার হবে।

কথা থামিয়ে রেখে আস্তে একটা হাঁপ ছাড়েন পূর্ণানন্দ। তারপর হাতের ঝোলাটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে কথা বলেন—তোমার বাড়ির পুবদিকে ওই যে ঘেসো জমিটা, ওখানেই ছোট একটা সামিয়ানা টানিয়ে লোকজনের বসবার জায়গা করে দিও।···কিন্তু···কিন্তু ভোর যে হয়ে এল, শিবু। একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চল।

কোন কথা না বলি

সকলেই জানেন, ওই বাড়িটা স্বামী-স্ত্রীর জীবনের বাড়ি। কিন্তু এরই মধ্যে একটা ঠাট্টার কথাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ওটা একটা ক্লাব-বাড়ি।

সহর নয়, ছোট একটি জনপদ, যার নাম পিটারপুরা। পিটার নামে এক ইংরেজ সাহেব প্রায় আশি বছর আগে এদিকের জঙ্গলের ভিতরে প্রথম কয়লা-খনি চালু করেছিলেন। আজ এই অঞ্চলের এদিকে ওদিকে অনেক কয়লাখনি। আর পিটারপুরাও অনেক দোকানপাট নিয়ে ছোট একটি জনপদ।

এই পিটারপুরার ওভার্সিয়ার জয়ন্তবাবুর বাড়িটাকেই ঠাট্টা করে ক্লাববাড়ি বলা হয়ে থাকে। সন্ধ্যা হতেই এবাড়ির বারান্দায় মস্ত বড় সতরঞ্চি পাতা হয়। খুব কড়া আলোর বাতি জ্বলে। কখনও তাস, কখনও দাবা, কখনও গ্রামোফোনের বাজনা। মাঝে মাঝে হারমোনিয়ামও বাজে, সেই সঙ্গে গান। জয়ন্তের পরিচিত আর আমন্ত্রিত মানুষের একটি ভিড় এবাড়ির বারান্দাতে যেন একটি উৎসব সৃষ্টি করে, আর চলে যায়। কোন সন্ধ্যায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। হ্যাঁ, শীতকালে মাঝে-মাঝে বাইরের ঘরের ভেতরেই এই উৎসবের যত হর্ষ আর মুখরতা আকুল হয়ে বাজতে থাকে।

এই সান্ধ্য আসরের আনন্দ আরও বিচিত্র, আরও রঙীন হয়, যখন জয়ন্তের স্ত্রী নীরজা নিজের হাতেই একটা ট্রে নিয়ে এই ঘরের ভিতরে বা এই বারান্দাতে এসে দাঁড়ায়। ট্রে থেকে এক এক করে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে দিয়ে কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে নীরজা। তারপরেই চলে যায়।

কিন্তু যেতে গিয়েও, থমকে দাঁড়াতে হয়, কারণ কেউ এক জন হয়তো বলে উঠেছে, আমার কিন্তু আর এক কাপ চা চাই, মিসেস রায়।

—আমার চায়ে আর একটু চিনি চাই।

—আমাকে আধ-কাপ গরম জল দেবেন।

—আমার এক টুকরো লেবু পেলে ভাল হতো।

তাসের খেলার ব্যস্ততা হঠাৎ থমকে গিয়ে এইভাবে নানা দাবির আবেদন হয়ে নীরজাকে ব্যস্ত করে দেয়। নীরজা তেমনই হেসে হেসে ভিতরে চলে যায়। আর, আবার এসে যার যত দাবির সামগ্রী এনে আর রেখে দিয়ে চলে যায়।

কেউ ডাকে বউদি, কেউ বলে মিসেস রায়, কেউ বা নীরজা রায় বলে ডাক দিতেই ভালবাসে। নয়ন গুপ্ত একদিন নীরজা বলেই ডাক দিয়ে ফেলেছিল।

সে ডাক শুনে কিন্তু নীরজার চোখে কোন বিরক্তির ভ্রূকুটি কেঁপে ওঠেনি, নীরজা শুধু চকিতে একবার নয়ন গুপ্তের দিকে তাকিয়েছিল, আর স্বচ্ছন্দে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলার সে আসর রঙীন হয়ে উঠবেই বা না কেন? নীরজা যখন ট্রে হাতে নিয়ে এই তাস, দাবা, হারমোনিয়াম আর গ্রামোফোনের আসরের কাছে

এসে দাঁড়ায়, নীরজার রঙীন শাড়ির আঁচল যে সত্যিই লতিয়ে লতিয়ে দুলতে থাকে, নীরজার গলার হার চিকচিক করে, ঝিক-ঝিক করে কানফুলের পোখরাজ। আর, এক-এক সন্ধ্যায় সত্যিই নীরজার গায়ের শাড়ি থেকে সামান্য দু'-ফোঁটা সেন্টের হালকা সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়েও পড়ে।

ওভারসিয়ার জয়ন্ত খুবই মিশুক স্বভাবের মানুষ। নিতান্ত এক ঘণ্টার পরিচিত মানুষকেও বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ফেলতে পারে জয়ন্ত। আর সারাদিনের খাটুনির পর এই বারান্দার সান্ধ্য আসরের হই হই উল্লাস আর কলরব যেন জয়ন্তের জীবনের একটা সান্ত্বনা। জয়ন্ত নিজেই বলে, এরকম একটু আনন্দের হল্লা না থাকলে এই জঙ্গলের ভেতরে বেঁচে থাকবো কি করে?

কিন্তু এই পিটারপুরাতে আরও তো কত বাড়ি আছে, সে-সব বাড়িতে জয়ন্তের মতো ভদ্রলোকেরাই থাকে, আর তাঁরা বেঁচেও আছেন, যদিও সে-সব বাড়ির বারান্দাতে প্রতি সন্ধ্যায় এরকমের কোন বিচিত্র রঙীন উল্লাসের আসর বসে না। কিন্তু এটাও কোন যুক্তি নয় নিশ্চয়। যার মনে যেমন অভিরুচি, তার মন তেমনই তৃপ্তি দাবি করবে। জয়ন্তের প্রাণ যে-ভাবে বাঁচতে চায়, সেভাবেই তো বাঁচবে।

ঠাট্টাটা কিন্তু এই জন্য নয়। আর ওই ঠাট্টাটা ঠিক সহজ, সরল একটা ঠাট্টাও নয়। এ ঠাট্টার ভিতর যেন খুব সূক্ষ্ম একটা ভর্ৎসনা কথা বলছে। সন্ধ্যাবেলাতে একগাদা চেনা অচেনা আর আধ-চেনা মানুষকে নিয়ে অন্য কোথাও তাস-দাবার আসর বসালেই তো পারে জয়ন্ত। বাড়িতে কেন? জয়ন্তের বিচার-বুদ্ধি কিংবা কাণ্ডজ্ঞান যদি বেশ ঢিলে না-হয়ে যেত, তবে নিশ্চয় বুঝতে পারতো জয়ন্ত, যে-বাড়িতে নীরজার মতো সুন্দরী স্ত্রী আছে, আর দ্বিতীয় কোন বয়স্ক বা বয়স্কা ব্যক্তি নেই, সে-বাড়িতে জয়ন্তের পক্ষে এরকম ভিড় ডেকে আনা উচিত নয়।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ছবি দেবী বলেন, ওভারসিয়ার জয়ন্তবাবু না হয় একটু কম বুদ্ধির মানুষ, কিন্তু নীরজা কি? নীরজার তো আপত্তি করা উচিত। নীরজার কি একটু ভয়ডরও নেই? কি আশ্চর্য, আপত্তি করা দূরে থাকুক, নীরজা নিজেই এই একগাদা পুরুষমানুষের আড্ডার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে আর হাসবে। খুব ভুল করছে নীরজা।

নীরজার কানেও কি এই সব মন্তব্য, সমালোচনা আর ঠাট্টার কোন কথা পৌঁছয় না? পৌঁছয় বইকি। কয়েকবার বেনামী চিঠিও এসেছে নীরজার নামে, —একটু সাবধান হবেন। আপনার ভাল'র জন্যেই বলছি। জয়ন্তবাবু বেচারা অত্যন্ত ভাল মানুষ, কিন্তু অত্যন্ত বোকা মানুষ। উনি সরল বিশ্বাসে আর বন্ধু-

ভাবে সবাইকে ডাকেন। কিন্তু যারা আপনার বাড়িতে গিয়ে ভিড় করে, তাদের অনেকেই বন্ধুভাবে যায় না, তারা সরল মানুষ নয়।

নীরজা কিন্তু বেনামী চিঠি পড়ে হেসে ফেলে। ঠিক কথাই লিখেছে বেনামী চিঠি। কিন্তু তবু তার মধ্যে একটি ভুল কথা লিখেছে। বুঝতে পারে না নীরজা, নীরজাকে কিসের সাবধান হতে এত অনুরোধ করছে এই চিঠি? নীরজা কি অসাবধান? কেউ কি কখনও দেখেছে যে, ওই সন্ধ্যার সময়টুকু ছাড়া আর কোন সময়ে কোন সরল বা অসরল উদ্দেশ্যের মানুষ জয়ন্তের বাড়িতে এসেছে আর তার সঙ্গে গল্প করছে নীরজা?

না, কেউ দেখেনি। শুধু একবার দেখা গিয়েছিল, নয়ন গুপ্ত তার মোটর সাইকেল নিয়ে ছুটে এসে এক দুপুরবেলায় জয়ন্তের বাড়ির কাছে থামলো। জয়ন্ত বাড়িতে নেই।

নয়ন গুপ্ত ডাকে—আমি, নয়ন এসেছি। আপনি কোথায়?

জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় নীরজা।—উনি তো এখন বাড়ি নেই।

নয়ন—জানি, কিন্তু আপনি এখন কি করছেন?

নীরজা—সেলাই করছি।

নয়ন—আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল।

নীরজা—বলুন।

নয়ন—ওভাবে ঘরের ভিতরে জানালার কাছে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি এখানে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে কথা বলবো?

নীরজা—তাই বলুন না। অসুবিধের কি আছে?

নয়ন—তুমি সব বুঝেও এ কিরকম কথা…।

নীরজা হাসতে থাকে—আপনার, মনে হয়, অসুখ করেছে।

নয়ন—কে বললে?

নীরজা—বোধহয় মাথার গোলমাল হয়েছে।

নয়ন—কে বললে?

জানালাটাকে আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেয় নীরজা।

এরপর আর নয়ন গুপ্তকে অবশ্য জয়ন্তর বাড়ির সন্ধ্যার আসরেও কোনদিন দেখা যায়নি। কিন্তু দেখা গিয়েছে, রমেশ সরকার নামে নতুন একজন এসেছে। খুব ভাল গাইতে পারে রমেশ সরকার।

নয়ন গুপ্ত থাকে চার মাইল দূরের এক কয়লাখনির একটি কোয়ার্টারে। গুখরা কোলিয়ারির ওভারম্যান নয়ন গুপ্ত যখন দু'মাসের মধ্যে একটি সন্ধ্যাতেও

এবাড়ির উল্লাসের আসরে দেখা দিল না, তখন জয়ন্ত নিজেই ব্যস্ত হয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছিল, কেন আসে না নয়ন গুপ্ত। চন্দ্রপুরা স্টেশনে একদিন নয়ন গুপ্তর সঙ্গে জয়ন্তের হঠাৎ দেখাও হয়ে গিয়েছিল। নয়ন গুপ্ত বলে—পায়ে একটা ব্যথা, মোটরবাইক চালাতে অসুবিধে হয়। তাই আর আপনার ওখানে যাওয়া হয়ে ওঠে না, জয়ন্তবাবু!

শুনে দুঃখিত হয়েছে জয়ন্ত।—তা হলে আর কি বলি? তবু একদিন যদি কোনমতে যেতে পারেন, তবে খুব খুশি হব; আর আপনিও রমেশ সরকারের গান শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। অদ্ভুত, অপূর্ব, চমৎকার গাইতে পারেন রমেশ সরকার।

রমেশ সরকার যেসব গান গেয়ে এই সন্ধ্যাবেলার আনন্দের আসরটিকে মুগ্ধ করে দেয়, তার সবই প্রেমের আকুলতার যত গান। আর কী আশ্চর্য, রমেশের গলার গান যখন মূর্চ্ছনাময় একটা আবেশ ঘনিয়ে তুলেছে, ঠিক তখন চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে আসরের কাছে এসে দাঁড়ায় নীরজা। রমেশের গান যেন এই আবির্ভাবের সাড়া পেয়ে আরও মিষ্টি হয়ে যায়।

রমেশ সরকার থাকে পালুড়ি কোলিয়ারিতে; রেজিং কণ্ট্রাক্টর রমেশ সরকার। নতুন কেনা একটা চকচকে মোটর গাড়িকে সেই পালুড়ি থেকে বারো মাইল রাস্তা ছুটিয়ে নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় এই বাড়িতে উপস্থিত হতে কোনদিন ভুল করে না রমেশ সরকার।

এই রমেশ সরকার একদিন হঠাৎ সকালবেলাতেই উপস্থিত হলো আর ডাক দিল—আমি রমেশ।

জানালাতে দাঁড়িয়ে কথা বলে নীরজা—উনি চন্দ্রপুরা গিয়েছেন।

রমেশ হাসে—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে জয়ন্তবাবুর পথেই দেখা হয়েছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে কোনদিনও একটু ভাল করে কথা বলবার সুযোগ পেলাম না।

নীরজা হাসে—বলুন।

রমেশ—আপনি তো রোজই আমার গান শুনছেন। কিন্তু কিছু কি বুঝতে পেরেছেন?

নীরজা—আমি তো লেখাপড়া একটু জানি, বুঝবো না কেন?

রমেশ হাসে—না, বুঝতে পারেন নি। গানগুলি সবই আমার রচনা।

নীরজা হাসে—এটা অবশ্য বুঝতে পারিনি।

রমেশ—কিন্তু বুঝতে তো পেরেছেন, কার জন্যে, কার কথা মনে করে এসব গান লিখেছি?

নীরজা—তা বুঝবো কেমন করে ?

রমেশ—এখনও যদি সেটা না বুঝতে পেরে থাকেন, তবে বুঝবো, আমারই দুর্ভাগ্য।

নীরজা—কিন্তু আপনি বুঝিয়ে দিলেই তো বুঝে ফেলতে পারি।

রমেশের চোখের চাহনি জলজল করে—আপনারই জন্যে লিখেছি। এখন আপনি বলুন, ভুল করেছি কি ? আপনি বলুন, শুনে ভাল লেগেছে আপনার ?

নীরজা আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ করে দেয়। রমেশের নতুন গাড়িও যেন সেই মুহূর্তে আতঙ্কিতের মতো ছটফটিয়ে ওঠে আর ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে যায়। আর, কোনদিনও জয়ন্তের বাড়ির এই সান্ধ্য-আসরে পালুড়ির রমেশ সরকারকে দেখতে পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত নিজেই একদিন নীরজাকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি কখনও ওদের কাউকে···তার মানে ভুল করে এমন কোন ব্যবহার···তার মানে অভদ্রতা বলে মনে হতে পারে, এমন ব্যবহার···।

নীরজা অদ্ভুতভাবে হাসে—পোকামাকড়ের সঙ্গে একটু অভদ্রতা করাই নিয়ম। তবু আমি···।

জয়ন্ত আশ্চর্য হয়—তুমি কি বলছো, বুঝতে পারছি না।

নীরজা হাসে—পোকামাকড়কে ঝাঁটা দিয়ে সরিয়ে দেওয়াই নিয়ম। তবু আমি সেটা করি না, করিওনি। ওরা নিজেরাই সরে যায়। তা ছাড়া···।

জয়ন্ত—কি ?

নীরজা—পোকামাকড়কে আমি ভয়ও করি না।

জয়ন্ত লজ্জিতভাবে হাসে—এঃ, তুমি মানুষগুলোকে ভয়ানক বেশি তুচ্ছ করে কথা বলছো। আমার ভয় হয়, তুমি হয়তো একদিন অধীরবাবুকেও···।

চমকে ওঠে নীরজা। জয়ন্তের কথাটা যেন প্রচণ্ড একটা মিথ্যের চিৎকার। আজ পর্যন্ত এবাড়ির সন্ধ্যা বেলার হই-হল্লার বৈঠকে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে ওই একটি মানুষকে বলা যায় সত্যিকারের ভালমানুষ। অধীরকে তুচ্ছ করবার কিংবা অশ্রদ্ধা করবার কোন কথা উঠতেই পারে না। জয়ন্তের বাড়ির সন্ধ্যা-বেলার বৈঠকে রোজই আসে অধীর। আসরের একপাশে বেশ শান্ত হয়ে বসে থাকে, মাঝে মাঝে গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজায়, চা খায়, আর চলে যায়।

এই অধীরই একমাত্র অভ্যাগত, যে একদিন বেশ কুণ্ঠিত আর লজ্জিত হয়ে, তবু বেশ হাসিমুখে আর শান্তস্বরে নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আপনি কেন কষ্ট করে আমাদের এই আজে-বাজে গণ্ডগোলের কাছে আসেন ?

আপনার চাকরকে বলে দিন, যখন দরকার হবে, চা দিয়ে যাবে।

সার্ভেয়ার্ অধীর পিটারপুরা থেকে দুই মাইল দূরের পাত্রাতু কোলিয়ারীতে কাজ করে। তাস খেলতে, দাবা খেলতে, গান গাইতে একেবারেই জানে না অধীর। এমনি কি, চেঁচিয়ে হাসতেও পারে না। এমন মানুষ কেন যে এই হাসি-হল্লার আসরে এসে বসে থাকে, কিছু বোঝা যায় না।

জয়ন্তেরই অনুরোধ—আসতেই হবে অধীরবাবু।

অধীর—কিন্তু আমি তো আপনাদের বৈঠকে একটা সাইফার মাত্র, আমার দ্বারা তো আপনাদের কোন কাজ হবে না।

জয়ন্ত—তবু, ওই একটু বসেই থাকবেন। তাতেও আড্ডাটা জমে।

সাইফার হয়েই সান্ধ্যআসরের একপাশে বসে থাকে অধীর। শুধু হই-হল্লা যখন একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন কথা বলে—আঃ, আপনারা একটু আস্তে কথা বলুন।

একদিন এভাবে আপত্তি করতে গিয়ে অধীর এই উচ্ছল হাসি-মুখর আসর-টাকে কিছুক্ষণের মতো বড় গম্ভীর করে দিয়েছিল। দু'চার জনের চোখে অপ্রসন্ন ভ্রূকুটিও শিউরে উঠেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য, জয়ন্ত বেশ একটু শক্ত স্বরে অধীরের কথার প্রতিবাদ করেছিল।—আপনি কিন্তু অকারণে এরকম একটা বাজে কথা বলে ফেললেন, অধীরবাবু।

মোটরকারের এজেন্ট শৈলেন চক্রবর্তী, দু'মাস তিনমাস পর পর পিটারপুরা ঘুরে যাওয়া তার কারবারেরই কাজের নিয়ম। সেই শৈলেন চক্রবর্তী বেশ চেঁচিয়ে এমন একটা ছড়া আবৃত্তি করেছে, যার ভাষার মধ্যে শালীনতার ছিটে-ফোঁটাও নেই।

অধীর বলে—এটা জঙ্গল নয় শৈলেনবাবু, ভদ্রলোকের বাড়ি। ওসব ছড়া এত চেঁচিয়ে বলতে আপনার একটুও লজ্জা হলো না?

শৈলেন চক্রবর্তী—আপনি কি মনে করেছেন যে, আমি সামান্য একটু ড্রিঙ্ক করেছি বলে একেবারে কমনসেন্স হারিয়ে ফেলেছি?

অধীর—তাই তো মনে হচ্ছে।

শৈলেন—মনে হচ্ছে, আপনি যেন কাউকে ফ্ল্যাটার করবার জন্যে এসব কথা বলছেন।

অধীর—হ্যাঁ।

অধীরের মতো শান্ত মেজাজের মানুষ কী ভয়ানক কঠোর স্বরে কথা বলতে পারে!

জয়ন্ত চেঁচিয়ে ওঠে।—না না, অধীরবাবুর কথায় আমি ফ্ল্যাটার্ড হবার মানুষ নই!

কিন্তু ঘরের ভিতরে মুখ টিপে হেসে ফেলে নীরজা। তখুনি আবার গম্ভীর হয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে।

একদিন ঘরের ভিতরে চুপ করে, আর, যেন মন-প্রাণ উৎকর্ণ করে দাঁড়িয়ে থাকে নীরজা। একটু আগেই ঘরের দরজার পর্দার এক ফাঁকে দেখতে পেয়েছে নীরজা, রেকর্ড বাছাই করছেন অধীরবাবু। কি গান বাজাতে চান অধীরবাবু? একগাদা রেকর্ডের ভিতর থেকে একটা দুটো ভাল গান বেছে নিতে এত দেরীই বা হচ্ছে কেন? আর বাছবারই বা কি আছে? আজ যে রেকর্ডের বাক্সটা ওখানে রয়েছে, তার মধ্যে সবই তো লয়লামজনুর প্রেমের গান।

রেকর্ড বাছতে বাছতে শেষে কি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন অধীরবাবু? দরজার পর্দার ফাঁকে আর একবার উঁকি দিয়ে দেখতে পায় নীরজা, চুপ আর হাত গুটিয়ে বসে আছেন অধীরবাবু।

এত কুণ্ঠা কেন? লয়লামজনুর প্রেমের একটা গানের রেকর্ড বাজিয়ে দিলে কি এই বাড়ির সন্ধ্যাবেলার আলো বাতাস একেবারে উতলা হয়ে যাবে? এত ভয়ই বা কিসের?

কিন্তু না। আশা করা বৃথা। অধীরবাবুর শুধু চোখ আছে, কিন্তু তাকাতে জানেন না। মন আছে, কিন্তু বুঝতে জানেন না।

এই তো এই কিছুক্ষণ আগে, অধীরবাবু যখন তাসের হল্লা থেকে একটু দূরে সরে বসে গ্রামাফোনে দম দিলেন, তখন নীরজা নিজেই চাকর ফেলুকে বলেছে, ওখান থেকে সব রেকর্ড তুলে নিয়ে চলে এস।

ফেলুকে রেকর্ড তুলে আনতে দেখেই আশ্চর্য হয়েছে অধীর—রেকর্ডগুলো নিয়ে যাচ্ছ কেন?

ফেলু—মা বলেছে।

ওগুলি সবই, যত ভজন আর কীর্তন গানের রেকর্ড। রেকর্ডগুলিকে আলমারির মাথার উপর তুলে রেখে দিয়ে আবার ফেলুর হাত দিয়ে এই দশটা গানের রেকর্ড পাঠিয়ে দিয়েছে নীরজা, লয়লামজনুর প্রেমের গানের রেকর্ড।

কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েই বা কি হলো? রেকর্ডগুলি বোবা জঞ্জালের মতো অধীরের চোখের সামনেই পড়ে রয়েছে। ঠিকই, সেদিন বেশ একটা মিথ্যে কথা বলেছিলেন অধীরবাবু; একেবারে মিথ্যে, কাউকে ফ্ল্যাটার করার ইচ্ছে নেই এই অধীরবাবুর মনে।

কিন্তু ভুলে গেলেন কেমন করে অধীরবাবু, এরই মধ্যে তো অন্তত পাঁচটি দিন নীরজা যে এতগুলি মানুষের মধ্যে বেছে বেছে অধীরবাবুকেই ফ্ল্যাটার করেছে। —আপনাকে আর এক কাপ চা এনে দিই, অধীরবাবু?

আর কারও প্রাণে আরও একপেয়ালা চায়ের পিপাসা আছে কিনা, একথা তো প্রশ্ন করে জানতে চায়নি নীরজা। শুধু ওই একজনেরই পিপাসার কথা জানতে চেয়েছে।

কিন্তু সামান্য একটা গানের রেকর্ড বাজাতে এত কুণ্ঠা কেন অধীরবাবুর? প্রশ্নটা যেন নীরজার নিঃশ্বাসের মধ্যে ছটফট করতে থাকে।

না, আজ থাক। বরং কাল সন্ধ্যাবেলা যখন এই হল্লার আসর ভাঙবে, আর অধীরবাবু যখন তাঁর সাইকেলের ল্যাম্পটাকে জ্বালাবার জন্যে জানালার কাছে এই অপরাজিতার বেড়াটার কাছে দাঁড়াবেন, তখন একবার নিজের মুখেই বলে দিলে হবে, একটা কথা বলবার আছে অধীরবাবু, কাল দুপুরে কিংবা বিকেলে কি এক-বার আসতে পারবেন?

অধীরকে কী কথা জিজ্ঞাসা করবে নীরজা? শুধু এই একটি কথা, আপনি আজ গানের একটা রেকর্ডও বাজালেন না কেন? লয়লা-মজনুর প্রেমের গানগুলি কী অপরাধ করেছে?

কিন্তু কেঁপে উঠেছে নীরজার শরীর। চোখ দুটো ভয় পেয়ে একেবারে পাথরের চোখের মতো নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। শাড়ির আঁচলটাকে শক্ত মুঠো করে ধরে নিয়ে মুখটাকে চেপে ধরে নীরজা; যেন একটা কথাও শব্দ করে ফুটে উঠতে না পারে।

সন্ধ্যার আসর ভাঙে। একে একে চলে যাচ্ছে সবাই। অধীরও চলে যাবে। অপরাজিতার বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ল্যাম্পটা জ্বালতে থাকে অধীর।

জয়ন্তকে ডাক দেয় নীরজা—শোন।

জয়ন্ত—বল।

নীরজা—তুমি অধীরবাবুকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলে দাও।

জয়ন্ত—বল, কি বলবো?

নীরজা—অধীরবাবু আর যেন এখানে না আসেন।

জয়ন্ত চমকে ওঠে।—ছিঃ, এরকম একটা অভদ্রতার কথা কি বলা যায়?

নীরজা—বলতে হবে।

জয়ন্ত—তুমি তো কোনদিনও কাউকে এভাবে তাড়িয়ে দেবার কথা বলনি? আজ হঠাৎ…।

নীরজা—কাউকে তাড়িয়ে দেবার দরকার হয়নি। তাই বলিনি।

জয়ন্ত—শেষে বেচারা এই অধীরবাবুকে তাড়িয়ে দেবার দরকার হলো।

নীরজা—হ্যাঁ।

জয়ন্ত—কেন?

নীরজা হাসে—সামান্য পোকামাকড় হলে তাড়িয়ে দেবার দরকার হতো না।

জয়ন্ত হাসে—তবে কি অধীরবাবু একটা অসামান্য বাঘ-সিংহ?

নীরজা—হ্যাঁ।

জয়ন্ত চিন্তিতভাবে বলে—সত্যি কি তুমি ভয় পেলে?

নীরজা—খুব ভয় পেয়েছি।

জয়ন্ত—কিন্তু বলবো কি করে? বলতে যে ভয়ানক লজ্জা করছে।

নীরজা ভ্রূকুটি করে তাকায়—লজ্জা করলে মরবে। যাও, দেরী ক'রো না, এখনই গিয়ে বলে দাও।

ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে জয়ন্ত। এগিয়ে গিয়ে অপরাজিতার বেড়ার কাছে দাঁড়ায়। জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে শুনতে পায় নীরজা—উঃ, কত স্পষ্ট করে বলে দিল জয়ন্ত, আপনি আর এখানে আসবেন না, অধীরবাবু, প্লীজ!

দেখতে পায় নীরজা, কোন কথা না বলে চলে গেল অধীর।

জীবনে তোমার পরিচয়

এই ট্রেনের এই কামরার কোন সীটে বসবার মতো খালি জায়গা আর নেই। কিন্তু সুধাকর আর একটু পরেই যখন নেমে যাবে, তখন রজতের পাশেই এক জনের মতো একটি জায়গা খালি হয়ে যাবে।

রজত আর সুধাকর, দুই বন্ধু এই ট্রেনেই টাটানগর থেকে আসছে। ট্রেন এখন ঘাটশিলা স্টেশনে থেমে রয়েছে। ট্রেন ছাড়তে আর দেরী নেই। বড়জোর আর মিনিট দুই-তিন সময় বাকি আছে।

রজত যাচ্ছে কলকাতা; সুধাকর এই ঘাটশিলাতেই নামবে, মাত্র একদিনের জন্য ঘাটশিলাতে থেকে কয়েকটা দোকানকে পাওনা টাকার জন্য তাগিদ দিয়ে তারপর আবার টাটানগর ফিরে যাবে।

সুধাকরের সঙ্গে কোন বিড়ম্বনার বোঝা নেই, একটা হাতব্যাগও না। হাতে শুধু সিগারেটের একটা টিন। কাজেই নেমে যাবার জন্য সুধাকরের তাড়াহুড়োও নেই। ট্রেন যদি হঠাৎ চলতেও শুরু করে, তবু কোন অসুবিধে নেই। টুপ করে নেমে পড়তে পারবে সুধাকর। আর, এইভাবে যতটুকু সময় পাওয়া যায়, ততটুকু সময় বন্ধু রজতের সঙ্গে বরং একটু গল্প করে নেওয়াই ভাল।

গার্ডের হুইসিল বাজেনি, ট্রেনও চলতে শুরু করেনি, তবু সুধাকরকে নেমে পড়তে হলো। কারণ, এক তরুণী ব্যস্তভাবে এই কামরাতেই উঠেছেন। তরুণীর সঙ্গে আরও যে দুই ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁরাও ব্যস্ত ভাবে বলেন, শুধু একজনের বসবার মতো জায়গা পেলেই তো হতো ; এ যে দেখছি……!

বুঝতে অসুবিধে নেই, এই দুই ভদ্রলোক এই ট্রেনের যাত্রী হতে আসেননি। এঁরা শুধু এই তরুণী যাত্রিণীকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন। কাজেই, এরপর সুধাকরের পক্ষে মিছিমিছি একটা জায়গা দখল করে বসে থাকা আর সম্ভব নয়। উঠে দাঁড়ায় সুধাকর।—আমি নেমে যাচ্ছি। আপনি এখানে বসতে পারেন।

বসতে তো হবেই। একটা জায়গা যে পাওয়া গেল, এটাই একটা ভাগ্যের কথা। যাত্রিণী তরুণী বেশ খুশি হয়েই বসে পড়লেন। আর, তাঁর সঙ্গের দুই ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হয়ে ও হাঁপ ছেড়ে কামরা থেকে নেমে গেলেন।

সুধাকরও নেমে যায়। প্লাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে কামরার জানালার দিকে তাকিয়ে হাসে আর কথা বলে—এইবার ট্রেন ছাড়ছে। আমি চললাম, কিন্তু যথাসময়ে কলকাতায় পৌছে যাব।

চলতে শুরু করেছে ট্রেন। তরুণীর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, সেই দুই ভদ্রলোকও কামরার জানালার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—কলকাতায় পৌছেই কিন্তু চিঠি দিও। ভুলে যেও না।

ঘাটশিলার স্টেশন আর দেখা যায় না। অনেক দূরে চলে এসেছে ট্রেন। ট্রেনের এই কামরার পাশাপাশি দুটি জানালা দিয়ে দুটি মুখ উঁকি দিয়ে শুধু মাঠ বন আর পাহাড়ের চেহারা দেখতে থাকে।

দু'জনের কাছে ট্রেনের এই কামরার ভিতরটাই বরং একটা অপরিচিত জগৎ। একটি মুখও চেনামুখ নয়। এই সীটের এখানে পাশাপাশি যে দুজন বসে আছে, তারাও কেউ কারও পরিচিত নয়।

এই তরুণী, যার নাম মলয়া, সেও কলকাতাতেই যাচ্ছে। রজত আর মলয়া, দু'জনে যেন দুটি নির্বিকার ও অবান্তর অস্তিত্ব হয়ে পাশাপাশি বসে থাকে, যদিও ট্রেনটা ভয়ানক ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। কামরার ভিতরে একটা ঘটি

গড়িয়ে গড়িয়ে ওদিকে চলে গেল। একটা বাক্সের উপর থেকে ছোট একটা ঝুড়ি ধুপ করে পড়ে গেল। উল্টে পড়ে গেল এক যাত্রীর টিফিন কেরিয়ার। কিন্তু এরা দুজন একটুও বিচলিত নয়। কেউ কারও সঙ্গে সামান্য দু'একটা মুখের কথায় একটু আলাপ করতেও চায় না। ইচ্ছেই হয় না।

ট্রেনের দুরন্ত দোলা আর ঝাঁকুনিতে কামরার ভিতরে যা-কিছু যেভাবে যত এলোমেলো হয়ে যাক না কেন, রজত আর মলয়ার মনের কামরার কোন জিনিস এলোমেলো হয়ে যায় না। শাড়ির আঁচলটাকে এক হাতে টেনে নিয়ে বেশ শক্ত হয়ে বসে আছে মলয়া। আর রজতও একটি শান্ত-সুস্থির মূর্তি নিয়ে যেন নিজেরই কল্পনার জগতের একটি ঠাঁই নিয়ে অবিচল হয়ে বসে আছে।

রজতের মনের প্রতিক্ষণের কল্পনা আসন্ন একটি উৎসবের ছবি দেখছে। সেই উৎসবের দিন-ক্ষণ সবই ঠিক হয়ে গিয়েছে। কাকা লিখেছেন, তুমি অন্তত এক মাসের ছুটি নেবে রজত। আর বিয়ের তারিখের অন্তত সাতদিন আগে কলকাতায় পৌঁছে যাবে।

রজতের জীবনের সঙ্গিনী হবার জন্য যে-মেয়ে আজ এই আসন্ন উৎসবের নেপথ্যে এখন দাঁড়িয়ে আছে, সে-মেয়ে রজতের চোখের অচেনা হলেও অজানা নয়। বড়দি লিখেছেন, রুণুর মতো সুন্দর চেহারার মেয়ে, হাজারেও একটা চোখে পড়ে কিনা সন্দেহ। কাকিমা লিখেছেন, আমরা ঠিক যেমন মেয়ে চেয়েছিলাম, ঠিক তেমন মেয়েরই খোঁজ পেয়েছি। সব দিকে ভাল। অচেনা অজানা ঘরের মেয়ে নয়, রুণু হলো আমারই সেজকাকার বড়মেয়ে সুচারুর মেয়ে।

শুধু কি বড়দির চিঠি আর কাকিমার চিঠি? তাও কি আবার দুই-তিনটি চিঠি? বোধহয় এই ছ মাসের মধ্যে তিরিশটি চিঠি পেয়েছে রজত, আর সে-সব চিঠিকে দু তিনবার করে পড়তেও হয়েছে। সব চিঠিই যেন রুণুর জীবনের যত রূপকথার কলরবে মুখর হয়ে রজতের বুকের ভিতরে অদ্ভুত এক মধুরতার গুঞ্জন ভরে দিয়েছে। এক-একদিন সত্যিই মনে হয়েছে রজতের, রুণুকে যেন চোখের কাছেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুই চোখে নিবিড় এক বিস্ময়ের আবেদন নিয়ে রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রুণু। হঠাৎ লজ্জা পেয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল রুণু, আর মাথাটাকে একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রুণুর খোঁপাতে সাদা ফুলের একটা স্তবক দেখতে পাওয়া যায়।

কাকিমা লিখেছেন, আমরা জানি, খুব শিক্ষিতা মেয়ে না হলে তোমার মতো ছেলের সঙ্গে একটুও মানাবে না। তাই রুণুকে আমাদের আরও পছন্দ হয়েছে। তোমাকে তো আগের চিঠিতেই জানিয়েছি যে···।

হ্যাঁ, আগের আরও তিনটি চিঠিতে জানিয়েছেন কাকিমা, রুণু হিস্ট্রিতে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়ে এম-এ পাশ করেছে! রুণু খুব ভাল গান গাইতে পারে। রুণুর হাতের বাটিকের কাজ তিনবার এগজিবিশন কমিটির সার্টিফিকেট পেয়েছে।

রুণু যে একটুও যেমন-তেমন স্বভাবের মেয়ে নয়, এই সত্যটাকেও নানাকথায় একেবারে স্পষ্ট করে আর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন বড়দি।—আমি তো সবই জানি, আমি রুণুকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। আগে সিঁথিতে আমাদেরই পাশের বাড়িতে রুণুরা থাকতো। এখন অবশ্য রুণুর বাবা পার্কসার্কাসে মস্ত বড় বাড়ি করেছেন। রুণু এত লেখাপড়া শিখেছে, বয়সও ছাব্বিশ পার হয়ে সাতাশে পড়েছে কিন্তু বিয়ের কথা শুনলে আঁচল তুলে মুখ ঢাকা দেয়, রুণু হলো এই-রকম স্বভাবের মেয়ে। বলতে গেলে, বেশ একটু ভীরু স্বভাবের মেয়ে। খুব মন-খোলা মেয়ে। কোন পছন্দ-অপছন্দ গোপন করে রাখবার মতো মেয়ে নয়। রুণুর বিয়ের জন্যে বিয়ের সম্বন্ধের খোঁজ এই প্রথম; তোমারই সঙ্গে বিয়ের কথা উঠলো, আর সবাই তখনি রাজি হয়ে গেল। আর সবচেয়ে যেটা ভাল কথা, সেটাও তোমাকে বলেই দিচ্ছি। রুণুও খুব খুশি। এটা শোনা কথা নয়, আমি নিজের চোখে দেখেছি, আর নিজের কানে শুনেছি। রুণু শেষ পর্যন্ত কোন লজ্জা না করে আর হেসে হেসে বলেই দিয়েছে, আমি তো শাঁখের শব্দ শোনার জন্যে কান পেতেই রয়েছি, আপনারা বাজাতে এত দেরি করে দিচ্ছেন কেন বউদি?

ট্রেন এখনও ঝাড়গ্রাম পৌছয়নি। খুব জোরে ছুটে চলছে ট্রেন। কামরার জানালা দিয়ে বাতাসের এক-একটা ঝাপটা ঢুকে রজতের জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনের মুখটাও দপদপ করে রাঙিয়ে দিচ্ছে। রঙীন হয়ে যাচ্ছে রজতের মুখটাও। মনে পড়েছে রজতের, সেদিন বড়দির এই চিঠির কথাগুলি রজতের নিঃশ্বাসের বাতাসে যেন রঙীন আবীর ছিটিয়ে দিয়েছিল। কল্পনা করে দেখতে গিয়েই যেন চোখে দেখতে পেয়েছিল রজত, রুণুর মুখের হাসিটা যেন দুর্বার এক অভিমানে রঙীন হয়ে রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে—এর পরেও তুমি দেরী করবে? কোনোদিন দুই চোখে দেখনি বলেই কি ভালবাসতে পারছো না।

বড়দিকে আর কাকিমাকে চিঠি দিতে আর দেরি করেনি রজত—আমি একমাসের ছুটির দরখাস্ত করে দিয়েছি। তোমরা দিন ঠিক করতে আর দেরি করো না।

দুই

শাড়ির আঁচলটাকে এত শক্ত করে ধরে, আর এত স্তব্ধ হয়ে বসে কী ভাবছে

মলয়া ?

মামলার তারিখ পড়েছে, আজই সন্ধ্যার ট্রেনে ঘাটশিলা থেকে চাইবাসা রওনা হবেন বড়মামা আর ছোটমামা। তা না হলে আজ মলয়াকে ট্রেনেতে শুধু তুলে দিয়েই ছ'জনে চলে যেতেন না, অন্তত ছোটমামা নিশ্চয় মলয়ার সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত আসতেন।

ছোট মামী নিজেই বেশ একটু রাগ করে বলেছেন, তোমাদের মামলা কবে মিটবে না মিটবে, সেজন্যে কি মেয়েটা এখনও এখানে পড়ে থাকবে ? ওর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখন ওকে নিয়েই তো যতো কাজ। ওর বাড়ির মনও যে কত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সেটাও কি বুঝতে পার না ? তা ছাড়া, মলয়ার নিজের মন বলেও তো কিছু আছে। ওর এখন আর এখানে থাকতে ভাল লাগবে কেন ?

কাজেই শেষ পর্যন্ত মলয়াকে একাই পাঠাতে হলো। এতে আর দুশ্চিন্তা করবার কি আছে ? এই ট্রেনই তো সোজা গিয়ে হাওড়াতে থামবে। টেলিগ্রাম করেই দেওয়া হয়েছে। মলয়াদের বাড়ির গাড়ি হাওড়া স্টেশনে এসে অপেক্ষায় থাকবে। মলয়ার পক্ষে একা কলকাতা ফিরে যাওয়া তো এমন কিছু সমস্যার ব্যাপার নয়।

পুরো একটা মাস ঘাটশিলাতে কাটিয়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়া, ঘাটশিলার মহুয়ার ছায়ার জন্য মলয়াব মনে একটু আকুলতা আজ জেগে উঠতো বই কি, যদি সে আকুলতার ঠাঁই হবার মতো একটু খালি জায়গা মনের এক কোণেও থাকতো। আজ ময়লার মনের সব ঠাঁই জুড়ে শুধু একটি কল্পনার ছবি হাসছে। এই ছবিও একটি আসন্ন উৎসবের ছবি। সে উৎসবের আঙিনাতে মলয়ার পাশে এমন একটি মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে, যাকে মন-প্রাণ দিয়ে আপন করে নিতে আর একটুও লজ্জা করতে ইচ্ছে করে না। চোখের চেনা নয়, তবু মনে হয় কত দিনের চেনা। মেজবউদির চিঠির ভাষার তো কোন মাত্রা নেই। কলমের মুখে যা এসেছে তাই লিখে দিয়ে বসে আছেন মেজবউদি। লিখেছেন, তুমি যা চাও, তাই পেতে চলেছো। তোমাকে যার সঙ্গে চমৎকার মানায়, তারই সঙ্গে তোমার জীবনের গাঁটছড়া পড়তে চলেছে। এতদিন যে তোমার ওপর কারও চোখ পড়ে নি, আর, কারও ওপর তোমারও চোখ পড়েনি, সে আক্ষেপ তুমি এবার পুষিয়ে নিতে পারবে। টুলুবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালে তোমার ওই ভীরু চোখ দুটিও দু'মিনিট ধরে তাকিয়ে থাকবে।

কিন্তু আবার এরকম একটা চিঠি লিখে মলয়াকে অশান্ত করবার কোন দরকার ছিল না মেজবউদির। মেজবউদিও তো শুনেছেন, সেদিন আলিপুরের

উমাদিকে কী কথা একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল মলয়া। মলয়া তো তৈরী হয়েই আছে, রাজি হয়েই আছে। মলয়া শুধু চায় যে, আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ কি? টুলুবাবু নামে সেই মানুষটি যখন রূপে গুণে আর স্বভাবে এতই সুন্দর তখন মলয়াকে তো আর কোন কথা বলবার দরকার হয় না।

জার্মানী থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রী নিয়ে, তারপর দু'বছরের ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরেছে আর রাউরকেলার স্টীল-প্ল্যাণ্টে ভাল কাজ পেয়েছে যে, সে মানুষের বিদ্যে বুদ্ধি আর শিক্ষা-দীক্ষায় কথা নিয়ে প্রশ্ন করবার তো কিছু নেই। দেখতে খুবই ভাল, বিশেষ করে মেজবউদির মতো মানুষের চোখ যেটা স্বীকার করছে, তখন তো সে ভদ্রলোকের রূপের এত বিবরণ শোনবার কোন দরকার হয় না। মেজবউদির চোখ ভয়ানক খুঁত ধরবার অভ্যেসের চোখ। একজন বেশ সুশ্রী মানুষকে দেখা মাত্রই বলে দেন মেজবউদি, ভদ্রলোকের কপালটা কেমন যেন চাপা, একটু বাঁকা। এহেন মেজবউদি যখন বলতে পেরেছেন, টুলুবাবু দেখতে চমৎকার, তখন আর বেশি চমৎকারিতা দাবি করবার কোন মানে হয় না। মলয়ার কল্পনাতে খুব বড় কোন দাবিও ছিল না। ভাললাগবে, ভালবাসতে কোন বাধা হবে না, শুধু এইটুকু রূপ-গুণ স্বভাব থাকলেই হলো! কোনদিনও এর চেয়ে বেশি আশা করতে চায়নি মলয়া।

তাই ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগে বইকি। যার জীবনের সঙ্গে মলয়ার জীবন মিলিয়ে দেবার জন্যে একটি লগ্ন আর একটি রাখী-ডোর অপেক্ষায় রয়েছে, সে যে মলয়ার কাছে আশার দাবির চেয়েও বড় একটি প্রাপ্তি। তাকে এখনই একবার দেখতে ইচ্ছে করে। কি আশ্চর্য, মেজবউদি তো বুদ্ধি করে একটা ফটো পাঠিয়ে দিতে পারতেন। চেষ্টা করলে কি ভদ্রলোকের একটা ফটো যোগাড় করা বাড়ির এতগুলো মানুষের মধ্যে কারও পক্ষে সম্ভব হতো না? মা একদিন অবশ্য হেসে-হেসে একটা ফটো দেখিয়েছিলেন, হাজারিবাগের একটা পাহাড়ের কাছে তোলা একটা গ্রুপ ফটো। সেই গ্রুপ ফটোর মধ্যে বারো বছর বয়সের একটা ছেলেকে দেখিয়ে দিলেন মা, এই, এই হলো টুলু।

একরকম ভালই হয়েছে; রাউরকেলার ইঞ্জিনিয়ার টুলুকে একদিনও দেখবার সুযোগ হয়নি। এই অদেখার সব ফাঁকি একদিন একটি পরমক্ষণের চরম দেখার মধ্যেই পূর্ণ হয়ে যাবে। সে দিনটাও তো এসেই পড়েছে। আর মনটাকে এত ছট-ফট করিয়ে লাভ কি?

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কল্পনা মলয়ার মনের এই ভাবনাটাকে যেন একটা ঠাট্টা করে হাসিয়ে দেয়। এই যে পাশে বসে আছেন এক অপরিচিত ভদ্রলোক, ঠিক

এইরকমই সেই ভদ্রলোকও যদি এখানে এই ট্রেনের কামরাতে দেখা দিতেন? তবে, মলয়া নিশ্চয় একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আর দেখে নিয়েই বুঝে ফেলতো ইনি কে। চিনতে আর জানতে একটুও ভুল হতো না মলয়ার।

আরও একবার মনে মনে হেসে ফেলে মলয়া, কি আশ্চর্য, সে ভদ্রলোক কিন্তু এখন স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না যে, মলয়া এখন তারই কথা ভাবছে আর তাকেই দেখবার জন্য ছটফট করছে।

ঝাড়গ্রাম। ট্রেন এখানে যে আর কতক্ষণ থেমে থাকবে কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না। লাইন খারাপ হয়েছে নাকি!

ট্রেনের যাত্রীরাও অদ্ভুত। ট্রেনের প্রায় অর্ধেকটা খালি করে দিয়ে যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে নেমেছে; ঘুরছে, বেড়াচ্ছে আর গল্প করছে। মনে হচ্ছে, ট্রেন ছাড়বার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিংবা আরও অনেক দেরিতে ট্রেন ছাড়বে।

তবে তো হাওড়া পৌঁছতে মাঝরাতও পার হয়ে যাবে। ড্রাইভার রামলালও শেষে ধৈর্য হারিয়ে আর শূন্য গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে না তো? তাহলে তো একটা বিপদেই পড়তে হবে। কাউকে একটু জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলে হতো, ট্রেন এখানে এতক্ষণ ধরে থেমে আছে কেন? কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করা যায়? পাশে বসে আছেন যে ভদ্রলোক, তিনি কি কিছু বুঝেছেন? ভদ্রলোক তো কামরা থেকে নামলেনও না, শুধু চুপ করে আর একেবারে সুস্থির হয়ে সিগারেট খেয়ে চলেছেন।

মলয়া যেন প্ল্যাটফর্মের একটা আলোর দিকে তাকিয়ে আর বেশ একটু উদ্বিগ্ন স্বরে আস্তে আস্তে কথা বলে—কিছু যে বুঝতে পারছি না! এখানেই এত রাত হয়ে গেল…।

রজত বলে—আপনি কোথায় যাবেন? কলকাতা?

মলয়া—হ্যাঁ।

রজত—হাওড়া পৌঁছতে কিন্তু বেশ রাত হয়ে যাবে।

চমকে ওঠে মলয়া—তাহলে তো খুবই অসুবিধেয় পড়তে হবে।

রজত—কেন বলুন তো?

মলয়া—বাড়ির গাড়ি যদি আর অপেক্ষা না করে চলেই যায় তবে…?

রজত হাসে—না, চলে যাবে কেন? খোঁজ নিয়ে জানতেই পারবে যে, ট্রেন কত ঘণ্টা লেট হয়ে পৌঁছচ্ছে। তা ছাড়া, আপনার চিন্তা করবার কিছু নেই। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে…।

মলয়া—কি করে হবে?

রজত—হাওড়া স্টেশন থেকেই বাড়িতে ফোন করবেন। একটু অপেক্ষা করবেন। তারপর আপনার বাড়ির গাড়ি চলে আসবে।

মলয়া হাসে—ধন্যবাদ, আপনি একটা উপায় বলে দিলেন। আমি কিন্তু ভাবতেই পারছিলাম না। ···কিন্তু ট্রেন এখানে থেমে আছে কেন?

রজত—ওই যে শুনলেন, টিকিট চেকার বলে গেল।

মলয়া—কই? কখন বললেন? আমি কিছুই শুনতে পাইনি তো।

রজত—মিলিটারীর দুটো স্পেশাল ট্রেন আসছে। সেগুলি আগে পাস করবে, তারপর আমাদের ট্রেন ছাড়বে।

মলয়া—কিন্তু কখন পাস করবে?

হেসে ফেলে রজত—সেটা জানা থাকলে তো বলাই যেত আমাদের ট্রেন কখন ছাড়বে।

মলয়া—তার মানে, কত দেরি হবে তার কোন ঠিক নেই।

রজত—তাই তো।

চুপ করে মলয়া। কিন্তু চুপ করে থাকলেই মনের অস্বস্তিটা যেন আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। একটা অনিশ্চয় মুহূর্তের অপেক্ষায় এভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেও ভয়-ভয় করে। প্ল্যাটফর্মের আলোও যেন হিমেল বাতাসের ছোঁয়া লেগে নেতিয়ে পড়েছে। মাসটা তো মাঘ মাস। এত রাতের বাতাসে এমন একটা হিমেল ভাব জেগে উঠবেই বা না কেন?

জানে না মলয়া, কতক্ষণ এভাবে শুধু প্ল্যাটফর্মের একটা আলোর দিকে চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে। হঠাৎ চমকে ওঠে মলয়া, পাশের ভদ্রলোক কি যেন বললেন।

মলয়া—আপনি কি আমাকে কিছু বললেন?

রজত—হ্যাঁ। আপনি চা খেতে চান তো বলুন, চা-ওয়ালাকে ডেকে দিচ্ছি।

বেশ কুণ্ঠিতভাবে হাসতে থাকে মলয়া—আপনি ডেকে দিলে অবিশ্যি···না থাক···চা আর নাই বা খেলাম।

রজতও হাসে—আপনি তো আপনার সঙ্গের খাবার-টাবারও খেলেন না। আর খাবেন কখন?

মলয়ার মনে পড়েছে, রজতও দেখতে পেয়েছে যে ছোট্ট একটা খাবারের বাস্কেট মলয়ার পাশে সীটের উপরে রয়েছে।

মলয়া—আপনি তো আমাকে বলছেন, কিন্তু আপনিও তো···।

রজত—আমি ট্রেনে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ কিছু খেতেই পারি না। অসম্ভব।

ইচ্ছেই করে না। শত খিদে লাগলেও না।

মলয়া—তা হয় না।

রজত—কি বললেন ?

মলয়া হাসে—আমার বেশ খিদে পেয়েছে। না খেয়ে পারবোও না। কিন্তু···

বাস্কেট খুলে দুটো সন্দেশ হাতে তুলে নিয়েই রজতের হাতের কাছে বাস্কেট এগিয়ে দেয় মলয়া—আপনি খান।

রজত—মাপ করবেন। কিছু মনে করবেন না। আমাকে দেবেন না।

কিন্তু হাত সরিয়ে নেয় না মলয়া। খাবারের বাস্কেটটাকে রজতের হাতের কাছে তুলে ধরেই রাখে। তারপর বিড়বিড় করে বলেই ফেলে—আপনি এরকম করছেন কেন ?

রজত তবু কুণ্ঠিত। হঠাৎ আনমনার মতো হয়ে আর পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করে রজত।

মলয়া—ও কি, আবার সিগারেট ধরাচ্ছেন কেন ? আগে খেয়ে নিন।

যেন শুনতে পায়নি রজত। আনমনার মতই প্রশ্ন করে—কি বললেন ?

মলয়া—আপনি বুঝছেন না কেন, আপনি না খেলে আমারও ···।

—সে কি ? না না, আপনি খাবেন না কেন ? চেঁচিয়ে ওঠে রজত।

হেসে ফেলে মলয়া—একটু চক্ষুলজ্জা থাকতে খাব কি করে ?

মলয়ার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই আর দ্বিধা করে না রজত। বাস্কেটটাকে হাতে নিয়ে কয়েকটা মিষ্টি তুলে নেয় আর খেতেও থাকে। তখুনি কামরা থেকে নেমে যায় রজত।—যাই, একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে নিয়ে আসি।

চা-ওয়ালা আসে। কিন্তু চা-ওয়ালার হাত থেকে গরম চায়ের পেয়ালা নিজেই তুলে নিয়ে মলয়ার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় রজত। মলয়া হাসে—আপনি খান।

রজতও হেসে ফেলে—দাই নেসেসিটি ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন।

মলয়া—এখন তো এটা বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু এই একটু আগে আমি যখন আপনার হাতের কাছে খাবার এগিয়ে দিলাম, তখন তো আপনার মনে হয়নি যে, আমিও ওকথাটা বলতে পারি।

রজত—আপনার কি তাই মনে হয়েছিল ?

মলয়া—মনে হলেই বা কি ? আপনি তো বুঝতে পারেন নি। যাক্ গে, মিলিটারির স্পেশালটা কি কোথাও ঘুমিয়ে পড়লো ?

রজত—আর বেশি দেরি হবে না মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না।

মলয়া—সত্যি ঠাণ্ডা লেগেছে। কিন্তু আপনার এ সন্দেহ কেমন করে হলো?

রজত—সন্দেহ নয়? চোখেই দেখতে পাচ্ছি, আপনার চোখ কেমন ছল-ছল করছে। আপনার গরম কোট এইবার গায়ে দিয়ে ফেলুন।

মলয়া—তা তো দিতেই হবে। এত ঠাণ্ডা সত্যিই আমার সহ্য হয় না।

রজত—আমার খুব সহ্য হয়।

মলয়া—এটা একটা চালাকির কথা বললেন।

চমকে ওঠে রজত—আপনি হঠাৎ এরকম একটা কথা…।

মলয়া—আপনার সঙ্গে গরম আলোয়ান নেই তাই, যেন আমি আপনার কোন ভুল না ধরতে পারি, তাই আগেভাগে একটা কৈফিয়ত শুনিয়ে রেখে দিলেন।

রজত—ঠিকই, ভুল হয়ে গিয়েছে। আলোয়ানটাকে টাটানগরে আমার বন্ধু সুধাকরের বাড়িতে ফেলে রেখে এসেছি।

মলয়া—আপনি আর ওখানে প্ল্যাটফর্মের ওপরে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ভেতরে এসে বসুন।

কামরাতে ঢুকে আবার নিজের সীটের উপর বসে রজত। কিন্তু আর তো নিজেকে একটা একলা মানুষ বলে মনে হয় না। পাশে বসে আছে এক অপরিচিতা সঙ্গিনী, যার জীবনের কোন পরিচয় জানা নেই, তারই সম্পর্কে মনের ভিতরের একটা বিস্ময় যেন হঠাৎ চমকে চমকে উঠছে, এই মেয়েকে যে হঠাৎ-পাওয়া একটি আপনজন বলে মনে হয়। গরম আলোয়ান সঙ্গে নেই বলে ধমক দেয়। রজত খাবার না খেলে নিজে খেতে পারে না। বাঃ, বেশ একটা কাণ্ড করে বসে রইল এই অপরিচিতা।

মলয়া বলে—এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কোন কথাবার্তা হয়নি, ভালই হয়েছিল। এখন কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না।

রজত—কেন?

মলয়া—এই যে বললাম; আপনি ঠাণ্ডাতে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু আমার কিছুই করবার উপায় নেই। আমার সঙ্গেও কোন আলোয়ান কিংবা চাদর নেই যে…।

রজত—এটা আপনি একটু বেশি বাড়িয়ে ভাবছেন। বাইরে অবশ্য ঠাণ্ডা আছে, কিন্তু এই কামরার ভিতরে তেমন কিছু ঠাণ্ডা নেই।

মলয়া—ট্রেন চলতে শুরু করলেই বুঝবেন, কেমন ঠাণ্ডা।

রজত—এসব কথা এখন বাদ দিন তো। গল্প করতে হলে অন্য কথা বলা যায়।

মলয়া হাসে—হ্যাঁ, গল্পই তো। আপনি কি ভাবছেন যে, আমি খুব সিরিয়াসলি বলছি!

রজত—না না, আমাকে সিরিয়াসলি কিছু বলবার তো কথা নেই! আপনি বলবেনই বা কেন? অনেক দিন আগে আমি একবার এই লাইনে নাগপুর গিয়েছিলাম। সে-সময় দেখেছিলাম, এই ঝাড়গ্রামে ঝুড়ি ভর্তি করে চাঁপা ফুল বিক্রি হচ্ছে।

মলয়া—ফুল কিনেছিলেন?

রজত—না।

মলয়া—কেন?

রজত হাসে—তখন দরকার ছিল না!

মলয়াও হাসে—এখন দরকার আছে বোধহয়।

রজত—না, এখনও দরকার হয়নি।

মলয়া—ভাল কথা! আমি অবশ্যি এই লাইনে আগে আর কখনও যাইনি। এই প্রথম ঘাটশিলাতে গিয়ে একমাস ছিলাম। সত্যি ঘাটশিলা খুব সুন্দর জায়গা, যদিও এখনও মহুয়া ফুল ফোটেনি।

রজত—কিন্তু তাতে মহুয়াবনে বেড়াতে তো কোন অসুবিধে নেই।

মলয়া—না, খুব বেড়িয়েছি। একা একাই বেড়িয়েছি। একা বেড়াতেই ভাল লাগে আমার।

রজত—একা একা ট্রেনে যেতেও ভাল লাগে নিশ্চয়?

মলয়া—না, সেটা ঠিক নয়। মামার সময় হলো না বলেই আমাকে একা একা যেতে হচ্ছে। কিন্তু···

রজত—কি?

মলয়া—আপনি আজ না থাকলে সত্যিই আমার এখানে এভাবে একা বসে থাকতে বেশ ভয় করতো।

রজত—ভয় কিসের? কামরাতে এত মানুষ রয়েছে। মহিলারাও আছেন। আপনার ভয়-ভয় করবার কোন মানে হতো না।

মলয়া—তবু। আপনাকে তো ঠিক ওদের মতো মনে হচ্ছে না।

অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছে মলয়া, বোধহয় নিজের মুখের কথারই শব্দটাকে শুনে আশ্চর্য হয়েছে। নিবিড় হয়ে গিয়েছে মলয়ার দুই চোখের কালো তারা দুটো। আর, চমকে উঠেছে রজতের বুকের ভিতরটা; হঠাৎ এ কি-কথা বলে ফেলেছে এই অপরিচিতা মহিলা! এই ট্রেনের কামরার ভিড়ের মধ্যে বেছে বেছে শুধু একজন মানুষকেই সত্যি করে কাছের মানুষ বলে মনে করে ফেলেছে, ক্ষণকালের একটা মায়ার কাছে মনের কথা মুখ খুলে বলে ফেলেছে।

রজত বলে—আমারও তো তাই মনে হতে পারে।

রজতের চোখের চাহনিটাকে ভয় পায় না মলয়া। আর রজতের মুখের এই কথা শুনেও মুখ ফিরিয়ে নেয় না। মলয়া যেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করে।—তা তো মনে হতেই পারে। মনে হলেই বা আপনাকে দোষ দিচ্ছে কে?

চলতে শুরু করেছে ট্রেন। রজত বলে—না, আপনি আর জোর করে জেগে থাকতে চেষ্টা করবেন না। আপনি চোখ বন্ধ করে যতটুকু পারেন ঘুমিয়ে নিন।

মলয়া যেন রাগ করে কথা বলে—আপনি বললেই আমার ঘুম এসে যাবে, না?

উত্তর দেয় না রজত। ঝাড়গ্রাম পার হয়ে রাতের অন্ধকারে, যেন দূর আকাশের তারার দিকে লক্ষ্য করে ট্রেন তখন ছুটে চলেছে।

চুপ করে জেগেই বসে আছে দু'জনে, রজত আর মলয়া। ক্ষণকালের এই সান্নিধ্যের ভয়ানক এক বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে আবার একলা হয়ে যাবার জন্য দু'জনের নিঃশ্বাসের ভিতরে যেন একটা সংগ্রাম চলেছে। ট্রেনের দোলানির সঙ্গে আর দুলতে চায় না মলয়ার মাথার খোঁপাটা, আর ট্রেনের ঝাঁকুনিতে চমকে উঠতে চায় না রজতের হাতের সিগারেটটা। শুধু কয়েকবার, বোধহয় তিনবার হঠাৎ দু'জনের মুখের দিকে দু'জনে তাকিয়ে ফেলেছে। সেই মুহূর্তে দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

হাওড়া স্টেশন। অনেক রাতে ট্রেন থেমেছে। কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই হেসে ফেলে মলয়া।—ওই যে, ড্রাইভার রামলাল দাঁড়িয়ে আছে।

উঠে দাঁড়ায় রজত। হাসতে চেষ্টা করে বলে।—তাহলে আমি আসি। আপনিও আসুন।

মলয়া—হ্যাঁ। কিন্তু…।

রজত—বলুন।

মলয়ার মুখটা খুবই গম্ভীর।—সত্যিই ভাল লাগছে না।

রজত—সত্যি কথা বলছেন?

মলয়—হ্যাঁ।

রজত—কিন্তু আর কি কখনও…।

মলয়া—না, আর দেখা হবে না। দেখা হলেই বা কি হবে?

রজত—আমিও এই কথা ভাবছিলাম। তবে…।

মলয়া—বলুন।

রজত—কি বলবো, বুঝতে পারছি না। ভুলে যাবেন না যেন।

মলয়া—না, ভুলবো না। কিন্তু থাক, আর কিছু বলবেন না। বলে লাভ নেই।

বিদায় নিয়ে চলে গেল মলয়া। রজতও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর চলতে থাকে।

তিন

পার্কসার্কাসের বাড়িতে, অনেক রাতের একটি মুহূর্তে, যখন মলয়া ওর একলা ঘরের নিভৃতে একটা স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে চেয়ারের উপর বসেছে, আর টেবিল ল্যাম্পের ঢাকাটা আর একটু টেনে নামিয়ে দিয়েছে, তখন মেজবউদি এসে ঘরে ঢোকেন, আর হেসে-হেসে মলয়ার কানের কাছে ফিসফিস করেন—আশীর্বাদের দিন ঠিক হয়েছে, আসছে মঙ্গলবার। কিন্তু তার আগেই, পরশুদিন টুলুবাবুকে চা খেতে নেমন্তন্ন করা হবে, যদি অবিশ্যি টুলুবাবু আজ কিংবা কালকের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে গিয়ে থাকেন।

মলয়া হাসে—একথাটা তো আমাকে কাল সকালেও বললে চলতো। সে জন্যে তোমার এত রাতে উঠে আসবার কোন দরকার ছিল না। অদ্ভুত!

মেজবউদি—বলতে এলাম এই জন্যে যে, তোমার ভাল ঘুম হবে।

মলয়া—ভাল ঘুম হবে না ছাই হবে।

মেজবউদি—কেন?

মলয়া—ট্রেনে যা বিশ্রী ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হলো, তার জের মিটতে বেশ ক'দিন লাগবে।

ঘাটশিলা থেকে হাওড়া, সেই দুঃসহ ট্রেনযাত্রার ক্লান্তিটা শরীরে আর নেই, কিন্তু মনের ভিতরে এখনও যেন আছে। তাই দুটো দিন পার হয়ে গেলেও আর বেশ ভাল ঘুম হলেও মলয়ার মনের ভিতরে যেন একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস বার বার ছটফট করে ওঠে।

কিন্তু সে অস্বস্তির নিঃশ্বাস যে এমন একটা চকিত বিস্ময়ের দখিনা বাতাসে ভরে যাবে, সেটা মলয়ার স্বপ্নেরও অগোচর একটা বাস্তব সত্য।

পার্কসার্কাসের বাড়িতে আজকের সকালবেলাটা যার আগমনের অপেক্ষা করে করে এতক্ষণে একটা বিপুল কলরব তুলে হেসে উঠেছে, সে এসেছে। বাইরের ঘরে বসে আছে। মলয়ার মা এসে বলে গেলেন—টুলু এসেছে।

মেজবউদি এসে বললেন—তুমিই টুলুবাবুকে চা দেবে। আমি অবিশ্যি তোমার সঙ্গেই থাকবো।

মলয়া—আমাকে দিয়ে এ কাণ্ডটা না করালেই কি ভাল ছিল না!

মেজবউদি—তবে কেন বলেছিলে যে, একবার দেখতে পেলে ভাল ছিল।

আর মুখ লুকোতে চাইলে হবে কি? একথা সত্যিই যে মেজবউদির কাছে একদিন বলে ফেলেছিল মলয়া। কাজেই, জীবনের আগ্রহ যখন একটা অঙ্গীকার হয়েই গিয়েছে, তখন আর এত কুণ্ঠা করবার দরকার কি?

মেজবউদির সঙ্গেই এগিয়ে যায় মলয়া। বাইরের ঘরের ভিতরে ঢুকেই কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। মেজবউদির একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। তারপর মেজ বউদিরই পিঠের আড়ালে মুখ লুকোতে চেষ্টা করে। মলয়ার সুন্দর মুখ থেকে যেন একটা স্বপ্নলোকের বিস্ময়ের রঙীন ফুলঝুরি ঝরে পড়ছে। হাসতে গিয়ে মলয়ার সারা মুখে যেন একটা ভোরবেলার লালচে আকাশের আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

রজত চমকে ওঠে, আর হাসতেও থাকে—এ কী ব্যাপার! এ যে দেখছি, আরব্য উপন্যাসের মতো কাণ্ড!

মেজবউদি—কি হলো?

রজত—আমরা যে দুজনে এক সঙ্গে একই ট্রেনে একই কামরাতে বসে সেদিন হাওড়াতে পৌছলাম।

মেজবউদির মুখের হাসিটা উতলা হয়ে ওঠে।—তাহলে তো···ট্রেনেই দু'জনের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

রজত—হ্যাঁ, হয়েছে।

মেজবউদি—তা হলে আমি আর এখানে কেন থাকি? হাসতে হাসতে আর ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন মেজবউদি। আর, পার্কসার্কাসের বাড়ির সব মানুষের মনে আর মুখে এই হাসির ছোঁয়া ছড়িয়ে দিল একটি অদ্ভুত ঘটনার খবর, ট্রেনেতেই টুলুর সঙ্গে রুণুর দেখা হয়েছে।

ট্রেনের কামরা নয়। পার্কসার্কাসের একটি বাড়ির বাইরের ঘর, যে ঘরে কল্পনার একটি মেয়েকে দেখতে এসে রজত এখন এক পরিচিতা মেয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছে।

মলয়া যাকে দেখছে, সে একজন অদেখা অচেনা কল্পনার মানুষ নয়।

মলয়া বলে—আমার কিন্তু এখন আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব···।

রজত হাসে—লজ্জা করছে?

মলয়া—হ্যাঁ।

রজত—আমারও কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল হতো।

মলয়া—কেন বলুন তো?

রজত হাসতে চেষ্টা করে—তা তো বলতে পারছি না। এত তাড়াতাড়ি কি

বলতেও পারা যায় ?

মলয়া হাসে।—আপনি নিশ্চয় এখানে রুণুকে দেখতে এসেছেন।

রজত—তাই তো জানি।

মলয়ার চোখ কাঁপে—কিন্তু সেটা কি উচিত হলো ?

রজতও গম্ভীর হয়—আপনিই বা রজতের সঙ্গে দেখা করতে এখানে এলেন কেন ? আপনারও কি এটা উচিত হয়েছে ?

মলয়া—না।

রজত—আমি তাহলে উঠি।

মলয়া—কিছু মনে করবেন না।

রজত হাসে—মনে করবার কি আছে ? কেউ কাউকে ঠকাতে পারলাম না, এটাই তো ভাল হল। নয় কি ?

মলয়া—হ্যাঁ।

গুহামানব

শতাব্দীর সভ্য জীবনের এই রাজপথের এক প্রান্তে, তার মানে, দমদম এয়ার-পোর্টের এলাকা ছাড়িয়ে ওদিকে মাত্র আধ মাইল এগিয়ে যেতে হবে, যশোর রোডের একপাশে, যে জায়গাটার নাম রায়বাগান, যেখানে মস্ত বড় এক শীট মেটাল কারখানার টিনের শেড রূপোলী পেন্টের প্রলেপ নিয়ে ঝকঝক করে সেখানে একজন আদিমকালীন গুহামানবের ঘর দেখতে পাওয়া যায়। একথা চেঁচিয়ে বললেও অনেকে নিশ্চয় বিশ্বাস করবে না। কিন্তু রায়বাগানের অনেকেই বিশ্বাস করে। ওই মেটাল কারখানার স্টোরের সেকেণ্ড ক্লার্ক শ্রীকালীপদ দত্তের বাড়িটাকেই বলা হয়—একটা গুহামানবের বাড়ি। হেসে হেসে নয়, ঠাট্টা করেও নয়, খুবই রাগ করে আর উত্তেজিতভাবে কথাটা রায়বাগানের অনেক ভদ্রলোকের মুখে কঠোর ধিক্কারের জ্বালা হয়ে বেজে ওঠে। কথাটা সবার আগে বলেছিল, হর্ষবাবুর বড়ছেলে সেই শিশির, যে আজ দু'বছর হলো এম-এ পাস করবার পর সমাজবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছে।

কে জানে, সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার শিশির রায়বাগানের এই কালীপদ দত্তকে কেন গুহামানব বলে মনে করেছিল ? রায়বাগানের ভদ্রলোকেরা কিন্তু

ধরেই নিয়েছেন যে, আদিমকালের সেই গুহামানব নিশ্চয় এই কালীপদ দত্তের মতো মানুষ ছিল। বাইরের জীবনের চেহারাটা মানুষ-মানুষ, কিন্তু ভিতরের জীবনটা পশু-পশু। ঘরের বাইরে কালীপদ দত্তকে দেখলে মেটাল কারখানার স্টোরের সেকেণ্ড ক্লার্ক বলেই মনে হবে, যদিও খুব কম কথা বলেন, এদিক-ওদিক কোন দিকে চোখ তুলে তাকাতেই চান না; আর কাজের ছুটি হলে হাতের ছাতাটিকে খুলে মুখটাকে লোকের চোখের দৃষ্টি থেকে প্রায় আড়াল করে রেখে ও ব্যস্তভাবে পা চালিয়ে চলে যান।

রায়বাগানের এপাড়া আর ওপাড়ার জীবনে মাঝে মাঝে উৎসবের মতো ঘটনা দেখা দিয়ে থাকে। মেয়ের বিয়ে, ছেলের বউভাত, অন্নপ্রাশন আর শ্রাদ্ধ। কিন্তু এসব সামাজিক উৎসব আর অনুষ্ঠানে কালীপদ দত্তের নিমন্ত্রণ থাকে না। পাড়ার হয়েও কালী দত্ত সত্যিই একটি ভয়াবহ অস্তিত্ব। প্রায় সকলেই মনে-প্রাণে কামনা করে, কালী দত্ত এই রায়বাগান ছেড়ে পৃথিবীর অন্য কোথাও, কিংবা যে-কোন রসাতলে চলে যাক।

পাড়ার মধ্যে নয়, পাড়ার একদিকে, একটু তফাতে, বেশ ময়লা আর দীন-হীন চেহারার ছোট্ট একটা বাড়ি যেন গাছের ছায়ার আড়ালে মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে। এটাই কালীপদ দত্তের বাড়ি। এ বাড়ির সব জানালা সব সময় বন্ধ থাকে। এ বাড়ির সামনের দরজার কপাট কখনও একটুও ফাঁক হয় না! সন্ধ্যায় কিংবা রাতে এ বাড়ির কাছে দাঁড়িয়েও কেউ বুঝতে পারবে না যে, ভিতরে কোন আলো জ্বলেছে কিনা। কান পেতে থাকলেও এ বাড়ির ভিতরের কোন শব্দ শোনা যাবে না। যেন মূক ও বধির জীবনের একটা গুহা।

কিন্তু সকলেই জানে, এহেন গুহাঘরের মধ্যে কালী দত্ত একা থাকেন না। কালী দত্তের স্ত্রীও থাকেন। রায়বাগানের এপাড়া আর ওপাড়ার ছোট ছেলে-মেয়েদের কেউ কেউ পিছনের দুয়ার দিয়ে হঠাৎ এবাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে বলেই জানতে পারা যায়, একা নন কালী দত্ত, কালী দত্তের স্ত্রীও আছেন। আর জানতে পারা যায় সেদিন, মেটাল কারখানার চাপরাশি সনাতন এসে হঠাৎ হরিসাধনবাবুর বাড়ির বারান্দায় উঠে যেদিন চেঁচিয়ে ওঠে—কালীবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন।

অগত্যা হরিসাধনবাবুকে একটু বিচলিত আর ব্যস্ত হতেই হয়। পাড়ার মহিলারা খবর শুনে চমকে ওঠেন। পরিতোষ রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে—লোক-টাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। ক্ষোভ ধিক্কার আতঙ্ক ও আক্ষেপের এই সোরগোলের মধ্যেই পাড়ার কয়েকজন ছেলে কোমরে গামছা বেঁধে আর বাঁশের খাটিয়া নিয়ে

কালী দত্তের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। সেদিন সেই সময় কালী দত্তের এই গুহা ঘরের সামনের দরজার কপাট কিছুক্ষণের মতো খোলা হয়ে পড়ে থাকে।

কেউ জানে না, কী হয়েছিল কালী দত্তের স্ত্রীর; কারখানার অফিসেরও কেউ আগে শোনেনি, জানতেও পারেনি, কবে থেকে কিসের অসুখে ভুগছিলেন কালী দত্তের স্ত্রী। শুধু পরিতোষের রুক্ষ গলার স্বর যখন প্রায় ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তখন আস্তে আস্তে বিড়-বিড় করে জবাব দেন কালী দত্ত, জ্বর হয়েছিল, প্রায় একমাসের জ্বর, নাগের বাজারের কবরেজের কাছ থেকে ওষুধ আনা হয়েছিল। মাঝে দু'দিন শ্যামবাজারের ডাক্তার বসুও এসে দেখে গিয়েছিলেন, ত্রিশটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। কিন্তু…।

আর কথা বলেন না কালী দত্ত। কালী দত্তের কৈফিয়তের কথাগুলিকে এরা কেউই বিশ্বাস করেন না। মিথ্যে কথা। শ্যামবাজারের ডাক্তার বসুর মতো এত বড় ডাক্তার রায়বাগানের এপাড়াতে এসে থাকলে সে-ঘটনা কি কারও অদেখা হয়ে থাকতে পারতো?

কালী দত্তের শুকনো খটখটে চোখে একবিন্দুও সজলতা নেই। খাটের বিছানার উপর এক নিষ্প্রাণ নারীর শুষ্ক শরীর চাদর ঢাকা হয়ে পড়ে আছে; শুধু মুখের উপর কোন ঢাকা নেই। তাই দেখতে পাওয়া যায়, কেউ যেন বেশ যত্ন করে আর পরিপাটি করে সেই নারীর এলোমেলো চুলের গুচ্ছগুলিকে খোঁপা করে বেঁধে দিয়েছে। সিঁথিতে সিঁদুরও আছে, টাটকা সিঁদুর বলেই তো মনে হয়। আর কী আশ্চর্য, পায়েও টাটকা আলতার দাগ।

শুনতে পাওয়া যায়, রুগ্ন বিড়ালের মতো করুণ মিউমিউ স্বরে কথা বলে বলে কে যেন কাঁদছে। কে? কে আপনি? পাশের ঘরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে পরিতোষ। কিন্তু তখুনি চিনে ফেলতেও পারে, কাঁদছে ভানুর মা, সেই প্রায়-অন্ধ বুড়িটা, মাঝে মাঝে পাড়ার এবাড়ি সেবাড়ি ঘুরে ঝি-এর কাজ খোঁজ করে যে বুড়ি।

ভানুর মা কাঁদে—গীতাদিদি গো, তুমি এমন করে চলে গেলে কেন গো।

পরিতোষ বলে—থাম, ভানুর মা। তোমার গীতাদিদিকে সাজিয়ে দেবার কাজ আরও কিছু বাকি আছে নাকি?

ভানুর মা বলে—তোমরা বুঝে নাও গো বাবা! আমি যে অন্ধ মানুষ বাবা, আমি আর কত করবো বল?

কোমরে গামছা-বাঁধা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে পরিতোষ বলে—ওঠাও, আর দেরি করার কোন মানে হয় না।

কালী দত্ত এগিয়ে আসেন। গায়ের কামিজের পকেট থেকে কৌটা বের করে এক টিপ নস্যি তুলে নেন। নস্যির টিপ নাকে গুঁজে দিয়ে কত জোরে দুটো টান দিলেন কালী দত্ত। কড়া নস্যির ঝাঁঝালো গন্ধে ঘরের বাতাস যেন শিউরে উঠেছে। কিন্তু এমন কড়া নস্যির ঝাঁঝেও কালী দত্তের চোখ ছলছল করে না। শবযাত্রার এই ছোট্ট মিছিলের পিছনে যেন নির্লিপ্ত এক পথচারীর মতো চুপ করে চলতে থাকেন কালী দত্ত।

আজ জানতে পারা গেল, কালী দত্তের এই স্ত্রীর নাম গীতা। এর আগে এই এগার বছরের মধ্যে রায়বাগানের ছেলেরা কালী দত্তের এই গুহাঘর থেকে একজন নীহারকণা, একজন শান্তিলতা, আর একজন পারুলবালাকে, মোট তিনবার তিনজনকে খাটের উপর থেকে তুলে নিয়ে শ্মশানে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। গীতা হলো কালী দত্তের স্ত্রীদের মধ্যে চতুর্থা ; ঠিক গীতারই মতো কালী দত্তের ওই তিন স্ত্রীর নামও কেউ আগে শুনতে বা জানতে পারেনি। জানতে পারা গিয়েছে ঠিক এই-ভাবে, হঠাৎ যেদিন খবর পাওয়া গেল যে, কালী দত্তের বউ মরেছে, আর শচীন ডাক্তারের কাছ থেকে মৃত্যুর সার্টিফিকেট নিতে হয়েছে!

হরিসাধনবাবুর স্ত্রী ঠিক কথাই বলেন—এ পোড়া বাংলা দেশে পান চুন থেকে শুরু করে চোদ্দ ক্যারেট সোনা পর্যন্ত সবই মাগ্‌গি, শুধু মেয়ে সস্তা। তা না হলে কালী দত্তের মতো মানুষও পটপট করে যখন খুশি তখন বিয়ে করতে পারবে কেন?

রতনবাবুর স্ত্রী বলেন—পাঁটিবেচা বাপেরও মনে দরদ আছে। যার তার হাতে মেয়েকে সঁপে দেয় না। কিন্তু ভেবে দেখুন দেখি, গীতা নামে এই মেয়েটার বাপ কত বড় হতচ্ছাড়া পাষাণ বাপ!

দোজবরে তেজবরেও নয়, একেবারে চারবরে একটা মানুষ, বয়স তো নিশ্চয়ই পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে, আর রোজগার তো ওই সামান্য একটা কেরানীগিরির মাত্র দেড়শটি টাকা! এহেন কালী দত্ত মাত্র এই তিন বছর আগে একমাসের ছুটি নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল আর বিয়ে করে ফিরে এল। গীতার পাষাণ বাপ বোধহয় সেদিন একটু খোঁজ করে দেখবারও দরকার মনে করেনি যে, মেয়েটাকে সত্যিই কোন অভিশাপের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো কিনা।

কালী দত্তের স্বভাবের নিয়মটাও রায়বাগানের সবাই বুঝে নিয়েছেন। প্রত্যেক বারই দেখা গেল, স্ত্রীর মৃত্যুর পর কয়েকটা মাস সত্যিই একলা থাকেন কালী দত্ত। কিন্তু বড়জোর ছ মাস বা সাত মাস। তারপরেই একমাসের ছুটি নেন। রায়বাগানের মানুষের মন সন্দেহ আর আতঙ্কে ভরে যায়, আবার বুঝি বিয়ে করবেন কালী দত্ত। কিন্তু মিথ্যে সন্দেহ নয়, মিথ্যে আতঙ্কও নয়। ছুটির

এক মাস রায়বাগান থেকে অদৃশ্য হয়ে তারপর একেবারে সস্ত্রীক হয়ে রায়বাগানে ফিরে আসেন।

পাড়ার মহিলারা কালী দত্তের নতুন বউকে দেখবার জন্যে আর একটুও উৎসাহিত হন না।

যেমন নীহারকণা, তেমনি শান্তিলতাও পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করতে বা পরিচিত হতে চায়নি। একদিন আরতির মা সাহস করে কালী দত্তের বাড়ির খিড়কির দুয়ারের কড়া নেড়ে ছিলেন। কিন্তু খিড়কির দরজা সামান্য একটু ফাঁক করে শুধু একটা কথা বলেছিল নীহারকণা—অনেক বেলা হয়েছে। শান্তিলতা বলেছিল—সন্ধ্যে তো হয়ে এল!

নীহারকণা মারা গেল শান্তিলতাও মারা গেল তারপর, একমাসের ছুটির মধ্যে কবে নতুন বউকে সঙ্গে নিয়ে, তার মানে পারুলবালাকে সঙ্গে নিয়ে কালী দত্ত তাঁর এই বাসাবাড়ির খিড়কির দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালেন, সেটাও কেউ জানতে পারেনি। কানুর ঠাকুরমা শুধু একবার বলেছিলেন, কাল অনেক রাত্তিরে মনে হলো, একটা রিক্সা এসে কালী দত্তের বাড়ির খিড়কির দোরের কাছে দাঁড়িয়েছে।

তার মানে আর-একটা নারীর প্রাণবলির ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। হিমাদ্রিবাবু আক্ষেপ করেন—ছি ছি। পরিতোষ রাগ করে—আমাদেরও দোষ আছে। আমরা এসব সহ্য করছি বলেই লোকটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

হিমাদ্রিবাবু বলে—আমি ভাবছি কালী দত্তের বউগুলোই বা কেমন! ওরা কেন এরকম ভয়ানক একটা শাস্তির জীবন চুপ করে সহ্য করে?

এটাও একটা প্রশ্ন বটে। যদি সত্যিই কালী দত্তের কোন বউ একদিন ওই গুহাঘরের কঠিন শাসনের মাথায় বাড়ি দিয়ে, কিংবা চেঁচিয়ে কেঁদে ছুটে পালিয়ে এসে হরিসাধনবাবুর স্ত্রীর কাছে বলে দিত, রক্ষা করুন মাসীমা, এই কালীয় নাগের বিষের জ্বালা থেকে আমাকে বাঁচান, তবে রায়বাগানের ভদ্রলোকেরা আর ভদ্রমহিলারা একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারতেন।

একবার একটা ঝড়ের রাতে সত্যিই কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল। কালী দত্তের গুহাঘরের ভিতরে কেউ যেন গলার স্বর চেপে চেপে কাঁদছে। সে-সময় পারুলবালা ছিল কালী দত্তের স্ত্রী। পরিতোষ ও রতনবাবু সে-রাতে লাঠি আর লণ্ঠন হাতে নিয়ে বের হয়েই পড়েছিলেন। কালী দত্তের বাড়ির কাছেও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু মনে হলো, না, কালী দত্তের ঘরের ভিতরে কেউ তো কাঁদছে না। মেটাল কারখানার পাশে ফাঁপা বাঁশের একটা গাদার মধ্যে ঝড়ের

বাতাসটা যেন কান্নার বাঁশির মতো কঁকিয়ে কঁকিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ ছাড়ছে।

কালী দত্ত কি তুকতাক জানে? তা না হলে কালী দত্তের ওই গুহাঘরের এক-একটি বন্দিনী নারীর দুঃখী প্রাণের অভিযোগ কেন শব্দ করে বেজে ওঠে না? এক বছর, দু'বছর বা তিন বছর, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন এক-আধমাসের জ্বরের জ্বালায় ধড়ফড়িয়ে মরে যেতে হবে, এই তো কালী দত্ত নামে অদ্ভুত লোকটার স্ত্রী হবার অবধারিত পরিণাম। সব জেনে-শুনেও কালী দত্তকে বিয়ে করতে রাজী হয়, কেমন মেয়ে ওরা? সন্দেহ হতে পারে, মেয়ে আর মেয়ের বাপ-মা, কেউই বোধহয় আগে জানতে পারে না যে, কালী দত্ত একজন ভয়ানক বিপত্নীক।

কিন্তু রতনবাবুর সঙ্গে একদিন কালীঘাটের এক বাড়িতে কালী দত্তের চতুর্থা স্ত্রী গীতার এক কাকার হঠাৎ দেখা হয়েছিল, আলাপও হয়েছিল। গীতার কাকা বলেছিলেন—জানি জানি, সবই জানি।

—কবে জানলেন? বিয়ের আগে?

—আজ্ঞে না। বিয়ের পরে।

—তারপর?

—তারপর আর কি? এখন মেয়ের অদৃষ্ট, যা হবার তাই হবে।

—কি আশ্চর্য, জেনেও আপনাদের একটু ভয় হয় না?

—না, মশাই না। গীতার কাকা বেশ চেঁচিয়ে জবাব দিয়েছিলেন।

বাঃ, কালী দত্ত তাহলে কি তুকতাক করে মেয়ের কাকা-বাবা-দাদাগুলোরও বুদ্ধি নাশ করে দেয়?

হিমাদ্রিবাবু একবার তাঁর অফিসের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথায় কথায় কালী দত্তের তৃতীয়া স্ত্রী পারুলবালার মামার বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিলেন। পারুলবালার মামাকে চিঠি লিখেছিলেন হিমাদ্রিবাবু, যদি আপনাদের মেয়ের জীবনের জন্য বিন্দুমাত্রও মায়া আপনাদের থেকে থাকে, তবে একবার এখানে এসে নিজের চোখে সব ব্যাপার দেখে যান। আপনারা ভুল করে মেয়েকে একটা রাক্ষুসে অদৃষ্টের ঘরে বিয়ে দিয়েছেন।

পারুলবালার মামা অনাথবাবু পত্রপাঠ ব্যস্ত হয়ে আর খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রায়-বাগানে এসেছিলেন। কালী দত্তের ওই ভয়ানক গুহাঘরের ভিতরে ঢুকবার আগে অনাথবাবু বুদ্ধি করে হিমাদ্রিবাবুরই বাড়িতে এসেছিলেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন অনাথবাবু।

হিমাদ্রিবাবুও একেবারে স্পষ্ট ভাষায় কালী দত্তের জীবনের ভয়ানক ইতিবৃত্ত শুনিয়ে দিয়েছিলেন।—ওটা তো মানুষের বাড়ি নয় অনাথবাবু; ওটা হলো···

পরিতোষ যাকে বলে, একটা ভয়ানক গুহামানবের বাড়ি। কালী দত্তের বউ বাঁচে না, বাঁচা সম্ভব নয়; কিন্তু তবু দেখুন, কী জঘন্য মনোবৃত্তি। বউ মরলেই ছয়-সাত মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করে।

অনাথবাবুর জলভরা চোখেও যেন আগুন জ্বলতে থাকে—কিন্তু বউগুলো মরে কেন বলতে পারেন? মারধর করে বুঝি?

—কিছু জানি না মশাই। এ এক ভয়ানক রহস্য, কালী দত্তের ঘরের ভেতরের খবর বোধহয় ভগবানও জানতে পারেন না।

হন হন করে হেঁটে কালী দত্তের বাড়ির দিকে চলে গেলেন অনাথবাবু। দেখে মনে হলো, ওই, গুহাঘরের ভিতরে ঢুকেই কালী দত্তের গলা টিপে ধরবেন অনাথবাবু।

কিন্তু বৃথা আশা করেছিলেন হিমাদ্রিবাবু। পরের দিন সকালবেলা যখন কালী দত্তের বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় সড়কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন অনাথবাবু ঠিক তখন হিমাদ্রিবাবুর মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। হিমাদ্রিবাবুকে দেখেই অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন অনাথবাবু; ভাব দেখালেন, যেন হিমাদ্রিবাবুকে দেখতেই পাননি। বেশ নিশ্চিন্ত, অনাথবাবু সত্যিই আকাশের দিকে তাকিয়ে সিগারেট খেতে খেতে চলে গেলেন। হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে একটা কথাও বললেন না।

হেডক্লার্ক নিশানাথবাবু কতবার কত ভাল কথা বলে কালী দত্তকে বুঝিয়েছেন, আপনি মশাই খামকা বিয়ে করেন। আপনার স্ত্রী অল্পায়ু হবেন আর হঠাৎ মারা যাবেন, এটা যখন আপনার বিধিলিপি, তখন আর এই ঝঞ্চাটের মধ্যে যান কেন? এবার ক্ষান্তি দিন মশাই।

কিন্তু বৃথা অনুরোধ। কালী দত্ত তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী শান্তিলতার হঠাৎ-মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত এরকমের অনুরোধের কথা অন্তত ত্রিশবার শুনেছেন। কিন্তু তবু তো দেখা গেল, আরও দু'বার বিয়ে করলেন কালী দত্ত। আরও দুটি নারীর প্রাণ কালী দত্তের অন্তরাত্মার আড়ালে গোপন করা এক নিষ্ঠুর পুরুষব্যক্তিকের কাছে বলি হলো। পারুলবালা গেল, তারপর আজ গীতাও গেল।

হর্ষবাবু বলেন—কালী দত্তের বিয়ের বাতিক বন্ধ করতে পারে, এমন কোন আইনও তো নেই।

কিন্তু এত নিন্দা, ধিক্কার ও ভর্ৎসনার কোন দ..কার হতো না, যদি কালী দত্ত এখান থেকে চলে যেতেন, কিংবা বিয়ে করবার বাতিক চাপা দিয়ে রেখে একলা-মানুষ হয়ে যেতেন। তবে নারীবলির মতো এই ভয়ানক কাণ্ড চোখে দেখতে হতো

না। তবে নিশ্চিন্ত হতো রায়বাগানের এগার বছরের উদ্বিগ্ন আর ক্ষুব্ধ মন।

রায়বাগানের ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাদের আর-একটা আক্ষেপের কথা এই যে, সত্যিই একমাত্র মানুষ, যিনি ইচ্ছে করলে একটা উপায় করতে পারেন, তিনি বোধহয় কিছু করতে চান না। তিনি কিন্তু ইচ্ছে করলে কালী দত্তকে এই স্টোর-কেরানী চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। তিনি অন্তত একটু শক্ত করে কথা বললে বা ভয় দেখালে কালী দত্ত নিশ্চয় ভয় পেতে বাধ্য হবেন। হিমাদ্রিবাবু আর রতনবাবু, তাছাড়া আরও তিন ভদ্রলোক প্রায় ডেপুটেশনের মতো একটা চেষ্টার কাণ্ড করেছেন, একবার নয়, তিন-চার বার। কিন্তু যাঁর কাছে ডেপুটেশন, তিনি ভদ্রলোকদের সঙ্গে প্রথমে কথা বলতেই চাননি। শেষে শুধু একটি কথা বলেছিলেন—আমি তো পারিই, কিন্তু সেটা কি আপনাদের পক্ষে খুব সম্মানের ব্যাপার হবে?

ডেপুটেশনের ভদ্রলোকদের কারও মুখের দিকে তাকিয়ে নয়, তিনি তাঁর হাতের বইয়ের খোলা পাতার লেখাগুলির দিকে তাকিয়ে আর খুব গম্ভীর স্বরে এই কথা বলেছিলেন। তিনি রায়বাগানের এই গোটা পাঁচেক ভদ্রলোককেও যেন সত্যিকারের মানুষ বলে গ্রাহ্য করতে পারছিলেন না।

যেমন আজ কালী দত্তের চতুর্থী স্ত্রী গীতার মৃত্যুর বিকেল বেলায় খুব বৃষ্টি হয়ে গেল, সেবারও ঠিক তেমনি কালী দত্তের দ্বিতীয়া স্ত্রী শান্তিলতার মৃত্যুর রাত্রিবেলাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। শুধু কি বৃষ্টি? যেমন বৃষ্টি, তেমনই ঝড়, আর তেমনই বিদ্যুতের চমকের সঙ্গে রাগী মেঘের গরগরে ডাক। সত্যিই সে রাতে খুব ভয় পেয়ে রায়বাগানের মানুষেরও বুক কেঁপে উঠেছিল। রাতটা যেন শান্তিলতার চিতার ছাই বৃষ্টির জলে ধুয়ে দিয়েও রায়বাগানকে ক্ষমা করতে পারছে না। কালী দত্তের মতো একটা পাপের কালীয় নাগকে পুষে রেখেছে যে রায়বাগান, তাকে ক্ষমা করতে না পেরে গরগর করছে নিকষ কালো আকাশের মেঘ।

সে-রাতে বৃষ্টি থামতেই হিমাদ্রিবাবু ও রতনবাবু দু'জনে টর্চ হাতে নিয়ে, আর প্রায় আধ মাইল পথ জলের উপর দিয়ে ছপছপ করে হেঁটে এই মানুষটিরই কাছে এসে অভিযোগ করেছিলেন—আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, এটা মৃত্যু নয়, এটা একটা হত্যা।

যাঁর কাছে অভিযোগ, তাঁর চমৎকার সুন্দর মুখের ফর্সা রঙ সেই মুহূর্তে যেন লাল হয়ে জলে উঠেছিল। কুঁচকে গিয়েছিল তাঁর দুই চোখের বড়-বড় দুটি বাঁকা ভুরু; যেন দুঃসহ একটা ঘৃণা শিউরে উঠেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর তিনি বলেছিলেন—এটা আপনাদেরই পক্ষে লজ্জার কথা।

—আপনি কিন্তু ইচ্ছে করলে…।

—আমি তো পারিই ; কিন্তু আপনারা কেন পারছেন না ? ছিঃ !

হিমাদ্রিবাবু আর রতনবাবু সে-রাতে এইরকম একটা পাল্টা অভিযোগের ভাষার কাছে প্রায় ধিক্কৃত হয়ে ফিরে এসেছিলেন ও হতাশ হয়েছিলেন। আর, কালী দত্তের নিষ্ঠুর পাপের সৌভাগ্যটা দেখে আশ্চর্য বোধ করেছিলেন। যিনি আজ ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে কালী দত্তের এরকমের একটা গুহায়িত নির্মম রহস্যের জীবনকে ভয় পাইয়ে দিয়ে শায়েস্তা করতে পারেন, তিনিও কেমন যেন একটা ঘৃণার বাতিকে চুপ করে থাকতে চান।

কালী দত্তের তৃতীয়া স্ত্রী পারুলবালার মৃত্যুর পরে শুধু একা হরিসাধনবাবু গিয়ে এঁরই কাছে সব কাহিনী শুনিয়েছিলেন। শুনে তাঁর সুন্দর মুখের চেহারা অদ্ভুত রকমের করুণ হয়ে গিয়েছিল। আর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর একটা অদ্ভুত কথাও বলেছিলেন—আমি কিন্তু একটা কথার কোন মানে বুঝতে পারি না, কাকাবাবু। ওরা সময় থাকতে সরে যায় না কেন ?

তার মানে, কালী দত্তের স্ত্রী হয়ে এই যে তিন-তিনটে মেয়ে এসে এই ভয়ানক গুহাঘরে ঢুকেছিল, তারা কালী দত্ত নামে একটা রাক্ষুসে পুরুষ-চরিত্রকে তুচ্ছ করে আর ঘৃণা করে পালিয়ে গেল না কেন ? ঠিকই তো, মাঝরাতে কালী দত্ত যখন ঘুমিয়ে পড়ে থাকে, তখন খিড়কির দরজার কপাট নিঃশব্দে খুলে ফেলতে কতটুকু সময় লাগে ? কালী দত্ত যখন মাঝ-দুপুরে কারখানার স্টোরের ঘরে বসে সীসার ওজনের হিসেব লেখে, তখন ওই বাড়ির সামনের দরজার কপাট খুলে পথে বের হয়ে পড়তে আর একটা রিকশা ডাকতে অসুবিধা কোথায় ?

এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না হরিসাধনবাবু। তিনি, আর রায়বাগানের প্রায় সকলেই জানেন যে, না, ওরা পারে না, পারেওনি। কালী দত্তের ঘরের নারী যেন সাপের ফণার সম্মুখে অচেতন হয়ে পড়ে যাওয়া এক-একটা ধড়ফড়ানো মুমূর্ষু পাখির প্রাণ। কিন্তু ইনি, যাঁকে হরিসাধনবাবু এসব কথাও কয়েকবার বলেছেন, তিনি কথাগুলিকে বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই বেশ একটু রুক্ষ-রুষ্ট স্বরে বলেছিলেন—আপনি যা-ই বলুন, কাকাবাবু, বউগুলোরও দোষ আছে। দোষ না হোক, ভুল।

হরিসাধনবাবু—যা-ই হোক, এখন তুমি যদি একটু……।

—আমি তো ইচ্ছে করলে একটা ব্যবস্থা করতে পারিই, কিন্তু বুঝতে পারি না, কেন করবো।

আজ, গীতার মৃত্যুর এই বিকেল বেলার বৃষ্টিটা থেমে যাবার পরেও রায়-

বাগানের এ-বাড়ি আর সে-বাড়ির ঘরে ঘরে শুধু এই অক্ষম ক্ষোভের গুঞ্জন বাজতে থাকে। না, কিছুই করা গেল না, কিছু করাও যাবে না।

ঘাটের কাজ সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে পরিতোষ। কিন্তু রোজ মাঝরাতে যেমন, আজকের এই এত রাতেও তেমনই বুঝতে পারা যায়, গুহা-মানব কালী দত্ত অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির বাইরের পাতকোর কাছে স্নান করছেন। কালী দত্তের হাতের ঘটি আর বালতি শব্দ করছে। ছরছর্ করে ঢালা জলের শব্দ আছড়ে পড়ছে।

এই শব্দটাও রায়বাগানের রাতের জীবনে যেন বারোমেসে ঘেন্না আর আতঙ্কের শব্দ। শীত গ্রীষ্ম বর্ষার কোন রাতও বাদ যায় না, যে-রাতে এইভাবে অন্ধকারের এক পাতকো'র কাছে স্নান না করেন কালী দত্ত। পরিতোষ বলতে পারে, এটা আদিমকেলে গুহামানবের স্বভাব কি না।

কালী দত্তের বুকে পিঠে বড় বড় কর্কশ রোঁয়া গিজগিজ করছে কি না, সেটা কারও জানবার কথা নয়। কিন্তু এটুকু সবাই জানে যে, লোকটা দাঁত দিয়ে কাঠ কাটে না, আর নখ দিয়ে গাছের ছালও ছাড়ায় না। কালী দত্তের বাড়ির সামনে কাঁচা-খাওয়া খরগোসের ছাল আর ভেড়ার শিং-ও পড়ে থাকে না।

কিন্তু গায়ের ফর্সা রঙ তামাটে হয়ে গিয়েছে, কব্জির চওড়া হাড়ের উপর নীল-নীল রগ ফুলে রয়েছে, কালী দত্তের এই চেহারা পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়েও যেন একটা হট্টা-কট্টা কঠোরতা। মাঘ মাসের রাতে আদুড় গায়ে পাতকো'র কাছের জঙ্গল কাটছেন কালী দত্ত, এ-দৃশ্যও কারও কারও চোখে পড়েছে। কিন্তু কোন মুহূর্তেও কালী দত্তের সামান্য একটা হাঁচি-কাশির শব্দ কেউ শুনতে পায়নি। পরিতোষ মাঝে-মাঝে বলে—ওই শক্ত চোয়ালের অদ্ভুত গড়ন দেখেই বোঝা যায়, ওটা আধুনিক কালের মানুষের পক্ষে বেশ একটু অস্বাভাবিক।

বুড়ো মানুষ হরিসাধনবাবু, এমনিতেই ঘুম ভাল হয় না। তার উপর এত রাতে কালী দত্তের এই স্নানের জল-ঢালার ছরছর শব্দ; হরিসাধনবাবুর ঘুম আর সম্ভব নয়। এই অবস্থায়, শুধু সেই পুরানো দুর্ভাবনাটাই মনের ভিতর ছমছম করে। কালী দত্ত কি সত্যিই আবার বিয়ে করবে?

দুই

এই কারখানার মালিক যিনি, তাঁর নাম এম সামন্ত। এখানে তাঁর বিপুল কর্মজীবনের ইতিহাসের সব কথা অনেকেই জানে না। রায়বাগানের হরিসাধন-বাবু কিন্তু অনেককিছু জানেন, কারণ তিনিও এককালে হাজারিবাগের জঙ্গলে

ঢুকে ভাগ্যের পরীক্ষা করবার জন্য অভ্রের খাদের লীজ নিয়েছিলেন। হরিসাধন-বাবুর অভ্রের খাদ থেকে শুধু কাঁকর মেশানো ধুধে মাটি উঠেছিল, অভ্রের ছিটেফোঁটাও সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু এম সামন্ত যখনই যে খাদের বুকের সামান্য গভীরে বারুদ ফুটিয়েছেন, তখনই সে খাদের পাথুরে পাঁজর থেকে রুবি অভ্রের স্তবক ঝরে পড়েছে। এক বছরেই লক্ষপতি হয়েছিলেন এম সামন্ত।

সেই এম সামন্ত আজ অবশ্য আশি বছরের কাছাকাছি বয়সের এক বৃদ্ধ। কিন্তু সেজন্য তাঁর কারবারী আকাঙ্ক্ষাটাও বুড়িয়ে যায়নি। প্রায় বারো বছর হলো এই মেটাল কারখানা চালু করেছেন, এখানেই মস্ত বড় এক বাড়ি করেছেন। সন্তান বলতে একটি মাত্র মেয়ে, সে মেয়ে এখনও এম সামন্তের এই বাড়িরই মানুষ। বিয়ে করেননি তরুলতা সামন্ত, যদিও বয়স কবেই চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে।

উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ের কাছে এক জমিদার তাঁর বিদুষী মায়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্যে একটি মেয়ে-কলেজ করেছেন—রানী লীলাবতী কলেজ। তরুলতা সেই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কাজেই, বছরের বারো মাস একটানা এখানে এই রায়বাগানে থাকেন না তরুলতা, কলেজের ছুটিতে এখানে আসেন, ছুটি ফুরোলেই আবার চলে যান।

রানী লীলাবতীর মেয়ে দময়ন্তী আর এম সামন্তের মেয়ে তরুলতা, দু'জনে এককালে লখনউ-এর একই কলেজের দুই সহপাঠিনী বান্ধবী ছিলেন। একদিন দুই বান্ধবীর জীবনের বিশেষ একটা জেদ প্রায় একটা প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠেছিল।

লখনউ-এর সেই মেয়ে-কলেজের হোস্টেলের দিদি চারুমতী নিগম একদিন সন্দেহ করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—ছি ছি, তোমরা দু'জনেই এত মন দিয়ে এসব বাজে বই পড়ছো কেন? তোমরা কি সত্যিই বিয়ে করতে চাও না?

সন্দেহ না করে পারবেন কেন দিদি চারুমতী? পড়বার মতো এত কাব্য নাটক পৃথিবীতে থাকতে, এই দুই ছাত্রী শুধু গাদা গাদা এমন বই পড়ছে, যেগুলি বলতে গেলে মেয়েলী সন্দেহের একটা বিদ্রোহের শাস্ত্র।

সে প্রতিজ্ঞা যে নিতান্ত একটা খেয়ালী শখের প্রতিজ্ঞা ছিল না, সেটা স্বীকার করতেই হয়। দময়ন্তীও বিয়ে করেননি। মিস দময়ন্তী সিন্‌হা শুধু ছবি এঁকে জীবনের দিনগুলি পার করে দিচ্ছেন। সেই সব ছবিতে জগতের সব রূপেরই কিছু না কিছু থাকে; রামধনু মরুকুঞ্জ আর বর্ষার নদী; পাখি ফুল আর হরিণ, স্নান-ঘাটের মেয়ে আর মেষপালিকা গুজর তরুণী। কিন্তু পুরুষ-চেহারার সামান্য ছায়াও সেসব ছবির কোন ছবিতে নেই।

এ তো আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা. তরুলতা সামন্ত যখন মাত্র আঠার বছর বয়সের আর খুবই শান্ত স্বভাবের এক ছাত্রী। সেই তরুলতা আজও যখন রায়বাগানের এই বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে কোচের উপর বসে সোনার ফ্রেমের চশমা চোখে দিয়ে কারখানার ম্যানেজারের অফিস থেকে পাঠানো ফাইলগুলিকে পড়তে থাকেন, আর তাঁকে নিশ্চয় ছাত্রী বলে মনে হয় না। তখন তাঁকে সত্যিই এই মেটাল কারখানার সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান আর ভাল-মন্দের এক বুদ্ধিময়ী কর্ত্রী বলে মনে হয়। কলেজের ছুটির যে-সময়ে রায়বাগানের এই বাড়িতে থাকেন মিস তরুলতা সামন্ত, সে সময়টা কারখানার ম্যানেজার চক্রবর্তীর জীবনটাও উদ্বেগে উতলা হয়ে থাকে। সব সময় সতর্ক থাকেন চক্রবর্তী, কে জানে কখন মিস সামন্তের কাছ থেকে কড়া ভাষার নোট হাজির হবে। হয়তো রোজের ক্যাশবুকের হিসাবের অঙ্কগুলিকে লাল পেন্সিলের দাগে দাগে ভরে দিয়ে, আর মন্তব্যের ঘরে মস্ত বড় একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন এঁকে দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।

এম সামন্তের পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনা দেখেছেন আর অনেক ঘটনার কথা শুনেছেন বলেই বুড়ো হরিসাধনবাবু তরুলতাকেও কিছুটা বুঝতে পারেন। পনের বছর আগে, এম সামন্ত যখন কানপুরে, তখন তাঁর একটা চিঠি পেয়ে এই হরিসাধনবাবু পাটনা থেকে কানপুরে গিয়েছিলেন। এম সামন্ত বললেন, এ বিয়ের চেষ্টাও ব্যর্থ হলো, হরিসাধন. তরু রাজি হলো না।

এত বড় পদস্থ এঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট বলেও বেশ সুনাম আছে, বয়সে স্বাস্থ্যে চেহারাতে সুশ্রীতার কোন অভাব নেই, এমন মানুষকেও বিয়ে করতে রাজী হলো না তরু, এ যে সত্যিই ভয়ানক এক অহংকারের অসম্মতি। এই নিয়ে মোট দশটি ভাল-ভাল বিয়ের প্রস্তাব তরুলতার আপত্তি আর তুচ্ছতায় মিথ্যে হয়ে গেল। এম সামন্ত সেদিন হরিসাধনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খুবই ছটফট করেছিলেন; যেন চরম আশাভঙ্গের কষ্টটাই ছটফট করেছিল।

হরিসাধনবাবুও দেখেছিলেন, এঞ্জিনিয়ার ছেলে সেই ধীরাজ মিত্র যখন অনেক আশায় ব্যস্ততার মতো সেদিন সন্ধ্যাবেলাতে এম সামন্তের কানপুরের বাড়িতে দেখা দিলেন, তরুলতা তখন ধীরাজের দিকে হাত তুলে একটা শুকনো সৌজন্যের ভঙ্গীও না করে ঘরের ভিতর সরে গেল। আশ্চর্য হয়েছিলেন হরিসাধনবাবু, ধীরাজের মতো ছেলেকেও এভাবে তুচ্ছ করতে পারে কোন মেয়ে? সে মেয়ে যতই সুন্দরী আর শিক্ষিতা হোক না কেন?

শুধু আশ্চর্য হয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেননি হরিসাধনবাবু। তাই এম সামন্তকে তিনিও শুকনো ভাষায় শুধু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিলেন—কি

আর করবেন বলুন ? তরুর মনে যদি কোন আগ্রহ না থাকে, তবে আমাদের চেষ্টা করবার মানে হয় না।

সেই তরুলতার নিজের নিঃশ্বাসের বাতাসও কোনদিনও চেষ্টা করেনি। মেয়ে কলেজের টিচারের চাকরি নিয়েছেন, দিন মাস আর বছর পার হয়েছে। তারই মধ্যে একদিন সেই মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপ্যালও হয়ে গিয়েছেন তরুলতা সামন্ত।

কলেজের ছুটির সময়ে রায়বাগানে এসে বাপের সম্পত্তির এই কারখানার হিসাব-পত্রের খাতা পরীক্ষা করাও তরুলতার একলাসুখী প্রাণের কালহরণ ছাড়া আর কিছু নয়। জলের ধারার মতো বয়সের ধারাও যেন শুকনো বালুর বুকের উপর দিয়ে অনেক দূর গড়িয়ে এসেছে, এইবার নিশ্চয় শুকিয়ে যাবে আর ফুরিয়েও যাবে। কিন্তু সেজন্য তরুলতা সামন্তের মনে কোন আক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না।

কারখানার হিসাবের খাতা আর চিঠির ফাইলের দিকে তাকিয়ে তরুলতা যখন তাঁর হাতের কলমটিকে আস্তে আস্তে দোলাতে থাকেন, তখন তাঁর কপালের কাছে আর কানের উপরে কালো চুলের ছোট্ট দুটি স্তবক আংটির মতো দুটি বৃত্ত হয়ে দুলতে থাকে, তার সঙ্গে দু'চারটে সাদা চুলের রেখাও জড়াজড়ি হয়ে কাঁপতে থাকে। সোনার ফ্রেমের চশমার কাচের উপর বাগানের শিমূলের মাথার রঙীন ছায়াটাও যেন ছোট্ট একটা রক্তচন্দনের ফোঁটার মতো ফুটে ওঠে। টিকালো নাক, টানা টানা চোখ, সুডোল চিবুক, তরুলতা যেন মূর্তিমতী মেধা। হিসেবের একটা স্টেটমেন্টের দিকে একবার তাকিয়েই তিনটে ভুল ধরে ফেলতে পারে, এমনই চকচকে আর উজ্জ্বল তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি।

রতনবাবু তাই একদিন হরিসাধনবাবুর কাছে না বলে পারেননি—সত্যি হরিদা, মিস সামন্ত সত্যিই একটা অদ্ভুত পার্সোনালিটি। আমার মনে হয়, এই জন্যেই···।

এই জন্যেই বোধহয় মিস তরুলতা সামন্ত বিয়ে করতে পারলেন না। রতন-বাবুর ধারণা, মেয়েদের মধ্যে এরকমের প্রখর ব্যক্তিত্বময় চেহারা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।—সত্যি কথা হরিদা, মিস সামন্তের চোখের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এরকম পার্সোনালিটির পুরুষ আই সি এস-দের মধ্যেই বা ক'জন পাওয়া যাবে ?

বুড়ো হরিসাধনবাবু অবশ্য দু'বার কেশেছিলেন, আর কুণ্ঠিত স্বরে একটা কথা বলেছিলেন—হতে পারে।

মিস তরুলতা সামন্ত ; ইনিই সেই পার্সোনালিটি যার কাছে রায়বাগানের যতো অনুরোধ আর আবেদনের ডেপুটেশন এসেছে আর হতাশ হয়ে ফিরে

গিয়েছে। সকলেই দেখতে পেয়েছেন, সমস্যার কথাটা শুনেই তরুলতার চোখে-মুখে যেন ঘেন্নায় ভরা একটা অস্বস্তির ভাব ছটফট করে উঠেছে। কিন্তু প্রতিকারের জন্য তিনি সামান্য একটু চেষ্টা করতেও রাজি হননি। পথের উপর মরা ইঁদুর পড়ে আছে দেখলে লোকের চোখের চাহনিটা যেমন ঘেন্না পেয়ে শিউরে ওঠে, নাক কুঁচকে যায়; অথচ একটা কাঠির খোঁচা দিয়ে ঘৃণার বস্তুটাকে সরিয়ে দিতেও ঘেন্না হয়। তরুলতার মনের ঘৃণাও প্রায় সেই রকমের একটা ঘৃণা।

কালী দত্তের রাক্ষুসে গুহাঘরের অন্ধকারে নারীবলির সেই চতুর্থ ঘটনার পর, তার মানে গীতার মৃত্যুর পর শুধু ঐ একটি প্রশ্ন ছাড়া রায়বাগানের প্রাণে আর কোন উদ্বেগ ছিল না—কালী দত্ত সত্যিই কি আবারও বিয়ে করবে?

দিন যায় মাস যায়। সাত আটটা মাস ফুরিয়েও যায়। রায়বাগানের দুশ্চিন্তা একটু একটু করে থিতিয়ে আসতেও থাকে। কিন্তু বৃথা স্বস্তি, রায়বাগানের কারও আর জানতে বাকি রইল না, এক মাসের ছুটি নিয়েছেন কালী দত্ত।

সত্যিই বৃথা স্বস্তি। একদিন বৃষ্টি থামতেই আকাশ জুড়ে একটা রামধনু ফুটে উঠেছিল। কিন্তু মাথার উপরে এত সুলক্ষণে একটা আকাশ থাকতেও রায়-বাগানের পক্ষে আর নিরাতঙ্ক হওয়া সম্ভব নয়। কালী দত্তের নতুন বউ এসেছে। সে বউ এখন ওই গুহাঘরের ভিতরেই আছে। দুর্ভাগ্যের বলি, সেই নারীর চেহারা এই পাড়ার মানুষের চোখে চকিত ছবির মতো একবার দেখাও দিয়েছে। কালী দত্তের বাড়ির একটা জানালা যেন বাতাসের হঠাৎ-আঘাতে একবার খুলে গিয়েছিল; তাই দেখতে পাওয়া গিয়েছে, রঙীন শাড়ি পরা একটি মূর্তি ঘরের ভিতরে ঘুর ঘুর করছে।

ঠিক সেইদিনই একটা চিঠি পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, শেষে কেঁদেই ফেললেন ভবানীর মাসি। রায়বেরিলি থেকে চিঠি লিখেছেন ভবানীর মাসির মাসতুতো দিদি—আমার তমালীর বিয়ে হয়েছে তোমাদেরই রায়বাগানের কালী দত্তের সঙ্গে; তমালীর খোঁজখবর একটু নিও।

বেশি দেরি করেননি ভবানীর মাসি। রায়বেরিলির সেই চিঠি হাতে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। একরকম ছুটে ছুটেই হেঁটে গেলেন। যিনি ইচ্ছা করলেই একটা প্রতিকার করতে পারেন, এ ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁরই কাছে এসে ফুঁপিয়ে উঠলেন ভবানীর মাসি—রক্ষে করুন দিদি। আমার তমালীর সর্বনাশ করেছেন আপনার অফিসের কালী দত্ত।

—কে? তমালী? কথাটা তরুলতা সামন্তের ওই শান্ত ঠোঁট দুটোকে যেন থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে বেজে উঠলো।

তরুলতার কাছে তমালী যে সত্যিই একটা চেনা নাম। তমালী মেয়েটার সেই চেহারাও যে স্পষ্ট মনে পড়ে। তরুলতার ছাত্রী সেই তমালী, কতবার রাগ করে আর শক্ত ভাষায় ধমক দিয়ে তমালীর হাসি থামিয়েছেন তরুলতা। ক্লাসের পড়ার মধ্যেই হেসে হেসে ছুটোপুটি করতো তমালী; কবিরাজ গোবিন্দবাবুর মেয়ে সেই তমালীকেই কি বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছে রাক্ষুসে পুরুষ ওই কালী দত্ত?

ভবানীর মাসি বলেন—হ্যাঁ, আমারই গোবিন্দ মেসোর মেয়ে তমালী।

তমালী মাত্র তিনটে মাস ওই রানী লীলাবতী কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসে পড়েছিল। তারপর আর আসেনি তমালী। তমালীর নাম কেটে দেবার অনেক দিন পরে জানতে পেরেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল তরুলতা, গোবিন্দ কবিরাজ এখন আর প্রতাপগড়ে নেই, কে জানে কোথায় চলে গিয়েছেন। প্রায় দশ বছর আগের কথা, তবু এখনও সবই মনে করতে পারেন তরুলতা। তমালীকে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না তরুলতার, কালো মেয়ের চেহারাও এত চমৎকার হয়। তমালীর ডানচোখের কোলের উপর মস্ত বড় একটা তিল ছিল। ওই তিল-টারই জন্যে কী ভয়ানক দুষ্টু আর চালাক দেখাতো মেয়েটাকে। হিসেব করলেই বুঝতে পারা যায়, সেই তমালীর বয়স আজ তিরিশের বেশি ছাড়া কম হবে না। কিন্তু দুষ্টুমি আর চালাকীর ওই তিল থেকেও কী লাভ হলো? তমালীর ভাগ্যটা যে একেবারে নিরেট আহম্মক হয়ে একটা জহ্লাদ পুরুষ-ব্যক্তিকের কুৎসিত ঘরে এসে ঢুকেছে।

ভবানীর মাসি বলেন—তমালী বাঁচবে না, দিদি, যদি একটা ব্যবস্থা···।

তরুলতা সামন্তের দুই চোখ শক্ত হয়ে যেন একটা কঠিন কল্পনার দিকে তাকিয়ে থাকে। বোধহয়, তরুলতাও বিশ্বাস করেছেন, ঠিকই বাঁচবে না তমালী, যদি না তমালীকে···।

তরুলতা বলেন—কিন্তু লোকটাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিলে আপনাদের তমালীর কি সুবিধে হবে? কালী দত্ত কি তমালীকে সঙ্গে নিয়েই আবার অন্য কোথাও একটা গুহাঘরে···।

ভবানীর মাসি—তাহলে আর তমালীর বাঁচা হবে কেমন করে? আপনি তমালীকে বাঁচান।

তরুলতা বলেন—একটু ভাবতে দিন। দেখি কি করতে পারি।

শুধু ভবানীর মাসি নয়; এতদিনে রায়বাগানের প্রাণ আশ্বস্ত হবার মতো একটা আশার ভাষা শুনতে পেল, স্বস্তিও পেল।

কিন্তু বৃথা স্বস্তি। দিনের পর দিন, আর মাসের পর মাস পার হয়ে গেল। তরুলতা সামন্ত তাঁর কলেজ করতে সেই কোন্ দূরের এক প্রতাপগড়ে চলেও গেলেন। তিনটি মাস পরে ফিরেও এলেন। কিন্তু তমালীর মুক্তি কোথায়? তরুলতা সামন্তের মতো মূর্তিমতী মেধা, ক্ষমতা আর পার্সোনালিটিও যেন ভেবে ভেবে শুধু হয়রাণ হয়ে যাচ্ছেন, কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না।

তবে কি তমালীও মরবে।

তিন

শিমূলের মাথা কদিন হলো আরও লাল হয়ে টুকটুক করছে। বাড়ির বাইরের বারান্দার চেয়ারে বসে আর হেসে হেসে যার সঙ্গে কথা বলছেন তরুলতা সামন্ত, তার হাসির শব্দে শিমূল গাছের কাকও চমকে গিয়ে উড়ে যাচ্ছে। খুড়তুতো ভাই বিকাশের সঙ্গে কথা বলছেন তরুলতা।—তুই টোকিও থেকে ফিরে এসেছিস, জানি। কিন্তু কোথায় আছিস এখন?

—মুঙ্গেরের টোবাকো ফ্যাক্টরীতে আছি।

—বিয়ে করবি?

—করবো বইকি? সবারই তো আর তোমার মতো একলা তপস্বিনী হয়ে থাকবার মতো মনের জোর···।

—চুপ কর। আমি যদি মেয়ে পছন্দ করে দিই, তবে অপছন্দ করবি না তো?

বিকাশ—কক্ষ্খনো না। কিন্তু সে'ও আমাকে পছন্দ করবে তো?

তরুলতা—নিশ্চয় পছন্দ করবে।

বিকাশ—বাস্, তবে আর কুছ-পরোয়া নেই। তুমি চেষ্টা কর।···আচ্ছা, আজ তবে আসি।

তরুলতা বলেন—আজই সন্ধ্যাবেলা একবার আসতে পারবি?

—পারবো। মুখভরা চুরুটের ধোঁয়া উগরে দিয়ে চলে যায় বিকাশ।

তরুলতা কিন্তু আর চুপ করে বসে থাকেন না।—গাড়ি বের কর, পরেশ! ব্যস্তস্বরে ডাক দিলেন তরুলতা। তরুলতার মনের গভীরে যেন একটা প্রতিজ্ঞা উতলা হয়ে উঠেছে। টানা টানা চোখের কালো তারা দুটোও হাসছে। এটাও নিশ্চয় একটা উতলা আশার হাসি।

ঠিক যখন বিকেলের রোদ লালচে হয়ে রায়বাগানের বাঁশের ঝাড়ের মাথার উপর এলিয়ে পড়েছে, তখন রায়বাগানের এপাড়ার সব ঘরের মানুষ হঠাৎ মোটর গাড়ির হর্নের শব্দ শুনে চমকে ওঠে। শব্দ তো নয়, যেন নিয়তির তূর্যনাদ। তরু-

লতা সামন্তের গাড়ি এসে গুহামানব কালী দত্তের বাড়ির সামনে থেমেছে।

গাড়ি থেকে নামলেন তরুলতা। সিল্কের শাড়ির দোলানো আঁচলটাকে টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিলেন। তরুলতার চশমার সোনার ফ্রেম যেন আগুনের রঙ নিয়ে জ্বলছে। কালী দত্তের বাড়ির সামনের দরজার কড়া নাড়লেন তরুলতা। কী অদ্ভুত শব্দ করে বেজে উঠলো কালী দত্তের বাড়ির ওই দরজার মরচেধরা কড়া।

পাড়ার ভদ্রলোকেরা নিজের নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে উস্‌উস্ করেন। মহিলারা জানালার গরাদের উপর মাথা রেখে আর চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন। এবার একটা হস্তেনেস্ত হয়েই যাবে।

—তমালী! ডাক দিলেন তরুলতা। সে ডাকও যেন নিয়তির আহ্বান। খুব মৃদু স্বরে কথা বলা যাঁর অভ্যাস, তাঁরই গলার স্বরে কী অদ্ভুত একটা আক্রোশের ঝঙ্কার! তরুলতার কানের হীরার ফুলও ঝিকঝিক করে যেন একটা জ্বালা ঠিকরে দিয়ে কাঁপছে। দেখে মনে হয়, ভয়ানক এক ঘৃণার জ্বালার ছুটো বিদ্যুতের ফুলাক ঝরে পড়ছে।

তরুলতার এক ডাকেই কালী দত্তের বাড়ির সেই বন্ধ দরজার কপাট খুলে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো যে মূর্তি, সেটা তমালীর মূর্তি নয়। বের হয়েছেন কালী দত্ত। নেমন্তন্ন-বাড়িতে ব্যস্ত কাজের মানুষের সাজ যে-রকমের হয়, কালী দত্তের সেই মূর্তির সাজও প্রায় সে-রকমের. গায়ে গেঞ্জি, ধুতিটা ছোট করে আর আঁট-সাট করে পরা, হাতে একটা তোয়ালে।

তরুলতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বললেন—আপনি সরে যান, আপনাকে ডাকিনি।

সেই মুহূর্তে সরে গেলেন কালী দত্ত: আবার ঘরের ভিতরেই চলে গেলেন। আর হঠাৎ-ঝড়ের বাতাসে কেষ্টচূড়ার রঙীন ফুলের গুচ্ছ যেমন ছিটকে এসে লুটিয়ে পড়ে, রঙীন সাজের এক তরুণী নারীর চেহারাও তেমনি ঘরের ভিতর থেকে যেন ছিটকে এসে তরুলতার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো। তরুলতার একটা হাত ধরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো তমালী—তরুদি! আপনি!

তরুদি—হ্যাঁ, আমি সেই তরুদি।

তমালীর প্রাণটাই যেন একটা বিস্ময় হয়ে ছটফট করছে। তরুলতার হাত ধরে টান দেয় তমালী—ভেতরে চলুন তরুদি।

—না। তুমি এখনই আমার সঙ্গে চল।

—কোথায় ?

—আমার বাড়িতে। চা খাবে।

—চলুন। বলতে গিয়ে তরুলতার গায়ের উপর আবার লুটিয়ে পড়তে চায় তমালী। তমালীর নির্বাসিত ভাগ্যটাই বোধহয় মুক্তির সুখে নরম হয়ে গলে পড়তে চাইছে।

—চল। গাড়িটার দিকে একবার তাকালেন তরুলতা; তারপর তমালীর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কিন্তু চলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তরুলতা। ঘরের ভিতরটার দিকে আর একবার তাকালেন।—ওখানে ওটা আবার কি ?

তমালী শুধু মাথা হেঁট করে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর তরুলতাও কোন প্রশ্ন না করে আস্তে আস্তে, এক-পা দু-পা করে এগিয়ে, কী আশ্চর্য, কালী দত্তের সেই ভয়ানক গুহাঘরের ভিতরেই ঢুকলেন।

ঘরের ভিতরের দেয়ালে টানানো একটা ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তরুলতা। তমালীরই ছবি। খোঁপাতে সাদা ফুলের মালা জড়ানো, তমালীর চেহারার একটা অয়েল পেন্টিং।

তরুলতা ডাকেন—কোথায় গেলেন, আপনি ? কী যেন আপনার নাম !

—আজ্ঞে। সাড়া দিয়ে ভিতরের বারান্দার দিক থেকে এগিয়ে এসে ঘরের ভিতরে দাঁড়ালেন কালী দত্ত।

তরুলতা—এ ছবি কোথায় পেলেন আপনি ?

কালী দত্ত হাসেন—তমালী ওর একটা ফটো দিয়েছিল, সেটাকে কলকাতাতে পাঠিয়ে এই ছবি করিয়ে আনা হয়েছে।

কালী দত্তের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়েই ঘরের চারিদিকের চেহারার দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকেন তরুলতা।

টেবিলের উপর এক গাদা গল্পের বই। তরুলতার চোখের শক্ত ভ্রুকুটি যেন আরও বিরক্ত হয়ে কুঁচকে যায়।—আপনি আবার বই-টই…।

—আজ্ঞে না, আমি না। এগুলো তমালীরই শখ।

তরুলতা—তমালীর বাবার নামটা যেন কী ?…হ্যাঁ, গোবিন্দ কবিরাজ। তিনি এখন কোথায় ?

—তিনি নেই। তমালীর মা অবিশ্যি বেঁচে আছেন। কিন্তু টি-বিতে ভুগছেন। কাজেই…।

তরুলতার কানের ফুলের হীরা ঝিকঝিক করে জলে ওঠে।—কাজেই মানে কি? কি বলতে চান আপনি।

—কাজেই তমালীর শখের বই-টই ছবি-টবি সবই তো এখন আমি ছাড়া আর কেউ…

তরুলতার চোখ দুটি এইবার সত্যিই জলতে থাকে।—আপনার এ ঘরের দেয়ালে তো আরও চারটে মেয়ের ছবি থাকবার কথা।

—ছিল। সে-সব ছবিকে বাক্সে তুলে রাখতে হয়েছে। আপনিও নিশ্চয় শুনেছেন, আমার ভাগ্যটা যে অদ্ভুত একটা…।

তরুলতা—কি বললেন?

—একটা সাংঘাতিক পরীক্ষা!

তরুলতা—তার মানে?

—সবাই এক-এক করে চলে যাবে, অথচ যাবার আগে দিব্যি দিয়ে বলে যাবে, একা থেকো না।

তরুলতা—কিন্তু চলে যায় কেন?

—আপনিই বলুন, কেন চলে যায়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।

তরুলতা—কিন্তু আপনি কেন একলা থাকতে চান না?

—একলা থাকতে পারি না।

তরুলতার গলার স্বর যেন দুঃসহ একটা ঘৃণার জালায় পুড়ে পুড়ে কাঁপতে থাকে।—কেন পারেন না?

কালী দত্তেরও গলার এতক্ষণের মৃদু মিনমিনে আওয়াজ যেন ছোট্ট একটা বিস্ফোরণের মতো গুমরে ওঠে।—একলা থাকতে ভাল লাগে না, তাই একলা থাকতে পারি না।

তরুলতা—খুব কুৎসিত আর ভয়ানক আপনার বাতিক।

—সেজন্যে তো আপনার কিংবা আর কারও কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

তরুলতা—কিন্তু চার-চারটে মেয়েকে মরতে হয়েছে।

—কিন্তু সেজন্য তো আপনাকে কিংবা আর কাউকে কাঁদতে হয়নি।

তরুলতা—আপনি কেঁদেছিলেন?

কালী দত্ত এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন।—আপনি…আপনি সত্যিই ভয়ানক অদ্ভুত কথা বলছেন।

—আপনি তো আমাদের মেটাল কারখানার স্টোরে কাজ করেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওরকম চেঁচিয়ে হাসবেন না।

কালী দত্ত কিন্তু হাসতেই থাকেন, আরও উচ্চকিত হাসি—আপনি বরং তমালীর সঙ্গে কথা বলুন।

ঠিকই, শুধু তমালীর সঙ্গেই কথা বলা উচিত ছিল। কালী দত্ত নামে এই অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে একটা কথাও বলা উচিত হয়নি। তরুলতার চোখের ভ্রূকুটি হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়।

কিন্তু না, তমালীর সঙ্গেও এখানে দাঁড়িয়ে কোন কথা বলবার দরকার নেই। তমালীকে এই অভিশাপের ঘর থেকে সরিয়ে একটা মুক্তির আঙিনাতে নিয়ে গিয়ে নতুন আলোর মুখ দেখিয়ে দিতে হবে। বিকেল তো প্রায় শেষ হতেই চলেছে। বিকাশ বোধহয় এতক্ষণে এসেই গিয়েছে, ড্রইংরুমে বসে আছে।

কিন্তু তমালীকে যে সত্যিই একটি তাজা রঙীন অয়েল পেন্টিং ছবির মতো দেখাচ্ছে। এই গুহাঘরের ভিতরে বন্ধ হয়ে পড়ে থেকেও কেমন করে ওরকম একটা ফুল্লতার ছবি হয়ে উঠলো তমালী? তমালী কি হাঁড়ি ঠেলে না? উনানের আঁচের ধারে-কাছেও যায় না? সামান্য কাজটাজও করে কি? না, সব সময় ও রকম সাজেশ্বরী হয়ে শুধু বসে থাকে?

চোখে পড়েছে তরুলতার, ঘরের ভিতরে একটা টেবিলের উপর চাদর পেতে তার উপর রেশমী সুতোর লেসের একটা ব্লাউজকে কে-যেন খুব যত্ন করে আর্ধেক ইস্তিরী করে রেখে দিয়েছে। ওদিকে মেজের উপরে জুতোর কালি আর একটা ব্রাশ পড়ে রয়েছে। দু'পাটি জুতোর শুধু একটা পাটিকে পালিশ করা হয়েছে, আর এক পাটির পালিশ বাকী। কিন্তু সত্যিই যে দু'পাটি মেয়েলী জুতো। বিছানার কাছে একটা কাঠের টুলের উপর একটা গেলাস, সরবতের গেলাস। সরবতের অর্ধেকটা খাওয়া হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কে খাচ্ছিল এই সরবত?

জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা ছিল না, তবু কথাটা যেন তরুলতার এই রুক্ষ গম্ভীর দাঁতচাপা মুখের ভিতর থেকে নিজের জোরেই ছুটে বের হয়ে এল।—কে খাচ্ছিল এই সরবত?

—আমি নয়। হাসতে থাকেন কালী দত্ত।

তরুলতা—আপনার তো ঝি-চাকর নেই, কিন্তু এই সব কাজ, এত নানা-রকমের কাজ কে করে?

—আমিই করি।

তরুলতা—তমালী করে না?

—করতে চায়, কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বলি, কী দরকার; যতদিন বেঁচে আছ ততদিন একটু আয়েস করে নাও। কোন ঠিক তো নেই, হঠাৎ করে এক-দিন এই খাঁচা ছেড়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে যাবে।

হেসে ফেলেন তরুলতা।—শুনে তমালী কী বলে?

—সবাই যা বলেছে, তমালীও তাই বলে, ওই একই কথা।

তরুলতা—কি কথা?

—বলে, তাই তো চাই। তার চেয়ে সুখের মরণ আর কি হতে পারে?

তরুলতা হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে কি-যেন ভাবতে থাকেন। তারপর, তাঁর মৃদু গলার স্বর আরও মৃদু হয়ে, যেন চাপা ভয়ের ভাষার মতো বিড়বিড় করে—কিন্তু তমালীকে আপনি বাইরে যেতে দেন না কেন? সব সময় একটা কয়েদীর মতো ওকে ঘরের ভিতরে আটক করে রাখা, এটা কি · ।

বাধা দিয়ে হেসে ওঠেন কালী দত্ত—ছি-ছি, আমি আটক করে রাখবো কেন? এই তো, আপনার সঙ্গে এখনই বাইরে যাচ্ছে তমালী, আমি কি কোন আপত্তি করেছি? তমালী নিজেই বাইরে যেতে চায় না।

তরুলতা—কেন?

—বাইরে বের হলেই তো ওই একই কথা, আমার নামে যত ভয়ানক নিন্দের কথা শুনতে হবে। কিন্তু আসল সত্যি কথাটা কি জানেন?

তরুলতা—কি?

—বাইরের মেলামেশা ডাকাডাকি আর নেমন্তন্নকে দূর্‌ছাই করতেই ভাল-বাসে তমালী। বলে, ঘরেই সবকিছু থাকতে বাইরে যাব কেন? আপনিই বলুন, এটা একটু বেশি অহংকারের কথা নয় কি?···কিন্তু আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। একটা চেয়ারকে টেনে নিয়ে তরুলতার কাছে এগিয়ে দিলেন কালী দত্ত।

চেয়ারে বসেন তরুলতা। সত্যি, ঘরের ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা। ফাল্গুন মাসের বিকালে রায়বাগানের কোন পাখাওয়ালা ঘরের ভিতরটা বোধহয় এত স্নিগ্ধ হয় না।

কালী দত্ত বলেন—বসলেনই যখন, তখন একটু চা খেয়ে যান।

রুমাল দিয়ে কপালের একটা ঘামের ফোঁটা মুছে নিয়ে কালী দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন তরুলতা। তরুলতার গলার স্বর আরও মৃদু হতে গিয়ে একেবারে নিবিড় হয়ে যায়।—না না, আপনি এরকম অনুরোধ করে আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

বিপদ? কিসের বিপদ? তরুলতা কি ঘুমের ঘোরে কোন স্বপ্নের সঙ্গে কথা বলছেন? নইলে একথার যে কোন মানেই হয় না।

কোন মানে হয় না, এমন একটা কথার কি মানে বুঝলেন কালী দত্ত, তা তিনিই জানেন। চা তৈরী করতেই ভিতরের বারান্দার দিকে চলে গেলেন কালী দত্ত।

তরুলতা সামন্ত বোধহয় একটু ক্লান্ত হয়েছেন! তাই এই ঘরের ঠাণ্ডার মধ্যে গভীর এক স্বস্তির স্বাদ পেয়েছেন। তা না হলে চোখ দুটো বন্ধ করে এই চেয়ারের উপর ওভাবে একেবারে নীরব হয়ে বসে থাকবেন কেন?

তবু নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছেন তরুলতা, ভিতরের বারান্দার দিক থেকে কাপ-ডিশ আর চামচের ঠুং ঠাং শব্দ ভেসে আসছে। তরুলতা সামন্তের তেষ্টার প্রাণ একটা সান্ত্বনার শব্দ শুনছে।

চোখ মেলে দরজার বাইরের দিকে তাকালেন তরুলতা। ওঃ, তমালী বেচারা যে অনেকক্ষণ ধরে ওখানে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তমালীকে বলে দিলেই তো হয়, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেক না তমালী, তুমি বরং আর দেরি না করে এখনই আমার বাড়িতে চলে যাও; আমি আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকি।

—কালীবাবু! শুনছেন? হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর প্রায় একটা চাপা চিৎকারের মতো শব্দ করে ডাক দিলেন তরুলতা।

কালী দত্ত আসতেই হাসতে চেষ্টা করেন তরুলতা—না কালীবাবু, প্লীজ, আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমি চা খাব না।

ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন তরুলতা। আর, তমালীর কাছে এসে একটা হাত ধরে তমালীকে ঘরের ভিতরে যেন ঠেলেই দিলেন।—তোমার আর বাইরে থেকে কাজ নেই তমালী। তুমি ঘরেই থাক।

রায়বাগানের পাড়ার মানুষ শুধু আশ্চর্য হয়ে আর হতাশ হয়ে দেখতে থাকে, তমালী সেই গুহাঘরের ভিতরেই ঢুকে পড়লো, আর তরুলতা সামন্তকে নিয়ে সেই মস্ত গাড়িটা ছুটে চলে গেল। হর্নের শব্দ নেই, শুধু ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে গাড়িটা।

কি হলো, কিছুই বোঝা গেল না। শুধু জানতে পারা গেল, সন্ধ্যা হবার আগেই তরুলতা সামন্ত ট্রেন ধরবার জন্যে দমদম চলে গিয়েছেন। ছুটি এখনও ফুরোয়নি, প্রতাপগড়ের মেয়ে-কলেজ এখনও খোলেনি, তবু চলে গেলেন? কী আশ্চর্য, কিছুই যে বোঝা যায় না।

হরিদার কাছে আমরাই গল্প করে বললাম, শুনেছেন হরিদা, কী কাণ্ড হয়েছে ?

উনানের মুখে ফুঁ দিয়ে আর অনেক ধোঁয়া উড়িয়ে নিয়ে হরিদা এইবার আমাদের কথার জবাব দিলেন—না, কিছুই শুনিনি।

—জগদীশবাবু যে কী কাণ্ড করেছেন, শোননি হরিদা ?

হরিদা—না রে ভাই, বড় মানুষের কাণ্ডের খবর আমি কেমন করে শুনবো ? আমাকে বলবেই বা কে ?

—সাতদিন হল এক সন্ন্যাসী এসে জগদীশবাবুর বাড়িতে ছিলেন। খুব উঁচু দরের সন্ন্যাসী। হিমালয়ের গুহাতে থাকেন। সারা বছরে শুধু একটি হরীতকি খান ; এ ছাড়া আর কিছুই খান না। সন্ন্যাসীর বয়সও হাজার বছরের বেশি বলে অনেকেই মনে করেন।

হরিদা—সন্ন্যাসী কি এখনও আছেন ?

—না, চলে গিয়েছেন।

আক্ষেপ করেন হরিদা—থাকলে একবার গিয়ে পায়ের ধুলো নিতাম।

—তা পেতে না হরিদা ! সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস। শুধু ওই একা জগদীশবাবু ছাড়া আর কাউকে পায়ের ধুলো নিতে দেননি সন্ন্যাসী।

হরিদা—কেন ?

—জগদীশবাবু একজোড়া কাঠের খড়মে সোনার বোল লাগিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে ধরলেন। তখন বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসী পা এগিয়ে দিলেন, নতুন খড়ম পরলেন আর সেই ফাঁকে জগদীশবাবুও সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো নিয়েছিলেন।

হরিদা—বাঃ, এ তো বেশ মজার ব্যাপার !

—হ্যাঁ, তা ছাড়া সন্ন্যাসীকে বিদায় দেবার সময় জগদীশবাবু একশো টাকার একটা নোট জোর করে সন্ন্যাসীর ঝোলার ভেতরে ফেলে দিলেন। সন্ন্যাসী হাসলেন আর চলে গেলেন।

গল্প শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন হরিদা। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমরা কী বলছি বা না বলছি, সেদিকে হরিদার যেন কান নেই।

হরিদার উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে। আমাদের চায়ের জন্য এক হাঁড়ি ফুটন্ত জল নামিয়ে দিয়েই হরিদা তাঁর ভাতের হাঁড়িটাকে উনানে চড়ালেন।

সহরের সবচেয়ে সরু এই গলিটার ভিতরে এই ছোট্ট ঘরটাই হরিদার জীবনের ঘর ; আর আমাদের চারজনের সকাল-সন্ধ্যার আড্ডার ঘর। চা চিনি আর দুধ আমরাই নিয়ে আসি। হরিদা শুধু তাঁর উনানের আগুনের আঁচে জল ফুটিয়ে দেন।

খুবই গরীব মানুষ হরিদা। কিন্তু কাজ করতে হরিদার প্রাণের মধ্যেই যেন একটা বাধা আছে। ইচ্ছে করলে কোন অফিসের কাজ, কিংবা কোন দোকানের বিক্রী-ওয়ালার কাজ পেয়ে যেতে পারেন হরিদা ; কিন্তু ওধরনের কাজ হরিদার জীবনের পছন্দই নয়। একেবারে ঘড়ির কাঁটার সামনে সময় বেঁধে দিয়ে আর নিয়ম করে নিয়ে রোজই একটা চাকরির কাজ করে যাওয়া হরিদার পক্ষে সম্ভব নয়। হরিদার উনানের হাঁড়িতে অনেক সময় শুধু জল ফোটে ভাত ফোটে না। এই একঘেয়ে অভাবটাকে সহ্য করতে হরিদার আপত্তি নেই, কিন্তু একঘেয়ে কাজ করতে ভয়ানক আপত্তি।

হরিদার জীবনে সত্যিই একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে। আর, সেটাই যে হরিদার জীবনের পেশা। হরিদা মাঝে-মাঝে বহুরূপী সেজে যেটুকু রোজগার করেন, তাতেই তাঁর ভাতের হাঁড়ির দাবি মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে সত্যিই উপোষ করেন হরিদা। তারপর একদিন হঠাৎ আবার এক সকালে কিংবা সন্ধ্যায় বিচিত্র ছদ্মবেশে অপরূপ হয়ে পথে বের হয়ে পড়েন। কেউ চিনতে পারে না। যারা চিনতে পারে এক-আনা দু-আনা বকসিস দেয়। যারা চিনতে পারে না, তারা হয় কিছুই দেয় না, কিংবা বিরক্ত হয়ে দুটো-একটা পয়সা দিয়ে দেয়।

একদিন চকের বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে ঠিক দুপুরবেলাতে একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল। একটা উন্মাদ পাগল ; তার মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ছে, চোখ দুটো কটকটে লাল। তার কোমরে একটা ছেঁড়া কম্বল জড়ানো, গলায় টিনের কৌটার একটা মালা। পাগলটা মস্তবড় একটা থান ইট হাতে তুলে নিয়ে বাসের উপরে বসা যাত্রীদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠছে যাত্রীরা দুটো একটা পয়সা ফেলেও দিচ্ছে।

একটু পরেই বাসের ড্রাইভার কাশীনাথ ধমক দেয়।—খুব হয়েছে হরি, এই বার সরে পড়। অন্যদিকে যাও।

অ্যাঁ? ওটা কি একটা বহুরূপী? বাসের যাত্রীরা কেউ হাসে, কেউ বা বেশ বিরক্ত হয় ; কেউ আবার বেশ বিস্মিত। সত্যিই, খুব চমৎকার পাগল সাজতে পেরেছে তো লোকটা।

হরিদার জীবন এইরকম বহু রূপের খেলা দেখিয়েই একরকম চলে যাচ্ছে।

এই সহরের জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ঘটনা সৃষ্টি করেন বহুরূপী হরিদা। সন্ধ্যার আলো সবেমাত্র জ্বলেছে, দোকানে দোকানে লোকজনের ব্যস্ততা আর মুখরতাও জমে উঠেছে। হঠাৎ পথের উপর দিয়ে ঘুঙুরের মিষ্টি শব্দ রুমঝুম করে বেজে-বেজে চলে যেতে থাকে। এক রূপসী বাইজী প্রায় নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। সহরে যারা নতুন এসেছে, তারা দুই চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু দোকানদার হেসে ফেলে—হরির কাণ্ড!

অ্যাঁ? এটা একটা বহুরূপী নাকি? কারও কারও মুগ্ধ চোখের মোহভঙ্গ হয় আর, যেন বেশ একটু হতাশস্বরে প্রশ্ন করে ওঠে।

বাইজীর ছদ্মবেশে সেদিন হরিদার রোজগার মন্দ হয়নি। মোট আট টাকা দশ আনা পেয়েছিলেন। আমরাও দেখেছিলাম, এক-একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই রূপসী বাইজী, মুচকি হেসে আর চোখ টিপে একটা ফুল-সাজি এগিয়ে দিচ্ছে। দোকানদারও হেসে ফেলে আর একটা সিকি তুলে নিয়ে বাইজীর হাতের ফুলসাজির উপর ফেলে দেয়।

কোনদিন পাগল, কোনদিন কাপালিক। কখনও বোঁচকা কাঁধে বুড়ো কাবুলীওয়ালা, কখনও হ্যাট-কোট-পেন্টলুন-পরা ফিরিঙ্গী কেরামিন সাহেব। একবার পুলিশ সেজে দয়ালবাবুর লিচু বাগানের ভিতরে দাঁড়িয়েছিলেন হরিদা; স্কুলের চারটে ছেলেকে ধরেছিলেন। ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল ছেলেগুলো; আর স্কুলের মাস্টার এসে সেই নকল পুলিশের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন—এবারের মতো মাপ করে দিন ওদের। কিন্তু আটআনা ঘুষ নিয়ে তারপর মাস্টারের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন সেই নকল-পুলিশ হরিদা।

পরদিন অবশ্য স্কুলের মাস্টার মশাইয়ের জানতে বাকি থাকেনি, কাকে তিনি আটআনা ঘুষ দিয়েছেন। কিন্তু মাস্টারমশাই একটুও রাগ করেননি। বরং একটু তারিফই করলেন—বা, সত্যি, খুব চমৎকার পুলিশ সেজেছিল হরি!

আজ এখন কিন্তু আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, হরিদা এত গম্ভীর হয়ে কী ভাবছেন। সন্ন্যাসীর গল্পটা শুনে কী হরিদার মাথার মধ্যে নতুন কোন মতলব ছটফট করে উঠেছে?

ঠিকই, আমাদের সন্দেহ মিথ্যে নয়। হরিদা বললেন—আজ তোমাদের একটা জবর খেলা দেখাবো।

—আমাদের দেখিয়ে আপনার লাভ কি হরিদা? আমাদের কাছ থেকে একটা সিগারেটের চেয়ে বেশি কিছু তো পাবেন না।

হরিদা—না, ঠিক তোমাদের দেখাবো না। আমি বলছি তোমরা সেখানে

থেকো। তাহলে দেখতে পারে…।

—কোথায় ?

হরিদা—আজ সন্ধ্যায় জগদীশবাবুর বাড়িতে।

—হঠাৎ জগদীশবাবুর বাড়িতে খেলা দেখাবার জন্যে আপনার এত উৎসাহ জেগে উঠলো কেন ?

হরিদা হাসেন—মোটা মতন কিছু আদায় করে নেব। বুঝতেই তো পারছো, পুরো দিনটা রূপ ধরে ঘুরে বেড়িয়েও দু-তিন টাকার বেশি হয় না। একবার বাইজী সেজে অবিশ্যি কিছু বেশি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ওতেই বা কি হবে ?

ঠিকই বলেছেন হরিদা। সপ্তাহে বড়জোর একটা দিন বহুরূপী সেজে পথে বের হন হরিদা। কিন্তু তাতে সাতদিনের পেট চলবার মতো রোজগার হয় না।

হরিদা বলেন—নাঃ, এবার আর কাঙালের মতো হাত পেতে বকসিস নেওয়া নয়। এবার মারি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার। একবারেই যা ঝোলে নেব তাতে আমায় সারা বছর চলে যাবে।

কিন্তু সে কী করে সম্ভব ? জগদীশবাবু ধনী মানুষ বটেন, কিন্তু বেশ কৃপণ মানুষ। হরিদাকে একটা যোগী সন্ন্যাসী কিংবা বৈরাগী সাজতে দেখে কত আর খুশি হবেন জগদীশবাবু ? আর খুশি হলেই বা কত আনা বকসিস দেবেন ? পাচ আনার বেশি তো নয়।

হরিদা বলেন—তোমরা যদি দেখতে চাও, তবে আজ ঠিক সন্ধ্যাতে জগদীশবাবুর বাড়িতে থেকো।

আমরা বললাম—থাকবো, আমাদের স্পোর্টের চাঁদা নেবার জন্যে আজ ঠিক সন্ধ্যাতেই জগদীশবাবুর কাছে যাব !

দুই

বড় চমৎকার আজকের এই সন্ধ্যার চেহারা। আমাদের সহরের গায়ে কতদিন তো চাঁদের আলো পড়েছে, কিন্তু কোনদিন তো আজকের মতো এমন একটা স্নিগ্ধ ও শান্ত উজ্জ্বলতা কখনও চারদিকে এমন সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেনি।

ফুরফুর করে বাতাস বইছে। জগদীশবাবুর বাড়ির বাগানের সব গাছের পাতাও ঝিরিঝিরি শব্দ করে কী যেন বলতে চাইছে। জগদীশবাবুর বাড়ির বারান্দাতে মস্ত বড় একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোর কাছে একটা চেয়ারের উপর বসে আছেন জগদীশবাবু। সাদা মাথা, সাদা দাড়ি, সৌম্য শান্ত ও জ্ঞানী মানুষ জগদীশবাবু। আমরা আমাদের স্পোর্টের চাঁদার খাতাটিকে জগদীশবাবুর

হাতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

চমকে উঠলেন জগদীশবাবু। বারান্দার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে জগদীশবাবুর দুই বিস্মিত চোখ অপলক হয়ে গেল।

আমরাও চমকে উঠেছি বইকি। আশ্চর্য হয়েছি, একটু ভয়ও পেয়েছি। কারণ, সত্যিই যে বিশ্বাস করতে পারছি না, সিঁড়ির কাছে এসে যে দাঁড়িয়েছে, সে কি সত্যিই হরিদা? ও চেহারা কি সত্যিই কোন বহুরূপীর হতে পারে?

জটাজুটধারী কোন সন্ন্যাসী নয়। হাতে কমণ্ডলু নেই, চিমটে নেই। মৃগচর্মের আসনও সঙ্গে নেই। গৈরিক সাজও নেই।

আদুড় গা, তার উপর একটি ধবধবে সাদা উত্তরীয়। পরনে ছোট বহরের একটি সাদা থান।

মাথায় ফুরফুর করে উড়ছে শুকনো সাদা চুল। ধুলো মাখা পা, হাতে একটা ঝোলা, সে ঝোলার ভিতরে শুধু একটা বই, গীতা। গীতা বের করে কি-যেন দেখলেন এই আগন্তুক। তারপর নিজের মনেই হাসলেন।

আগন্তুক এই মানুষটি যেন এই জগতের সীমার ওপার থেকে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছেন। শীর্ণ শরীরটাকে প্রায় অশরীরী একটা চেহারা বলে মনে হয়। কী অদ্ভুত উদাত্ত শান্ত ও উজ্জ্বল একটা দৃষ্টি এই আগন্তুকের চোখ থেকে ঝরে পড়ছে!

উঠে দাঁড়ালেন জগদীশবাবু—আসুন।

আগন্তুক হাসেন—আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়?

জগদীশবাবু কিছু ভেবে বলেন—কেন? কেন? আপনি একথা কেন বলছেন মহারাজ?

আমি মহারাজ নই, আমি এই সৃষ্টির মধ্যে এককণা ধূলি।—কিন্তু আপনি বোধহয় এগার লক্ষ টাকার সম্পত্তির অহংকারে নিজেকে ভগবানের চেয়েও বড় বলে মনে করেন। তাই ওখানেই দাড়িয়ে আছেন, নেমে আসতে পারছেন না।

সেই মুহূর্তে সিঁড়ি ধরে নেমে যান জগদীশবাবু।—আমার অপরাধ হয়েছে। আপনি রাগ করবেন না।

আগন্তুক আবার হাসেন—আমি বিরাগী, রাগ নামে কোন রিপু আমার নেই। ছিল একদিন, সেটা পূর্ব-জন্মের কথা।

জগদীশবাবু—বলুন, এখন আপনাকে কিভাবে সেবা করবো?

বিরাগী বলেন—ঠাণ্ডা জল চাই, আর কিছু চাই না।

ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়ে হাঁপ ছাড়েন বিরাগী। এদিকে ভবতোষ আমার কানের কাছে ফিসফিস করে।—না না, হরিদা নয়। হতেই পারে না। অসম্ভব! হরিদার

গলার স্বর এ রকমেরই নয়।

বিরাগী বলেন—পরম সুখ কাকে বলে জানেন? সব সুখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া!

ভবতোষের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে অনাদি বলে—শুনছো তো? এসব ভাষা কি হরিদার মুখের ভাষা হতে পারে?

জগদীশবাবু ততক্ষণে সিঁড়ির উপরে বসে পড়েছেন। বোধহয় বিরাগীর পা স্পর্শ করবার জন্যে তাঁর হাত দুটো ছটফট করতে শুরু করেছে। জগদীশবাবু বলেন—আমার এখানে কয়েকটা দিন থাকুন বিরাগীজী। আপনার কাছে এটা আমার প্রাণের অনুরোধ। দুই হাত জোড় করে বিরাগীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জগদীশবাবু।

বিরাগী হাসেন—বাইরে খোলা আকাশ থাকতে আর ধরিত্রীর মাটিতে স্থান থাকতে, আমি এক বিষয়ীর দালান বাড়ির ঘরে থাকবো কেন, বলতে পারেন?

—বিরাগীজী! জগদীশবাবুর গলার স্বরের আবেদন করুণ হয়ে ছলছল করে।

বিরাগী—না, আপনার এখানে জল খেয়েছি, এই যথেষ্ট। পরমাত্মা আপনার কল্যাণ করুন। কিন্তু আপনার এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জগদীশবাবু—তবে অন্তত একটু কিছু আজ্ঞা করুন, যদি আপনাকে কোন···।

বিরাগী—না না, আমি যার কাছে পড়ে আছি, তিনি আপনার চেয়ে কিছু কম নয়। কাজেই আপনার কাছে আমার তো কিছু চাইবার দরকার হয় না।

জগদীশবাবু—তবে কিছু উপদেশ শুনিয়ে যান বিরাগীজী, নইলে আমি শান্তি পাবো না।

বিরাগী—ধন জন যৌবন কিছুই নয় জগদীশবাবু। ওসব হলো সুন্দর সুন্দর এক-একটি বঞ্চনা। মন-প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শুধু সেই একজনের আপন হতে চেষ্টা করুন, যাঁকে পেলে এই সৃষ্টির সব ঐশ্বর্য পাওয়া হয়ে যায়।·· আচ্ছা আমি চলি।

জগদীশবাবু বলেন—আপনি একটা মিনিট থাকুন বিরাগীজী।

সিঁড়ির উপরে অচঞ্চল হয়ে একটা মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন বিরাগী। আজকের চাঁদের আলোর চেয়েও স্নিগ্ধ হয়ে অদ্ভুত এক জ্যোৎস্না যেন বিরাগীর চোখ থেকে ঝরে পড়ছে। ভবতোষ ফিসফিস করে—না না, ওই চোখ কী হরিদার চোখ হতে পারে? অসম্ভব!

জগদীশবাবুর হাতে একটা থলি। থলির ভিতরে নোটের তাড়া। বিরাগীর পায়ের কাছে থলিটাকে রেখে দিয়ে ব্যাকুল স্বরে প্রার্থনা করেন জগদীশবাবু—

এই প্রণামী, এই সামান্য একশো এক টাকা গ্রহণ করে আমাকে শান্তি দান করুন বিরাগীজী। আপনার তীর্থ ভ্রমণের জন্য এই টাকা আমি দিলাম।

বিরাগী হাসেন—আমার বুকের ভিতরেই যে সব তীর্থ। ভ্রমণ করে দেখবার তো কোন দরকার হয় না।

জগদীশবাবু—আমার অনুরোধ বিরাগীজী…।

বিরাগী বলেন—আমি যেমন অনায়াসে ধুলো মাড়িয়ে চলে যেতে পারি, তেমনই অনায়াসে সোনাও মাড়িয়ে চলে যেতে পারি।

বলতে বলতে সিঁড়ি থেকে নেমে গেলেন বিরাগী। একশো এক টাকার থলিটা সিঁড়ির উপরেই পড়ে রইল। সেদিকে ভুলেও একবার তাকালেন না বিরাগী।

তিন

—কি করছেন হরিদা? কি হলো? কই? আজ যে বলেছিলেন জবর খেলা দেখাবেন, সে-কথা কি ভুলেই গেলেন। আজকের সন্ধ্যাটা ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলেন কেন?

বলতে বলতে আমরা সবাই হরিদার ঘরের ভিতরে ঢুকলাম।

হরিদার উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে। উনানের উপর হাঁড়িতে চাল ফুটছে। আর, একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হরিদা চুপ করে বসে আছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই লজ্জিতভাবে হাসলেন।

—কি আশ্চর্য! চমকে ওঠে ভবতোষ।—হরিদা, আপনি তাহলে সত্যিই বের হয়েছিলেন। আপনিই বিরাগী?

হরিদা হাসেন—হ্যাঁ রে ভাই।

ওই তো সেই সাদা উত্তরীয়টা পড়ে রয়েছে মাদুরের উপর, আর সেই ঝোলাটা আর সেই গীতা।

অনাদি বলে—এটা কি কাণ্ড করলেন, হরিদা? জগদীশবাবু তো পাঁচশো টাকা সাধলেন, অথচ আপনি একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর মতো সব তুচ্ছ করে সরে পড়লেন?

হরিদা—কি করবো বল? ইচ্ছেই হলো না। শত হোক…।

ভবতোষ—কি?

হরিদা—শত হোক্, একজন বিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে টাকা-ফাকা কি করে স্পর্শ করি বল? তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়।

কী অদ্ভুত কথা বললেন হরিদা! হরিদার একথার সঙ্গে তর্ক চলে না। আর,

বুঝতে অসুবিধে নেই, হরিদার জীবনের ভাতের হাঁড়ি মাঝে মাঝে শুধু জল ফুটিয়েই সারা হবে। অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।

অনাদি বলে—কিন্তু আপনি কি জগদীশবাবুর কাছে গিয়ে আর কখনও⋯।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন হরিদা—যাবই তো। না যেয়ে উপায় কি? গিয়ে অন্তত বকসিসটা তো দাবি করতে হবে?

—বকসিস? চেঁচিয়ে ওঠে ভবতোষ। সেটা তো বড়জোর আট আনা কিংবা দশ আনা।

হরিদা বিড়ি মুখে দিয়ে লজ্জিতভাবে হাসেন—কি আর করা যাবে বল? খাঁটি মানুষ তো নয়, এই বহুরূপীর জীবন এর চেয়ে বেশি কি আশা করতে পারে?

উচলে চড়িনু

তেঁতুলিয়া মাঠের ঘাসের রঙ বার মাস সবুজ। অনেক দিন আগে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে বাইরে আসতেই দিনেশ বড় সুন্দর একটা দৃশ্য দেখেছিল। তেঁতুলিয়া মাঠে লাল কৃষ্ণচূড়ার ভাঙা ভাঙা ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল কোথা থেকে। আজ আবার ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে—তেঁতুলিয়া মাঠের সবুজে হঠাৎ কোন উত্তুরে হাওয়ায় রক্তিম তুষারের ফুল কতকগুলি এসে ছড়িয়ে পড়েছে। একদল ইরানী বেঁদের মেয়ে—মাঠের এককোণে পড়েছে তাদের তাঁবু।

পরণে খাট খাট লাল ঘাগরা, হাঁটবার সময় কেঁপে দুলতে থাকে। মনে হয় ওটা বুঝি ওদের গায়ের পালক। নিটোল খালি পা—গোলাপী মোমের প্রলেপ দেওয়া। রুক্ষ বেণীগুলি কোমর পর্যন্ত ঝোলে। গায়ে বেগুনী রঙের জামা, চুড়িদার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত। মাথায় কপাল চেপে রুমালের ফেট তার নীচে লালচে মুখ, টিকালো নাক আর তার দুপাশে জোড়া জোড়া চোখ যেন কাস্পিয়ান নীলিমায় টলমল।

মাঠের অন্যদিকে হল্লা আর হররা চলেছে খুব। বেদিয়া যুবকেরা ছোট ছোট জুয়ার বৈঠক বসিয়েছে। বাজারের বহু উৎসাহী জুয়াড়ী সেই ব্রাহ্মমুহূর্তেই এসে ভীড় করেছে গন্ধে গন্ধে—ভাগ্যের সঙ্গে প্যাঁচ কসে নিচ্ছে এক হাত। অথবা রাত্রেই শুরু হয়েছিল—হারজিতের টানাপোড়েনে মাৎ করে আর মার খেয়ে দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দত্ত কোম্পানীর আফিসে এতক্ষণ ধর্ণা দিয়ে ঘরে ফিরেছে দিনেশ। মাত্র পাঁচটা টাকা এ্যাডভান্স, তাও চেয়ে পাওয়া যায়নি। তবে শুধু খালি হাতে ফিরতে হয়নি।

পথে ফিরতে বিলাসী কোত্থেকে এসে তার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে কয়েকটা টাকা—'ধারই দিলাম বাবু। যখন পার শোধ করে দিও।'

খনির মজুরণী বিলাসী, এ বয়সেই পাঁচবার সাঙ্গা তালাক করেছে। নামকরা নেশাড়ী সুপেশল কালো কঠিন চেহারা। মুখ ও বুকের ছাঁদে নারীত্বের কোমলতা-টুকু তবু অটুট আছে। গতরভাঙা পরিশ্রমে পুরুষ মজুরও ওর কাছে হার মানে।

বিমর্ষ দিনেশ ঘরের বাইরে দাওয়ার ওপর বসে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে হিস্টিরিয়ার মতো শরীরে একটা তীব্র কম্পন আর অবসাদ নেমে আসে। কিসের বিরুদ্ধে যেন তার একটা অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

বছর দু'এক আগের কথা, কলেজের বার্ষিক উৎসবে দিনেশ তার রোমান রিংয়ের খেলা দেখিয়েছে। বাঘের চামড়ায় আঁটসাট জাঙ্গিয়া, খোলা গা। দোলায়মান রিংয়ের ওপর কসরৎ। লীলায়িত পেশীপুঞ্জের রক্তরাগে ফুটে ওঠে প্রাণের শ্রেষ্ঠ সম্মানলিখা। করতালির বরষা আর শত শত দর্শকের বিমুগ্ধ দৃষ্টির আশীর্বাদ। গ্যালারি থেকে কনভেণ্টের মেয়েদের রুমালের উৎক্ষেপ আর হর্ষের কাকলি। কোথায় মিলিয়ে গেল সে ছবি!

বাঙালী সমাজে কানা খোঁড়ার জীবনেও বিয়ের ফুল ফোটে। ভবিষ্যপুরুষের ধমনীতে তারা সঁপে দিয়ে যায় শুধু কতকগুলি পঙ্গু বীজাণুর প্রবাহ। তাতেও দোষ নেই। যত বিচার আর ব্যতিক্রম শুধু দিনেশের অদৃষ্টে। বিয়ের সম্বন্ধ আসে আর ভেঙে যায়। পাত্রের যা রোজগার—এক সপ্তাহের পেটের খোরাক যোগাতেই নিঃশেষ। কন্যাপক্ষ আতঙ্কে পিছিয়ে যায়।

এদিকে দত্ত কোম্পানী আবার মাইনে কাটে। দিবারাত্রি দু'দফা সিফট চলে। খনি হাতড়ে মাল ওঠে না। এটাও যেন তারই অপরাধ। এর চেয়ে সাত সাগর ছেঁচে মুক্তো আনাও বোধহয় সহজ।

দিনেশের অন্তরাত্মা হিংস্র হয়ে ওঠে। তার চেয়ে ভাল ফ্যাকাসে তোবড়া একটা মুখের ভেতর দু'পাটি পোকাপড়া দাঁত—সোনা দিয়ে বাঁধানো। অস্থিসার একটা নড়বড়ে শরীরে অজীর্ণ আর অম্লশূল—কাশ্মীরী শালে ঢাকা। যে কোন ঘটক দেখলেই খুসিতে আটখানা হয়ে যাবে। যেন ঐ সোনা আর শালের ঔরসে জন্ম নেবে জাতিধর আর বংশধরের দল।

আরো মুস্কিল হয়েছে ভদ্রলোক হয়ে লেখাপড়া শিখে। জীবনের দুর্ধর আবেগ

টেনে নিয়ে যায় পাতালের দিকে। বিলাসীকে নিয়ে যে জনরব গড়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে সেটা সত্য হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু রুচিতে বাধে। পদে পদে ভদ্রয়ানার নিষেধভীরুতা। অভাবে স্বভাব নষ্ট হবে, এ হতে পারে না।

আবার মনে হয় সমাজ সংসার মিছে সব। এই জঙ্গল আর পাথরের চটান। চুনা পাথরের ধস্ নেমে গেছে নদীর গড়খাই পর্যন্ত—অগণ্যকোটি কীটের চূর্ণাস্থি। এই সেই গণ্ডোয়ানা ভূমি যেখানে গলিত প্রস্তরের নিশ্বাস শূন্যে মিলিয়েছে একদিন। যে পরমাণুর যজ্ঞে সৃষ্টি হলো হীরা, পান্না পোখরাজ, নীলা, পদ্মরাগ। প্রথম প্রেমে মরণাহত কত অতিকায় গোধিকার চুম্বন আঁকা আছে এই পাষাণে পাষাণে। দিনেশের ইচ্ছে হয়, অর্বাচীন বিংশ শতাব্দীর এই সংকুচিত জীবনের জঞ্জাল ঠেলে দিয়ে বিলাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আত্মনাশের আনন্দে।

কিন্তু তা হয় না।

ঘরে চোর ঢুকেছে। দিনেশের ঘুম ভেঙে গেল। খুট্‌খাট্ শব্দ।

বড় ভুল করেছে চোর। দিনেশ ভাবতে গিয়ে নিজেই লজ্জিত হলো। এ ঘরে চুরি করার মতো কিছু নেই। কি নেবে চোর? পাশের ঘরে আছে একটা রুটি সেঁকার তাওয়া, বেলুন, চাকি, খুন্তি আর এলুমিনিয়ামের ডেকচি। বারান্দায় আছে এঁটো থালা আর গেলাসটা। উঠোনে একটা পাইখানা যাবার পেতলের গাড়ু। পশ্চিমের ঘরে শুধু একটা এনামেলের গামলা—ছোলা ভেজান আছে। এর মধ্যে কোন্ জিনিসটি চোরের পক্ষে লোভনীয় হতে পারে?

একটু দূরেই তো ছিল দত্ত কোম্পানীর অভ্রের স্টোর। হাঁপানী রুগী কুঁজো মুকুটধারী সিং বন্দুক ঘাড়ে পাহারায় রয়েছে। চোর যদি তার সামনে গিয়ে একটু জোরে কাশে তবে বন্দুক খসে পড়বে হাত থেকে নির্ঘাত! তারপর কাঠের বাক্সগুলি ভেঙে ফেললেই হলো—হাজার পাঁচ তো পাবেই। কিন্তু গবেট চোরগুলোর চোখে সোজা রাস্তা তো পড়ে না। এসেছে ওভারম্যান দিনেশের ঘরে।

আরও ভুল করেছে চোর। সে জানে না এখানে থাকে দিনেশ চৌধুরী—যে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, পুরো দম টানলে যার বুকের বেড় বেলুনের মতো ফুলে আটচল্লিশ ইঞ্চি হয়, আধ ইঞ্চি পুরু ও আড়াই ইঞ্চি চওড়া লোহার পাত যে চিটেগুড়ের মতো দুমড়ে মুচড়ে দেয়। দৈবাৎ যদি চোরের হাত দিনেশের ঐ লোহার পাঞ্জায় ধরা পড়ে, কি হবে পরিণাম? একটি হ্যাঁচকা টানে কাঁধ থেকে ছিঁড়ে খুলে আসবে না কি?

সত্যি চোর ঢুকেছে, এ ব্যাপার জেনেও দিনেশ আবার গায়ে চাদরটা টেনে

নিল। ঘুমের আরামটুকু নষ্ট করে লাভ নেই। চোরের যা সাধ্যি থাকে করুক।

কিন্তু মনে পড়লো বড় আয়নাটা, রূপোর ফ্রেমে বাঁধা। পশ্চিমের ঘরে দেয়ালে টাঙ্গান আছে। কমিশনার সাহেবের মেম কসরৎ দেখে খুশি হয়ে এটি উপহার দিয়েছিলেন। পঁচিশজন গুরুভার মানুষে বোঝাই একটা গরুর গাড়ীর চাকা ঘাড়ের ওপর দিয়ে পার করেছিল দিনেশ, যার জন্যে আজও একটা ঘাড়ের রগ মাঝে মাঝে টনটন করে।

এখন মাসের শেষ। একটা গামছা দিয়ে ঢাকা আছে আয়নাটা। খোরাকের কমতি পড়েছে এখন, তাই ডন বৈঠক মেহন্নতও বাদ পড়েছে। এখন চলেছে শুধু ঝিঙের তরকারী আর ভাত। এই খোরাকে এক্সারসাইজ করলে ক্ষতি হয় শরীরের—দম ঢিলে হয়ে আসে, পেশিগুলো রুক্ষ হয়ে কুঁচকে যায়। একটুতে ক্লান্তি বোধ হয়।

পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। তবু মাসের প্রথম কটা দিন প্রতি নিঃশ্বাসে, মাংসপেশীর প্রতিটি লীলায়িত নৃত্যের মধ্যে দিনেশ প্রাণের আস্বাদ পায়। পেট ভরে রুটী-তরকারী একপো ঘিয়ের ফোড়ন দেওয়া অড়হরের ডাল—একটু সুরুয়াদার মাংসের কারি—সকালের দিকে মোষের দুধ—বিকেলে বাদামের সরবৎ। ডন-বৈঠক আর বারবেল ভাঁজার পর তেলে মাজা শরীরে স্নান সেরে দিনেশ এই আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়, আয়নার বুকে সেই অপার স্বাস্থ্য মহিমার প্রতিচ্ছায়ার পায়ে তার মন অনুরাগের আবেশে নুয়ে পড়ে।

আয়নাটা গেলে ক্ষতি হবে। দিনেশ বিছানা ছেড়ে উঠলো।

দিনেশের পায়ের শব্দে একটা চোরের ছায়ামূর্তি ঘরের ভেতর থেকে ছিটকে বারান্দায় এসে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো দিনেশের লোহার মতো দুটি বাহুর পাকে। মুহূর্তের মধ্যে চোরের শরীর নরম নতুন বালিশের মতো চেপ্টে যেন এতটুকু হয়ে গেল।

দুড় দুড় আওয়াজ। আরও কজন চোর উঠোনের পাচিল ডিঙিয়ে খিড়কির দোর খুলে পালিয়ে গেল।

বন্দী চোর হাঁপাচ্ছে। দিনেশের কানের কাছে চোরের কাতর স্বর বেজে উঠলো, অতি করুণ এক আবেদন—'উঃ, গায়ে ফোড়া আছে, বড় লাগছে।'

আচমকা শিথিল হয়ে পড়লো দিনেশের বাহুবন্ধন। দ্বার খোলা পিঞ্জরের পাখীর উল্লাসের মতো চোর একবার মরীয়া হয়ে ছটফটিয়ে উঠলো মুক্তির জন্যে। কিন্তু দিনেশ তার ভুল বুঝে সামলে নিল।

আর একবার কেঁপে উঠলো দিনেশ। চোর তার বুকের ওপর বসিয়ে দিয়েছে

হিংস্র এক কামড়—নির্বিষ সাপের ছোবলের মতো একটু চিন্ চিন্ করে উঠলো শুধু। স্প্রিংয়ের মতো পেশিতে দাঁত বসাতে পারে না—চামড়াটা শুধু ছড়ে যায় সামান্য। দিনেশ আর একবার কষে দিলে তার নিদারুণ আলিঙ্গন গ্রন্থি। নিপিষ্ট চোরের দম ফেটে এক পরম হতাশার আক্ষেপ ফুঁপিয়ে বেজে উঠলো।

কিন্তু ধীরে শিথিল হয়ে আসছে দিনেশের হাত অলস অবসাদে। রেশমের মতো নরম চুলেভরা চোরের মাথাটা দিনেশের চিবুকে ঘসা খেল একবার। ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিতেই চোরের মাথার বেণীটা চাবুকের মতো দিনেশের কাঁধের ওপর সাপটে পড়লো। তার ওপর মিঠে ফুলের গন্ধ, বেণীতে গোঁজা ফুল, টাটকা স্থলতান চাঁপা।

একটা স্বেদাক্ত মসৃণ মুখ মাছরাঙা পাখীর মতো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছে দিনেশের মুখের ওপর। জেলির মতো কোমল দুটি অদৃশ্য অধরের বিহ্বল চুম্বন। অগোচরের এই স্পর্শ তিলে তিলে গ্রাস করে নিচ্ছে তার পরিচয়। শরীরের প্রতি কণিকা যেন চূর্ন হয়ে যাচ্ছে কাঠিন্য হারিয়ে।

বাইরের অন্ধকার থেকে মৃদু ঝড়ের স্রোতে ভেসে আসছে অতি করুণ একটা শব্দের কম্পন—কাটা বাঁশির আওয়াজের মতো। শত শত সাপ যেন ফনা তুলে শিষ দিয়ে ডাকছে সঙ্গিনীকে। দিনেশের হাত দুটি ঝুলে পড়লো।

এক মিনিট মাত্র। অবসাদের ঘোর কাটিয়ে উঠেই দিনেশ দেশলাই জ্বালালো। হাতে চকচকে ছুরি—একটি ইরানী বেদে মেয়ে—হাতড়ে হাতড়ে দরজা খুঁজছে। এরাই এসেছে তেঁতুলিয়া মাঠে।

বাইরে আর একবার সাপের শিষের ঝড় শিউরে উঠলো একসঙ্গে। চোর খিড়কির দরজা দিয়ে চকিতে পার হয়ে চলে গেল।

দত্ত কোম্পানীর অভ্রের খনি। ওভারম্যান দিনেশ ডিউটি দিতে নেমে চললো সুড়ঙ্গের পথে। হাতে টর্চ আর বেঁটে একটা লাঠি। চওড়া ঢালু পথ নেমে গেছে —গাছের ডাল দিয়ে সিঁড়ি করা, পা ঠেকা দেবার জন্যে। মাথার ওপরটা যেন এক বিরাট পাষাণের চন্দ্রাতপ—গাঁইতার মারে চেঁচেছুলে খিলান করে দেওয়া হয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে ফাটল—ভূভারের আক্রোশ যেন ভ্রূকুটি করে রয়েছে। কাঁচা গাছের তক্তা দিয়ে খিলানটা এক প্রস্থ তালি মারা হয়েছে—পচে ছিঁড়ে গেছে আর্ধেক কাঠ। তারই ফাঁকে চুঁয়ে পড়ছে ভুস্‌কো মাটি, কাদাজল আর কাঁকর। একটা শিমুলের শেকড় সাপের লেজের মতো ঝুলছে। ঢালু সিঁড়িটা শেষ হয়েছে যেখানে—ছাতটা সেখানে পাকা ফোঁড়ার মতো ফুলে উঠেছে। এক

ভয়ংকর পরিণামের আশঙ্কায় টনটন করেছে জায়গাটা। দুর্বল আশ্বাসের মতো কয়েকটা কাঠের খুঁটি দিয়ে ঠেকা দেওয়া হয়েছে।

নামতে নামতে দিনেশ এসে দাঁড়ালো ঢালুর শেষে—জায়গাটা প্রায় সমতল। তুধে মাটির কাদায় পা ডুবে যায়। দুপাশে স্তরে স্তরে কেওলিন গলে রয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে আর কিছু দেখা যায় না। শুধু একটা খাড়া চানকের মুখ মাথার অনেক ওপরে, বহিঃপৃথিবীর আলোয় রাঙা দিনমানের একটি বুদ্বুদের মতো ভেসে রয়েছে।

এখান থেকে তিন দিকে তিনটে সুঁদ চলে গেছে। দুপায়ে গুঁড়ি মেরে আর দু'থাবায় হেঁটে দিনেশ চললো—টর্চের আংটাটা দাঁতে কামড়ে। ধারালো কোয়ার্টসের নুড়িতে হাঁটু ছড়ে যায়। ঘাড় টাটিয়ে উঠলেও মাথা তোলা যায় না। মাথার ওপরে এবড়ো খেবড়ো পাথর—পাতাল দানবেরা দাঁত মেলে পড়ে আছে। বেসামাল হলেই মাথার খুলি ঠুকে যায়, ভেঙে যেতেও পারে। সরীসৃপের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে বুকে হেঁটে দিনেশ চলেছে ডিউটি দিতে—পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরী।

নুড়ি ভরা পথটা শেষ হয়েছে। তারপর হঠাৎ একটা ঢালু। দিনেশ ঝুপ করে পড়ে গেল।

যেন একটা স্প্রিংয়ের গদি। একটা রামার গাদি। খনিকরের উপেক্ষিত কালো অভ্র রামা। রামা কালো বলেই অকেজো, কেউ ছোঁয় না। এ জায়গাটা তবু একটু সুপরিসর—চারটে দিক ঠাহর করা যায়। নইলে সুঁদের পথে একবার ঢুকলে মনে হয়—এ জগৎ যেন আয়তনতত্ত্বের বাইরে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুধু অশরীরী একটা প্রাণ অচরিষ্ণু পাথরের স্তর দীর্ণ করে এগিয়ে চলে—চাকরী করতে।

দিনেশ উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পাগুলো একবার টেনে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেন মেরুদণ্ডের আশ্রয়ে বসিয়ে দিল। সুঁদের পথ এবার আরও গভীরে ডানদিকে ঘুরে খাড়া নেমে গেছে। গুমোট বড় বেশি—কাছে কোন চানক নেই। টর্চ্ জ্বাললেও পথ পরিষ্কার দেখা যায় না। কোটী কোটী অভ্ররেণু শুষ্ক ঝড়ের মতো পথ জুড়ে রয়েছে।

অনেকটা ঝুলে ঝুলে নামতে হয়। একটা দড়ি খুঁটোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, গতির বেগে দেহের ভার যেন আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়। পাশে একটা চওড়া খুপরি। রেড়ির তেলের একটা পিদিম নিভে রয়েছে। একটা শূন্য-গর্ভ তাড়ির ভাঁড়—কয়েকটা ভাঙ্গা গালার চুড়ি। নামার পথে দিনেশ এখানে

রোজই একবার জিরিয়ে নেয়।

এই খুপরিটা যেন পাতালপুরীর একটা পান্থশালা। শুধু মুনাফা শিকারী ব্যবসায়ী মানুষের নখরের আঁচড় নয়—প্রাণময় মানুষের কামনার শিলালিপিও লেখা রয়েছে এখানে।

দড়ি ধরে ধরে দিনেশ নীচে নেমে চললো। এই ধূলি ধাতু ও পাষাণের সংসারে সেও যেন পরমাণুর মতো লঘু হয়ে আসছে। মর্ত্যলোকের যত পাপ পুণ্যের সংস্কার এই অতল অন্ধকারের শাসনে খসে পড়েছে একে একে। মৃত্যু এখানে কত ঘনিষ্ঠ—তাকে প্রাণের মতই এখানেই অনুভব করা যায়।

গন্ধকের ধোঁয়ার গন্ধ। দিনেশের চাকুরীর আস্তানা এগিয়ে আসছে। সুঁদের একটা সংকীর্ণ বাঁক—একটা কুঁয়োর মতো গর্তের মুখে এসে শেষ হয়েছে। হুম হুম হুম—একটানা একঘেয়ে একটা শব্দের গমক। পাষাণের হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন অন্ধকারের নিঃশ্বাস ছাড়ছে। আবার মনে হয়, লক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাসের একটা ঘূর্ণি পাথরের পেটে বন্দী হয়ে আছে—ক্ষেপে ফেটে পড়তে চায়।

কুঁয়োর মুখে এসে ঝুঁকে তাকাতেই এই শব্দ তাণ্ডবের যেন একটা ছন্দোবদ্ধ অর্থ পাওয়া গেল। খনিমজুর বানিয়াতিদের গান। মেয়েকুলি ধারিদের কলহাস্য। খান হাতুরির আছাড়ের গুরু গুরু ধ্বনি। নুড়ির স্তূপের ওপর ছপ ছপ করে বেলচার টান পড়ছে। একেবারে নীচে একটা পিদিম—একটা আলোদানার চক্ষু যেন নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দিনেশ অন্ধ অজগরের মতো লাফিয়ে পড়লো হাত তিনেক নীচে—সাত নম্বর দরজা, দিনেশের ডিউটিস্থল।

বানিয়াতিদের গান আর খান ছেনির উদ্দাম সংঘর্ষ বন্ধ হলো। পিদিমে আরও খানিকটা তেল ঢেলে সলতে উস্কে দেওয়া হলো। জেলেকনাইটের ধোঁয়া ধূলো আর ঘোলা আলোর সেই নীহারিকার মধ্যে দিনেশের চোখে প্রথম ধরা দিল একটি হাসি হাসি মুখ—প্রতীক্ষমান এক জোড়া চোখের সার্থক দীপ্তি—বিলাসী।

বিলাসী একটা বেলচা কোলের কাছে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।—'আজ বড় দেরি হলো বাবু?'

বিলাসীর দিকে একবার তাকালো দিনেশ—হ্যাঁ, পাতালপুরীর মেয়েই বটে। ধূলোয় রুক্ষ চুলের ওপর অজস্র অভ্রের কুচি চিক্‌চিক্ করছে—যেন একটা চুমকির জালি দিয়ে ঘেরা। নোংরা শতছিন্ন কালো রঙে ছোপানো একটা ধূলিকীর্ণ শাড়ি—রসাতলের এক তপস্বিনীর মূর্তি! ওরা হাড় দিয়ে পাথর ভাঙে। মর্ত্য-

নারীর মতো ওদের দেহ লালিত্যে লতিয়ে ওঠেনি। ধরিত্রীর এই তমসাবৃত জঠরলোকে ওদের অয়স্কান্তির কঠিন লাবণ্য কত নয়নাভিরাম তা এখানে না এলে কেউ বুঝবে না। এই পাষাণের ছন্দে ওদের যৌবন বাঁধা। যে কোন ক্লিওপেট্রাকে এখানে কুৎসিত প্রেতিনীর মতো মনে হবে!

কিন্তু দিনেশের মন আজ ছন্দ হারিয়েছে। বিলাসীর কথার উত্তর না দিয়ে কাজের হিসেব নিতে মন দিল।

দুটো মেয়ে ধারি বেলচায় মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে আর ঘুমের ঘোরেই থুথু ফেলছে মাঝে মাঝে। মেয়ে দুটোর কণ্ঠনালি রবারের থলির মতো এক-একবার ফুলে উঠছে—বমির তোড় আটকাচ্ছে দাঁতে দাঁত দিয়ে।

বীভৎস! দিনেশ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বিলাসী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। দিনেশ সরে গেল।

বানিয়াতি লোটন বললো, 'ওদের আজ হুঁস নাই বাবু। মানা করলাম তবুও শুনলো না। নেশা করেছে।'

দিনেশের মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠলো, 'আর কে কে? নাম বল্ তো।'

'—আর চমন। একবার ঐদিক তাকিয়ে দেখ বাবু।' লোটন হেসে ফেললে।

চমন পাথরের গায়ে একটা খুপরির মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে রেখে চোখ বুঁজে ধীর স্থির হয়ে বসে আছে। পাতালপুরীর কোন ভাস্কর যেন এক অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব মূর্তি রেখেছে খোদাই করে।

তিনজনের হাজরি কেটে দিয়ে দিনেশ আবার কাজের কথাই পাড়লো, 'একি? এতখানি ছাড় রেখে বিঁধ দিয়েছিস কেন?'

লোটন মুচকে হেসে বললো, 'বাবু, আর একজনের হাজরি কাটতে হয় তা হলে।'

দিনেশ, 'আর কে?'

বিলাসীর মাথাটা নেশায় দুলছিল। দিনেশের মেজাজী গলার স্বর শুনে, মুখে আঁচল চাপা দিল ভয়ে। লোটন তেমনি মুচকে হেসে কাজের কথার উত্তর দিল, 'ওটা বাজা পাথর বাবু। বিঁধে কিছু হবে না। মিছা বারুদ নষ্ট হবে।'

টর্চের আলো ফেলে দিনেশ চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। কোন দিকে কোন ভরসার চিহ্ন নেই। আজ সাত দিন ধরে কাজ হচ্ছে, দশ সের মালও ওঠেনি। জেলেকনাইটের করাল বিস্ফোরণে এই অন্ধ পাথরের বুক ফেটে এক-আধটু ধূলো চাপড়া ঝরে পড়েছে শুধু। মালিকের পয়সা নষ্ট হচ্ছে, এর পরিণাম কি হবে তা সেই জানে। এই পাতাল ঘেঁটে তাকে বার করতে হবে কোথায়

অভ্রের রেতি—রক্তকায় সরীসৃপের মতো কোয়ার্টসের বুকে লুকিয়ে আছে। নইলে মাইনে ও মজুরী মুন্সীজীর খাতায় চিরকাল কালির আখরেই লেখা থাকবে, হাতে আর আসবে না।

দিনেশের মেজাজ ধারি ও বানিয়াতিদের কাছে আজ একটু অন্যরকম লাগলো। হুমকি হুকুমবাজি তো এখানে অচল। তা ছাড়া দিনেশবাবু অতি দিলদার লোক। ধারি বানিয়াতি আর ওভারম্যানের ধর্ম এখানে একই সঙ্গে সমাহিত ছিল পাতালিক প্রীতির বন্ধনে। আজ এই ব্যতিক্রম কেন?

আর বিলাসী? সে তো বেশ ভাল ফাকৃনিক কাজ জানে, কারখানায় বসে অভ্র কাটলে রোজগার অনেক বেশি হতে পারে। তবু ধারি হয়ে ঝুড়ি ও বেলচা নিয়ে নেমেছে এই মৃত্যুময় অভ্রমরীচিকার গহনে। যে সিফ্‌টে যত নম্বর দরজায় ওভারম্যান দিনেশের ডিউটি থাকে, বিলাসীও সেখানে থাকবে। খনিমহলে কথাটা কারও অবিদিত নেই। প্রত্যেক শ্রমিক ও শ্রমিকার কাছে ঐ দুজনের গল্প অনেকটা রূপকথায় মতো, আলোচনা করতে বেশ মজাই লাগে। এর মধ্যে কিছুই অশোভন, কিছুই অসুন্দর নেই।

সেই দিনেশবাবু আজ কেমন যেন বিসদৃশ হয়েছে। বিলাসীর সঙ্গে একটা কথাও হলো না। লাঠি ও টর্চ্ হাতে দিনেশ আবার সিঁড়ির তলায় এসে দাঁড়ালো। '—তোরা আবার একটা বিঁধ দিয়ে আওয়াজ কর। দেখ, কপালে যদি কিছু থাকে। আমি ওপাশের ছোট গাড়াটা একবার দেখে আসি।'

সিঁড়ি ধরে একটু ওপরে উঠে আসতেই দিনেশ পেছনে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। বিলাসী।

'—একি? তুই আসছিস কোথায়?'

'—তোমার সঙ্গে।'

'—না নিজের কাজে যাও।'

বিলাসী সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল নিথর অভিমানের শিলীভূত মূর্তির মতো।

'—তালা নেবে! খুব সস্তা; খুব মজবুত। চোরে ভাঙতে পারে না, বউ পালাতে পারে না।'

দিনেশ চমকে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলো—একটা ইরানী বেদে মেয়ে, যাদের তাঁবু পড়েছে তেঁতুলিয়া মাঠে। একটা বড় চামড়ায় পেটি ঝুলছে কাঁধের ওপর—রকমারী পণ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ।

'—দেখছো কি? তালা নেবে কি না বল?' মেয়েটা সরাসরি দাওয়ায় উঠে

একেবারে দরজার মুখে এসে দাঁড়ালো।

দিনেশ তাকিয়েছিল। হ্যাঁ, এই সেই মেয়ে। সেই রেশমী চুলের বেণী—মাথায় সুলতান চাঁপা গোঁজা। হতভম্ব হয়ে ধরা গলায় দিনেশ আস্তে আস্তে বললো, 'কত দাম?'

মেয়েটা এদিক ওদিক দুবার তাকালো। ভুরু কুঁচকে কি ভাবলো। ছোট একটা পেতলের তালা তুলে ধরে বললো, 'দাম দশ টাকা।'

ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দিনেশ আর কোন কথা না বলে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে থেকে মেয়েটা আর একবার চেঁচিয়ে বললো, 'আচ্ছা, পাঁচ টাকা। না হয়, দু'টাকা। জিনিস চেন না বেকুব?'

দিনেশের কানে কোন কথাই পৌঁছল না।

দুপুরের রোদ মাথার ওপর তেতে উঠেছে। দিনেশ তবু দাওয়ায় বসে আছে। আজকাল রোজই এইরকম হয়। বসে বসে দেখে তেঁতুলিয়া মাঠের চারদিকে তাতারসি কাঁপে—তৃষ্ণার ছবির মতো। বেদে মেয়েটা হন্তদন্ত হয়ে রোজই এ পথে তাঁবুতে ফেরে।—'পেলে টাকা?' যাবার সময় জিজ্ঞাসা করে যায়।

দিনেশের ইচ্ছে হয় একবার ডেকে প্রশ্ন করে নামধামগোত্র। কেমন এই পথিক মানুষের দল, মেরুমরালের পাখার মতো পথের প্রেমে যাদের স্নায়ু শিরা সতত চঞ্চল। মহাদেশের গিরিদরিবন ধরে যায় আর আসে। ভাষা গান উৎসব সবই পথ থেকে কুড়িয়ে নেয়। যেখানে পায় তুলে নেয় নতুন পাপপুণ্য, নতুন রক্ত, নতুন ব্যাধি। দিনেশের জানতে ইচ্ছে হয়, ওরা কাঁদতে জানে কিনা। না শুধু হাসির ফুৎকারে জীবন উড়িয়ে নিয়ে যায় আয়ুর সীমানায়, ডাকতে সাহস হয় না দিনেশের।

'—আচ্ছা, এক টাকা। সস্তা করে দিলাম। এইবার রাজি হয়ে যাও।' নির্লিপ্তভাবে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে মেয়েটা চলে যায়। দিনেশও আর বড় বিচলিত হয় না। যাযাবরীর এই নিত্য চতুরালি গা সহা হয়ে আসছিল।

গলায় চুনীর মালা আর ঘাঘরার শব্দে দিনেশকে সচকিত করে মেয়েটা এক দিন সামনে এসে ভালমানুষের মতো চুপ করে বসলো। মুখ ঘুরিয়ে নিল দিনেশ। শীগ্‌গির চলে গেলে হয়। এ সব অপ্রাকৃতিক জীব—ঘনিষ্ঠ না হওয়াই ভাল। কিন্তু বড় সুন্দর।

'—কি? তাকাতে ভয় পাচ্ছ বুঝি? কোন ভয় নেই, যত খুশি তাকাও।'

কথার মধ্যে কোন আবেগ নেই তবু মোহ এসে পড়ে। দিনেশ তাকালো লজ্জা সত্ত্বেও।

'—একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পার মেহেরবান!' মেয়েটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

ক্লান্ত হবার কথা। দু'পায়ে পুরু ধুলোর ঢাকা পড়েছে। এই রৌদ্রে কতদূর ঘুরে এসেছে কে জানে। দিনেশ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো জলের জন্য। এক দুরন্ত বনহরিণী দোরে এসে তৃষ্ণার জল চাইছে তার কাছে।

গেলাসে জল নিয়ে বাইরে আসতেই দিনেশ দেখলো মেয়েটা নেই। রাস্তা ধরে নিজের মনে চলে যাচ্ছে। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েই খিলখিল করে হেসে উঠলো।

দিনেশ সেদিন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে আজ ডেকে ওর পরিচয় নেবেই। রবিঅভ্রের মতো অমন স্থন্দর চেহারা। ওর মধ্যে মানুষীর হৃদয় থাকবে না, এ কি করে হয়?

'—এই শোন, কাজের কথা আছে।' দিনেশ সহজস্বরে ডাকলো।

নকল ত্রাসে চোখদুটো বড় বড় করে মেয়েটা বললো, 'ওরে বাবা, যাব না। জুলুম করবে।'

দিনেশের প্রতিজ্ঞাটা যেন কিসের সংকোচে এলোমেলো হয়ে গেল, কিন্তু প্রত্যুত্তর তৈরী হবার আগেই মেয়েটা সটান চলে এল। বললো, 'আমার নাম সারা, তুমি একটাও তালা কিনলে না। কত করে বললাম।'

হাসি মুখেই দিনেশ বললে, 'তোমার তালা কিনবার মতো লিয়াকৎ আমার নেই। আমি গরীব।'

সারার উদ্ধত দৃষ্টি যেন নরম হয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি কর। রোজগার কর না?'

'—অভ্রের খাদে কাজ করি।'

'—খাদে? ভেতরে নাম তুমি?'

—'হ্যাঁ, রোজই।'

'—তুমি আদমি নও। তুমি সাপ, নইলে গর্তে ঢোক কি করে?'

সত্যি এদের কথাবার্তার চালচুলো নেই। দিনেশ একটু বিরক্ত হয়েই চুপ করে গেল।

কতক্ষণ আনমনা হয়েছিল দিনেশ জানে না। হঠাৎ চোখে পড়লো সারা একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে তাকেই দেখছে—দুটি শান্ত মেয়েলী চোখের দৃষ্টি। দিনেশ খুশি হলো। সারার কণ্ঠস্বরে সত্যই মমতার আমেজও ফুটে ওঠে। বললো—'তোমার বিবি নেই?'

'—না।'

'এমন নওজোয়ান তুমি। বিবি নেই ? আজব তোমার কাণ্ড !'

দিনেশের সাহস বেড়েছে, 'তুমি বিবি হবে !'

'—হব। বুড়া হলে কিন্তু পালিয়ে যাব।'

'—আর তুমি বুড়ি হবে না বুঝি ?'

সারা ততক্ষণ উঠে ঝোলাঝুলি পিঠে তুলে তর্‌তর্ করে নেমে গেছে দাওয়া থেকে। ভুরু কুঁচকে মুচকি হেসে বলে গেল,—'এত দিল্‌লগী ভাল নয়। সাপ কাহাকা।'

আর একদিন সারা বললো,—'তোমার সঙ্গে বসে বসে শুধু গল্প আর গল্প। আর পারবো না। আমার রোজগার খারাপ হয়ে গেছে। মালিক আমায় জবাই করে ছাড়বে, যদি জানে···।'

দিনেশ,—'কি ?'

সারা,—'যদি জানে তোমার সঙ্গে মোহব্বৎ হয়েছে।'

দিনেশ চমকে উঠলো।—এ কি কথা বলে ? মোহব্বতের কথা যাযাবরীর মুখে ? হিমনদের মতো নিরাবেগ যাদের জীবনে হাসি কান্না উষ্মা অভিমান। পথে তুলে নেওয়া আর পথে ফেলে যাওয়া যাদের আনন্দ ?

সারা,—হ্যাঁ, মালিকের কানে পৌঁছে গেছে। আমাকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছে। এ বেইমানীর সাজা কি জান তো ? নেড়া করে তাড়িয়ে দেবে দল থেকে। বলবে —'যা তোর মাশুকের কাছে যা !' ওকে তো চেন না, একটা কুর্দকসাই।'

সারার চোখ ছল-ছল করছে। হিমনদের গহনে অন্তঃশীল প্রবাহের কলক্রন্দন। সারা মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সারাই কথা বললো। গলাটা যেন একটু ধরে এসেছে। ওদের ভাষায় মিনতি নেই, চোখে দেখে বুঝে নিতে হয়।—'তুমি চল।'

'—কোথায় ?'

'—আমার কাছে, আমার তাঁবুতে।'

'—তারপর ?'

'—তারপর আর কি ? থাকবে, ঢোলক বাজাবে।'

প্রস্তাব শুনে দিনেশ হেসে চুপ করলো। সারা বিস্ময়ের সুরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'এ কি হাসছো ? জবাব নেই ?'

দিনেশ তেমনি একটা ভারিক্কি হাসি হেসে বললো, 'আচ্ছা সে হবে হবে।'

যেন কোন দোজবরে বাঙ্গালী স্বামী তার দ্বিতীয় পক্ষের একটা ছেলেমানুষী বায়না মিষ্টি কথায় ঠাণ্ডা করছে।

সারার দৃষ্টিও প্রখর হয়ে এল। আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'কি জবাব দিলে না।'

আবার সেই ল্যাদারে ভালমানুষী হাসি। দিনেশ শুধু বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় জবাব দেব।'

সারা মাঠের পথে নেমে পড়লো।

সারা ভালবেসেছে। এতদিন পরে সত্যিকারের ট্রফি লাভ হয়েছে দিনেশের। জীবনের সবচেয়ে বড় বঞ্চনার ক্ষতে এতদিনে যেন একটু জ্বালাহর প্রলেপ পড়লো। তার পৌরুষের তোরণে এসে ইরাণী যাযাবরীর চিত্ত সকল উদ্‌ভ্রান্তি ঘুচিয়ে শান্ত হয়ে গেছে। নতুন করে যেন মধ্য এশিয়া জয় করলো সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।

মনে পড়লো বিলাসীর কথা। ওর ওপর মমতা হয়। দু'দিকের দুই আহ্বান। বিলাসী ডাকে মৃত্যুর গহনে, আর সারা ডাকছে জীবনের খরস্রোতে। সারার নীল চোখের দিকে তাকিয়ে এক স্বর্গঙ্গার কলরোল শুনতে পায় দিনেশ, শুধু ভেসে চলে যাবার আহ্বান। কিন্তু বিলাসীর কালো চোখ তাকিয়ে আছে নিঃসঙ্গ ভোগবতীর অতল থেকে, যেন ডুব দিয়ে তলিয়ে যেতে ডাকছে বার বার।

সারা এসে বিষণ্ণভাবে বললো, 'কেমন আছ? আমাদের দিন ফুরিয়ে এল। এবার তাঁবু উঠবে। আর কি? এবার একদিন এসে শেষ সেল্লাম জানিয়ে যাব।'

দিনেশের বিমূঢ় বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সারা কোন মতে হাসি চেপে রাখলো।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে দিনেশ সেদিনের মতো ঘরোয়া কথা পাড়লো, যার ঘর নেই তার সঙ্গে।'—তোমার বাড়ি কোথাও একটা ছিল তো? সে কোথায়? ইরাণ?'

'—আমি ইরাণী নই। আমি জহান-কি-রানী।' খিলখিল করে হেসে উঠলো সারা।

তারপরে সহজভাবে ভাটের ছড়ার মতো নিরর্গল কথার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চললো দিনেশকে।'—আমি তাজিকের মেয়ে, বাবা আমাকে বেচে দেয় এক খোরাসানী সদাগরের কাছে। হিন্দুস্থানে আসতে আজাদ এলাকায় তোচিখেল বদমাসেরা আমাদের লুট করে। বড় বেইজ্জত হয় আমার। আমাকে তারা ধরে নিয়ে যায়। তারপর পেশোয়ার বাজার।'

সারার চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে গেছে। ঘাঘরার ধুলোর মতো সমস্ত

স্মৃতিভার সে যেন ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে কথা বলে বলে।

—পেশোয়ারে বাজারে আমাকে তারা বেচে দিলে পাঁচ আফগানীর বদলে—মিয়াঁওয়ালী বেদিয়াদের কাছে। তারপর কাণপুর। অসুখে ভুগে খোঁড়া হয়ে গেলাম। মিয়াঁওয়ালীরা বেচে দিল কঞ্জরহাটিদের কাছে—একটা মুর্গীর দামও তারা পায়নি। রোগা শুকনো খোঁড়া মেয়ে মানুষ কিই বা তার দাম হতে পারে? সেই থেকে আমি এই কঞ্জরহাটির তাঁবুতে। তারা নাচিয়ে নাচিয়ে আমার খোঁড়ামি ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। আর ভাল লাগে না, তবে বেইমানি করে চলে যেতেও পারিনা। ভাল লোক যদি কেউ আবার কিনে নিত!'

একটা আফশোষের শব্দ করে সারা চুপ হলো।

'—তুমি আমায় কিনে নাও। যতদিনের জন্য ইচ্ছে কিনে নাও। যেদিন খুশি ছেড়ে দিও। কিছু টাকা দিলে মালিককে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসি।' উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠলো সারার মুখ।

এ প্রখর অনুরোধের আঘাতে দিনেশের নিরেট ভালমানুষী ভীরুতা একটু নাড়া খেল যেন। অধৈর্যে কাতর সারার গলার স্বর।—'তবু তুমি ভাবছো? না হয় পরে আমায় আবার বেচে দিও। এমন নওজোয়ান মরদ, টাকা জোগাড় করতে পার না। ইচ্ছে করলে এক রাত্রে তুমি হাজার টাকা আনতে পার। আমি চললাম। সেলাম।'

সারা উঠতেই দিনেশ তাকে ধরে বসাতে গেল। সারা দু'পা পিছিয়ে বললো—'ব্যস্, ছুঁয়োনা। আমাকে ছোঁবার কোন হক্ নেই তোমার।'

দিনেশ—'এই তোমার মোহব্বত?'

সারার গলার স্বর আবার যেন কাতরতায় আকুল হয়ে উঠলো—'তুমি বোঝ না অন্ধ। এই মোহব্বতের জন্য আমায় সাজা পেতে হবে। প্রাণ যেতেও পারে। রোজগার নষ্ট করে তোমার সঙ্গে দোস্তি করেছি। মালিক সব কথা জানে। আমায় বাঁচাও।'

'—ভয় নেই সারা। আমি টাকা আনছি দু'তিন দিনের মধ্যেই। পাকা কথা দিলাম।'

'—জিতা রহো মাশুক মেরা! আমায় উদ্ধার করো। মালিকের দেনা শোধ করে দিয়ে আমি চলে আসি তোমার কাছে।'

সারার মুখ কৃতার্থতার হাসিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। আজ বিদায় নেবার সময় দিনেশকে একটা ছোট সলজ্জ আদাব জানিয়ে গেল। পথে নেমে চামড়ার ঝোলা থেকে বার করলো একটা নাসপতি। গুন গুন করে চাপা গলায় গান ধরে, নাস-

পতি খেতে খেতে তেঁতুলিয়া মাঠের পথে হেলে দুলে চলে গেল।

টাকা চাই। কন্যাপণ। এই পরম নির্বন্ধের জন্যই দিনেশের নির্বাসিত যৌবন অপেক্ষায় বসে ছিল শুধু। বরপণের দেশে তাইতো সে পুরুষের মর্যাদা পায়নি।

ভালই হয়েছে। বীর্যশুল্কা যাযাবরীর চিত্তজয়ের আমন্ত্রণ এসেছে তারই কাছে। মধ্যযুগের ক্ষত্রপ প্রেমিকের মতো আত্মপ্রসাদে দিনেশ যেন অস্থির হয়ে ওঠে।

বিলাসী এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। সেদিনের আচরণের কথা স্মরণ করে দিনেশ অনুতপ্ত হলো।

'—আয় বিলাসী, তোকে ছাড়া কাজ চলবে না আমার। একটা শক্ত কাজ আছে।'

এই আহ্বানের জন্যই বিলাসীর অন্তরাত্মা উদগ্রীব হয়ে থাকে। অনেকদিন আগেই এ আহ্বান শোনার দাবী ছিল তার। যার সঙ্গে ছায়া হয়ে মিশে থাকতে চায় সে, তারই কাছে। আর কারও কাছে নয়। যার হাত ধরার জন্য রোজগার, কুলমান, কুটীরসুখ ও আলো বাতাসের মায়া ছেড়ে নেমে এসেছে এই অতলতার অমারাজ্যে যেখান মরণ ও মিলন মিশে আছে একাকার হয়ে।

যে সিঁড়ির কাছে সেদিন বিলাসীকে থামিয়ে দিয়েছিল দিনেশ, সেখান থেকেই আজ আবার সুরু হলো যাত্রা। কোথায় কোন্ লক্ষ্যে, বিলাসী তা জানে না। তার জানবার প্রয়োজন নেই।

দিনেশের প্ল্যান ঠিক ছিল। বেলচা, শাবল, গুল্লা টোপি আর রেড়ির তেলের পিদিম নিয়ে তারা অগ্রসর হলো।

ছোট বড় নানা সুঁদের বাঁক ঘুরে ঘুরে একটা ছোট খাদের কাছে এসে দিনেশ ও বিলাসী দাঁড়ালো। টর্চের আলো ফেলে ধীরে ধীরে চারদিকে দেখে নিল। বিলসীর বেলচা দিয়ে দিনেশ ক'বার আঘাত দিতেই একটা ফাটল ধরা পাথরের চাপ খসে পড়লো ঝুপ করে।

উৎকট উল্লাসে দিনেশ চেঁচিয়ে উঠলো—'দেখছিস বিলাসী?''

—'হ্যাঁ'

বিলাসী দিনেশের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। ওর চোখের তারা দুটো তারই দিকে স্থির নিবদ্ধ, লুব্ধক জ্যোতি জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

'—এই দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। খুব সাবধান বিলাসী। কেউ যেন না জানে। মাত্র তিনটে বিঁধে খসে পড়বে হাজার টাকার মাল। পশ্চিমের চানক দিয়ে তুই মাল পার করে দিবি। ওপরের জঙ্গলে খদ্দের দাঁড়িয়ে থাকবে। উপায় নেই বিলাসী, করতেই হবে, আমার টাকা দরকার।'

সারি সারি গোরিয়া পাথর যেন ভরসার স্তরের মতো এখানে এসে পৌঁছেছে। দেখা যাচ্ছে কাজরা পাথরের চাপ—তিল-চিহ্নখচিত সুলক্ষণা গোরী ললনার গালের মতো। তারপর এই যোগিনিয়া পাথরের তিলকুট—রাঙা পাষাণীর কটাক্ষে রত্নলোকের ইসারা ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। '—এই নে গুল্‌লা টোপি। বিঁধে ফেল্ বিলাসী।' দিনেশ পকেট থেকে জেলেকনাইটের মোড়কটা নামালো।

শাবল দিয়ে একটা জায়গা বিঁধে আওয়াজ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। ফিউজের বাতিটা ধীরে ধীরে পুড়ে ক্ষয় হচ্ছে। একটা ভূমিকম্পের বীজ যেন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে মহাপরিণামের দিকে।

দিনেশ ডাকলো, 'আমার কাছে সরে আয় বিলাসী। এবার আওয়াজ হবে।'

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। আর্ত প্রস্তরপুঞ্জের শিহর আর ধোঁয়ার উৎপাত থামলো। দশটা মিনিট দিনেশ আর বিলাসীর কাটলো মুহ্যমান অবস্থায়। দিনেশ উঠে দাঁড়াতেই তার হাতটায় টান পড়লো। বিলাসী ধরে আছে।

আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে নিয়ে দিনেশ বিঁধের দিকে তাকালো—দুই চোখে তীব্র ঐশ্বর্যের জ্বালা। দিনেশের গলা থেকে আর একটা উন্মাদ আনন্দের বিস্ফোরণ ফেটে পড়লো। 'ঐ দেখ্ বিলাসী।'

কাজরা পাথরের একটা চাপ খুলে গিয়ে অভ্রের টিকরি ঝক্ ঝক্ করছে—প্রাক্ পুরাণিক কোন কুবেরের রত্নীভূত পাঁজর সাজানো রয়েছে স্তরে স্তরে।

'—চললাম বিলাসী। আজ সন্ধ্যায় চানকের মুখে খদ্দের দাঁড়িয়ে থাকবে। তুই অন্ততঃ দুটো বোঝা পার করে দিস্। আমি বন্দোবস্ত করতে চললাম।'

বিলাসী দাঁড়িয়ে রইলো নির্বোধের মতো। দিনেশ সত্যিই চলে যায় দেখে ডাকলো, 'বাবু।'

'—কি ? না আর দেরি করিস্ নি।'

'—ও চানক পার হব কি করে বাবু!'

'—খুব পরিষ্কার রাস্তা। খাড়া উঠে যাবি।

দিনেশের টর্চের আলো সুঁদের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'—ও চানকে গ্যাস আছে বাবু।' কিন্তু বিলাসীর এই আর্তস্বরের আবেদন দিনেশের কানে পৌঁছল না।

টাকার তোড়াটা তোরঙ্গে রেখে দিনেশ ঘরের বাইরে একবার পায়চারি করে গেল। তেঁতুলিয়া মাঠে ঢোলকের বাজনা মেতে উঠেছে। লণ্ঠনগুলোতে ঝড়ের আঁচ লেগে দপ দপ করছে, যেন কতগুলি আগুনের কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছ।

বিলাসী গ্যাস লেগে জখম হয়েছে খুব। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। হয়তো এই শেষ, আর চোখ মেলে তাকাবে না বিলাসী। এ খবর শুনেছে দিনেশ, খুব সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। এটা যেন অবধারিত সত্য ছিল।

দুঃখ পেয়ে গেল বিলাসী নিজের দোষে। ওর অন্ত্যজ অনুরাগের মধ্যে যেন একটা সহমরণের তৃষ্ণা লুকিয়ে ছিল। বিংশ শতাব্দীর রুচিমান দিনেশ চৌধুরী অত নীচে নামতে পারে না। নিশ্চিহ্ন হতে পারে না। বিলাসীর জন্যে দুঃখ হয়, অন্য সময় হলে বোধহয় কান্নাও আসতো।

কিন্তু সব দুঃখ ছাপিয়ে নেশার মতো একটা সুখাবেশ স্নায়ুজালে জড়িয়ে ধরেছে আজ। বাহিরের মৃদুঝড়ে বাসক রাত্রি উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সারার আসবার সময় হলো। মুক্তির মুহূর্ত আসছে এগিয়ে। প্রতি দণ্ড পল অনুপল গুণছে দিনেশ!

খুট খাট শব্দ। চোর এসেছে। ঘস্ ঘস্ ঘাঘরার শব্দ। চুণীর মালাটা বেজে উঠছে ঘুমন্ত পাখীর কলালাপের মতো। দিনেশের কায় মন প্রাণ সার্থক হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠলো। বিছানার ওপর নিস্পন্দ হয়ে বসে তাকিয়ে রইল দরজার দিকে —নিস্পলক চোখে।

চোরের আবছায়া মূর্তিটা ঘরে ঢুকলো—মার্জারীর মতো পদশব্দহীন। তোরঙ্গের ডালাটা কঁকিয়ে উঠলো একবার। কচ্‌কচ্ করে উঠলো টাকার তোড়াটা। দিনেশ চোখ দুটো একবার রগড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে অনেকগুলি সাপের শিষের সংকেত তীব্র শব্দের শিহর তুলে বেজে উঠলো একসঙ্গে। চোরের আবছায়া মিলিয়ে গেল ধোঁয়া হয়ে।

ক ত টু কু ক্ষ তি

আর্টিষ্ট শ্রীমন্ত সেন হন্তদন্ত হয়ে স্বাক্ষর পত্রিকার অফিসে ঢুকলো। শ্রীমন্তের মুখের দিকে তাকিয়েই সম্পাদক অক্ষয়বাবু বুঝলেন—পর্ব্বতো বহ্নিমান্। এই রুচিমান শিল্পীর নিষ্ঠার পর্বতে কোন্ বহ্নির স্পর্শ দাবানল সৃষ্টি করেছে, অভিজ্ঞ সম্পাদক অক্ষয়বাবুর কাছে সে রহস্য অজানা ছিল না। আর্টিষ্ট শ্রীমন্তকে তিনি আজ চার বছর ধরে এই মূর্তিতেই দেখে আসছেন। মিষ্টি কথার বর্ষা নামিয়ে এই উত্তপ্ত মূর্তিকে কিভাবে ঠাণ্ডা করে দিতে পারা যায়, সেই কৌশল তাঁর কাছে চার

বছরের নিয়মিত চর্চ্চায় এখন নিছক একটা অবলীলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমন্ত আর্টিষ্ট যতই রাগে গর্জ্জন করুক্, ভয় দেখাক্, অনুরোধ করুক—সম্পাদক অক্ষয়বাবু বিচলিত হন না কিছুতেই। কিন্তু আর্টিষ্ট শ্রীমন্ত এত বিচলিত হন কেন? কেন আজ চার বছর ধরে একটা বিক্ষোভের ঝড়ে তার মনের শান্তি বিপর্য্যস্ত হয়ে আছে?

শ্রীমন্ত আর্টিষ্টের বিদ্রোহী মূর্তিটা একটা চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়েই সম্পাদক অক্ষয়বাবুকে যেন চ্যালেঞ্জ করলো।—আবার আপনি ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্তর তোলা একটা লক্কড় ফটো ছেপেছেন! বিজয় ফটোগ্রাফারের এলবামটাকে যদি আপনি একটা রত্নদীপ মনে করে থাকেন, তবে তাই করুন; কিন্তু আমাদের বাদ দিন। প্রতি মাসে ঐ এলবাম থেকে এক একটি ঘুঁটে পোড়ানো রত্ন দিয়ে আপনার স্বাক্ষরকে সাজিয়ে বার করুন। আর্টিষ্টদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিন। বাস্—স্বাক্ষরকে যদি রাখতে হয়, তবে এক নৌকায় পা দিতে শিখুন। তেলে জলে মেশাবার চেষ্টা করবেন না। হয় আর্টিষ্ট নয় ফটোগ্রাফার—এর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। বলুন।

উত্তরে সম্পাদক অক্ষয়বাবু মৃদু হেসে যথাসৌজন্যে শুধু সিগারেটের ডিবেটা শ্রীমন্তের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন।—আসুন।

একটা সিগারেট অবশ্য তুলে নিল শ্রীমন্ত, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে প্রসঙ্গ থেকে সহজে রেহাই দিল না।—না অক্ষয়বাবু, আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই আপনার উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য? অক্ষয়বাবু তাঁর সম্পাদকীয় জীবনে এই প্রথম একটা অদ্ভুত কথা শুনলেন। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট যেন একটা প্রচণ্ড ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছে। উদ্দেশ্য? সম্পাদকের উদ্দেশ্য? পত্রিকার উদ্দেশ্য? আজ চার বছর ধরে স্বাক্ষরের মতো বাংলা পত্রিকার অন্তর্লোকে আনাগোনা করেও যে-মানুষ এখনো পত্রিকার উদ্দেশ্য জানবার কৌতূহল রাখে, তার জন্য কার না দুঃখ হয়? সত্যি, শ্রীমন্তের জন্য বড় দুঃখে হাসছিলেন অক্ষয়বাবু।

শ্রীমন্ত বললো—সমাজ সাহিত্য ও শিল্প প্রচারের পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছেন, অথচ একটা নীতি, একটা লক্ষ্য, একটা রুচি……।

একটা সমবেদনার উচ্ছ্বাসেই বাধা দিয়ে অক্ষয়বাবু বললেন—আছে আছে, সব আছে শ্রীমন্তবাবু।

শ্রীমন্ত—ফটোর নীচে আবার লিখে দিয়েছেন—ফটোশিল্পী বিজয়গুপ্ত। ছি ছি, কী ভাল্গারিজ্‌ম্ মশাই। ফটোগ্রাফার হলো শিল্পী। আরশুলা হলো পক্ষী? কুত্তার নাম বাঘা? কানার নাম পদ্মলোচন। মোষের নাম মহাশয়?

অক্ষয়বাবু—চা খাবেন? তার সঙ্গে টোস্ট? মরিচ দিয়ে? কেমন?

বহ্নিমান্ শ্রীমন্ত একটু স্তিমিত হয়ে এল। অনুযোগের সুরে বললো।—না, এসব বড় অন্যায় করছেন অক্ষয়বাবু। না দেখছেন পত্রিকার প্রেস্টিজ, না দেখছেন আমাদের মানসম্মান! কী পদার্থ আছে ঐ ফটোতে? বিজয়গুপ্তের তোলা ফটো, তার নাম আবার—'ফাগুন লেগেছে বনে বনে।' হাসালেন অক্ষয়বাবু।

অক্ষয়বাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—অবশ্য আপনাকে জানাতে বাধা নেই, ঐ ফটোটার খুব demand হয়েছে। নিউ-ইয়র্কের একটা পত্রিকার প্রতিনিধি আজই এসে ফটোগ্রাফারের ঠিকানা নিয়ে গেছে—ওরাও ফটোটা ছাপাতে চায়।

শ্রীমন্ত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে উল্লসিত হয়ে উঠলো—এই তো! এইখানেই চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেল। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের দেশের যা-কিছু বিদ্‌ঘুটে, বিদেশীদের কাছে তারই আদর বেশী। আজগুবী না হলে ওরা পছন্দই করবে না। নইলে ধরুন, বন্যমার্জারীর প্রেমাবেশ' নামে মিস্ মরুলতা মজুমদারের এমন উঁচুদরের নৃত্যটা বিদেশীদের কাছে কোন আদরই পেল না। অথচ, জংলী সাঁওতালী নাচ দেখে ওরা মুগ্ধ হয়ে যায়। বিদেশী রুচির কথা আর বলবেন না। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। ওরাই বিজয়গুপ্তকে চিনেছে।

অক্ষয়বাবু কিছু একটা বলবার জন্য মনে মনে তৈরী হচ্ছিলেন। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট আবার প্রশ্ন করলো—একটা ফটোর জন্য কত দক্ষিণা দেন বিজয়গুপ্তকে?

অক্ষয়বাবু।—সাড়ে চার টাকা।

শ্রীমন্ত বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকালো।—সাড়ে চার টাকা! লোকে তিন আনা পয়সা খরচ করে ষোল নম্বর বাসে চড়ে গড়িয়া পৌঁছে একটা খালের ধারে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকালেই স্পষ্ট দেখতে পাবে—ফাগুন লেগেছে বনে বনে। তার জন্য সাড়ে চার টাকা? অপব্যয়।

ফটোর মূল্য সাড়ে চার টাকা শুনে মনে মনে একটু খুসী হয়ে উঠছিল শ্রীমন্ত। অক্ষয়বাবু—কিন্তু মনে মনে ঠিকই জানছিলেন এবং দুঃখ করছিলেন—বিজয়গুপ্তকে গুণে গুণে দশটি টাকা দিতে হয়। কিন্তু সম্পাদকীয় স্ট্র্যাটেজি নামে একটি মনস্তাত্ত্বিক কৌশল আছে। দক্ষিণার ব্যাপারে তিনি দ্বন্দ্বী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের আগ্রহের ওপর প্যাঁচ দিয়ে একটি তত্ত্বকে সফল করে তুলতে জানেন অর্থাৎ অল্পে সুখস্বস্তি।

সুতরাং অক্ষয়বাবু আবার আরম্ভ করলেন—আপনার আঁকা ছবিটার মর্ম কিন্তু কেউ বুঝতে পারলো না শ্রীমন্তবাবু। অবশ্য পিওর আর্ট বোঝবার মতো লোক এই পোড়া বাংলা দেশে······।

শ্রীমন্ত বাধা দিল—কী বলছেন অক্ষয়বাবু? পৃথিবীতে যাঁকে একমাত্র সত্যি

কারের আর্ট-সমালোচক বলে জানি, সেই অধ্যাপক ত্রিদির ভট্টচাজ এই ছবি সম্বন্ধে কী লিখেছেন জানেন? তিনি লিখেছেন—'এই ছবির মধ্যে যে অব্যয়ীভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্বদেশের ও সর্বযুগের রস। সৃষ্টি একদিন মুছিয়া যাইবে, কিন্তু শিল্পী শ্রীমন্ত সেনের আঁকা এই অত্যাশ্চর্য ছবিটির আত্মার কখনো বিনাশ হইবে না।'

উৎসাহিত হয়ে অক্ষয়বাবু বললেন,—ঠিক কথা। খাঁটি কথা। এতক্ষণে জিনিসটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আগে এতটা বুঝতে পারিনি। ছবির নাম দিয়েছেন—'স্বর্গীয় মদের ফেনা', অথচ আকাশে একটা ভাঁড়ের মতো জিনিস উপুড় হয়ে রয়েছে।

শ্রীমন্ত—হ্যাঁ, ওটা হলো চাঁদ।

অক্ষয়বাবু—আর ভাঁড়ের মুখ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা উথ্‌লে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছে কেন?

শ্রীমন্ত—হ্যাঁ, ওটা হলো জ্যোৎস্না।

অক্ষয়বাবু—আশ্চর্য, আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি শ্রীমন্তবাবু। কী যে বলবো, শুধু বলতে হচ্ছে করছে—আশ্চর্য। হ্যাঁ, আপনার প্রাপ্য দক্ষিণাটা নিয়ে যান। এই নিন—আট টাকা দিলাম আপনাকে।

শ্রীমন্ত অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ প্রতিবাদ করার মতো কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না।—আট টাকা? বেশ তাই দিন। একটু ইতস্ততঃ করে টাকা কয়টা পকেটে পুরে সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে বের হয়ে এল শ্রীমন্ত।

ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিছেন অক্ষয়বাবু। ঘরে ঢুকলো ফটোগ্রাফার বিজয়গুপ্ত। দ্বিতীয় কিস্তি একটা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন অক্ষয়বাবু।

বিজয়গুপ্ত বললো—আবার আপনি জলছবি ছাপতে আরম্ভ করেছেন। স্বাক্ষরের সুনাম আর রইল না। আপনার পত্রিকা উঠে যাবে, অবধারিত।

অক্ষয়বাবু বিস্ময়ের ভান করে প্রশ্ন করলেন—জল ছবি?

বিজয়গুপ্ত—হ্যাঁ স্যর, শ্রীমন্ত আর্টিষ্টের আঁকা ছবি। কী হয়েছে ওটা? স্বাক্ষরের মতো কাগজে যদি ঐসব রঙীন রাবিশ ছাপান, তবে আমাদের বাদ দিন। আর্টিষ্টদেরই মাথার মণি করে রাখুন আপনি।

অক্ষয়বাবু লজ্জায় জিভ কাটলেন।—ছিঃ, ওরকম করে বলবেন না বিজয়বাবু। বিদেশের গুণী আর রসিকেরা শ্রীমন্ত সেনের ছবির কদর জানে। আজই নিউ ইয়র্কের একটা পত্রিকার প্রতিনিধি এসে 'স্বর্গীয় মদের ফেনা' ছাপবার জন্য তিনশো

টাকা দক্ষিণা দিয়ে শ্রীমন্ত সেনের অনুমতি নিয়ে গেছে। অথচ আমরা ঐ ছবির কতটুকু মূল্য দিতে পেরেছি, পাঁচটি টাকা মাত্র। এই তো?

বিজয়গুপ্তের উত্তেজনা হঠাৎ কেমন মিইয়ে এল। নেহাৎ অজ্ঞাতসারেই একটা সমবেদনার আভাষ যেন তার কথার মধ্যে ফুটে উঠলো—মাত্র পাঁচ টাকা, সে কী অক্ষয়বাবু?

অক্ষয়বাবু—হ্যাঁ বিজয়বাবু, এমন একজন আর্টিষ্টের আঁকা ছবির মূল্য পাঁচ টাকার বেশী দেবার সামর্থ্য নেই আমাদের। আর ধরুন, সত্যি কথা বলতে গেলে, আপনারা অর্থাৎ ফটোগ্রাফারেরা যা করেন, তার মধ্যে আর্ট বলে জিনিসের বালাই নেই। ভাল ক্যামেরা, ভাল ফটো —ব্যস্, আপনাদের কাজ হলো যন্ত্রের কাজ। তবু আপনার দক্ষিণা…।

বিজয়গুপ্তের সারা মুখে একটা রক্তাভ উচ্ছ্বাস দেখা যায়। সে সব সহ্য করতে পারে কিন্তু ফটোগ্রাফীর নিন্দা বরদাস্ত করা তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। বিজয়গুপ্তকে তাঁর ফটোগ্রাফার গুরু শিখিয়ে দিয়েছেন—ফটোগ্রাফী যন্ত্রের খেলা নয়, ফটোশিল্পীরাও শিল্পী, বরং তারাই নতুন যুগের শিল্পী। গুরুদত্ত সেই বাণীকে সম্পাদক অক্ষয়বাবু নিন্দে করে ভয়ানক ভুল করছেন। ফটোগ্রাফীর নিন্দা—এখানে কারও কাছে হার মেনে কোন আপোষ করতে রাজী নয় বিজয়গুপ্ত। নেহাৎ সহ্য করতে না পেরেই বিজয়গুপ্ত বললো—কথাগুলি সংযত করুন অক্ষয়বাবু।

অক্ষয়বাবু—বেশ বেশ, মাপ করবেন। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম আর্টিষ্ট যেমন কল্পনাকে রূপ দিতে পারে…

বিজয়গুপ্ত—ফটোশিল্পী বাস্তবের রূপ ধরে দিতে পারে।

অক্ষয়বাবু—আর্টিষ্টের তুলিতে যেন একটা অতীন্দ্রিয় রোমান্স আছে।

বিজয়গুপ্ত—ক্যামেরার সেলুলয়েডের চোখে সত্যের রোমান্স আছে।

অক্ষয়বাবু—আর্টিষ্টরা…

বিজয়গুপ্ত বাধা দিয়ে বললো—আর্টিষ্টরা বস্তুর ওপর মিথ্যার রূপ দেয়। ওটা রঙের ছলনা।

অক্ষয়বাবু—তাহলে ফটোগ্রাফারেরা…।

বিজয়গুপ্ত—ফটোগ্রাফারেরা মিথ্যার আবরণ সরিয়ে দিয়ে বস্তুর রূপ খুলে দেয়।

অক্ষয়বাবু আবেগভরে বলে উঠলেন—আশ্চর্য, আপনি আমাকে আশ্চর্য করে দিলেন বিজয়বাবু। এভাবে আমি কোনদিন ভেবে দেখিনি। আপনার কথায়

বুঝলাম সত্যিই আপনারা—কী বলবো। আপনারা হলেন—আর্টিষ্টরূপী শশক-জম্বুক সঙ্কুলিত মানব অরণ্যের শিল্পীকেশরী।

বিজয় গুপ্ত শান্ত হয়ে বললো—আজকের মতো উঠি।

সিগারেটের ডিবেটা এগিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে সম্পাদক অক্ষয়বাবু বললেন—আসুন। সেই প্রতিযোগিতার কথা স্মরণে রেখেছেন তো? উঠে পড়ে লাগুন এইবার, আর যে সময় নেই।

চলে আসবার আগে বিজয় গুপ্ত উৎসাহিত ভাবেই উত্তর দিল—নিশ্চয় মনে আছে। আসি নমস্কার।

কোনো একটি দেশকল্যাণ সমিতি থেকে একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে আর্টিষ্ট এবং ফটোগ্রাফারদের কাছ থেকে।—'অনশন ও বুভুক্ষার ফলে মানবতার চরম ক্ষতি কি হইতে পারে, এই বিষয়ে যে শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র অথবা তোলা ফটো সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে, সেই শিল্পীকে মাতৃমঙ্গল সমিতি পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবেন।'

স্বাক্ষর পত্রিকার তরফে সম্পাদক ও সত্বাধিকারী অক্ষয়বাবু অতিরিক্ত আরও একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। প্রতিযোগী শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং তোলা ফটো—সবই আগামী সংখ্যা স্বাক্ষরের কলেবর অলঙ্কৃত করে প্রকাশিত হবে।

আর্টিষ্ট বনাম ফটোগ্রাফার—প্রতিযোগিতাই শেষাশেষি একটা শ্রেণীদ্বন্দ্বের মতো হয়ে দাঁড়ালো। বহু আর্টিষ্ট যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সবচেয়ে বড় ভরসা শ্রীমন্ত সেন। শ্রীমন্তের হাতের তুলি দুর্বল নয়, তার কল্পনা অনুজ্জ্বল নয়। তার রঙে কত ব্যঞ্জনা, রেখায় কত দ্যোতনা ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীমন্ত আর্টিষ্ট চুপ করে বসে নেই। তার সমস্ত শক্তি ও প্রতিভাকে সংহত করে ষ্টুডিওর নিরালায় বসে এক রকম ধ্যানস্থ হয়ে আছে শ্রীমন্ত। রাত জাগতে হচ্ছে—স্নানাহার করতে ভুলে যাচ্ছে। আর্টিষ্ট সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব শ্রীমন্ত সেনের ওপর পড়েছে।

ফটোগ্রাফারেরাও কম উতলা হয়নি। ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে গেছে তারা। নিজের নিজের জয় পরাজয়ের কথা তারা ভাবে না। তারা শুধু কায়মনে প্রার্থনা করে ফটোগ্রাফার সম্প্রদায়ের জয় হোক্। অর্থাৎ বিজয়গুপ্তের জয় হোক্। বিজয়গুপ্তকে তারা শতভাবে প্রেরণা দিয়ে বলেছে—আমাদের মান সম্মান আপনার হাতে বিজয়বাবু। জলছবিওয়ালাদের কাছে যদি হেরে যাই, তবে এ জীবনে ক্যামেরা

আর স্পর্শ করবো না।

বিজয়কে তারা রোজই দেখছে। সকাল হতেই কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে পথে বের হয়ে পড়ে বিজয়গুপ্ত। কোন ত্রুটী করছে না সে। খোলা আকাশ, প্রভাতের সূর্যালোক, সন্ধ্যার রক্তিম মেঘ, কলকাতার উত্তপ্ত পথের রৌদ্রজ্বালা—এই তার ষ্টুডিও। ফুটপাতে, গাছতলায়, বস্তির অন্তরে—পথে প্রান্তরে মানবতার সেই চরম ক্ষতির দুর্লক্ষ্য চিহ্ন আবিষ্কারের যাত্রায় বের হয়েছে বিজয়গুপ্ত। ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই।

স্বাক্ষর পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। একটা তীব্র ঔৎসুক্যের স্পন্দন শত শত গ্রাহক পাঠক ও উৎসাহীর মনের অনুভব ছেয়ে রেখেছে ঠিক এই মুহূর্তটিতে। সদ্য প্রকাশিত স্বাক্ষরের পাতা উল্টিয়ে দেখছেন সমালোচকেরা। গ্রাহকেরা দেখছেন সাগ্রহে। মেসে বোর্ডিংয়ে ছাত্র হোটেলে লাইব্রেরীতে কৌতূহলী পাঠকের মাথার ভীড় স্বাক্ষর পত্রিকার ওপর ঠোকাঠুকি করছে। পরীক্ষকেরা প্রতিযোগী শিল্পীদের নামের তালিকা হাতে নিয়ে নম্বর দিচ্ছেন একে একে—ঠিক এই মুহূর্তটিতে।

প্রথম পৃষ্ঠা খুলতেই দর্শকের চোখের ওপর একটা বিচিত্র বর্ণরাগের আলিম্পন ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেনের আঁকা ছবি। দর্শকদের মনের গহন থেকে আপনা-আপনি একটা করুণতম আক্ষেপধ্বনি উৎসারিত হয়—আহা! যাঁরা একটু আবেগপ্রবণ তাঁদের চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। কী করুণ এই ছবি!

—পথের পাশে একটি গাছের ছায়ায় এক ক্ষুধাজীর্ণ ভিখারিণী বসে আছে। তার কোলে একটি মুমূর্ষু শিশু। শিশুটির অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। অস্থিসার ভিখারিণী মাতার বুকে শিশুপ্রাণের পানীয় সেই জীবতুষ্টির ধারা শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মুমূর্ষু শিশু তৃষ্ণার্ত্ত অধর শুধু শেষ বিদায়ের আক্ষেপে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। আর ভিখারী মাতার চোখ থেকে একটি দুটি করে তপ্ত মুক্তার মতো জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে শিশুটির অধরে।

ব্যর্থ মাতৃত্বের একটি সুকরুণ দৃশ্য। সার্থক ছবি। কোন সন্দেহ থাকে না, আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেনের জন্যই জয়মাল্যের পুরস্কার অবধারিত।

পরীক্ষকেরা পাতা উল্টিয়ে যান। পর পর কত ছবি, কত ফটো বিচিত্র পটক্ষেপের মতো পাঠক ও দর্শকদের চোখের ওপর দিয়ে চকিতে পার হয়ে যায়। কোন ছবি, কোন ফটো মনে ধরে না পরীক্ষকদের। শ্রীমন্ত সেনের আঁকা ছবির তুলনায় সবই নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে পরীক্ষকেরা কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্তের তোলা ফটো। শুধু পরীক্ষকেরা নয়, ঠিক এই মুহূর্তটিতে গ্রাহক পাঠক ও উৎসাহীর দল ঠিক এমনিভাবে ফটোর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকে। যুগ যুগান্তের প্রত্যয়ে লালিত একটি মোহ রূঢ় আঘাতে যেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। রূপকথা নয়, কল্পনা নয়, কিংবদন্তী নয়, কলকাতার পথের ওপর কুড়িয়ে পাওয়া একটি নিরলঙ্কার ছবি।

—এক শিশু সেবা-প্রতিষ্ঠানের দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের সামনে গাছের তলায় এক ভিখারী মাতা বসে আছে। তার কোলের ওপর মুমূর্ষু শিশু সন্তান। শিশুটির বুকের পাঁজরা থরথর্ করে কাঁপছে, বিস্ফারিত ঠোঁটদুটিতে বিদায়ী প্রাণবায়ুর শেষ সাড়া ফুটে উঠেছে। আর ভিখারিণী মাতা পরম প্রসন্নমনে এক মগ-ভর্তি দুধ ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে চলেছে।

শোকাহতের মতো পরীক্ষকেরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। লুপ্ত মাতৃত্বের একটি নিষ্ঠুর ছবি। মানবতার চরম ক্ষতি। শ্রেষ্ঠ ছবি।

পরীক্ষকেরা নম্বর দিলেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী—ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্ত। পুরস্কার ঘোষণা করলেন পরীক্ষকেরা।

ঠিক এই মুহূর্তটিতে আর্টিষ্ট শ্রীমন্ত সেন স্বাক্ষর পত্রিকাটিকে বন্ধ করে তুলে রাখলো। একটা মূর্চ্ছাভঙ্গের পর যেন হঠাৎ সে জেগে উঠেছে। রঙের তুলিগুলি একে একে ধুয়ে দেরাজে বন্ধ করলো। তারপর কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখলো।
—আমার অভিনন্দন জানবেন বিজয়বাবু।

অ ধী শ্ব রী

সে নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে কোন মুখরতা ছিল না। নাটকের মেয়েটি, যার নাম জয়া, সে তখন একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাসছে। কি অদ্ভুত শান্ত হাসি। হাসছে জয়ার চোখ দুটো, দুই অপলক কালো চোখের বড় বড় পাতার ছায়ার মধ্যে হাসিটা যেন নিবিড় হয়ে টলমল করছে।

অভিনয় দেখছেন যাঁরা তাঁদের সবারই চোখে নাটকের জয়ার এই শান্ত হাসি খুবই করুণ একটি দৃশ্য বলে বোধ হয়েছে। জয়ার স্বামী মানুষটা, যার নাম জয়ন্ত-

কুমার, সে এইমাত্র জয়ার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে, উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিয়ে, তারপর বেশ হাস্যময় ও প্রসন্ন একটি মুখ নিয়ে চলে গিয়েছে। জয়া জানে, তার স্বামী এই যে সন্ধ্যা হতেই বেলফুলের মালা হাতে জড়িয়ে আর ব্যস্ত হয়ে চলে গেল, আজ সারা রাতের মধ্যে সে মানুষের পায়ের শব্দের কোন সাড়া আর শুনতে পাওয়া যাবে না।

দর্শকদের কারও বুঝতে অসুবিধে নেই, জয়ার স্বামী জয়ন্তকুমার এখন কোথায় কার কাছে গেল। ভয়ানক এক রাতজাগা ফুর্তির ঘরে যেখানে এক হাতে গেলাস আর এক হাতে চাঁপা ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক রঙ্গিলা নারী তারই ঘুঙুরের শব্দের কাছে মন-প্রাণ লুটিয়ে দেবার জন্য চলে গেল জয়ন্তকুমার। কিন্তু জয়া কি এটা বোঝে না? খুব বোঝে। তবু কী আশ্চর্য জয়া হাসছে। হাসছে জয়ার দুটি অপলক কালো চোখ। দর্শকেরা দেখে বিস্মিত হয়েছেন, জয়ার শান্ত মুখের ও শান্ত চোখের ওই হাসির মধ্যে ওর জীবনের দুঃসহ করুণতার ছবিটা কত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

স্বামী চলে গিয়েছে। একা ঘরের ভিতরে তখন নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয়া। শান্ত হাসির সেই চোখ আর সেই মুখ নিয়ে জয়া তাকিয়ে আছে টেবিলের উপর রাখা ছোট একটি ফটোর দিকে। স্বামীর ফটো। ফটোর কাছে টাটকা ফুলের একটি তোড়া রেখে দিল জয়া।

হঠাৎ আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলো জয়া। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিল। দপ্ করে জ্বলে উঠলো সবচেয়ে কড়া আলোর বাতিটা। টেবিলের দেরাজ টেনে ভিতর থেকে বের করে নিল উলের একটা গোছা আর কাঁটা। দর্শকেরা এবার আরও বিস্মিত হয়ে দেখলেন, স্বামীর জন্য যে সোয়েটারের অনেকখানি বুনে রেখেছিল জয়া, তারই বাকিটা বুনতে শুরু করেছে। বাঃ!

সামনের সারিতে একটি চেয়ারে বসে অভিনয় দেখছেন যে মহিলা, যাঁর নাম ইন্দুলেখা, তাঁর চোখের তারা ঝিক করে হেসে ওঠে। তিনিও বলে উঠলেন—বাঃ!

এটাও বিস্ময়ের ধ্বনি, কিন্তু কী যে সেই বিস্ময়, সেটা ইন্দুলেখাই জানেন।

ইন্দুলেখার পাশের চেয়ারে বসে আছে যে ধীরাজ, সে কিন্তু শুধু ওই প্রশস্তির ধ্বনি শুনে বিস্মিত হয়। ইন্দুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে ধীরাজ—কী হলো?

ইন্দুলেখা—এই তো, এইরকমটি হলেই হয়।

ধীরাজ—কী হয়?

ইন্দুলেখা—ঠিক এইরকম শান্ত ও সরল একটি মেয়ে পাওয়া গেলে বড় ভাল হয়।

হেসে ফেলে ধীরাজ—বুঝলাম। ও মেয়ে কিন্তু নাটকের জয়া। সত্যি করে কোন জয়া নয়।

· ইন্দুলেখা—সেটা কি আর বুঝি না? তবু ভাবছি, নাটকের এই জয়ার মতো সত্যি কি কোন মেয়ে থাকতে পারে না?

মঞ্চে এখন অন্ধকার। অভিনয় শেষ হয়েছে। শুধু ড্রপসীনের নদীর নীল-জলের ঢেউ আলোকিত হয়ে কাঁপছে। দর্শকেরা হলঘর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছেন। ইন্দুলেখা আর ধীরাজও এখনি চলে যাবে।

কিন্তু দুই ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বিনীতভাবে ইন্দুলেখা আর ধীরাজের চোখের সামনে দাঁড়ালেন। জিতেনবাবু যিনি এই অভিনয়ের সব আয়োজন ও ব্যবস্থার কর্তা, তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে সঙ্গী ভদ্রলোকেরও পরিচয় জানিয়ে দিলেন। —আমি এই নাটকের সব ব্যবস্থার কাজ করেছি। আর, এই নির্মল, এই নাটকটি লিখেছে।

ইন্দুলেখা—খুব ভাল হয়েছে আপনাদের এই···কী যেন নাম নাটকটার?

জিতেনবাবু—'তবু দীপ জ্বলে'।

ইন্দুলেখা—সুন্দর হয়েছে। খুব ভাল অভিনয় হয়েছে ওই মেয়েটির, যার নাম জয়া।

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ, সবাই এই কথা বলছে।

ইন্দুলেখা—কে এই মেয়েটি?

জিতেনবাবু—আমাদেরই অফিস-স্টাফের একজন। টাইপিস্ট; এই তো, পুরো এক বছরও হয়নি, আমাদের এই কোম্পানীতে কাজ পেয়েছে শোভা।

ইন্দুলেখা—শোভা?

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ। শোভা হলো আমাদের বন্ধু এই নির্মলের বোন।

নির্মল হাসে—হ্যাঁ, শোভা কিন্তু আগে কোনদিন অভিনয় করেনি। এই প্রথম।

ইন্দুলেখাও হাসেন—তাই নাকি? আশ্চর্য! আমার মনে হচ্ছে, শোভা বোধ-হয় নাটকের জয়ার মতোই শান্ত ও সরল স্বভাবের মেয়ে।

জিতেনবাবু—আপনি ঠিক ধারণা করেছেন। শোভা নিজে অদ্ভুত শান্ত ও সরল স্বভাবের মেয়ে বলে জয়ার ভূমিকাতে ওর অভিনয়ও এত নিখুঁত হয়েছে।

ইন্দুলেখা ও ধীরাজকে দর্শকদের মধ্যে বিশেষ মাননীয় মনে করেন বলেই

নাটকের প্রযোজক আর স্বয়ং নাট্যকার দুজনেই একটু উৎসুক হয়ে, এবং নিশ্চয় দু'চারটে প্রশস্তির কথাও আশা করে এইরকম বিনীতভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন ও কথা বলছেন।

চা-বাগানের আর কয়লাখনির মেশিনারী তৈরী করে খুব বিখ্যাত হয়েছে ব্যারাকপুরের যে গ্রেগ অ্যাণ্ড রতনলাল, তাঁদেরই অফিসের স্টাফ 'তবু দীপ জ্বলে' নাটকের অভিনয় করেছেন। অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নন্দী সাহেবের কাছ থেকে বিশেষ অনুরোধের চিঠি নিয়ে ধীরাজের কাছে গিয়ে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন স্টোরের শঙ্করবাবু—আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে আসতেই হবে। তাই অনিচ্ছা থাকলেও নন্দীসাহেবের বিশেষ অনুরোধের মুখরক্ষা করবার জন্য ধীরাজ এই নাটক দেখবার অনুষ্ঠানে এসেছে। নাটক দেখবার কোন রুচি কিংবা আগ্রহ ধীরাজ ঘোষের ত্রিশ বছর বয়সের জীবনে কোনদিনও ছিল না, আজও নেই।

ধীরাজের সঙ্গে এসেছেন যে মহিলা, তাঁকে এই অফিসের কেউই চেনেন না। নন্দীসাহেব চেনেন না, শঙ্করবাবুও জানেন না। কিন্তু বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয়নি জিতেনবাবুর আর নির্মলের, এই মহিলা নিশ্চয় ধীরাজ ঘোষের কোন আপনজন হবেন। মহিলা বোধহয় বিধবা; কারণ সিঁথিতে সিঁদুর নেই। ধীরাজের চেয়ে বয়সে বেশ বড়ই হবেন মহিলা। ধীরাজ ঘোষের বয়স তিরিশ বছরের বেশি হতেই পারে না। কিন্তু এই মহিলাকে দেখে তাঁর বয়স খুব কম করেও চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বলে মনে হয়। মহিলার সিঁদুরবিহীন সিঁথির সামনের দিকের দু পাশের চুলের খানিকটা সাদা-কালোতে মেশানো। সুতরাং বয়স হয়েছে বৈকি। কালো পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ি, সাদা চিকনের ব্লাউজ, আর পায়ে সাদা চামড়ার জুতো, মহিলার সাজের এই সাদাটে সহজ-সরলতা খুবই চমৎকার একটা স্টাইল বলে মনে হয়।

নন্দীসাহেবও এলেন। নন্দীসাহেব বেশ উৎফুল্ল স্বরে হাসেন—কী ধীরাজ, নাটকটা তোমার বোধহয় ভালই লেগেছে?

জবাব দিলেন ইন্দুলেখা—খুব ভাল লেগেছে। বিশেষ করে জয়া মেয়েটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

নন্দীসাহেব—জয়া? তার মানে আমাদের টাইপিস্ট শোভা? তাই নয় কি জিতেনবাবু?

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দীসাহেব—শোভা সত্যি খুব ভাল মেয়ে।

জিতেনবাবু—খুব মৃদু স্বভাবের মেয়ে। শোভাকে কোনদিন আমরা একটু জোরে কথা বলতেও শুনিনি। ক্যাশিয়ার একবার ভুল করে শোভার মাইনের হিসাবে একশো কুড়ি টাকার মাত্র একশো টাকা দিয়ে বসে রইলেন। মেয়েটি এতই শান্ত যে, মুখ খুলে একবার বলতেও পারলো না, কুড়িটা টাকা কম হয়েছে।

ইন্দুলেখার চোখের তারা ঝিক করে হেসে ওঠে—তাই নাকি ?

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ। ক্যাশিয়ারই হিসাব মেলাতে গিয়ে ভুলটা নিজেই ধরলেন। তারপর শোভাকে ডেকে কুড়ি টাকা দিলেন।

নির্মল হাসে—আমাদের তিন ভাই বোনের মধ্যে শোভা একটু অন্যরকমের। আমরা দুই ভাই কতবার ভুল করে ওর ভাগের ভাত ডাল তরকারী চেটেপুটে খেয়ে ফেলি। কিন্তু শোভা কোনদিন ঠাট্টা করেও বলে না যে, আমরা কী ভুল করে ফেলেছি। শোভা না খেয়েই অফিসে এসেছে আর ফিরে গিয়ে রাত দশটায় ভাত খেয়েছে।

ইন্দুলেখা—আপনি কী করেন ?

নির্মল—আমি একটা প্রাইমারী স্কুলের টিচার।

জিতেনবাবু—নাটক লেখা হলো নির্মলের একটা শখের ব্যামো।

ইন্দুলেখা—না না, ব্যামো কেন হবে ? খুব ভাল নাটক লিখেছেন নির্মলবাবু।

জিতেনবাবু হেসে ওঠেন—আমার সন্দেহ হয়, শোভার স্বভাবের সঙ্গে মিল রেখে জয়া চরিত্রটি তৈরী করেছে নির্মল, যাতে শোভার পক্ষে জয়ার ভূমিকায় অভিনয় করা সহজ হয়।

নির্মল হাসে—জিতেনদার সন্দেহটা খুব মিথ্যে নয়।

ইন্দুলেখা—তাহলে তো বলতে হয়, শোভা একটি অসাধারণ শান্ত স্বভাবের মেয়ে।

জিতেনবাবু—কোন সন্দেহ নেই।

ইন্দুলেখা—নির্মলবাবুরা কোথায় থাকেন ?

জিতেনবাবু—সোদপুরে পঞ্চাননতলার কাছে।

নির্মল—পঞ্চাননতলাতেই আমাদের বাসা।

ইন্দুলেখা—আর কে কে সেখানে থাকেন ?

নির্মল—বাবা আর মা আছেন।

জিতেনবাবু—দুঃখের বিষয়, নির্মলের বাবা আর মা দু'জনেই রোগী মানুষ। প্রায় শয্যাশায়ী বললেই চলে।

ইন্দুলেখা—তাহলে তো বুঝতে হয়, বাড়ির সব কাজ শোভাকেই করতে হয়।

জিতেনবাবু—সব সব। রান্না-বান্না থেকে শুরু করে কুমড়ো গাছের পরিচর্যা পর্যন্ত সব কাজ শোভাই করে। শোভার কাজও কত নিখুঁত। সব সময় কাজ করছে, কিন্তু মুখে হাসি লেগেই আছে। আপনি শোভার কাজেরও কোন শব্দ শুনতে পাবেন না।

ইন্দুলেখা—শোভার বয়স খুব অল্প বলে মনে হয়েছে।

জিতেনবাবু—এই তো, দু'বছর আগে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে।

নির্মল—শোভার বয়স এখন কুড়ি কিংবা একুশ হবে, তার বেশি নয়।

ইন্দুলেখা—বাঃ, চমৎকার।

জিতেনবাবু—পঞ্চাননতলার প্রত্যেকেই বলেন, চমৎকার। কেশববাবু বলেন, তাঁর মেয়ে অরুন্ধতীকে বিয়ের দিনে এমনই সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল শোভা যে, অরুন্ধতীকে একটি অসাধারণ রূপসী মেয়ে বলে মনে হয়েছিল। অথচ অরুন্ধতী হলো নিতান্ত সাধারণ রকম চেহারার মেয়ে।

ইন্দুলেখা খুশি হয়ে হাসেন—শোভাকে তাহলে ভাল আর্টিস্ট বলতে হয়।

জিতেনবাবু—হ্যাঁ, বলতেই হয়।

ইন্দুলেখা—ভাল সাজাতে জানে যখন, তখন ভাল সাজতেও জানে নিশ্চয়?

জিতেনবাবু—নিশ্চয়। তা ছাড়া, দেখতেই তো পেলেন, সামান্য একটা লাল-পেড়ে তাঁতের শাড়িতে জয়াকে কী অদ্ভুত অপরূপ দেখাচ্ছিল। নয় কি?

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা এখন চলি। কিন্তু আপনি, কালই সকাল-বেলা আমাদের ওখানে একবার অবশ্যই আসবেন, জিতেনবাবু।

জিতেনবাবু—আজ্ঞে?

ইন্দুলেখা—আপনি একবার আসবেন। কথা আছে।

দুই

ব্যারাকপুরের এ বাড়ির দোতলার জানালার কাছে দাঁড়ালে গঙ্গার ঢেউ দেখতে পাওয়া যায়। বেশ বড় বাড়ি, তিনতলা বাড়ি। এ বাড়ির ষোল আনা মালিকানা স্বত্ব যাঁর, তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। তিনি হলেন ধীরাজের ছোট কাকা বিনোদ ঘোষ, যিনি এককালে রেলওয়ের কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। সত্তর বছর বয়সের ছোট কাকা বিনোদ ঘোষ এখন তাঁর উত্তরপাড়ার ছোট বাড়িতে একাই থাকেন আর গীতা পাঠ করে দিনযাপন করেন। স্ত্রী নেই, তিনি বিপত্নীক হয়েছেন কুড়ি বছর আগে। নিঃসন্তান বিনোদ ঘোষ এখন তাঁর এই একা-জীবনের ছোট বাড়িটার মধ্যেই শান্তির নীড় পেয়ে গিয়েছেন। বিনোদ ঘোষের মেজদার ছেলেরা

সকলেই ভাল রোজগারে মানুষ, সবারই বাড়ি আছে। তাই তিনি বলে রেখেছেন, তাঁর ব্যারাকপুরের ওই তিনতলা বাড়িটাকে তিনি বড়দার ছেলে ধীরাজকেই গিফ্‌ট্ করে দেবেন। বড়দা আর বড় বউঠান এই বাড়িতেই থেকে জীবন কাটিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের ওই এক ছেলে ধীরাজও ওই বাড়িতে থাকুক আর জীবন কাটিয়ে দিক।

হ্যাঁ, ধীরাজ যদি বিয়ে করে প্রকৃত সংসারী হয়, তবেই। তা না হলে একটা একা জীবনের জন্য এত বড় তিনতলা বাড়ি নিয়ে কী করবে ধীরাজ? না, তাহলে বাড়িটাকে কোন জনসেবার ট্রাস্টের কাছে সঁপে দিতে হবে।

এই বয়সে জয়ন্তী জুট মিলের ওয়ার্কস ম্যানেজার হওয়া ধীরাজের মতো ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ, যদি বালিগঞ্জের পিশেমশাই, অনন্তবাবুর সুপারিশের ও চেষ্টার জোর না থাকতো। অনন্তবাবু কিন্তু এই একটি বছরে অন্তত পাঁচবার খুব গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করেছেন—প্রায় দু'বছর হলো কাজ পেয়েছে ধীরাজ; কিন্তু এখনও বিয়ে করবার কোন ইচ্ছের কথা বলে না কেন? কী ভেবেছে ধীরাজ? এইভাবে একটা ইয়ের মতো জীবনটা কাটিয়ে দেবে? তবে এই দেড় হাজার টাকা মাইনের চাকরিটা ওর কোন্ দরকারের কাজে লাগবে?

ভবানীপুরের কাকার বাড়িতে গিয়ে পিসিমা কয়েকবার বেশ একটু তপ্ত হয়ে তাঁর একটা আপত্তির কথা বলেছেন।—ধীরাজ যদি বিয়ে করতে না চায়, তবে নাই বা করলো। কিন্তু ওই উড়ে এসে জুড়ে বসা বিধবাটি ওবাড়িতে থাকবে কেন? আছেই বা কেন?

করুণা-বউদি বলেন—কী করে বলি!

পিসিমা—কিন্তু ব্যাপারটা কি?

করুণা-বউদি—দুমকার নিশিবাবুর কথা আপনার মনে আছে?

—হ্যাঁ।

—নিশিবাবুর বাড়ির বাগানটাকে মনে পড়ে?

—হ্যাঁ।

—একদিন একটা হরিণ বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল, মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ, হরিণটা সারা বাগান ঘুরে ঘাস আর কচি গাছের পাতা খেতো, আমগাছের ছায়াতে ঘুমিয়ে পড়ে থাকতো।

—কিন্তু হরিণটা বাগানের ভিতরে ঢুকতে পেরেছিল কেন, জানেন কি?

—জানি বৈকি। মালীটা রাত্রিবেলা বাগানের ফটক বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। কাজেই খোলা রাস্তা পেয়ে হরিণটা…।

হেসে ফেললেন করুণা-বউদি—এই ব্যাপারটাও ঠিক ওই রকমের ব্যাপার।

পিসিমা ভ্রূকুটি করেন—কিন্তু ব্যাপারটা যে একটুও ভাল দেখায় না। ইন্দুলেখা চলে যাবে কবে?

করুণা-বউদি—সত্যিই যাবে কি?

পিসিমা—ইন্দুলেখা ওখানে থাকলে ধীরাজের বিয়ে কোন দিনই হবে কি?

করুণা-বউদি—বুঝতে পারছি না।

পিসিমা—ছি ছি।

দেয়ালের যেমন কান আছে, বাতাসেরও তেমনই মুখ আছে বোধহয়। এইসব আলোচনা ও মন্তব্যের অনেক কথা যেন হাওয়াই বার্তা হয়ে ইন্দুলেখার কানে পৌঁছে গিয়েছে। শুনে গম্ভীর হয়েছেন ইন্দুলেখা। কিন্তু পর মুহূর্তে হেসে উঠেছে তাঁর চোখের তারা।

ইন্দুলেখার চোখের তারার ভিতরে বোধহয় একটা হীরের কুচি লুকিয়ে আছে। নইলে হঠাৎ ওরকম ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠবে কেন বেয়াল্লিশ বছর বয়সের দুটো মেয়েলী চোখের তারা?

ঠিক কথা। মনে যখন বিষাদ, আশাটা হঠাৎ যখন অন্ধকার দেখে ভীরু হয়ে যায়, তখন বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যায় ইন্দুলেখার চোখ দুটো। আর নতুন আলো দেখতে পেয়ে আশাটা যখন সাহস পায় আর খুশি হয়, তখনই হেসে ওঠে তাঁর চোখের তারার ভিতরে লুকানো হীরের কুচি।

কিন্তু ইন্দুলেখার সম্পর্কে এইসব অভিযোগের মেঘ আর বেশী ঘনিয়ে উঠবার সুযোগ পেল না। ধীরাজের আপনজন এইসব কাকা পিসিমা আর বউদিরা শুনতে পেলেন ও জানতেও পারলেন যে, ধীরাজের বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ইন্দুলেখা। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এদিক ওদিক অনেক মেয়েও দেখেছেন। ইন্দুলেখার কাছ থেকে এঁরা সবাই উল্টো অভিযোগের চিঠি পেয়েছেন: আপনারা সবাই যদি চেষ্টা না করেন, তবে আমি একা কী করতে পারি? ধীরাজের বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজে খুঁজে আমি তো হয়রান হয়ে গেলাম। আপনারা একটু সচেষ্ট হলে এতদিনে কি একটি ভাল মেয়ে পাওয়া যেত না? নিশ্চয় পাওয়া যেত।

চিঠি পেয়ে এঁরা সবাই বেশ লজ্জাও পেয়েছেন। ইন্দুলেখাকে এতদিন ধরে খুবই ভুল বুঝেছেন তাঁরা। করুণা-বউদি লজ্জিত হয়ে বলেন—যাক, ভাগ্যি ভাল, আমি তেমন কিছু নিন্দের কথা বলিনি।

পিসিমা বলেন—একটু ভেবে চিন্তে নিন্দে করা উচিত ছিল।

করুণা-বউদি—সবচেয়ে ভয়ানক নিন্দের কথা বলেছেন সুহাসদি।

—কী বলেছে সুহাস ?

করুণা-বউদি—সুহাসদি বলেছিলেন, ইন্দুলেখা হলেন একটি রাজসাপ, আর ধীরাজ একটা চড়ুই পাখি। রাজসাপের চোখের দৃষ্টির সামনে চড়ুই যেমন মুষড়ে পড়ে আর রাজসাপেরই মুখের কাছে এগিয়ে আসে তেমনই···।

পিসিমা—থাম থাম। তুমি বলেছ হরিণ আর সুহাস বলেছে রাজসাপ। দুইই খুব অন্যায় কথা, খুব ভুল কথা।

ইন্দুলেখা জানেন যে, তিনি যদি ইচ্ছে না করেন তবে ধীরাজ কখনও কোন-দিনও বিয়ে করতে ইচ্ছে করবে না। সত্যি কথা, বিয়ে করতে ধীরাজের কোন ইচ্ছে তো নেইই, বরং ঘোর আপত্তি আছে। কিন্তু ইন্দুলেখা বুঝেছেন, ধীরাজের এইসব আপনজনের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করলে ধীরাজের খুবই ক্ষতি হবে। পিসেমশাই বেশী রাগ করলে ধীরাজের দেড় হাজার টাকা মাইনের চাকরিটাকেও তিনি মিথ্যে করে দিতে পারেন। সে জোর তাঁর আছে। ধীরাজ বিয়ে না করলে ছোট কাকা রাগ করে তাঁর এই তেতলা বাড়িটাকে খয়রাতী করে দিতে পারেন।

ধীরাজের মা মারা যাবার আগে তাঁর সব অলঙ্কার করুণা-বউদির কাছে রেখে দিয়ে রেজিস্টারী করা একটা ইচ্ছাপত্র রেখে দিয়ে গিয়েছেন। ধীরাজ যদি বিয়ে করে, তবে তাঁর সব অলঙ্কার ধীরাজের বউ পাবে। যদি বিয়ে না করে ধীরাজ, তবে সব অলঙ্কার ভবানীপুরের বাড়ির তিন বউ করুণা বিমলা আর অর্চনা পাবে। শুনেছেন ইন্দুলেখা, সে সব অলঙ্কারের সোনার ওজন দেড়শো ভরিরও বেশি। তা ছাড়া হীরের আংটি আর দু'জোড়া দুলও আছে। জড়োয়া হার আছে পাঁচটা। সুতরাং ধীরাজের বিয়ে না করার কোন মানে হয় না। আর ইন্দুলেখাই বা ধীরাজের বিয়ে না দিয়ে পারবেন কেন ? সব হারিয়ে ধীরাজ যদি একটা গাছতলার ধীরাজ হয়ে যায়, তবে তার পাশে বসে কতটুকু ছায়া পাবেন ইন্দুলেখা ? তার চেয়ে পুনার স্কুলবাড়ির ভাঙা থামের ছায়াটাও অনেক ভাল।

যে ইন্দুলেখা আজ ধীরাজের সুখ শান্তি আর কল্যাণের জন্য এত ভাবছেন দু'বছর আগেও সে ধীরাজের সঙ্গে তাঁর সামান্য চোখে দেখা একটা পরিচয়ের সম্পর্কও ছিল না। ধীরাজ শুধু শুনেছিল যে, বড় মামার বড়ছেলে মধুদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে যাঁর তাঁরই নাম ইন্দুলেখা। প্রায় দশ বছর আগের কথা, মেজমাসীর একটি চিঠি পেয়ে জানতে পেরেছিল ধীরাজ, মধুদা আর নেই। হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গিয়েছেন।

দশ বছর আগের একটি চিঠি থেকে পাওয়া খবরের সেই ঘটনা কবেই স্মৃতি-বিস্মৃতির একটা ঝাপসা ঘটনা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই দু'বছর হলো, মিলের কাজে

পুণাতে গিয়ে মিস্টার মজুমদারের কাছে শুনতে পেল ধীরাজ, মধুদার বিধবা স্ত্রী, ইন্দুলেখা পুণাতেই একটা মেয়ে-স্কুলের বাংলা টিচার হয়ে কাজ করেন, মাইনে আশি টাকা। ইন্দুলেখার সঙ্গে দেখা করে মাত্র একটি ঘণ্টার আলাপের পর বুঝতে পেরেছিল ধীরাজ, ইন্দু-বউদির আর এখানে পড়ে থাকা উচিত নয়। ইন্দুলেখা বলেছিলেন—আমার নিজের জন্য একটুও ভাবছি না; ভাবছি, তুমি কেন একেবারে একলাটি হয়ে পড়ে থাকবে? কোনদিনও তোমাকে দেখিনি, সে একরকমের ভাল ছিল। কিন্তু এর পর…।

ইন্দুলেখার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। তার কারণ ইন্দুলেখার জীবনে এইবার একটা নতুন ভাবনার কষ্ট দেখা দিল। এই সুদূর পুণাতে বসে ইন্দুলেখাকে রোজই ভাবতে হবে, ধীরাজ কেমন আছে? কাজের খাটুনির পরে বাড়িতে ফিরে এসে ধীরাজ এক পেয়ালা গরম চা খেতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না'কে জানে! ঠাকুর আর চাকরের যত্ন কি সত্যিই একটা যত্ন?

ইন্দুলেখার ঘরে বসে, গরম চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে আর ইন্দুলেখারই মুখের অদ্ভুত রকমের দুটি নরম ঠোঁটের দুঃখিত হাসিটার দিকে তাকিয়ে ধীরাজ হঠাৎ বলে ওঠে—না আমি তোমার কোন আপত্তির কথা শুনবো না ইন্দুবউদি। তুমি চল।

সেই যে পুনা ছেড়ে চলে এসেছেন ইন্দুলেখা, তারপর ব্যারাকপুরের এই বাড়িটাই তাঁর মন-প্রাণের ও হাতের সব যত্নের আশ্রম হয়ে উঠেছে। ধীরাজের বিছানার উপর আর পুরনো খবরের কাগজ ছড়িয়ে পড়ে থাকে না। আয়নার টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা আর থাকে না। পুরনো ময়লা ফার্নিচারের কিছুই আজ আর নেই। সব সরিয়ে আর বেচে দিয়ে নতুন সেগুনের ফার্নিচারে ঘর-গুলিকে সাজানো হয়েছে। মেজেতে নতুন কার্পেট, সিঁড়ির দু'পাশে ফুলের নতুন টব। ঠাকুর আর সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবার সুযোগ পায় না। চাকরকে দুবেলা প্রত্যেকটি ঘরের ধুলো মুছতে হয়। দিনে আর রাতে ধীরাজ কী খাবে কিংবা খাবে না, সেটা বিচার করে বুঝে দেখবার দায়িত্ব ইন্দুলেখারই। ধীরাজের কিছুই বলবার নেই, কিছু বলবার দরকারও হয় না। মাসের মাইনের দেড় হাজার টাকা ইন্দুলেখার হাতে ফেলে দিয়েই দায়মুক্ত হয়ে যায় ধীরাজ।

নিজের পছন্দ মতো সুখ শান্তি ও প্রীতির একটি স্বর্গ তৈরী করে নিয়েছেন ইন্দুলেখা। তার মধ্যে নিজের ইচ্ছার মন্দার কাননও তৈরী করে ফেলেছেন। তার মধ্যে পারিজাতও ফুটে উঠেছে। ইন্দুলেখার চেষ্টা ও যত্নের কোন ভুল হয়নি। তার সব ইচ্ছাই জয়ী হয়েছে।

ধীরাজও কম যত্নশীল নয়। ইন্দুবউদির সুখ-সুবিধার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত হয়ে আছে ধীরাজ। ইন্দুলেখা মুখ খুলে তাঁর মাথার কষ্টের কথাটা বলেন না, শুধু মাথাটাকে এক হাত দিয়ে ছুঁয়ে আর নীরব হয়ে শুয়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট। ধীরাজ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাখা হাতে নিয়ে ইন্দুলেখার মাথায় বাতাস দিয়ে দিয়ে তিনটি ঘণ্টা পার করে দিলেও ক্লান্ত হয় না ধীরাজ। ইন্দুলেখার কপালে ওডিকলোনের পটি লাগাতে গিয়ে ধীরাজের হাতটা খুব সাবধানে কাজ করে। হাতটা যেন তড়বড় না করে, ইন্দুবউদির ঘুম যেন ভেঙ্গে না যায়।

ইন্দুলেখা চান, ধীরাজও চায়, এ বাড়ির জীবনের এই সাজানো রূপের কিছুরই যেন নড়চড় না হয়। যেমনটি চলছে, ঠিক যেন তেমনটি চিরকাল চলতে থাকে। তাই ধীরাজের বিয়ে দিয়ে এমন একটি মেয়েকে এ বাড়িতে আনতে চান ইন্দু-লেখা, যে মেয়ে তাঁর এই সাজানো বাগানের মধ্যে একটি ফুল হয়ে ফুটে থাকবে। যেন একটা ঝড় হয়ে সব ওলট-পালট না করে দেয়।

বুঝতে পারেননি বালিগঞ্জের পিসিমা, উত্তরপাড়ার ছোটকাকা আর ভবানী-পুরের করুণা, কেন ধীরাজের বিয়ে হতে একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁরা আবোলতাবোল অনেক বাজে চিন্তার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এইবার তাঁরা শুনতে পেয়ে নিশ্চয় চমকে উঠবেন, এ বাড়ির রূপের বাগানে চমৎকার একটি শান্ত শোভার ফুল হয়ে ফুটে থাকতে পারবে, এমনই একটি মেয়ের খোঁজ পেয়ে গিয়েছেন ইন্দুলেখা। কী আশ্চর্য, মেয়েটির নামও শোভা।

জিতেনবাবুর সঙ্গে কাজের কথা নিয়ে যেদিন আলোচনা করলেন ইন্দুলেখা, তার পরের দিনই সোদপুরে গিয়ে শোভাকে তিনি দেখে এলেন। সোদপুরের সেই পঞ্চাননতলার একজন মনুবউদি এসে একেবারে উচ্ছসিত হয়ে ইন্দুলেখারই প্রশংসা করেছেন—সত্যিই আপনার চোখের প্রশংসা করতে হয় দিদি। আপনি খাঁটি জিনিস চিনতে জানেন। গরীব ঘরের মেয়ে বটে শোভা কিন্তু গুণে স্বভাবে ও রূপে এ মেয়েকে আপনাদেরই মতো মানুষের বাড়িতে ভাল মানায়।

আর সাতটি দিন পরেই শোভার সেই ভাগ্যের উৎসবটাকে দেখে সোদপুরের পঞ্চাননতলার সন্ধ্যাবেলার চাঁদটাও যেন খুশি হয়ে জ্যোৎস্না ছড়ালো আর হাসলো। প্রতিবেশী সনাতনবাবু বললেন—একেই বলে ভাগ্য।

তিন

ব্যারাকপুরের বাড়িতে ফুলশয্যার রাত্রিটাও আলোতে ভরে গিয়ে ঝলমল করে হেসে উঠলো। ধীরাজের আপনজন বলতে যাঁরা কলকাতাতে আছেন তাঁরা

সবাই এলেন। এমন কি বড়কাকার মেয়ে সুহাসিনীও তাঁর তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আর খুশি হয়ে শোভার সুন্দর মুখটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ইন্দুলেখা এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালেন, আর হাসলেন—কী দেখছেন সুহাসদি? স্বীকার করুণ এবার আপনার ঋষ্যশৃঙ্গ ভাইটির মনপ্রাণ উতলা করে দেবার মতো জিনিসটি আমি এনেছি।

সুহাসিনী বলেন—স্বীকার করছি ভাই। আগন্তুক অভ্যাগতদের হাসি-হল্লা আর মেয়েদের কলকণ্ঠের কাকলি নীরব হতে হতে রাত দশটা পার হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ হতে আর সবাই বিদায় নিয়ে চলে যেতে রাত এগারটা। তারপর নীরব তিনতলা বাড়িতে শুধু ফুলশয্যার ঘরে একটি বিহ্বল হাসির শব্দ বাজতে থাকে। গল্প করেন আর হাসতে থাকেন ইন্দুলেখা।

বিছানার উপরে একদিকে বসে আছে শোভা, আর-একদিকে ধীরাজ। ইন্দুলেখা একটা চেয়ার বিছানার কাছে টেনে নিয়ে আর বিছানারই উপর দুই কনুই রেখে গল্প বলতে থাকেন। সাতারার শিবাজীর দুর্গের গল্প, মোগলসরাইয়ের ওয়েটিং রুমের গল্প, আর বোম্বাইয়ের মারাঠী মেয়ে সৌদামিনীর বিয়ের গল্প। ধীরস্থির হয়ে আর চুপ করে বসে গল্প শোনে ধীরাজ, কিংবা গল্পের কথাগুলি শুনতে পাচ্ছে না বলেই ধীরস্থির হয়ে আর চুপ করে বসে আছে। কিন্তু হেসে উঠছে শোভা। দুই কালো চোখ একেবারে অপলক হয়ে আর নিবিড় হয়ে হাসতে থাকে।

সৌদামিনীর বিয়ের গল্পটি বলতে অনেক সময় নিলেন ইন্দুলেখা। গল্পটা যেন ফুরোতেই চায় না।...বিয়ের বাজনা বেজে উঠলো অনেক রাতে, এতক্ষণে বর এসেছে। বরের মাথার পাগড়ীর ঝালরের সঙ্গে ফুলের মালা দুলছে। এদিকে... ও কী, কাক ডাকছে বোধহয়। ভোর হয়ে গেল নাকি?

ঠিকই ভোর হয়ে গিয়েছে। ইন্দুলেখা বলেন—কী আশ্চর্য, কত শিগগির ভোর হয়ে গেল।

বিছানা থেকে নেমে পড়ে ধীরাজ। ইন্দুলেখা বলেন—তোমার বোধহয় এখুনি এক পেয়ালা চা চাই।

ধীরাজ—হ্যাঁ।

ইন্দুলেখা—তবে যাও, হাত মুখ ধুয়ে নাও।

ধীরাজ চলে যেতেই শোভার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর কথা বলেন ইন্দুলেখা—ঘুমোতে পারলে না বলে কষ্ট হলো না তো, শোভা?

শোভা—না।

ইন্দুলেখা—কষ্ট হয়েছে নিশ্চয় ?

শোভা—না, একটুও না।

হাসছে শোভার দুই কালো চোখ। ঠিক সেই হাসি, যে হাসি সেদিন নাটকের জয়ার চোখে দেখতে পেয়েছিলেন ইন্দুলেখা।

ফুলশয্যার এই রাত্রির পর আরও অনেক রাত্রি পার হয়ে যাবার পর আরও খুশি হলেন ইন্দুলেখা। শোভা সত্যিই শোভা। যেখানে যেমনটি করে এই শোভাকে সাজিয়ে আর বসিয়ে রাখছেন ইন্দুলেখা, শোভা ঠিক তেমনটি করে সেজে আর বসে থাকতে পারে। সকালবেলা, ঠিক আটটার সময় যখন ইন্দুলেখা আর ধীরাজ নিজের নিজের ঘর থেকে বের হয়ে এসে ড্রইংরুমের সোফার উপর বসে, তখন শোভাও তার ঘর থেকে বের হয়, আর ড্রইংরুমে এসে কোচের উপর বসে। সন্ধ্যাবেলাতেও এই নিয়ম। তিনজনের মেলা-মেশার আর গল্প করবার যা-কিছু অনুষ্ঠান সবই এই ড্রইংরুমের সকাল ও সন্ধ্যার দুটি আসর হয়ে দেখা দেয়। ধীরাজ কখন খাবার টেবিলের কাছে গিয়ে বসলো, কিংবা বাইরে বের হয়ে গেল, সে-সব ঘটনার কোন খবর রাখবার দরকার নেই শোভার। সে-সব ঘটনার দেখা-শোনা করবার জন্য ইন্দুলেখাই আছেন।

শোভা যেন মনে-প্রাণেও একেবারে সেই নাটকেরই জয়া। সেই অচঞ্চল শান্ত মুখ, চোখে সেই নিবিড় হাসি। সত্যি, এই শোভা একটি প্রশ্নহীন অস্তিত্ব। যেমন করে শোভাকে মানাতে চাইছেন ইন্দুলেখা, শোভা ঠিক তেমনই করে মানিয়ে চলেছে। যেদিন যে-শাড়ি পরতে বলেন ইন্দুলেখা, সেদিন সেই শাড়িই পরে শোভা। সোদপুরের পঞ্চাননতলার মেয়ে, একুশ বছর বয়স, সে যেন ব্যারাক-পুরের এই তিনতলা বাড়িতে শোভার ভূমিকা নিয়ে একটি সুন্দর স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে আছে; হাসছে বসছে আর ঘুরছে। বুঝতে পেরেছেন ইন্দুলেখা, যা আশা করেছিলেন তিনি, তার চেয়ে কিছু বেশিই পেয়ে গিয়েছেন।

বাতাসের মুখ আছে, বাতাসও কথা বলে। তাই আবার শুনতে পেয়েছেন ইন্দুলেখা, ছোটকাকা এইবার বাড়িটাকে ধীরাজের নামে গিফ্‌ট করে দেবার দলিল লেখাবার জন্য উকিলকে ডেকেছেন। ভবানীপুরের করুণা বলেছে, ধীরাজের মায়ের সব অলঙ্কার নিয়ে সে নিজেই শিগগির একদিন এ বাড়িতে আসবে। ইন্দু-লেখার ইচ্ছা ও আশার সব স্বপ্নই সফল হতে চলেছে।

বুঝতে পেরেছেন ইন্দুলেখা, অনেক রাতে কাঁরিডরের দুই প্রান্তের বিদ্যুতের বাতি দুটো যখন মৃদু হয়ে জ্বলে তখন শোভা তার ঘরের বাইরে পায়ের শব্দের

অনেক আনাগোনার কোন সাড়া শুনতে পায় না। শুনতে পেত যদি তবে বোধ-হয়, অন্তত কোনদিনও একবার দরজা খুলে ঘরের বাইরে উঁকি দিয়ে দেখতো। কিংবা কিছুই ধারণা করতে পারে না। নিজের ঘুম আর নিজের স্বপ্ন নিয়ে ঘরের ভিতরে একা শুয়ে থাকতেই ভালবাসে শোভা।

ইন্দুলেখা বলেন—সোদপুরের বাড়িতে যে চিঠি লিখবে, সে চিঠিটা একবার আমাকে দেখতে দিও, শোভা।

শোভা—আচ্ছা।

ইন্দুলেখা বলেন—সুহাসদি যদি কোনদিন এসে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছ শোভা, তবে তুমি তাঁকে কী বলবে, একবার বলতো, শুনি।

শোভা হাসে—আপনি বলে দিন, কী বলবো।

ইন্দুলেখার চোখের হীরার কুচি হেসে ওঠে—এই তো, ঠিক কথা বলেছ। এ বাড়িতে আমরা তোমার কাছ থেকে এইরকম কথাই আশা করি।…যাক, তুমি শুধু বলবে, খুব ভাল আছি, ইন্দুদি থাকতে আমার ভাল না-থাকবার সাধ্যি কী?

হেসে ওঠে শোভার শান্ত নিবিড় কালো চোখ। শোভা বলে—তাই বলবো।

ড্রইংরুমে বসে গল্প করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ইন্দুলেখা—তুমি কি আগেও কখনও অভিনয় করেছিলে, শোভা?

শোভা—না।

ধীরাজ হাসে—লায়লা রিজিয়া মৃণালিনী কিংবা শৈব্যা হওনি কোনদিন?

শোভা—না।

ধীরাজ—শুধু ওই এক জয়া?

শোভা—হ্যাঁ।

ধীরাজ—তাহলে আর কী করে বলি যে, তুমি খুব ভাল অভিনয় করতে পার?

ইন্দুলেখা—আর অভিনয় করবার দরকার তো নেই। তবে হ্যাঁ, যদি লায়লা-টায়লা সেজে এই ঘরে মাঝে মাঝে বসে থাকে শোভা, তবে আমোদটা মন্দ হয় না।

ধীরাজ—তা ওরকম করে সাজতে টাজতে পারে নিশ্চয়ই শোভা। কী যেন তার নাম যাকে বিয়ের দিনে তুমি নিজের হাতে সাজিয়ে খুব রূপসী করে দিয়েছিলে?

শোভা—অরুন্ধতী।

ধীরাজ—তবে তুমি নিজে একটা লায়লা কিংবা মৃণালিনীর মতো সাজতে

পারবে না কেন? খুব পারবে।

শোভা—যাকে কখনও দেখিনি, তার মতো সাজবো কেমন করে?

ইন্দুলেখা—তবে তাদেরই মতো সাজ করে দেখাও, যাদের দেখেছো। এই ধর সুহাসদির মেয়ে বরুণা সেদিন যেমন সেজেছিল তুমি একদিন ঠিক ওইরকম খোঁপার মুকুট করে, তার সঙ্গে জুঁইয়ের মালা জড়িয়ে একেবারে বরুণাটি হয়ে আমাদের আশ্চর্য করে দাও তো, দেখি।

শোভা—আমি বরুণাকে ভাল করে দেখিনি।

ইন্দুলেখা চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন—ও হরি, আগে ভাল করে দেখতে হবে?

শোভা—তা না হলে···।

ইন্দুলেখা—তবে আর কী বলা যায়। তুমি ভাল আর্টিস্ট নও, শোভা।

শোভা—আমি কিন্তু ঠিক আপনার মতো সাজতে পারি।

—অ্যাঁ? কী বললে, ঠিক আমার মতো?

শোভা—হ্যাঁ।

—কালো পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ি পড়লেই কি ইন্দুদি হওয়া যায়? অসম্ভব।

শোভা—কেন সম্ভব নয়, ইন্দুদি?

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন ইন্দুলেখা—শোন বোকা মেয়ের কথা! কালো পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ি না হয় পেলে। কিন্তু কোথায় পাবে ইন্দুদির এই দুই ঠোঁট, এই চকচকে চোখ আর এইরকম দুটি নিটোল হাত? আমি বলবো, তুমি চেষ্টা করলে লায়লা হতে পারবে, রিজিয়া শৈব্যাও হতে পারবে। কিন্তু শত চেষ্টার তপস্যা করলেও ইন্দুদি হতে পারবে না।

ধীরাজ রুমাল তুলে মুখের উচ্ছসিত হাসিটাকে চাপা দেয়। ধীরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শোভা। একুশ বছর বয়সের দৃষ্টিটাই হঠাৎ যেন একটা নিথর নিরেট জিজ্ঞাসা হয়ে ধীরাজকে দেখছে।

চার

অনেক রাত, ঘুম আসেনি তাই বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পায় শোভা, ঘরের বাইরের পায়ের শব্দটা ওদিক থেকে এসে করিডরের শেষদিকে ইন্দুদির ঘরের দিকে চলে গেল। তারপর শুধু গঙ্গার জলের শব্দ শুনতে থাকে শোভা। বোধহয় গঙ্গাতে বান এসেছে।

সকালবেলা ড্রইংরুমে এসে ঢুকতেই ইন্দুলেখা বললেন—আজ বিকেলে শকসেনা

সাহেবের বাড়ির মেয়েরা আসবেন, শোভা। আজ কেমনটি সাজবে, বল?

শোভা—বলে দিন।

ইন্দুলেখা—সালোয়ার পায়জামা আর ওড়না পরবে?

শোভা—হ্যাঁ।

ইন্দুলেখা—বেনী রাখবে, না খোঁপা রাখবে?

শোভা—বলে দিন।

ইন্দুলেখা—আমার মনে হয়, বেণীই ভাল। তোমার মতো বয়সের মেয়েকে বেণীতেই ভাল মানায়।

শোভা—আচ্ছা।

বিকেলের রোদের আভা লেগে ড্রইংরুমের জানালার কাঁচ যখন সোনালী হয়ে জ্বলছে, ঠিক তখন উপস্থিত হলেন মিসেস শকসেনা ও তাঁর দুই শ্যালিকা। শোভাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মিসেস শকশেনা।—বাঃ, সুন্দর। আমি তো দেখে বুঝতেই পারিনি যে, এই কচি মেয়েটি হলো ঘোষসাহেবের ওয়াইফ।

ইন্দুলেখা হাসেন—বয়স কিন্তু একুশ বছর।

মিসেস শকসেনা—কিন্তু দেখে তো ষোল বছর মনে হয়।

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ, তাই মনে হয়। বয়স একুশ বছর হলেও এই মেয়ের প্রাণটা সত্যিই একেবারে ষোল বছর বয়সের মেয়েটির মতো।

মিসেস শকসেনা—খুব ছটফটে?

ইন্দুলেখা—না না, একটুও ছটফটে নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। খুব শান্ত, খুব সরল স্বভাবের মেয়ে।

মিসেস শকসেনা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর ইন্দুলেখা হাসতে থাকেন—মিসেস শকসেনাকে ভাল করে দেখেছো তো, শোভা?

শোভা—হ্যাঁ।

ইন্দুলেখা—তবে একদিন ওইরকমটি ভারী জর্জেট পরে আর মুখে পাঁচ খিলি পান পুরে গালটি ফুলিয়ে নিয়ে মিসেস শকসেনা হয়ে যাও।

শোভা—কিন্তু…।

ইন্দুলেখা হাসেন—বুঝেছি, সম্ভব নয়। মিসেস শকসেনার মতো অমন একটি ভুঁড়ি পাবে কেমন করে?

হেসে ফেলে শোভা—না, সেকথা বলছি না। বলছি মিসেস শকসেনার মুখের হাসিটি বেশ সুন্দর।

বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ শুনেই সোফা থেকে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন ইন্দুলেখা—এ কি? ধীরাজ এল নাকি?

হ্যাঁ, ধীরাজই এসেছে। ঘরে ঢুকেই হেসে ফেলে ধীরাজ—এ কী, এ আবার কোন সঙ? সালোয়ার পায়জামা আর ওড়না?

ইন্দুলেখা—আমি বলেছি, তাই শোভা এইরকমটি সেজেছে। মিসেস শকসেনা এই কিছুক্ষণ হলো চলে গেলেন।

ধীরাজের হাতে একটা চিঠি। চিঠিটাকে শোভার হাতের উপর ফেলে দিয়ে ইন্দুলেখারই পাশে সোফার উপর বসে পড়ে ধীরাজ—গ্রেগ অ্যাণ্ড রতনলালের অফিসের স্টাফ আবার 'তবু দ্বীপ জ্বলে' প্লে করবার ব্যবস্থা করেছে। নন্দী সাহেব আবার বিশেষ অনুরোধ করে নাটক দেখবার নেমতন্ন করেছেন। এ ছাড়া তাঁর আরও একটা অতিবিশেষ ইচ্ছের অনুরোধ হলো, শোভা যেন আবার নাটকের জয়া হয়ে অভিনয় করে যায়। স্টাফেরও সবারই তাই ইচ্ছে।

ইন্দুলেখা—কবে হবে অভিনয়?

ধীরাজ—আজই। নন্দী সাহেব লিখেছেন, জিতেনবাবুও টেলিফোনে অনেক মিনতি করে বলেছেন, শোভা যেন একটু আগভাগে বিকেল থাকতেই চলে আসে। অভিনয়ের পার্ট একটু রিহার্স করে নেবার দরকার হবে।

ইন্দুলেখা—বেশ তো, শোভা তাহলে আর দেরি না করে এখনই চলে যাক। আমরা ঠিক সন্ধ্যা হলেই যাব কী বল শোভা, তোমার কী ইচ্ছে?

শোভা—আপনি যা বলবেন।

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ, গাড়ি তৈরী হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। চারটে বাজতে আর বেশি দেরিও নেই। তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গাড়িটা ফিরে আসুক। তারপর আমরা দুজন··· ।

শোভা—আমি কি এইরকম সালোয়ার পায়জামা পরেই··· ।

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? অভিনয় শেষ হলে তুমি তো আমাদেরই সঙ্গে ফিরে আসবে।

শোভাকে নিয়ে গাড়িটা যখন চলে গেল তখন বিকেল চারটা। আর ফিরে এসে ইন্দুলেখা আর ধীরাজকে নিয়ে গাড়িটা যখন অভিনয়ের হলঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন ঠিক ছ'টা। অভিনয় শুরু হলো যখন, তখন ঠিক সাতটা। আর নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটা যখন দেখা দিল, তখন রাত দশটা।

কিন্তু এ কী ব্যাপার? এ কেমন শেষ দৃশ্য? নাটকের জয়ার কালো চোখে তো কোন শান্ত-নিবিড় হাসি টলমল করে না। কালো চোখ থেকে যেন বিদ্যুৎ

ঠিকরে পড়ছে।

জয়ার স্বামী জয়ন্তকুমার হেসে হেসে চলে যেতেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে ঘরের দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল জয়া। তারপর টেবিলের উপর থেকে স্বামীর ফটোটাকে তুলে নিয়ে ঘরের মেজের উপর একটা আছাড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঝন ঝন করে বেজে উঠলো ভাঙা ফটোর কাঁচ।

আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে জয়া। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট। অদৃশ্য এক আগন্তুকের পায়ের শব্দ শোনা যায়। ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে সেই শব্দ। ঘরের দরজার পাটের উপর অদৃশ্য আগন্তুকের ছায়াটা একেবারে সুস্থির হয়ে লেগে রইল। জয়া বলে—কে? অদৃশ্য আগন্তুকের ছায়াটা বলে—আমি বিকাশ। তোমার মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তোমাকে নিতে এসেছি, জয়া।

চেঁচিয়ে ওঠে জয়া—আপনি? আপনি এসেছেন? আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন? ভেবেছিলেন, জয়া বুঝি মরেই গিয়েছে।

—না, তা ভাবিনি। তুমি চল।

—চলুন।

নাটক শেষ। মঞ্চে অন্ধকার। ড্রপ সীনের নদীতে নীল জলের ঢেউ কাঁপছে। দেখতে পায় ধীরাজ, শোভার দাদা নির্মল দূরে দাঁড়িয়ে জিতেনবাবুর সঙ্গে কথা বলছে।

ইন্দুলেখা খুব বিরক্ত, আর ধীরাজ বেশ উত্তেজিত। দু'জনের দুই অপ্রসন্ন মূর্তি বেশ ব্যস্ত হয়ে হেঁটে আর এগিয়ে জিতেনবাবু ও নির্মলের কাছে এসে দাঁড়ায়।

ইন্দুলেখা ভ্রূকুটি করেন—এটা আবার কী রকমের তবু দীপ জ্বলে?

নির্মল—শেষ দৃশ্যটা বদলাতে হয়েছে।

ইন্দুলেখা—দৃশ্যটা খুবই খারাপ হয়েছে।

নির্মল—কিন্তু সবাই বলছেন, ভাল হয়েছে।

ধীরাজ—যাচ্ছেতাই হয়েছে। যাকগে, শোভাকে ডেকে দিন, আমরা এখনই বাড়ি চলে যাব?

নির্মল—শোভা বাড়ি চলে গিয়েছে।

চমকে ওঠেন ইন্দুলেখা—বাড়ি চলে গিয়েছে? কোন্ বাড়িতে গিয়েছে।

নির্মল—সোদপুর পঞ্চাননতলার বাড়িতে।

ইন্দুলেখা—কেন? এরকম করে না বলে-কয়ে শোভার সোদপুরে চলে যাবার কোন কথা তো ছিল না।

নির্মল—চলে যখন গিয়েছে, তখন আর কী করবেন। আপনারা দু'জনে বাড়ি চলে যান।

ইন্দুলেখা—সে কী? এ কী রকমের অদ্ভুত কথা। ধীরাজ একা বাড়ি ফিরবে?

নির্মল—একা ফিরবে কেন? আপনিই তো সঙ্গে আছেন।

ইন্দুলেখা—কিন্তু ব্যারাকপুরের বাড়িতে কবে ফিরে যাবে শোভা?

নির্মল—কোনদিনও না।

ধীরাজ চেঁচিয়ে ওঠে—আমি জানতে চাই, কে ওই বিকাশ?

নির্মল—বিকাশ হলো বিকাশ। নাটকের বিকাশ।

ধীরাজ—কিন্তু আমি জানতে চাই, লোকটা কে?

নির্মল—একদিন জানতেই পারবেন।

দুই চোখ অপলক করে ধীরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, আর হাঁপাতে থাকেন, ইন্দুলেখা। যেন গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটা নিরেট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন। কুঁচকে গিয়েছে তাঁর নরম ঠোঁট, আর চোখের তারার ভিতরে লুকানো সেই হীরের কুচিটা বোধহয় মাটির কুঁচি হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ গোধূলি

ওদের দু'জনকে পাশাপাশি একসঙ্গে দেখলে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয়। অলকা আর প্রশান্ত যেন একই ছন্দে একই কবিতার দুটি চরণের মতো মিলে গেছে। দু'জনে পাশাপাশি থাকলে তবেই ওদের দু'জনকে এত সুন্দর দেখায়। বর্ষাকালের জলভরা পুকুরের পাশে একটি পুষ্পিত ঝুমকো জবার গাছের মতো, ওরা নিজের গুণেই যেন পরস্পরকে রূপ ধার দিয়ে এতটা সুন্দর করে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছে। নইলে, শুধু একটা জলভরা পুকুর কিই-বা এমন সুন্দর! একটা ঝুমকো জবার গাছের একলা রূপের মধ্যে তাকিয়ে দেখবার মতো এমন কিই-বা আছে?

বিয়ের পরেই আগ্রাতে বেড়াতে গিয়েছিল দু'জনে। তাজমহলের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একজন আমেরিকান টুরিষ্ট আচমকা সামনে এসে দাঁড়ালো। ইশারায় অনুরোধ জানালো—এক মিনিটের জন্য একটু থেমে থাকতে। ক্লিক্ ক্লিক্! উৎফুল্ল পাখির মতো টুরিষ্টের ক্যামেরা যুগল-রূপের দিকে তাকিয়ে একবার ডেকে উঠলো।

চৌরঙ্গীতে বাসের প্রতীক্ষায় ওরা দুজনে একটা স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'একটা বেহায়া টমি একরোখা কেউটের মতো শিষ দিতে দিতে এগিয়ে আসে। একেবারে সামনে এসে পড়তেই, অলকা ও প্রশান্ত একসঙ্গে তাকায়। কেউটে টমি চকিতে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। দূরে এগিয়ে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভীরু চোখ তুলে দেখে—কালা আদমির দেশে কোন শিল্পী যাদুকরের তৈরী এক-জোড়া মোহ যেন পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু চেহারার জন্য নয়, শুধু গুণ মান শিক্ষা ও বিত্তের জন্য নয়, ওরা সবচেয়ে সুখী ওদের ভালবাসার জন্যই। এই ভালবাসাকে ক্ষণিকের জন্য বিচলিত করতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোন ছলনা আছে বলে ওরা বিশ্বাস করে না।

সুতরাং, নিজের সম্বন্ধে প্রশান্তের ধারণা যদি তার মনের ভেতর একটি সুশোভন স্পর্দ্ধায় ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে, তবুও তাতে দোষ দেওয়া যায় না। অলকা যদি আত্মবিশ্বাসে একটু বেশি সাহসী হয়ে উঠতে থাকে, তবে তাতে নিন্দে করার মতো বিশেষ কিছু থাকতে পারে না।

প্রশান্ত এক এক সময়ে বলে—অলকা, তুমি কল্পনা করতে পার, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি। আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে, তার হাতটা এভাবে তোমার গলা জড়িয়ে আছে!

অলকা প্রশান্তের হাতটা সজোরে টেনে নামিয়ে দেয়—এরকম বিশ্রী কথা বলবে তো আমায় ছুঁতে পাবে না।

প্রশান্ত হাসতে থাকে। তার সুপুরুষতার মূল্য আর মর্য্যাদা অলকার কাছে মাঝে মাঝে এইভাবে নেহাৎ রসিকতার ছলেই সে যাচাই করে নেয়। অলকা রাগ করে, কিন্তু প্রশান্তের বেশ লাগে।

প্রশান্তের একবার জ্বর হয়েছিল। একটি নার্স রাত জেগে প্রশান্তকে শুশ্রূষা করতো। নার্সটি দেখতে সুন্দর, তার ওপর বেশ ভদ্র আর লাজুক। ওষুধ খাওয়া-বার সময় নার্স প্রশান্তের মাথাটা হাত দিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরতো। নার্সের আগ্রহ ভরা দু'চোখের দৃষ্টি প্রশান্তের মুখের ওপর ঝুঁকে থাকতো। অলকা সবই দেখতো, তবু তার মনের কোণে কোন মেয়েলি অভিমানে একটুও অস্বস্তির খোঁচা লাগাতো না। অলকার কাছে এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। অলকা জানে, প্রশান্তের মনে একতিল জায়গাও আর খালি পড়ে নেই। সব ঠাঁই জুড়ে বসে আছে স্বয়ং অলকা। প্রশান্তের সঙ্গে বের হয়ে, পথে ট্রামে বাসে কতবার কত সত্যিকারের রূপসী চোখে পড়েছে অলকার, কিন্তু অলকা দেখেছে, প্রশান্ত তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না।

দেশ বিদেশের নাম-করা অ্যাথলেটদের ছবির একটা অ্যালবাম এনে একদিন প্রশান্ত অলকাকে দেয়।—নাও, বসে বসে দেখ। এক একটি চেহারা দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে তোমার।

অলকা অ্যালবামটা একবার উল্টিয়েদেখেই টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়—ভারী সব ছিরি! এসব দেখবার কোন গরজ নেই আমার, তোমার সাধ থাকে তুমি দেখ।

প্রশান্তর চোখে অদ্ভুত এক তৃপ্তি, এবং সেই সঙ্গে একটু গর্বও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই রসিকতাগুলি নেহাৎ তুচ্ছ, কিন্তু তার মধ্যে যেন এক পরম বিশ্বাস বার বার পরীক্ষায় মাজাঘষা হয়ে খাটি সোনার মতো আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই প্রশান্ত এত খুশী! প্রশান্তের আত্মশ্রদ্ধা অলকার সমাদরের জলবাতাসে সতেজ চারাগাছের মত ঊর্ধ্বে মাথা ঠেলে উঠেছে। সুন্দরী অলকার কাছে পৃথিবীর সব পুরুষ মিথ্যে, রূপেগুণে, ব্যক্তিত্বে ও প্রেমিকতায় সত্য হয়ে মাত্র একটি পুরুষ অলকার কাছে নিশ্বাসবায়ুর মতো মনপ্রাণ ছেয়ে আছে। সে হলো অলকার স্বামী প্রশান্ত। এই উপলব্ধি প্রশান্তের কথাবার্তায় ঠাট্টায় রসিকতায় এক সবিনয় ঔদ্ধত্যের নেশা এনে দিয়েছে। প্রশান্ত সেটা বুঝতে পারে না বোধহয়। কিংবা বুঝতে পারলেও ভাল লাগে।

প্রশান্তকে যদি পুরুষোত্তম বলা যায়, তবে প্রশান্তের বন্ধু শঙ্করকে অপৌরুষের না বলে উপায় নেই। রোগা কালো টাকপড়া মাথা, কপালের ওপর চার পাঁচটা বসন্তের দাগ। জীবন বীমার দালালী করে শঙ্কর। সামান্য রোজগার। লেখাপড়া হয়তো সামান্য কিছু জানে।

শঙ্কর প্রায়ই সন্ধ্যার সময় প্রশান্তের বাড়ি একবার ঘুরে যায়। প্রশান্তের সঙ্গে অনেক পদস্থ ও সম্পন্ন লোকের জানাশোনা আছে! তাদের একটু বলে কয়ে দিলেই শঙ্কর দু'একটা জীবন বীমার মক্কেল পেয়ে যায়।

শঙ্কর করুণার পাত্র সন্দেহ নেই। প্রশান্ত তাই এই গরীব বন্ধুকে সাহায্য করতে কুণ্ঠা করে না। অলকাও তার যথাসাধ্য করে। চা-জলখাবার না খাইয়ে সে কখনো শঙ্করকে উঠতে দেয় না।

অলকা ও প্রশান্ত এক একদিন বেড়িয়ে ফিরে দেখে, শঙ্কর বৈঠকখানার ঘরে একা একা বসে আছে, রাত নটা বেজে গেছে যদিও। ওরা আসা মাত্র শঙ্কর গাত্রোত্থান করে। প্রশান্ত বলে—আরে, এতক্ষণ যখন ধৈর্য ধরে বসেই আছ, তখন আর পাচ মিনিট বসে যেতে দোষ কি? বসো বসো।

অলকা প্রশান্তের একটা ইশারা বুঝতে পারে। একটা ডিসে কিছু খাবার সাজিয়ে এনে শঙ্করের সামনে রাখে।

এ ছাড়া শঙ্করকে নিয়ে আর একটা ব্যাপার প্রায়ই হয়ে থাকে। হাসাহাসি আমোদের চর্চা।

শঙ্করকে নিয়ে প্রশান্ত প্রায়ই রগড করে। বিয়ের পর থেকে প্রশান্তের এই খেয়ালটা আরও বেশী প্রবল হয়ে উঠেছে।

এক-একদিন প্রশান্তের মাথায় যেন রগড়ের একটা ভূত এসে ভর করে। শঙ্কর ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তবু অদ্ভুত এক পুলকে মাতাল হয়ে প্রশান্ত বলতেই থাকে —যদি নেহাত বিয়ে করতে হয় শঙ্কর, তবে প্রেম করে বিয়ে করবে। নইলে আমার মতো পস্তাতে হবে!

পস্তাতে হবে। নিছক রঙ্গ করেই এত বড় একটা মিথ্যা না বলে নিলে প্রশান্ত যেন তার পরিণয়ে কৃতার্থ জীবনের সত্যটিকে চরম করে অনুভব করতে পারে না।

অলকা এসে ঘরে ঢোকে। প্রশান্তের রসিকতা আরও উদ্বেল হয়ে ওঠে— তুমি জান না অলকা, শঙ্কর এযাবৎ তিনবার প্রেমে পড়েছে। ওর দোষ নেই। নায়িকারাই মরিয়া হয়ে ওর পেছনে লেগেছিল। শঙ্করের উপেক্ষায় একটি ভগ্ন-হৃদয় তরুণী তো আজ পর্যন্ত বিয়েই করলেন না!

সবই নিছক মিথ্যা, তৈরী করা কাহিনী মাত্র। নগণ্য শঙ্করের জীবনে নিতান্তই অলীক উপকথার কতগুলি বিদ্রূপ। তবু এসব কথা বলে প্রশান্ত কি যে আনন্দ পায় তা সে-ই জানে।

অপ্রস্তুত শঙ্কর সত্যিই লজ্জায় আরও কুৎসিত হয়ে ওঠে। অলকা সামনে বসেই সব শুনছে, হয়তো সব বিশ্বাস করে ফেলেছে! শঙ্কর প্রশান্তকে ধমকের স্বরে আপত্তি জানায়—কি সব বাজে কথা বলছো প্রশান্ত? তোমার আর মাত্রা-জ্ঞান নেই।

অলকার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে শঙ্কর চোখ নামিয়ে নেয়। অলকা শান্তভাবে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৌতুকে অলকারও চোখ দুটি হাসতে থাকে। একটা অধঃপতিত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দূর নক্ষত্রের দরদের মতো অলকার চোখের হাসিটা যেন মিটিমিটি জ্বলে।

চা খাওয়া শেষ করে শঙ্কর। জীবন বীমার নতুন একজন মক্কেলের ঠিকানা প্রশান্তের কাছ থেকে জেনে নিয়ে উঠে পড়ে শঙ্কর, চলে যায়।

প্রশান্ত একদিন বললো—তোমার সৌভাগ্যের চন্দ্রকলা এতদিনে পূর্ণ হলো অলকা।

অলকা—কি হলো ?

—তুমি মনে করেছ, শঙ্কর এখানে শুধু খাবার খেতে আর জীবন বীমার মক্কেলের খোঁজ নিতে আসে ?

—তা মনে করবো কেন ? তোমার বন্ধু মানুষ, তুমি ওকে ভালবাস তাই আসে।

—না গো বিশ্বমনোরমা, তোমাকেই দেখতে আসে।

—কি যে বল ! এরকম বিদ্‌ঘুটে কথা আর বলো না, আর যা-ই বল।

প্রশান্ত যেন এতদিনে তার কল্পনার মধ্যে আর একটি প্রচণ্ড প্রহসন তৈরী করেছে। হাসি থামাতে পারে না প্রশান্ত।

প্রশান্ত প্রস্তাব করে—একটা মজা করতে হবে অলকা। তোমাকে রাজি হতেই হবে।

অলকা একটু ভয় পায়। ঠিক ভয় নয়, লজ্জাই বোধ হয়। ভয় পাবার মতো মন তো তার নয়—আমাকে আবার কি করতে হবে ?

—তুমি শঙ্করকে একদিন প্রেম নিবেদন কর। আমি পাশের ঘরে থাকবো। আমি শুধু বোকাটার মুখের ভাবটুকু স্টাডি করবো : দেখি ও কি বলে, আর কি করে !

অলকা বিরক্তির সঙ্গে প্রবলভাবে আপত্তি জানায়—এসব কি কথা ! তোমার বন্ধুকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা-রগড় কর, সেটা খারাপ কিছু নয়, কিন্তু আমি ওসব করতে যাব কেন ? ছিঃ !

—আরে, শুধু একটু থিয়েটারী ঢঙে অভিনয় করবে।

—কি করতে হবে ?

—বলবে, শঙ্করবাবু, আপনাকে আমি কত ভালবাসি তা আজও বুঝতে পারলেন না। আপনি হৃদয়হীন⋯।

অলকা ঘৃণায় ও লজ্জায় শিউরে ওঠে—রামো রামো ! অভিনয় করেও কি এসব কথা বলা যায় ! তার চেয়ে, গুডফ্রাইডের ছুটিতে রাণু যখন এখানে আসবে, তোমরা শালী ভগ্নীপতিতে ষড়যন্ত্র করে শঙ্করকে নিয়ে যত খুশী মস্করা কর, আমি বাধা দেব না। রাণু চোখেমুখে কথা বলতে পারে, এসব ও-ই ভাল পারবে।

—রাণুকে দিয়ে এসব করালে আমার কি লাভ হলো ? আমি যেটা এক্স-পেরিমেণ্ট করে দেখতে চাই, আসলে সেটাই হবে না।

অলকা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। আবার এক কোন খেয়াল নিয়ে মশগুল হয়েছে প্রশান্ত ? না, প্রশান্তের প্রেমিকতার শ্লাঘা মনের ভেতর থাকলেই

সুন্দর ছিল। যেটা নিঃসংশয় সত্য, তাকে বার বার নানা তুচ্ছ প্রসঙ্গে খুঁটে খুঁটে যাচাই করবার কোন অর্থ হয় না। অবশ্য এসব ঝগড় মাত্র। সেটা প্রশান্ত জানে, অলকাও বোঝে। তবু···তবু অলকা একটু বিরক্তই হয়।

অলকা—বড় বেশি ছেলেমানুষী করছো তুমি। লোকটাকে নিয়ে ছিনিমিনি করে কি সুখ পাও বুঝি না।

কিন্তু প্রশান্তের অনুরোধের জেদে শেষ পর্যন্ত রাজী হয় অলকা—যাই হোক, আমি কিন্তু কথাগুলি বলেই পালিয়ে যাব। কি বলতে হবে লিখে দাও, মুখস্থ করে নিই।

একটা কাগজ টেনে নিয়ে লেখা শেষ করে প্রশান্ত বললো—এই কথা ক'টি বলবে, শঙ্কর, প্রাণেশ আমার। আমার বাইশ বছর বয়সের সকল কামনা শুধু তোমাকেই যে লতার মতো জড়িয়ে ধরতে চাইছে। ওগো চিতচোরা।···

অলকা লেখাটা পড়ে নিয়ে বলে—ভারি বগড করছো! এসব ভাষা শুনলে কে না বুঝবে যে ভান করা হচ্ছে।

—তা হলে কি ভান করে একেবারে খাঁটি প্রেমের কথা···তা কি করে হয়··· তা কি বলতে পারবে?—অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করে প্রশান্ত।

অলকা বিরক্ত হয়ে বলে—কি যে বল!

প্রশান্ত একটু সমস্যায় পড়ে আমতা আমতা করে উত্তর দেয়—যাই হোক, একটু উদ্‌ভ্রান্তের মতো কথাগুলি বলবে, তা হলেই শুনতে বেশ লাগবে। ভান ফান বুঝতে না পেয়ে ঘাবড়ে যাবে।

•

বৈঠকখানা সেদিন সন্ধ্যায় এত ভাল করে সাজানো হলো কেন? ফুলদানির ওপর এত বড় দুটো গন্ধরাজের তোড়া রাখবার কিই-বা প্রয়োজন ছিল? একগুচ্ছ ধূপকাঠি পুড়িয়ে ঘরের বাতাস এত সুরভিত করাই বা কেন? প্রশান্ত অলকার দিকে তাকিয়ে উৎসাহে হাসতে থাকে—বাপ্‌রে, ঘরে যেন সত্যিই রোমান্স থমথম করছে।

শঙ্করের পায়ের শব্দ শুনে প্রশান্ত পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে গিয়ে বসে থাকে।

বৈঠকখানার দরজা পর্যন্ত এসেই শঙ্কর থেমে গিয়ে প্রশ্ন করে—প্রশান্ত নেই?

অলকা—না, এই কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেলেন।

—কখন ফিরবে?

—আজ ফিরতে রাত হবে অনেক।

—আচ্ছা, আমি আজ তা'হলে যাই।

—সে কি কথা? নতুন করে আপনাকে অনুরোধ করতে হবে নাকি? চা খেয়ে তারপর যাবেন।

চা আনে অলকা! চা খাওয়া শেষ করে শঙ্কর একটা বই তুলে নিয়ে এক মনে পড়তে থাকে। অলকা উসখুস করে, ঘরের ভেতর পায়চারি করে। চেয়ারের ওপর বসে কিছুক্ষণ, তারপরই ছটফট করে উঠে পড়ে। ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দায় আলোর সামনে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠো থেকে কাগজটা খুলে লেখাগুলি একবার পড়ে নেয় অলকা। সবই মুখস্থ করা ছিল, তবু আর একবার যেন মনস্থ করে নেয়, যেন আবৃত্তি করতে কোন ভুল না হয়, কোন কথা ফস্‌কে না যায়।

ঘরে ঢুকেই অলকা বলল—শঙ্করবাবু।

শঙ্কর—বলুন।

দুটি মিনিট বৃথাই স্তব্ধ হয়ে রইল। অলকা মনে মনে কথাগুলি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকে।

অলকা। শঙ্করবাবু, আপনি রোজই এখানে আসেন কেন?

শঙ্কর বই পড়া বন্ধ করে বিস্মিত হয়েই অপ্রস্তুতের মতো বলে—আমার আসাটা কি আপনারা পছন্দ করেন না?

—শুধু জিজ্ঞাসা করছি, কেন আসেন?

—কাজের দায়েই আসতে হয়। প্রশান্ত দু'একটা পার্টির খোঁজ দেয়, তাই। তা না হলে এত ঘন ঘন আপনাদের বিরক্ত করতে…।

—সেই সামান্য খোঁজ নিতে কতক্ষণ সময় লাগে? কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন কেন? কি দরকার?

—দরকার কিছুই নয়। আপনারা কিছু মনে করেন না বলেই বসে থাকি।

—তাই বলে কি রোজ আসতে হয়? রোজ এখানে আসতে এত ভাল লাগে আপনার?

তা, ভাল লাগে বৈকি! এত সজ্জন আপনারা।

পাশের ঘরের চাঞ্চল্য প্রকট হয়ে না পড়লেও, বোঝা যায়, সেখানে অস্ফুট একটা প্রতিবাদ যেন ইঙ্গিতে শব্দ করে বেজে উঠছে। মেঝেতে প্রশান্তের জুতোটা দুবার ঘষা লেগে আর বেশ জোরে একটা শব্দ করেছে। নেপথ্য থেকে যেন কতকগুলি সঙ্কেত অলকার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে—অভিনয় ঠিক হচ্ছে না।

অলকা বলে—আপনার বন্ধু সজ্জন হতে পারেন, কিন্তু আমাকে প্রশংসা করছেন কেন? আমি তো আপনার কোন উপকার করিনি!

শঙ্কর—বন্ধু তো সজ্জন হবেনই, তার জন্য তাকে প্রশংসা করার কি আছে? বরং আপনি কেউ না হয়েও যতখানি···।

অলকা—কি?

শঙ্কর—যতখানি খাতির করেন, আপন জনের মতো ব্যবহার করেন···।

অলকা—আমি খাতিব করি? আমি আপন জনের মতো ব্যবহার করি? সত্যি বলছেন?

শঙ্কর আস্তে আস্তে চোখ তুলে অলকার দিকে তাকায়।

তিন চার মিনিট ধরে ঘরের ভেতর একটা মূর্ছাহত নীরবতার মধ্যে দেয়াল ঘড়িটা শুধু টিক্‌টিক্‌ করে বাজতে থাকে। কৌতূহলের আবেগে অস্থির প্রশান্তের চোখ দুটো পর্দার আড়াল থেকে সহসা চোরা টেলিস্কোপের মতো উঁকি দেয়।

এক হঠাৎ-গোধূলির ছোঁয়া লেগে বৈঠকখানার ঘরটা যেন অবাস্তব হয়ে আকাশ পটের মতো অনেক দূরে সরে গেছে। শঙ্করের মুখটা যেন ছেঁড়া মেঘের মতো তার মধ্যে ভাসছে। বসন্তের দাগগুলি তবু স্পষ্ট চিনতে পারা যায়! শঙ্করের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অলকা। একটা রাত্রি শেষের চাঁদ যেন একটা জঙ্গলের মাথার উপর সান্ত্বনার জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে।

শুনতে পায় প্রশান্ত, যদিও অলকার গলার স্বরটা কানে-কানে বলা কথার মতোই অস্পষ্ট।—এখানে আসতে ভাল লাগে?

শঙ্করের ছোট ছোট চোখ দুটো আরোও ছোট হয়ে পিলসুজের পোড়া তেলের মতো চিক্‌চিক্‌ করতে থাকে—হ্যাঁ, ভাল লাগে।

অলকা বলে···রোজ আসবেন, কেমন?

শঙ্কর চলে যাবার অনেকক্ষণ পরে অলকা বুঝতে পারে, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে, পুঞ্জ পুঞ্জ সিগারেটের ধোঁয়া ভেসে আসছে।

একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে প্রশান্ত বই পড়ছিল। অলকা ব্যস্ত ভাবে ঘরে ঢুকতেই প্রশান্ত হাসে—রগড়টা জমিয়ে তুলেছিলে বেশ।

আবার শান্তভাবে এবং সুস্থির হয়ে একমনে বই পড়তে থাকে প্রশান্ত।

ফল্গু ও ফাল্গুন

আর দেরী না করে, আগন্তুক ভদ্রলোককে স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে, আপনি এখন চলে যান। কারণ, আপনি যাঁর নামে চিঠি নিয়ে এসেছেন, তিনি

এখন বাড়িতে নেই···, তিনি আজও নয় কালও নয় একেবারে পরশু দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরবেন। তাছাড়া বাড়িতে এখন দ্বিতীয় কোন পুরুষ মানুষও নেই যে আপনার সঙ্গে কোন কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

স্টেশনমাষ্টার সুধাকরবাবুর কাছ থেকে এই বাড়ির হেমবাবুর নামে যে চিঠি নিয়ে এই ভদ্রলোক এসেছেন, তাতে শুধু লেখা আছে যে, এই ছেলেটি হলো আমার এক বন্ধুর ছেলে জয়ন্ত। জয়ন্ত ওর দরকারের কথাটা নিজেই আপনাকে বলবে। আমি আজ দুপুরে চক্রধরপুর যাচ্ছি, ভোরের ট্রেনে ফিরবো। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা ময়ূর যোগাড় করেছি। আপনি যদি নিতে চান, তবে পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু আগন্তুক এই ভদ্রলোক, যার নাম জয়ন্ত, যার চেহারা দেখে মনে হয় বয়স তিরিশের বেশি হবে না, আর ওই সামান্য যে পরিচয় স্টেশনমাষ্টার সুধাকর বাবুর চিঠিটাতে লেখা আছে, সেটা তো প্রায় একটা অপরিচয়। বলতে গেলে, নিতান্ত অজানা একটা মানুষ।

রেল-স্টেশন এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে, এই কদমপুরা এখনও একটা শহর হয়ে উঠতে পারেনি। বাজার আছে, বস্তি আছে, তাই একটা থানা আছে। আর আছে, রোড ওভারসিয়ারের এই সরকারী কোয়ার্টার, বাংলো-ধাঁচের ছোট খাটো একটি বাড়ি, যার টালির চালা লতানে গোলাপের ফুলে ও পাতায় একেবারে ছেয়ে গিয়েছে। বারোমেসে হলদে গোলাপ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থোকা থোকা গোলাপের উপর রঙীন ফড়িং আর প্রজাপতি ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায়, সড়কের পাশে একটা মাঠ, তার এদিকে গোটা চারেক পলাশ, ওদিকে কদমের ফুল। সবচেয়ে সুখের হলো, কদমপুরার শালবনের শোভা আর দূরের ওই জোড়া-পাহাড়। ভোরের আলো, পূবের মেঘ, আর চাঁদের আলো-মাখানো শীতের কুয়াশা, সবই অদ্ভুত এক মায়ার খেলা বলে মনে হয় এই জোড়া-পাহাড় আর শালবন আছে বলে।

এই শালবনেরই ভিতরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাথর কাটার কাজ চলে। ঠিকেদারের মোটর লরি সারাদিন ছুটোছুটি করে আর টন টন কুচো পাথর নিয়ে কদমপুরা রেল-স্টেশনের সাইডিং-এ জমা করে। কদমপুরা বাজারে ঠিকেদারদের অনেক আস্তানা আছে; ডিপো আছে; মোটর লরির গ্যারেজও আছে। কদমপুরার শান্ত শালবনের মধ্যে ডিনামাইটের চাপা-চাপা শব্দ সারাদিনই বাজে।

আজ প্রায় এক বছর হলো কদমপুরার এই বাড়িতে আছেন রোড ওভারসিয়ার হেম সরকার। তাঁর আগে যিনি রোড ওভারসিয়ার হয়ে এই বাড়িতে ছিলেন, সেই অতুল রায় এখন সাসারামে আছেন। একটানা প্রায় চার বছর ধরে

এই বাড়িতে ছিলেন সেই অতুল রায়। দু'বছর আগে, তার মানে বদলি হবার একবছর আগে এই বাড়িতেই অতুল রায়ের মেয়ে প্রভার বিয়ে হয়েছিল। স্টেশন-মাষ্টার সুধাকরবাবু এখনও ঠিকাদারদের সঙ্গে গল্প করেন—আঃ, বেচারা অতুল কী ভয়ই না পেয়েছিল; এরকম একটা জংলী কদমপুরাতে মেয়ের বিয়ের সব ব্যবস্থা কী করে হবে? আমি গ্যারান্টি দিয়েছিলাম, কোন চিন্তা নেই অতুল। আমি থাকতে কোন ব্যবস্থার অভাব হবে না। চক্রধরপুর থেকে আমিই তো বাঙালী পুরোহিত নিয়ে এলাম, আমিই রাজবাড়ির পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে নিয়ে এলাম, প্রায় মণ দুই পাকা পাকা রুই। আমারই চেষ্টাতে বাবুলাল শেঠের ধর্মশালাতে বরযাত্রীদের থাকবার চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু…।

—বাড়িতে কে আছেন! জয়ন্তর ডাক শুনে ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে বাইরের বারান্দাতে যারা দু'জন উঁকি দিয়েছে, আর জয়ন্তর হাত থেকে চিঠি নিয়ে ঘরের ভিতরে হেমবাবুর স্ত্রী বিজয়ার হাতে দিয়েছে, তারা হলো রমা আর ইমা, হেমবাবুর দুটো মেয়ে। একজনের বয়স দশ, আর একজনের বয়স সাত। আর বিজয়া সেই চিঠি পড়ে যাকে জানিয়েছে, সে হলো বিজয়ারই সমান বয়সের এক মহিলা। হেমবাবুর বড় ভাই বীরেশ সরকারের মেয়ে রীতা সরকার।

ঠিকাদারদের সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করেন স্টেশনমাষ্টার সুধাকরবাবু—কে বিশ্বাস করবে যে, আমাদের এই রোড ওভারসিয়ার হেমবাবুর বড়দা হলেন দিল্লী ওয়ালা একজন সেক্রেটারী, একটা সরকারী দপ্তরের বড়কর্তা। সাহেব মানুষ সেই ডি, সরকার, যিনি এগার বছর লণ্ডনে ছিলেন, যিনি আজকাল ভাল করে বাংলা বলতেও পারেন না, তাঁরই আপন ভাই এই হেমবাবু কিন্তু কুমড়োর কচি ডাঁটা খুঁজে বেড়ান আর চেঁচিয়ে রামপ্রসাদী গান করেন। কী আশ্চর্য, এক বৃন্তে এরকম একেবারে দুটি ভিন্ন ফলও হয়!

ডি, সরকারের মেয়ে রীতা সরকারও কদমপুরার রোড ওভারসিয়ারের এই বাড়ির ভিতরে এখন একটা অভাবনীয় বিস্ময়েরই শোভা। বয়সে প্রায় সমান হলেও বিজয়া কাকিমার সঙ্গে এই রীতা সরকারের রূপে, গুণে, সাজে ও প্রসাধনে, শিক্ষাতে ও রুচিতে, চোখের চাহনিতে ও হাসির ভঙ্গীতে কোন মিল নেই। যে বিছানার উপর শুয়ে বিজয়া-কাকিমার হাতের ওই চিঠির কথাগুলি শুনেছে রীতা, সেই বিছানার উপর, কে-জানে কোন বিলিতি পাখির পালক দিয়ে তৈরী একটা ঢাকা, বিছানার উপর, একগাদা বই ছড়িয়ে পড়ে আছে। সবই ফরাসী নভেল। ইংরেজীর এম-এ রীতা সরকার ফরাসী ভাষাও জানে। বিছানার পাশে ছোট একটি টেবিলের উপরে ছোট একটি আয়না, লিপষ্টিক আর পাউডারের ডিবে

পড়ে আছে। আর আছে, একজোড়া আইলাশ। জিনিসগুলি রীতা সরকারের যখন তখন দরকার হয়, তাই হাতের কাছেই থাকে। সন্ধ্যা হবার পর গরম জলের ভাপ আর স্কিন-লোশন দিয়ে মুখটাকে ধোয়ামোছা করে নিয়ে তারপর ওই আই লাশ যখন চোখে লাগায় রীতা, তখন রমা আর ইমা খুশী হয়ে হাততালি দেয় ও নেচে ওঠে—রীতাদির কী সুন্দর চোখ! বিজয়াও আশ্চর্য হয়ে আর অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে। ঠিকই, রীতার দুই চোখের পাতা যেন স্বপ্নমাখানো দুটি মায়ার ঝালর। রীতা হাসে, চোখ বড় করে তাকায়। রীতার ওই সুন্দর মুখের শোভাও যেন টলমল করে দুলতে থাকে।

ওভারসিয়ার কাকার বাড়িতে কুমড়োর কচি ডাঁটার ঝোল খেতে খুব আপত্তি নেই রীতার। কিন্তু সেজন্য রীতার বিজয়া-কাকীমারও দুশ্চিন্তার কোন ঝঞ্ঝাট নেই। রীতা নিজেই তার দরকারের অনেক উপাচার সঙ্গে নিয়েই এসেছে—মাখন বিস্কুট মাংস ও মাছের সস্, জ্যাম ও জেলির গুঁড়ো, ডিম আর গুঁড়ো দুধের, পীচ আর আঙুরের যত ডিবে শিশি আর বোতল। নিজের রুচি আর অভ্যাসের জন্য যা-কিছু দরকার, তার অনেক কিছুই নিয়ে এসেছে রীতা। ভাসুরের সঙ্গে পুরো দুটি বছর জাপানের টোকিওতে ছিল যে ভাসুরঝি, তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কদমপুরার এই কাকীমা মানুষটিকে তেমন কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি।

একটি মাস, বড় জোর দুটি মাস এই কদমপুরাতে কাকার বাড়িতে থাকবে, তারপর আবার দিল্লিতে ফিরে যাবে রীতা সরকার। কোন কুণ্ঠা না রেখে, সমবয়সী কাকিমার কাছে মনের কথাটা বলেই দিয়েছে রীতা—আমি ইচ্ছে করেই ফেরারী আসামীর মতো গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকবার জন্যে তোমাদের এখানে এসেছি কাকী। কেউ জানে না, শুধু বাবা জানেন যে, আমি এখন তোমাদের এই কদমপুরাতে আছি।

বিজয়া হেসেছেন—কার নজরের ভয়ে গা-ঢাকা দিলে?

—ভয়ে নয়, ভয়ে নয়। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে রীতা।

—তবে?

—ভালবেসে।

—ভালবাসলেই যদি, তবে আবার লুকিয়ে থাকা কেন?

—কাকী, তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না,—এটা হলো ভালবাসার ট্রায়াল। জানতে চাই, বুঝতে চাই, বেচারা সোমেন আমাকে দেখতে না পেয়ে আর খুঁজে না পেয়ে পাগল হয়ে গেল কি না।

—তাতে তোমার লাভ ?

—আমার লাভ এই যে, সোমেন এইবার মর্মে মর্মে বুঝতে পারবে যে, আমিই ওর জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সুখ। আমি ছাড়া সোমেনের জীবনটা জীবনই নয়।

বিজয়া আবার হাসেন—সোমেনকে পাগল করতে গিয়ে শেষে তুমি নিজেই পাগলা হয়ে যাবে না তো ?

—আমি ? আমি পাগলা হব ? রীতা সরকার পাগলা হবে ? তুমি আমার প্রাণটাকে একটুও চিনতে পারনি, কাকী।

রুমাল দিয়ে সুন্দর মুখের চাপা হাসিটাকে একটু আড়াল করে নিয়ে রীতা সরকার বলে—তোমার কাছে মুখ খুলে মনের কথা বলতে আমার কোন লজ্জা নেই, তাই বলছি কাকী, সোমেনকে ভালবেসেছি বটে, তবু এখনও ভাবতে হচ্ছে, সোমেনকে একেবারে স্পষ্ট করে একটা হ্যাঁ বলে দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দেওয়া উচিত হবে কি না।

—এ কী কথা ! খুব অদ্ভুত কথা !

—আমি আজ পর্যন্ত কাউকেই একেবারে স্পষ্ট করে হ্যাঁ বলতে পারিনি। মৃগাঙ্ক মনে করে, আমি ওকে বিয়ে করবো। শিবরামন্ মনে করে, ওরই সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমার দোষ নয়, কাকী। আমি কখনও কাউকে কোন কথা দিইনি। ওরা নিজের নিজের ইচ্ছায় বিশ্বাস করে বসে আছে।

—কিন্তু…।

—আমার মনের ভিতরে কোন 'কিন্তু' নেই কাকী। আমি এত তাড়াতাড়ি কাউকেই কোন কথা দিয়ে ফেলতে পারবো না, এমনকি সোমেনকেও না।

—এ যে আরও অদ্ভুত কথা হয়ে গেল, রীতা।

—হতে পারে, কিন্তু আমার উপায় নেই, কাকী। আমি এত সহজে…।

বিজয়া-কাকিমা এইবার রীতার হাতে আস্তে একটা চিমটি কাটেন ও হাসেন—তার মানে, ঢলে পড়তে পার, কিন্তু গলে পড়তে পার না। তাই না ?

—জানি না, জানি না। বলতে বলতে মাথা দুলিয়ে হেসে ওঠে রীতা। দুই চোখে দুই মায়ার ঝালর। সেই চমৎকার আইল্যাশও যেন কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে। বিজয়া-কাকিমার গাল টিপে ধরে রীতা সরকার। কাকী, তুমি ভয়ানক দুষ্ট, তোমার ভাষা আরও দুষ্টু।

অতি আধুনিকা ও অতি শিক্ষিতা ভাস্বরঝির সঙ্গে কথা বলতে আর এ রকম অদ্ভুত কথা শুনতে ভালই লাগে কদমপুরার বিজয়া-কাকিমার! একটা ভিন্ জগতের রূপকথা শুনতে কার না ভাল লাগে ?

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, ভিন্ জগতের রূপকথার ওই মেয়েকে আগন্তুক ভদ্রলোকের চিঠির কথাগুলি শুনিয়ে দিয়ে কোন লাভ হল না। চিঠির কথাগুলি শুনলো আর হাত বাড়িয়ে একটা নভেল তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিল রীতা সরকার। কোন কথা বলে না রীতা। বিজয়া তাই নিজের মনে গুনগুন করে বলেন—ভদ্রলোককে কী যে বলা যায়, বুঝতে পারছি না।

এইবার কথা বলে রীতা। চলে যেতে বলে দাও, এর মধ্যে এত ভেবে দেখবার কী আছে ?

—বলে দিতে পারা যায়, কিন্তু···

—কিসের কিন্তু ?

—কে জানে, হয়তো একজন অতিথি মানুষ। ভদ্রলোক কেন এসেছেন, সে কথাটা না জেনে নিয়ে চলে যেতে বলা উচিত হবে কি ?

রীতা হাসে—তা'হলে আমার আর বলবার কিছু নেই, যা ইচ্ছে হয় কর।

ফরাসী নভেলটাকে বুকের উপর রেখে এইবার বিছানার উপর এলিয়ে শুয়ে পড়ে রীতা।

কদমপুরার বোড ওভারসিয়ার হেম সরকারের স্ত্রী বিজয়া সরকারের পক্ষে একটু চিন্তিত হবারই কথা। চিঠি দিয়েছেন, আর কেউ নয়, ওই স্টেশনমাষ্টার সুধাকরবাবু, যিনি কদমপুরার এই বাড়ির সব দরকারে তাঁর সাধ্যমত উপকার করেন। এই সেদিন, তিন সের সোনামুগের ডাল যোগাড় করে পাঠিয়েছেন। ইমার অসুখের সময়ে দিনে তিনবার এসে খোঁজখবর নিয়েছেন, রাঁচি থেকে ওষুধ আনিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বন্ধুর ছেলে জয়ন্তকে এখনি একেবারে চলে যেতে বলা কি উচিত হবে ? কিন্তু চাকর কালুরামও তো এখন বাড়িতে নেই ; দুধ আনতে দেড় মাইল দূরের সেই মাহাতোর বাড়িতে গিয়েছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবে কে ?

বিজয়া অগত্যা দরজার আড়ালে দাঁড়াল। দশ বছর বয়সের রমাকে ডাক দিয়ে বলেন—যা রমা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কর, উনি কেন এসেছেন।

রমা সেই মুহূর্তে দরজার পর্দা সরিয়ে বাইরে আসে আর জিজ্ঞাসা করে—কেন এসেছেন ?

জয়ন্ত—হেমবাবুর সঙ্গে দেখা করা আর কয়েকটা কথা বলবার দরকার ছিল।

রমা—বাবা বাড়িতে নেই।

জয়ন্ত—কখন আসবেন ?

রমা—আজ আসবেন না।

জয়ন্ত—কিন্তু আমার যে আজই দরকার ছিল।

দরজার আড়াল থেকে রমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করেন বিজয়া—কী দরকার ?

সাত বছর বয়সের ইমা সঙ্গে সঙ্গে একটা দৌড় দিয়ে বাইরে চলে যায় আর জিজ্ঞাসা করে—কী দরকার ?

জয়ন্ত হাসে—আমার দরকারের কথা শুনলে তোমরা হেসে ফেলবে না তো ?

রমা বলে—আমি হাসবো না।

জয়ন্ত—আজ সন্ধ্যাবেলা তোমাদের ঘরে যখন আলো জ্বলবে, তখন আমি তোমাদের একটি ঘরের ভিতরে, এই যে বারান্দার এদিকে এই ছোট ঘরটার ভিতরে গিয়ে একটু দাঁড়াবো আর দেখবো।

সন্ধ্যা হতে তো আর বেশি দেরী নেই। পলাশের মাথার উপরে বিকালের শেষ রোদের শেষ আভাটুকুও এখন আর নেই। এরই মধ্যে কদমকুঞ্জের পাশে বুড়ো বটের মাথার উপরে বাদুড় উড়তে শুরু করেছে। ফাল্গুন মাসের পাহাড়া কদমপুরার শেষ বিকালের বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বইতে শুরু করেছে, সিরসির করে কাঁপছে শালবনের মাথা।

দরজার আড়ালের বিজয়ার দিকে একবার তাকায় রমা, তারপর জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে আরও চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে—কেন ?

জয়ন্ত হাসে—আজ একুশে ফাল্গুন, আমার বিয়ের দিন। তিন বছর আগে সেদিন এ বাড়িতে যিনি ছিলেন, সেই অতুল রায়ের মেয়ে প্রভার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। আর, ওই ছোট ঘরটাই হয়েছিল বাসরঘর।

রমা—তোমার বউ কোথায় ?

জয়ন্ত অদ্ভুতভাবে হাসে—আমার বউ মরে গিয়েছে।

ইমা—তুমি খুব কেঁদেছিলে ?

জয়ন্ত—হ্যাঁ।

ইমা—আবার কাঁদবে ?

জয়ন্ত—হ্যাঁ। সব সময়ই তো কাঁদছি, কেউ কিন্তু বুঝতে পারে না।

দরজার আড়ালে চুড়ির শব্দ বাজে, একটা চাপা গলার স্বরও ফিস্‌ফিস্ করে—বসতে বল, রমা।

রমা—তুমি বসো। বারান্দার একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে জয়ন্ত। বিজয়ার হাতের ইসারা দেখতে পেয়ে রমা ঘরের ভিতরে ছুটে আসে, তারপর বাইরে গিয়ে জয়ন্তর চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়ায়—তুমি এখন চা আর পরোটা

খাবে, তারপর সন্ধ্যা হলে…।

ইমা ছুটে এসে জয়ন্তর হাঁটুর উপর হাত রেখে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে—আলু ভাজাও খাবে।

জয়ন্ত চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—না না, আমি কিছু খাব না। আজকের দিনে আমি কিছুই খাই না।

ইমা—তোমার বউ মরে গেল কেন?

—কে জানে কেন! নিজেই আমাকে চিঠিতে লিখলে জর কমেছে, এইবার শিগগিরই আমি তোমার কাছে যাব। তুমিই এসে নিয়ে যেও।

রমা—তুমি আসনি?

—হ্যাঁ। চিঠি পেয়ে সাতদিনের মধ্যেই চলে এলাম। কিন্তু এলে কি হবে, এসেই জানতে পেলাম, প্রভা তিন দিন আগেই চলে গিয়েছে।

ইমা—কোথায় গেল?

—ওই ওই যে জোড়া পাহাড়ের মাথার উপরে একটা তারা ফুটে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ?

ইমা—হ্যাঁ।

—ওইখানে চলে গিয়েছে প্রভা।

ইমা—কবে আসবে?

—আর আসবে না, কোনদিনও না। আমি চিরকাল একলা হয়ে এই পৃথিবীতে পড়ে থাকবো।

রমা—তুমি কোথায় থাক?

—আমি থাকি অনেক দূরে, আসামে। সে জায়গাটার নাম হাফলং। সকাল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত রেলগাড়ীতে থাকি। তার পর ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু ঘুম হয় না।

ইমা—তোমার সাইকেল নেই?

—আছে।

ইমা—তবে রোজ রেলগাড়ীতে চড়ো কেন?

—আমি ট্রেনের গার্ড।

রমা—তুমি হুইসিল বাজাও? নিশান দেখাও?

—হ্যাঁ। ওই তো আমার কাজ।

রমা—কাজ করে টাকা পাও?

—হ্যাঁ।

রমা—অনেক টাকা ?

—হ্যাঁ, একশো আশি টাকা।

রমা—বাবা পায় দু'শো দশ টাকা।

রমা আর ইমা হঠাৎ এক সঙ্গে দৌড় দিয়ে ঘরের দরজার দিকে ছুটে যায়। দরজার পর্দার আড়াল থেকে একটা ইসারার হাত ডাক দিয়েছে। গলার স্বর চেপে কথা বলে বিজয়া—তোমরা এখন ঘরের ভেতরে থাক। কালুরাম আসুক। ঘরে আলো জ্বলুক, তারপর না হয়…।

বুকের উপর থেকে ফরাসী নভেল নামিয়ে রেখে এইবার বেশ একটু বিরক্ত স্বরে কথা বলে রীতা—তুমি বড় বেশি ইয়ে মানুষ, কাকী। আজে বাজে একটা লোককে এতটা প্রশয় দেওয়া উচিত হলো না।

বিজয়া চোখ বড় করে তাকায়—আজেবাজে লোক নয়, রীতা। সুধাকরবাবুর বন্ধুর ছেলে। আমাদেরই চেনা অতুল রায়ের জামাই। অতুল রায়ের মেয়ে প্রভা-কেও আমি দেখেছি।

রীতা—যাই হোক না কেন, এরকম একটা মানসিক রোগে ভুগছে যে লোক, তাকে আপ্যায়িত করবার কোন মানে হয় না।

বিজয়া—মানসিক রোগ ?

রীতা সরকারের চোখের ভ্রুকুটি যেন আরও রাগ করে আর ঘেন্না করে আরও কুঁচকে যায়।—তা ছাড়া আর কী ? ট্রেনের গার্ড তো দূরের কথা, কোন সোমেন মজুমদার যদি আজ এখানে এসে এরকম প্রেমের একটি আষাঢ়ে গল্প বলতো, তবে আমি তাকেও মানসিক রোগের মানুষ বলে মনে করতাম। যদিও সোমেন হলো…।

বিজয়া—কী ?

রীতা—দিল্লীর নাম করা সার্জন, সোমেনের শুধু একটি ক্লিনিকের মাসিক আয় দশ হাজার টাকার মতো। তা ছাড়া আলমোড়াতে সোমেনের দুটি বাড়ি আছে। দেখতে শুনতে সোমেনের মতো ব্রাইট আর স্মার্ট মানুষ তুমি সারা কল-কাতাতেও খুঁজে পাবে কি না সন্দেহ।

বিজয়া হাসেন—ভগবান করুন, আসছে বৈশাখেই যেন সোমেনের সঙ্গে তোমার…

রীতা—আঃ, চুপ কর, কাকী। ওসব কথা এখন থাক। তুমি এখন লোকটাকে চলে যেতে বলে দাও।

বিজয়া—বলতে পারা যাবে না, রীতা।

রীতা—তুমি যদি বলতে না পার, তবে আমিই বলে দিই।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় রীতা। জানালার পর্দাটাকে টেনে একপাশে সরিয়ে দেয়। বাইরের বারান্দায় দিকে তাকায়। সত্যিই এখনি ভদ্রলোককে হাঁকিয়ে দেবে রীতা।

—থাম রীতা, লক্ষ্মীটি, তুমি কোন কথা বলো না। রীতার হাত চেপে ধরে মিনতি করেন বিজয়া।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে রীতা হাসতে থাকে—এই লোকটা। ওই কালো কষ্টিপাথর আর আধ-মাথা টাক উনিই নাকি আস্ত একটি রোমান্সের মস্ত একজন হিরো। আমার যে হাসতেও ইচ্ছে করে না কাকী!

কিন্তু হেসে হেসেই আবার ফরাসী নভেল হাতে তুলে নেয় রীতা সরকার। ঘরে এখনও আলো জ্বলেনি, বই পড়া সম্ভব নয়। তবু বোধহয় বিদ্‌ঘুটে একটা অস্বস্তির ছোঁয়া থেকে মনটাকে মুক্ত করবার জন্যে বই পড়তে চেষ্টা করে রীতা।

বিজয়া বলেন—প্রভাও দেখতে বেশ কালো ছিল। তার উপর বেশ রোগা। কিন্তু মুখের হাসিটা বেশ মিষ্টি। লেখাপড়া কিছুই শেখেনি, কিন্তু কী অদ্ভুত খাটতে পারতো মেয়েটা। স্বভাবটাও কত নরম। চার বছর আগে, বামগড়ে বদলি হবার সময় আমরা সবাই এই বাড়িতে এসে একদিন ছিলাম। আমাদের কী যত্নই না করেছিলেন অতুলবাবু। সবচেয়ে আশ্চর্য করে দিয়েছিল ওই প্রভা। আমার কোন আপত্তি শুনলো না, নিজের হাতে গরম জল দিয়ে আমার পা ধুয়ে দিয়ে আলতা পরিয়ে দিল। প্রভাব কথা মনে পড়লে সত্যিই মনটা বেশ খারাপ হয়ে যায়।

দুধ নিয়ে ফিরে এসেছে চাকর কালুরাম। বিজয়া বলেন—ওই ঘরে একটা আলো জ্বেলে দাও কালু; আর ওই বাবুকে বল, ঘরে আলো জ্বালা হয়েছে, এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে যা দেখবার হয় দেখে নিন।

পাশের ছোট ঘরে আলো জ্বালে কালুরাম। ঘরের দরজাও খুলে দেয়। রমা আও ইমা সেই মুহূর্তে দৌড় দিয়ে আবার বারান্দায় গিয়ে জয়ন্তর হাত ধরে টানাটানি করে—চল, তোমার বাসরঘর দেখবে চল।

ঘরের ভিতরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্ত। ঘরের আলোর আভা যেন চিকচিক করে জয়ন্তর দুই চোখের তারার উপরে জ্বলতে থাকে।

রমা—কী দেখছো?

জয়ন্ত—ঠিক ওইখানে মেঝের উপর সুন্দর একটা আলপনা ছিল, হলদে রঙের ধানের মঞ্জরী আর সবুজ রঙের অর্জুন পাতা আঁকা হয়েছিল।

রমা—কে এঁকেছিল? তোমার বউ?

—হ্যাঁ। আর ওই যে, যেখানে ছোট একটা টেবিল রয়েছে, সেখানে ছিল চক্‌চকে পেতলের একটা পিলসুজ! সেই পিলসুজের বাতি সারারাত জ্বলেছিল!

ইমা—তোমার বউ খুব সেজেছিল?

—খুব, খুব; চমৎকার সেজেছিল। ফিকে গোলাপী একটি বেনারসী শাড়ি পরেছিল; কপালে আর গালে চন্দনের সব ছাপ ছিল। কপালের মাঝখানে কুম-কুমের টিপও ছিল। কী চমৎকার সুগন্ধ, ধূপ পুড়ছিল ওই ওখানে, একটা থলির উপরে। ঘরের ভিতরে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায় জয়ন্ত। একটা জানালার গরাদে হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে।

রমা—তুমি কাঁদছো কেন?

হেসে ফেলে জয়ন্ত—কই, কাঁদছি না তো। খুব ভাল লাগছে, তাই আমার চোখ খুশি হয়ে চকচক করছে। · হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই জানালার গরাদগুলো ঝাউপাতা দিয়ে মোড়া হয়েছিল, তার মধ্যে লালচে রঙের নানারকম ফুলও গোঁজা ছিল। আর, ওই দরজার দু'দিকে চাঁদমালার ঝালর ঝুলছিল। আর···

রমা—কী?

—আর, ঠিক এইখানে ছিল একটি খাট, তার উপর বিছানা পাতা; সেই বিছানাতে জুঁইয়ের কুঁড়ি জড়ানো ছিল।

ইমা—বউ গান করেছিল?

—না, গান তো দূরের কথা, আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি।

রমা—তুমি রাগ করনি?

—খুব রাগ করেছিলাম। যখন দেখলাম, অনেক রাত হয়েছে, তবু প্রভা চুপ করে বিছানার একপাশে বসে আছে আর কোন কথাও বলছে না, তখন আমি রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দার ঠিক ওইখানে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে রইলাম।

রমা—বউ তখন ঘুমিয়ে পড়লো?

—না, হঠাৎ দেখি বউ উঠে এসে এই দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

ইমা—বউ খুব ভাল মেয়ে।

—হ্যাঁ; বার বার আমাকে ডাকলো বউ, ঘরের ভিতরে এসে বসুন। আমি কিন্তু রাগ করে বারান্দায় চেয়ারের উপরেই বসে রইলাম। তারপর···।

রমা—কী? কী? বল, বল!

—চেয়ারের উপর আমি গুটিসুটি হয়ে বসে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎ চোখ মেলে দেখি, ওই জোড়াপাহাড়ের মাথার উপর চাঁদ ভেসে উঠেছে। শাল-

বনের মাথার উপর সাদা কুয়াসা থমথম করছে, আর তোমাদের সেই প্রভাদি আমার একটা হাত ধরে টানছে—ঘরে চল।

রমা—তারপর কী হলো ?

—আমি বললাম, না এখন আর ঘরের ভিতরে যাব না, তার চেয়ে ভাল, দু'জনে মিলে এখন জোড়াপাহাড়ের মাথার ওই চাঁদ আর শালবনের মাথার ওই সাদা কুয়াসা দেখি। ভোর হোক, পাখী ডাকুক, তারপর ঘরের ভিতরে যাব।

ইমা—ভোর হলো কখন ?

—ঠিক ভোরের বেলাতে। তোমাদের প্রভাদি বললে, জীবনে আমার উপরে কখনও রাগ করবে না বল ? আমি বললাম কখ্খনো···না, আর কি কিছু দেখবার নেই।

আবার বাইরের বারান্দায় এসে চেয়ারটার কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়ায় জয়ন্ত। রমা বলে—তুমি এখন চলে যাবে ?

—হ্যাঁ, যদিও এখনই চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।

ইমা—তবে এখানেই বসে থাক।

—যদি তোমরা বল, কোন আপত্তি না কর, তবে থাকবো।

রমা—থাকতেই হবে। এখন স্টেশনে যাবে কি করে ? পথে জঙ্গল আছে ; মহুয়াতলায় ভালুক বসে আছে।

—তাই তো শুনেছি।

রমা—কিন্তু সারা রাত এখানে বসে থাকতে তোমার ভয় করবে না ?

—না।

রমা—প্রভাদি যদি ভূত হয়ে এসে তোমাকে ধরে ?

হেসে ওঠে জয়ন্ত—না না, তোমাদের প্রভাদি কখনও ভূত হতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নের ছবির মতো আমার চোখের কাছে দেখা দিতে নিশ্চয়ই পারে। সেটাও তো চমৎকার ব্যাপার। আমিও তাই চাই।

ভিতরের ঘরে হঠাৎ একটা শব্দ বেজে ওঠে। রীতা সরকার বোধহয় ভুল করে, কিংবা খুব বিরক্ত হয়ে হাতে-ধরা ফরাসী নভেলটাকে রেখে দিতে গিয়ে ঘরের মেজের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

রমা আর ইমা দৌড় দিয়ে ঘরের ভিতরে চলে আসে। আর বিজয়া ফিস্ফাস্ করে কালুরামের সঙ্গে কথা বলেন।—বাবুকে বুঝিয়ে বল, সারা রাত এখানে কষ্ট করে বসে না থেকে ঠিকেদার রতন সাহুর আস্তানাতে গিয়ে থাকুন। সেখানে থাকবার জায়গা আছে। পয়সা দিলে খাটিয়া আর কম্বল পাওয়া যায়। নয়তো

যদি নেহাতই থাকতে ইচ্ছে করেন, তবে ওই ছোট ঘরের ভিতরেই থাকতে পারেন। কিন্তু তাহলে, কালুরাম তুমিও এখানে থাকবে, তুমি আর আজ বাড়ি যাবে না।

কালুরামের কাছ থেকে এবাড়ির ইমার সব কথা শুনে গিয়ে জয়ন্ত যে-কথা বলে, সে-কথার সবই এই ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে শুনতে পাওয়া যায়। বিজয়া শোনে, রীতা সরকার শোনে, আর রমা ও ইমাও শোনে।

জয়ন্ত বলছে—আপনাদের শত ধন্যবাদ, কিন্তু আমি শুধু এই বারান্দাতে বসেই রাতটা কাটিয়ে দিয়ে যেতে চাই। ঘরের ভিতরে থাকবার দরকার নেই। এই মাঠ, ওই পলাশ আর কদমকুঞ্জ, এসবই তো আমার চেনা। এখানে বসে থাকতে আমার একটুও কষ্ট হবে না, বরং বেশ ভালই লাগবে। কিন্তু আপনারা যদি কোন অস্বস্তি বোধ করেন, তবে অবশ্য আমি চলেই যাব।

দরজার পর্দার দিকে তাকিয়ে আর বিজয়ার ইসারা বুঝে নিয়ে চাকর কালু-রামও একটা হাঁপ ছাড়ে আর কথা বলে—তবে আপনি থেকেই যান, বাবু। আমাদের কোন অসুবিধে নেই।

টকটকে টাটকা লালের প্রলেপ দিয়ে রীতা সরকারের নরম-দুই ঠোঁটের শোভা বাতুল করে তোলে যে নন-স্মীয়ার লিপষ্টিক, সেই লিপষ্টিক টেবিলের উপর থেকে তুলতে গিয়ে রীতা সরকারের হাতটাই যেন খট করে একটা শব্দ করে বেজে ওঠে। খুবই বিরক্ত একটা অস্বস্তির শব্দ। কী আশ্চর্য, কাকী কি একটুও বুঝতে পারে না যে, এরকম অদ্ভুত স্বভাবের একটা লোককে, একটা আঘাটে গল্পকে এভাবে সারা রাত ধরে বাড়ির বারান্দায় বসিয়ে রাখা কোন ভদ্রতা নয়, সুরুচিও নয়। এখনই আবার একটা অচেনা লোক এসে যদি বলে যে মন্ত্রের জোরে সে এই বাড়ির সব সোনার গয়না ডবল করে দেবে, তবে কাকী বোধহয় তখনি খুশি হয়ে লোকটাকে ঘরের ভিতরে শোবার ঠাঁই করে দেবে। ছিঃ, এ কেমন দুর্বলতা।

বিজয়া বোধহয় বুঝতে পেরেছেন যে, রীতা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে। রীতা খুবই অস্বস্তি বোধ করছে। তাই খুব করুণ করে একটা অনুরোধের কথা বলেন বিজয়া—তুমি কিছু মনে করো না রীতা। কিংবা মনে কর যে কোন মানুষ-টানুষ নয়, শুধু একটা ছায়া বাইরের বারান্দায় বসে আছে।

রীতা হাসে—আমি তাই মনে করি, কাকী।

কদমপুরার বাতাসে শব্দের সাড়া জাগিয়ে ডাউন মাল গাড়ীটা চলে গেল। তার মানে, এখন রাত আটটা। তারপর আরও দুটো ঘণ্টা। ফাল্গুন মাসের পাহাড়ী কদমপুরার রাত নিঝুম হয়ে যায়। মাঝে মাঝে শালবনের ঝুরুঝুরু

পড়েছে রীতা। ওদিক থেকে কাদের হাতের দুটো ক্যামেরা তাক্ করে রয়েছে-। বয়ে গিয়েছে। ক্যামেরার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না রীতা।

কিন্তু কোথায় সেই জুহু, আর কোথায় এই কদমপুরা। রাতের অন্ধকার গায়ে মেখে আরও কালো হয়ে গিয়েছে ওই জায়গাটা। চুপ করে চেয়ারের উপর বসে আছে। না, সত্যিই দুঃসহ। এবার বলে দেওয়াই উচিত, এখনই চলে যাও।

বিছানা থেকে নেমে পাশের ছোট ঘরের ভিতর ঢোকে রীতা। তারপর যেন রুক্ষ ও বিরক্ত একটা অস্বস্তির আঘাত হে. রীতা সরকারের হাতটা একটান দিয়ে দরজায় কপাটের খিল নামিয়ে দেয়। কপাট খুলে বাইরের পাশের সেই ছায়ার দিকে তাকায় রীতা, যে ছায়ার নাম জয়ন্ত—ট্রেনের গার্ড, কালো টেকো একটা সামান্য মানুষ।

চমকে ওঠে রীতা সরকারের মনের সব অস্বস্তি আর চোখের সব বিরক্তি। জোড়াপাহাড়ের মাথার উপরে চাঁদ ভেসে উঠেছে, সাদা কুয়াশায় ভরে গিয়েছে শালবনের মাথার আকাশ, আর পলাশের গাছে একটা পাখির মিষ্টি শিসের শব্দ যেন গলে গলে ঝরে পড়ছে।

জোড়াপাহাড়ের মাথার চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে জয়ন্ত। চিকচিক করছে জয়ন্তর দুই অপলক চোখ। লোকটা কি জাগা চোখেই স্বপ্ন দেখছে? তা না হলে এত ধীর স্থির আর শান্ত হয়ে বসে আছে কেন?

জানে না রীতা। বুঝতেও পারে না রীতা, কতক্ষণ ধরে সে ওই জয়ন্তের মুখের দিকে দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে আছে। কদমপুরার ফাল্গুন মাসের শেষ রাতের জ্যোৎস্নাতে যে এত অদ্ভুত একটা মায়া থাকতে পারে, তাও নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেনি রীতা। কী আশ্চর্য, জয়ন্ত নামে ওই লোকটাকে যে একে-বারে ভিন্ জগতের একটা মানুষ বলে মনে হয়। কিংবা সেই বনময় কুয়াশার যুগের একটি মানুষ, বুক ফুলিয়ে গুহার মুখের সামনে বসে আছে। এখনই ছুটে আসবে ওর রাতের সঙ্গিনী, আর ওই চওড়া বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। জয়ন্তও নিশ্চয় সেই মুহূর্তে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া নিশাসঙ্গিনীর বুকটাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে পিষে দিতে থাকবে।

রীতা ডাকে—ঘরের ভিতরে আসুন।

চমকে ওঠে জয়ন্ত। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে বিস্ময়ে বিবশ দুই চোখের অপলক দৃষ্টি তুলে ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। জয়ন্ত যেন সত্যিই তার সফল স্বপ্নের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছে।

না, প্রভা নয় ঠিকই, কিন্তু প্রভা যে ঠিক ওইভাবে ঠিক ওখানেই দাঁড়িয়ে এই

বাতাস হঠাৎ উতলা হয় আর এলোমেলো হয়ে উড়ে বেড়ায়। বুড়ো বটের মাথার উপর ঝুপঝাপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুশি বাদুড়ের ঝাঁক। রোড ওভার্সিয়ার হেম সরকারের কোয়ার্টারের বাইরের বারান্দায় সত্যি একটি অদ্ভুত ছায়া চুপ করে চেয়ারের উপর বসে থাকে। কে জানে কিসের আশায়, কাকে দেখতে পাবে বলে এই বারান্দায় বসে রাত জাগছে জয়ন্ত? সত্যিই কি বিশ্বাস করে জয়ন্ত, বাসরঘরে আবার বাতি জ্বলবে, প্রভা এসে আবার তার হাত ধরবে, আর জোড়া পাহাড়ের মাথায় গিয়ে ভেসে ওঠা চাঁদ দেখে দেখে ভোর হয়ে যাবে?

জানালার পর্দা দুলিয়ে দিয়ে ফাল্গুনের কদমপুরার মাঝরাতের একটা দমকা বাতাস ঘুমন্ত রীতা সরকারের ক্রীমমাখা চুলের ভাঙা স্তবক হঠাৎ শিউরে দিয়েছে, তাই বোধহয় চমকে ওঠে রীতা। রীতার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিছানার উপরে উঠে বসে আর জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় রীতা, ঠিকই একটা ছায়া রাতের অন্ধকারের মধ্যে কী ভয়ানক কালো হয়ে বারান্দার একটা চেয়ারের উপর বসে আছে। সত্যি, কী বিদ্‌ঘুটে ও বিশ্রী একটা ছায়া। ছায়াটাকে এখনই বলে দিতে ইচ্ছে করে—চলে যাও।

কিন্তু কী দরকার? যার বাড়ি, সেই বিজয়া কাকী যখন কিছুই বললেন না, তখন দিল্লী থেকে কদিনের জন্য বেড়াতে আসা রীতা সরকারই বা কেন সেকথা বলতে যাবে?

ও-ঘরে ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ। ঘুমোচ্ছেন কাকী, আর বনও ইমা। ভিতরে বারান্দাতে ঘুমন্ত কালুরামের নাক-ডাকার শব্দ, একটা কম্বলের উপরে পড়ে আছে আর ঘুমোচ্ছে চাকর কালুরাম। কিন্তু রীতা সরকারের ঘুমভাঙা চোখে আবার নতুন করে ঘুমের আবেশ লাগে না। বিদ্‌ঘুটে একটা ছায়া বসে আছে বাইরে, ঘুম আসবে কেমন করে? দুঃসহ একটা অস্বস্তি রীতা সরকারের নিঃশ্বাসের বাতাসে বার বার ছট্‌ফট্ করে। লোকটা চলে না গেলে স্বস্তি পাবে না রীতা, ঘুমও আর হবে না।

কিন্তু জোরে চেঁচিয়ে ধমক না দিয়ে, খুব আস্তে গলার স্বর চেপে দিয়ে এখনই তো লোকটাকে বলে দিতে পারা যায়—চলে যাও। ঘরের ঘুমন্ত মানুষগুলির কেউই শুনতে পাবে না, জেগেও উঠবে না। একটি কথায় সব সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু কী দরকার?

জানে না রীতা, কখন আবার ঘুমিয়ে পড়তে হয়েছে। বুঝতেও পারে না, এমন সুন্দর সমুদ্র-স্নানের স্বপ্নটাও হঠাৎ কেন ভেঙ্গে গেল। জায়গাটা হলো জুহুর সমুদ্রতট। সাঁতারের মিনি সাজ পরে সমুদ্রের জলের ছোট ঢেউয়ের উপর এলিয়ে

কথাই বলেছিল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে জয়ন্ত, আর আবার শালবনের মাথার সাদা কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু ফাল্গুনের কদমপুরার শেষ রাতের বাতাস যেন রীতা সরকারের বুকের ভেতরে ঢুকে রীতার নিঃশ্বাস উতলা করে দিয়েছে। নন-স্মীয়ার লিপস্টিকের রঙীন প্রলেপ দুই ঠোঁটের পিপাসার বাষ্পে ভিজে গিয়েছে। আর সরস উচ্ছলতার এক একটা ঝলক সহ্য করতে গিয়ে সারা শরীরটাই যেন ভিজে ভিজে পিছল হয়ে যাচ্ছে।

আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে না রীতা সবকার। এগিয়ে আসে, জয়ন্তর হাত ধরে, জয়ন্তর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। তপ্ত নিঃশ্বাসের বাষ্প ছড়িয়ে জয়ন্তর কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলে রীতা—ঘরে চল।

চমকে ওঠে। সরে দাঁড়ায় জয়ন্ত—ছি, এ কী কথা বলছেন? কে আপনি?

—তাকিয়ে দেখ, ভাল করে দেখ, আমি কে? জয়ন্তর চোখের কাছে মুখটাকে যেন ভাসিয়ে দিয়ে কথা বলে রীতা। হ্যাঁ, এই শেষ রাতেও মায়ার ঝালর সেই আই-ল্যাশ চোখে পরতে ভুলে যায়নি রীতা। মায়ার ঝালর কাঁপে, শেষ রাতের চাঁদের আলোও যে কাঁপতে থাকে।

জয়ন্ত—চিনলাম না, বুঝলাম না, কে আপনি?

রীতা—ঘরে এস, কেউ জেগে নেই, সবাই ঘুমিয়ে আছে।

জয়ন্ত—অসম্ভব, ক্ষমা করবেন আমাকে। দোহাই আপনার, আমার স্বপ্ন নষ্ট করবেন না। আর কিছুক্ষণ আমাকে এখানে থাকতে দিন। কাক ডাকলেই আমি চলে যাব।

রীতা—তুমি কি সত্যিই একটা পাগল না, একটা অ্যানিমিয়া?

জয়ন্ত হাসে—আমাকে মিথ্যে গালমন্দ করে আপনার কোন লাভ নেই। প্লীজ, হাত ছেড়ে দিন, সরে যান,···না না অসম্ভব, মুখ সরিয়ে নিন, বলতে বলতে রীতা সরকারের সেই ঝাঁপিয়ে পড়া মত্ত শরীরটাকে একটা ঠেলা দিয়ে বুকের কাছ থেকে সরিয়ে দেয় জয়ন্ত, আর নিজেও বারান্দার সিঁড়ির দিকে সরে যায়।

হ্যাঁ, কাক ডেকে উঠেছে। সিঁড়ি থেকে নেমে মাঠের পলাশের পাশ কাটিয়ে একেবারে সড়কের উপরে গিয়ে দাঁড়ায় জয়ন্ত। হেডলাইট জ্বালিয়ে ঠিকেদারের একটা লরি স্টেশানের দিকে ছুটে চলে গেল। জয়ন্তও স্টেশন যাবার সড়ক ধরে চলতে শুরু করে দেয়। সড়কের ধারে মহুয়াতলায় এখন বোধহয় আর কোন ভালুক বসে নেই।

ভোরের আলোর আভা জেগেছে। তবু বারান্দার চেয়ারের কাছে চুপ করে

দাঁড়িয়ে থাকে রীতা সরকার। ঘরের ভিতর থেকে আশ্চর্য হয়ে বাইরে বের হয়ে এসে আরও আশ্চর্য হয়ে যান বিজয়া—এ কী রীতা! কী হলো?

রীতা—কী আবার হলো?

বিজয়া—এ কী রকমের মূর্তি?

রীতা—কী রকমের?

বিজয়া—এলোমেলো চুল, জামার বোতাম খোলা, গায়ের শাড়ি খসে পড়ে ঝুলে রয়েছে, এ যে একটা পাগল মূর্তি।

—তাই তো, তাই তো! হেসে ফেলে রীতা। ব্যস্তভাবে হাত চালিয়ে ঝুলে পড়া শাড়িটাকে ভাল করে গায়ে জড়াতে থাকে।

স ম্প ত্তি

নরেশ দত্তের বাড়ির সামনে একটা ভীড়। কাগজপত্রের একটা ফাইল হাতে নিয়ে এক ভদ্রলোক এই ভীড়ের মধ্যেই ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইনিই হলেন হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু। ক্রোকী পরোয়ানা নিয়ে আদালতের লোকের সঙ্গে নরেশ দত্তের বাড়ি দখল করতে এসেছেন।

তবু এক বিন্দু আনন্দ নেই মহাজন কৈলাসবাবুর মনে। পুরো পাঁচটি হাজার টাকা হাতড়ে নিয়েছে নরেশ দত্ত। অথচ ঐ বাড়ি নিলাম করলে বাজার দর অনুযায়ী বাড়ির দাম চড়বে বড় জোর আট হাজার টাকা, তার বেশি কখনই নয়! কিন্তু বৃথা, কোন লাভই হবে না। জোচ্চোর লোকটা আরও তিন মহাজনের কাছে টাকা ধার নিয়েছে। চন্দননগরের এক মহাজনের কাছ থেকে তিন হাজার, বারাসাতের এক মুদীর কাছ থেকে তিন হাজার আর বড়বাজারের এক মাড়োয়ারীর কাছ থেকে তিন হাজার। সব পাওনাদারই এক একটি মামলা এনে নরেশ দত্তের কাছে টাকা দাবী করেছে। শেষ পর্যন্ত ফল এই হল যে, কোন মহাজনই তাঁর প্রাপ্য পুরো টাকা উদ্ধার করতে পারবেন না। নিলামে যে দাম উঠবে ঐ বিশ্রী চেহারার একটা বাড়ির, তাই সকলকে ভাগ করে নিতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা পাওনার বদলে কৈলাসবাবুর কপালে দু' হাজারও জুটবে কিনা সন্দেহ। কি ধূর্ত এই নরেশ দত্ত! ওর ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে কখনো কল্পনাও করা যায় নি যে, এত কৌশল আছে ওর মাথার ঘিলুর ভিতরে। চার

চার-জন পাকা কারবারী মানুষকে ঐ একটুখানি এক বিশ্রী বাড়ির লোভ দেখিয়ে বন্ধকী হাওলাত করে কতগুলি টাকা হাতড়ে নিল।

শুধু কৈলাসবাবুই নয়, আরও তিন পাওনাদারের উকীল আর এটর্ণির লোকও ছিল। ছিল আদালতের কেরাণী আর চারজন পুলিশ কনেষ্টবল। ছটফট করছে সকলেই। কারও চক্ষে একবিন্দু সমবেদনার ছায়া নেই। থাকবার কথাও নয়। বরং, একটা প্রতিশোধ নেবার আগ্রহই যেন ছটফট করছে সকলের চোখে।

প্রতিশোধ নেওয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে। চারজন কুলি নরেশ দত্তের ঘরের ভিতর থেকে এক এক করে যত অস্থাবর সম্পদ ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে এসে পথের উপর আছাড় দিয়ে ফেলছে। কিন্তু সেই সব অস্থাবর সম্পদের দিকে তাকিয়ে মহাজন কৈলাসবাবুর দু'চোখের আক্রোশ আরও হতাশ হয়ে জ্বলতে থাকে। সব সরিয়ে ফেলেছে জোচ্চোর লোকটা! কুলিরা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাড়ের উপর যেন এক একটা বিদ্রূপের আবর্জনা তুলে নিয়ে আসছে। কয়েকটা কাঠের আলনা, নড়বড়ে তক্তপোষ, দুটো টিনের ড্রাম—তা'ও আবার ফুটো, দশ বারটা পুরনো ল্যাম্পের কঙ্কাল, ছেঁড়া জুতো দু'বস্তা আর পাঁচটা পায়া-ভাঙা চেয়ার। ছি-ছি-ছি, এই আবর্জনা কি দশ টাকা দিয়েও কেউ কিনবে? হাতের ফাইলটা তুলে নিজের কপালের উপরেই আস্তে একটা আঘাত করেন কৈলাসবাবু।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে কৈলাসবাবু আর আদালতের কেরাণী স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, বিছানার উপর বসে তখনো সেই ধূর্ত লোকটা ট্যারা চোখ তুলে বসে বসে হাসছে। তাই আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ছটফট করেন কৈলাসবাবু। লোকটা যে আর একটু পরেই দুনিয়াকে কলা দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে যাবে! একেবারে চোখের উপর দিয়েই সরে পড়বে। একটুও দুঃখিত নয়, একটুও বিমর্ষ নয় লোকটা। বের হয়ে যাবার জন্য যে লোকটা মনের আনন্দে তৈরী হয়েই রয়েছে, তাকে বের করে দিয়ে কোন প্রতিশোধের আনন্দও নেই। লোকটা এমনই একটা চতুর ভাঁওতা যে, ওকে জব্দ করবার সুযোগ নেই আর শক্তিও নেই এই পৃথিবীর।

নরেশ দত্তের বাড়ি, মাত্র চারখানা ছোট ছোট ঘর, একটুখানি একটা উঠান, সরু সরু বারান্দা, দরজা ও জানালার কাঠ কুঁকড়ে গিয়েছে। দেয়ালের এখানে ওখানে পালেস্তারার তলায় উই। বাড়িটার বয়স চল্লিশ বছরের কম নয়, নরেশ দত্তের চেয়ে মাত্র দশ বছরের ছোট। নরেশ দত্তের বাপ এই বাড়ি তৈরী করার পর দশটি বছর মাত্র বেঁচে ছিলেন। নরেশ দত্তের বিয়ে হবার বছরেই মারা

গেলেন নরেশ দত্তের বাপ। তারপরেও চারটি বছর এই বাড়িটার মধ্যে কলরব ছিল, কিন্তু তারপর আর নয়। তারপর থেকেই বাড়িটা যেন কেমন হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘুন ধরলো কড়িকাঠে, আর দেয়ালে উই।

কিন্তু যেদিন, আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে এই বাড়িটা শেষবারের মতো শব্দ করে কেঁদেছিল, সেদিন সান্ত্বনা দেবার জন্য এই বাড়ির ভিতরে এসেছিলেন প্রতিবেশী বিনোদবাবু। ঐ যে, উই-খাওয়া বাড়িটার সামনে প্রকাণ্ড লালরঙের দালান বাড়িটা হলো বিনোদবাবুর বাড়ি। বিনোদবাবুও এখন তাঁর দালান বাড়ির বারান্দায় কয়েকজন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে গল্প করছেন, আর দেখছেন নরেশ দত্তের বাড়ি ক্রোক করার হল্লা, ছটফটানি উল্লাস আর আক্রোশের দৃশ্যটাকে। কোন সমবেদনা নেই বিনোদবাবুর চোখে, কোন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের চোখে। কারণ, সকলেই জানেন যে, বোগাস নরেশ দত্তই এতগুলি মহাজনকে কলা দেখিয়ে সরে পড়ছে। ইচ্ছে করেই আর রীতিমত প্ল্যান করে লোকটা ভাঁওতা হাসিল করেছে। যা চেয়েছিল নরেশ দত্ত, তাই হয়েছে।

নরেশ দত্তের ঐ বাড়ি, তিরিশ বছর আগে ঐ বাড়ির দেয়ালে উই লাগেনি। নরেশ দত্তের বউভাতের নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন বিনোদবাবু ঐ বাড়িরই ছাদের উপর বসে। তারপর একদিন নরেশ দত্তের ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণও খেয়েছিলেন বিনোদবাবু ঐ বাড়ির উঠানে ছোট এক রঙীন সামিয়ানার নীচে বসে। কি যেন নাম ছিল ছেলেটার? বিশু, হ্যাঁ বিশু। বিশুর মা বিশুকে কোলে নিয়ে ঐ বাড়িরই ছাদের উপর দাঁড়িয়ে প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা কথা বলতো পাশের বাড়ির শ্যামবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে।

কিন্তু ব্যস, তারপর আর নয়। নরেশ দত্তের ঐ বাড়ি আর কোনদিন হেসে হেসে নিমন্ত্রণ করতে পারেনি প্রতিবেশী বিনোদবাবুকে।

দু'টি বছর যেতে না যেতেই বার বার তিনবার কেঁদে উঠল নরেশ দত্তের বাড়ি। প্রত্যেকবার ছুটে এলেন বিনোদবাবু। প্রথমবার, নরেশ দত্তের বাবা মারা গেল যেদিন। দ্বিতীয়বার, নরেশ দত্তের স্ত্রী মারা গেল যেদিন। আর তৃতীয়বার, নরেশ দত্তের ঐ বাড়ির কান্না শুনে ছুটে সেদিন এসেছিলেন বিনোদবাবু আর প্রতিবেশীরা, একমাসের জ্বরে মারা গেল যেদিন তিন বছর বয়সের বিশু।

হ্যাঁ, আর একবার এসেছিলেন বিনোদবাবু। সেই রাত্রেই। সেই শেষ আসা। শোকার্ত আর সারাদিন উপোসী নরেশ দত্তকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু খেতে রাজি করাবার জন্য এসেছিলেন বিনোদবাবু। এসেই দেখতে পেয়েছিলেন, ঘরের ভিতর দেয়ালের গায়ে ছোট একটা কালো ছাপের দিকে ট্যারা চোখের অপলক দৃষ্টি

তুলে তাকিয়ে আছে নরেশ দত্ত। শিশুর কালিমাখা ছোট্ট হাতের একটা ছোট্ট ছাপ।

ছলছল করে উঠেছিল নরেশ দত্তের ট্যারা চোখের দৃষ্টি। বলেছিল নরেশ দত্ত, বিশ্বাস করুন বিনোদদা, এই বাড়িটাই অপয়া, ভয়ঙ্কর অপয়া।

সেদিন নরেশ দত্তের ট্যারা চোখের ছলছল দৃষ্টিকে বিশ্বাসই করেছিলেন বিনোদবাবু। কিন্তু তারপর? তারপর নরেশ দত্ত নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ঐ ট্যারা চোখ শুধু ধূর্ত হাসি লুকিয়ে লোক ঠকাবার ফিকিরে ঘুরে বেড়ায়। অপয়া বাড়িটাকেই পয়া করে তুলেছে নরেশ। আট হাজারও দাম হবে না যে বাড়ি, সেই বাড়িকে ভাঙিয়ে পনর হাজার টাকা বাগিয়েছে।

এই সেদিনও, যেদিন নরেশ দত্তের বিরুদ্ধে মহাজনের মামলা সুরু হলো, সেইদিন বিনোদবাবুর কাছেই এসে বেপরোয়া বেহায়ার মতো হেসে হেসে নরেশ দত্ত বলেছিল, বৃথাই ওরা মমলা করছে বিনোদদা।

—কেন? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বিনোদবাবু।

নরেশ দত্ত বলেছিল, আমার কোনই লস হবে না বিনোদদা। কাঁচা ইটের বাড়ি, বাজে শাল কাঠের কড়ি বরগা আর চৌকাঠ। তাতে আবার ঘুন ধরেছে। এ বাড়ি ছেড়ে দেবার চেষ্টাই করে আসছি পঁচিশ বছর ধরে।

বিনোদবাবু—কিন্তু কোথাও মাথা গুঁজে থাকতে হবে তো।

ঝক্ করে হেসে ওঠে নরেশ দত্তের ট্যারা চোখ—তা চেষ্টা করলে কি একটা জায়গা হবে না বিনোদদা।

বিনোদবাবু—নতুন বাড়ি করবার মতলব করেছেন না কি?

মুখের কথার উত্তর না দিয়ে শুধু হাসতে থাকে নরেশ দত্ত। তারপর বলে—টাকা হাতে থাকলে কি না হয়?

পঁচিশ বছর আগে এই নরেশ দত্তকে পাড়ার লোকেরা ঠিক চিনতে পারেনি, চিনেছে অনেক পরে, এবং আজ সবচেয়ে ভাল করে চেনা গেল। ঠিকই বলে পাড়ার ছেলেরা, বোগাস নরেশ দত্ত। শুধু কথার চালাকিতে মানুষকে বোকা করে দিয়ে লোকটা অনেক ক্লাব সমিতি আর সেবাকার্যের টাকা মেরেছে। ভুয়ো কোম্পানী করার অভিযোগে দু'বার মামলায় পড়েছিল। ওর মুখের কথা আর হাতের সইকে আজ অন্তত এই পাড়ার কোন মানুষ বিশ্বাস করে না।

নরেশ দত্তের বাড়ির সামনে ভীড়ের হল্লা বাড়ে। দৌড়াদৌড়ি করে পুলিশ কনেষ্টবল। সেই দিকে তাকিয়ে বিনোদবাবু বলেন—প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হলো লোকটার, তবু কি আশ্চর্য।

তবু, কি আশ্চর্য, লোকটা মানুষকে ধাপ্পা দেবার ব্যবসা করে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে আর টাকা জমাচ্ছে। মাত্র একটা প্রাণ, টাকার জন্য এত লোভের দরকারই বা কি?

কিন্তু চিন্ময়বাবু বলেন—ভালই হলো, লোকটাকে পাড়া থেকে সরাবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, পুলিশকেও অনেকবার বলেছিলাম। কিন্তু কোনই ফল হয়নি। আজ যাই হোক…।

আজ দেখা যাচ্ছে, লোকটা সত্যিই চলে যাচ্ছে। পাড়ার মধ্যে এরকম একটা সাংঘাতিক বোগাস লোক থাকলে পাড়ার পক্ষেই আশঙ্কার কথা।

আক্ষেপ শুধু এই যে, লোকটা একটুও জব্দ হলো না। বেশ মোটারকম বাগিয়ে নিয়ে, আর খুশি মনে একটা উই-খাওয়া আর ঘুনধরা অপয়া বাড়িকে পাড়ার বুকের উপর ফেলে দিয়ে সরে পড়বে বোগাস নরেশ দত্ত। শুধু হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু নয়, বিনোদবাবু, চিন্ময়বাবু, আর প্রতিবেশীদের ভীড়টাও একটা চাপা আক্রোশ নিয়ে নরেশ দত্তের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু লোকটা এখনো বাড়ির ভিতর বসে করছে কি? বোধহয় ট্যারা চোখ নিয়ে হাসছে আর সিগারেট খাচ্ছে।

হঠাৎ একটা সোরগোল জাগে বাড়ির সামনে পথের ভীড়ের মধ্যে। কি হয়েছে? কি হয়েছে? প্রশ্ন করে সকলেই।

পুলিশ কনষ্টেবল বলে—বাড়ির বের হতে চাইছে না লোকটা।

গর্জন করেন হাটখোলার মহাজন, আর সেই গর্জনে এতক্ষণের একটা হতাশ আক্রোশ উল্লাস হয়ে ফেটে পড়ে।—গলা টিপে, কান ছিঁড়ে, ঘাড়ে ধরে, লাথি মেরে বের করে দিন বেটাকে। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসুন ঠগটাকে।

আদালতের কেরাণী পুলিশ কনেষ্টবলকে লক্ষ্য করে বলেন—দেখবেন মশাই, একটু সামলে কাজ করবেন। মনে হচ্ছে, লোকটার কোন অসুখ বিসুখ করেছে।

কনেষ্টবল বলে—আমার মনে হয় লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে। বিছানাটা গুটিয়ে বগলদাবা করে নিয়ে চুপ করে মেজের ওপর বসে রয়েছে। কিন্তু উঠতে চাইছে না।

আদালতের কেরাণী বলেন—তাহলে বোঝা যাচ্ছে, অসুখও হয়েছে, মাথাও খারাপ হয়েছে। কাজেই, এ অবস্থায় লোকটার গায়ে হাত দেওয়া ঠিক আইন মতো কাজ হবে কি?

হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু দুটো দশ টাকার নোট বের করে আদালতের কেরাণী আর পুলিশ কনেষ্টবলের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে ফিসফিস

করে বলেন—আর জ্বালা বাড়াবেন না মশাই। এইবার খুশি হয়ে কাজটা সেরে দিন। লোকটাকে ঘাড়ে ধরে··।

বাড়ির ভিতরের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল কনেষ্টবলের মারমূর্তি। চেঁচাতে থাকেন কৈলাসবাবু—কান ধরে হিড়হিড় করে, একেবারে হেঁচড়ে ঘেঁষড়ে টেনে···।

কিন্তু বৃথাই প্রতীক্ষায় ছটফট করেন মহাজন কৈলাসবাবু আর পথের ভীড়। কনেষ্টবল ভিতরে গিয়েছে তো গিয়েছেই, ফিরে আর আসে না।

গর্জন করেন আদালতের কেরাণীবাবু—এঃ, এত সমীহ করার কি আছে? হাত ধরে টেনে আনলেই তো।

বলতে বলতে কেরাণীবাবু তাঁর হাতের ক্রোকী পরোয়ানা বুকে চেপে নিয়ে বোগাস নরেশ দত্তের উঁই-খাওয়া বাড়ির ভিতর লক্ষ্য করে ছুটে যান।

কিন্তু বৃথা, কেরাণীবাবু ফিরে আসেন না। পুরো দশটা মিনিট সময় পার হয়ে যায়। অস্থির হয়ে আতঙ্কিতভাবে ডাক ছাড়েন কৈলাসবাবু—কি হলো মশাই?

পথের ভীড়ও কৌতূহল সহ্য করতে না পেরে মুখর ও চঞ্চল হয়ে ওঠে—কি হলো? কি হলো? আবার কি কাণ্ড হলো?

সামনের বাড়ির বারান্দায় বিনোদবাবু আর চিন্ময়বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কি হলো?

কৈলাসবাবু বলেন—লোকটা আবার ভোগা দিচ্ছে মশাই, বের হতে চাইছে না।

বিনোদবাবু বলেন—আর দেরি করবেন না। নইলে আবার একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে তুলবে।

ভীড়ের মধ্যে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—বাধিয়ে তুলেছে বোধহয়।

কৈলাসবাবু দাঁতে দাঁত চেপে হুঙ্কার ছাড়েন—তাহলে?

বলতে বলতে স্বয়ং কৈলাসবাবু আর পথের সমস্ত ভীড় হুড়মুড় করে বোগাস নরেশ দত্তের ঘুনধরা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে।

এতক্ষণে সব চাঞ্চল্য আর মুখরতাকে যেন হঠাৎ গিলে ফেলেছে অপয়া বাড়িটা। একেবারে স্তব্ধ, কোন শব্দ হয় না! বাড়ির ভিতরে ঢুকে এত বড় একটা কলরবও কি মরে গেল?

বিনোদবাবু উঠে দাঁড়ান। ব্যাপার কি? লোকটা বের হয় না কেন?

চিন্ময়বাবু এক দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন—লোকটাকে বের করে দেওয়া হচ্ছে না কেন? এত দেরী কিসের জন্য?

বিনোদবাবু—বোধহয় আবার একটা ব্লাফ দিয়ে সকলকে বোকা বানাচ্ছে বোগাসটা।

চিন্ময়বাবু দুই চোখ কটমট করে ওঠে—তাহলে আমাদের কর্তব্য হলো…।

যেন পাড়ার মধ্যে এক ঝোপের ভিতর ক্ষেপা শেয়াল লুকিয়ে রয়েছে। বের হতে চায় না, কিন্তু বের করে দিতে হবে। ধমক না শুনলে ঘাড়ে হাত দিতেই হবে। দিতে দেরী হচ্ছে কেন? কি এমন সমস্যা?

চিন্ময়বাবু বলেন—আপনি একটি ধমক দিলে কাজ হবে বিনোদবাবু।

আর দেরী করবেন না বিনোদবাবু আর চিন্ময়বাবু! ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে ঘুনধরা বাড়িটার ভিতরে ঢুকলেন।

সত্যিই কি ভয়ানক ব্লাফ জমিয়েছে বোগাস নরেশ দত্ত।

এতগুলি লোকের ভিড় যেন হতভম্ব হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে নরেশ দত্তের ট্যারা চোখ দু'টোকে, আর মাঝে মাঝে আর একটি জিনিসকে।

পুলিশ কনেষ্টবলের হাত দুটো যেন অকর্ম্মণ্য পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, একটুও নড়ে না। বোগাস নরেশ দত্তের ঘাড় স্পর্শ করবার সাহস নেই কনেষ্টবলের ঐ দুই হাতে।

আদালতের কেরাণী ক্রোকী পরোয়ানাকে মিছামিছি পড়েন আর এদিক ওদিক তাকান।

হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু আস্তে আস্তে মাথা চুলকান, আর এক পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করেন।

আর, ভীড়ের লোক অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, যেন বোগাস নরেশ দত্তকে নতুন করে চেনবার চেষ্টা করছেন বিশ জোড়া চক্ষু।

ময়লা উঁইধরা দেয়ালের গায়ে ছোট একটি শিশুর হাতের একটি কালিমাখা ছাপ। গোটানো বিছানা বগলদাবা করে বসে আছে বোগাস নরেশ দত্ত, আর তার ট্যারা চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে রয়েছে সেই কালিমাখা ছাপের দিকে তাকিয়ে। যেন হঠাৎ কোমর ভেঙ্গে বসে পড়েছে নরেশ দত্ত আর উঠতেই পারছে না। অচল অনড় আর স্তব্ধ করে দিয়েছে নরেশ দত্তকে, ঐ কোন এক শিশুর হাতের ছোট্ট একটি কালিমাখা ছাপ।

বিনোদবাবু চমকে ওঠেন। চিন্ময়বাবু ভয় পেয়ে বিনোদবাবুর কানের কাছে ফিসফিস করেন।—ঐ যে সেই, সেই যে আপনি গল্পটা বলেছিলেন, মনে পড়েছে বোধহয়, ঐ ছাপটা বোধহয় ওরই…।

বিনোদবাবু—হ্যাঁ, ওরই ছেলের হাতের ছাপ।

বোগাস নরেশ দত্তের ভয়ঙ্কর ব্লাক সত্যিই একেবারে অকর্মণ্য করে দিয়েছে আদালতের ক্রোকী পরোয়ানা আর এতগুলি আক্রোশ আক্ষেপ আর প্রতিশোধের দাবীগুলিকে।

ঠিকই, উঠতে পারছে না বোগাস নরেশ দত্ত। যেন আজ পঁচিশ বছর পরে নিজেকেই হঠাৎ চিনতে পেরে ভয় পেয়েছে নরেশ দত্ত, আর ধপ করে বসে পড়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি সুবিচার আর প্রতিশোধের মূর্তিগুলিকেও যেন বসিয়ে দিয়েছে নরেশ দত্ত। মহাজন কৈলাসবাবু অসহায়ের মতো ভাঙ্গাগলায় আস্তে আস্তে বলেন—এখন আপনিই একটা পরামর্শ দিন বিনোদবাবু।

কথা বলেন বিনোদবাবু—তুমি যদি ইচ্ছে করো তবে এখনো এখানেই থাকতে পার নরেশ, কিন্তু মহাজনদের টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে।

কোন উত্তর দেয় না নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু—এই বাড়ির জন্য যদি এতই মায়া ছিল, তবে কেন মিছিমিছি···।

উত্তর দেয় না নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু—যদি কথা দাও যে, একমাসের মধ্যে সকলের পাওনা মিটিয়ে দেবে, তাহলে···।

চিন্ময়বাবু বলেন—তাহলে এঁরাও ক্রোক স্থগিত রাখবেন, আর তুমিও আপাতত এখানে থাকতে পারবে নরেশ।

গোটানো বিছানাটা আস্তে আস্তে খুলে ঘরের দেয়াল ঘেঁষে পেতে ফেলে নরেশ দত্ত। বিছানার উপর বসে, আর দেয়ালের কালিমাখা ছোট্ট হাতের ছাপের দিকে ট্যারা চোখে অদ্ভুত এক স্নেহান্ধ দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। যেন দু'চোখের সাধ ঢেলে দিয়ে জীবনের একটা খাঁটি সম্পত্তির রূপ দেখছে নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু বলেন—তাহ'লে কি বলছ নরেশ?

আনমনার মতো বিড় বিড় করে নরেশ দত্ত বলে—পরের কথা পরে। এখন আমি এক পা'ও নড়তে পারবো না বিনোদদা।

আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন মহাজন কৈলাসবাবু—তাহলে আমার কি হবে? একটা পরামর্শ দিন আপনারা।

ঘরের ভিতরে ভিড় কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়।

বোধহয় আধ মিনিটও পার হয়নি, মহাজন কৈলাসবাবুও যেন প্রচণ্ড একটা ভয়ের তাড়া খেয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে এসে বাইরের ভিড়ের

কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন।

আদালতের কেরাণী প্রশ্ন করেন—কি হলো?

কৈলাসবাবু বাললন—উঃ, কি ভয়ানক জিনিস!

কেরাণীবাবু হাসেন—কার কথা বলছেন? বোগাস নরেশ দত্ত।

কৈলাসবাবু—আরে নারে মশাই; দেওয়ালের গায়ে ঐ যে একটা…। যাক্‌গে, এইবার একটা পরামর্শ দিন।

কেরাণীবাবু চিন্তিতভাবে বলেন—আপাতত…।

গানের চেয়ে বেশী

বেহালার নতুন রাস্তার ধারে পাশাপাশি তিনটি নতুন বাড়ি। এদিকের বাড়িটা হল মুক্তাকণা মিত্রের বাবা সঞ্জয় মিত্রের বাড়ি। আর ওদিকের বাড়িটা হল বিতুলা সেনের কাকা পার্থ সেনের বাড়ি। মাঝের বাড়িটা ভাড়া খাটে, বাড়ির মালিক দাশগুপ্ত মশাই থাকেন নিউ শ্যামবাজারে।

মাঝের বাড়িটা বেশ কিছুদিন খালি থাকার পর, সেই বাড়িতে ভাড়াটিয়া হয়ে যারা এসেছে, তারা হল এক পরিবার। এসেছেন এক অপ্রবীণ বয়সের ভদ্রলোক, তার মা আর তার দুটি ভাই-বোন। দেখে বোঝাই যায়, এখনও বিয়ে করেন নি ভদ্রলোক। আরও বোঝা যায় বছর দশেক আগে বিয়ে করলেই ভাল করতেন ভদ্রলোক। চেহারাটা তেমন কিছু কাঁচা-বয়সের চেহারা নয়।

সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথম দিনেই নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করলেন—বেশ ছেলেটি!

তিন বাড়ির এই মাঝের বাড়িতে যে রায়-পরিবার ভাড়াটিয়া হয়ে থাকতে এসেছে তারা নিশ্চয়ই চিরটা কাল এখানে থাকতে আসেনি। কিন্তু কতদিন থাকবে? কি বলে ছেলেটি? সঞ্জয় মিত্র খোঁজ নিয়েছেন, পার্থ সেনও খোঁজ নিয়েছেন। জানতে পেরেছেন দু'জনেই, মাত্র এক বছর এরা এই বাড়িতে থাকবার জন্য এসেছে। ছেলেটি অর্থাৎ পরমেশ রায় ভারত সরকারের হিসাব বিভাগে বেশ ভালো মাইনের একটা সার্ভিসে আছে। কলকাতার অফিসে মাত্র এক বছরের জন্য কাজ করবে পরমেশ, তার পরেই আবার বদলি। বোধহয় ডিব্রুগড়েই চলে যেতে হবে।

—উঃ, এত দূরে ? সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন, দু'জনেই যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন।

পরমেশ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ ও পরিচয় হবার পর আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লেন সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন। প্রায়ই চা-খাওয়ার নিমন্ত্রণ পায় পরমেশ। কোনদিন সকালে সঞ্জয় মিত্রের বাড়িতে, কোনদিন সন্ধ্যায় পার্থ সেনের বাড়িতে।

মাত্র এই তো ব্যাপার। কিন্তু এরই মধ্যে পাড়ার নিন্দুকেরা আড়ালে ফিস-ফাস করতে শুরু করে দিয়েছে, জামাই বাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন পার্থ সেন আর সঞ্জয় মিত্তির।

নিন্দুকেরা ভুল ধারণা হয়তো করেনি, কিন্তু নিন্দুকদের ধারণা সত্য হবে বলে মনে হয় না। পাড়ার মেয়েরা সবার আগে বুঝতে পেরেছেন, সঞ্জয় মিত্তির আর পার্থ সেন যে আশায় একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, সে আশা নিতান্তই ভুল আশা। পরমেশের মা নিজেই কথায় কথায় বলে ফেলেছেন—ছেলে বিয়ে করতে চায় না। আমি দশ বছর ধরে বলে বলে হার মেনেছি, কিন্তু সব বৃথা। ছেলে যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ধরেছে।

সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেনের বাড়িতেও এই সমস্যা। দুই বাড়িতে যেন দুটি মেয়ে ভীষ্ম রয়েছে। মুক্তা মিত্র বিয়ে করতে চায় না; বিদুলা সেনও বিয়ে করতে চায় না।

বি-এ পাশ করার পর আজ প্রায় পাঁচ বছর হল, মুক্তা মিত্র যেন ইচ্ছে করেই এই বাড়ির একটি ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। একটি তানপুরা, আর এক গাদা স্বরলিপির বই, এই নিয়ে মুক্তা মিত্র তার নিজের মনের জগতে লুকিয়ে আছে। গানকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে মুক্তা। শুধু গান আর গান। মুক্তার জীবন যেন এই সংসারের সব মায়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এক স্বরলোকের নীড়ে, মীর মূর্ছনা গমক আর ঝংকারের মায়ার মধ্যে মুগ্ধ হয়ে বসে আছে।

পিসিমা খুবই বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে ঝগড়াও করেন। —গান-উলীর বয়স কত হল ভেবে দেখ সঞ্জু। কোন্ মুখে আর মেয়েটি মেয়েটি করছিস ? মেয়ের বিয়ে দিবি কবে ? আমার মতো যখন মেয়ের চুল পেকে শনের নুড়ি হবে, তখন ?

পার্থ সেনের ভাইঝি ঐ মেয়েটি, ঐ বিদুলা সেনও বিয়ে করবে না। কখনই না। আই-এ ফেল করার পর থেকে সেই যে ছুঁচ কাঁটা কুরুশ নিয়ে সেলাই-এর বাতিক ধরেছে, তো ধরেইছে। সে-ও তো প্রায় আট বছর হল। দিবারাত্রি শুধু

রঙীন সুতো নিয়ে এক বাতিকের খেলা। শুধু ফুল তোলা আর নক্সা আঁকা।
বড়দাও রাগ করে বলেন—এতই যদি পারিস, তবে একটা দরজীর দোকান দিয়ে ফেল না বিদুলা।

বিদুলা বলে—শুধু দরজীর দোকান কেন, আমি একটা রান্নার দোকানও দিতে পারি। এখুনি যে আমারই হাতের তৈরী পাঁচটা মাছের-চপ টপাটপ খেয়ে ফেললে, সেগুলি খেতে খারাপ লাগল?

বড়দা—তবে তাই কর। একটা রান্নার দোকান দিয়ে ফেল।

বিদুলা—তা হলে তো একটা মাথা-টেপার দোকানও দিতে হয়।

বড়দা--কি বললি?

বিদুলা—তুমিই তো বলেছ, আমি তোমার মাথা না টিপে দিলে ফিজিক্সের কোন ফরমুলাই তোমার মনে পড়ে না। পড়াতে গিয়ে ছেলেদের কাছে নাকাল হও।

অধ্যাপক বড়দা সত্যিই একটু নাকাল হয়ে তারপর একটু হেসে ফেলেন।

বেহালার নতুন সড়কের পাশে নতুন তিনটি বাড়ির উপর দিবারাত্রি নিমের ছায়া দোলে, কিন্তু তিন বাড়ির জীবনের ভিতরের সমস্যা একটুও দোলে না। সমস্যাটা তেমনি নিরেট হয়ে রয়েছে।

কিন্তু এমন সমস্যার কারণটাই বা কি? কেন বিয়ে করতে চায় না মাঝের বাড়ির পরমেশ? বিয়ের নামে এত ভীত হয়ে পড়ে কেন এই বাড়ির মুক্তা, আর ওই বাড়ির বিদুলা?

পরমেশের মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করার পর পিসিমার মুখে যে সব কথা ফুটতে থাকে সে-সব কথা শুনলে মনে হয়, হ্যাঁ, তাই হবে বোধহয়। সমস্যার কারণটা প্রায় আন্দাজ করতে পেরেছেন পিসিমা।

পরমেশের মা'র কাছে পিসিমা বলেন—আমার কি মনে হয় জান? বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে বিয়ে করবার মনই হারিয়ে ফেলে।

পরমেশের মা হাসেন।—আমার ছেলে কিন্তু দশ বছর আগে থেকে, যখন বলতে গেলে ছেলেমানুষই ছিল, তখন থেকেই বিয়ের নামে শুধু না-না করেছে, আজও তাই করছে।

পিসিমা বলেন—তা'হলে বলতে হয়, এরা মনের মতো জন খুঁজে পাচ্ছে না বলেই বিয়ে করছে না।

পরমেশের মা বলেন—কিন্তু মনের মতো হয় না কেন বলুন? আমার ছেলের কথাই ধরুন না, কত ভাল মেয়ে ওকে দেখিয়েছি, কিন্তু মনে তো ধরল না।

পিসিমা—তা হলে বুঝতে হয় যে, এরা ছাই বুঝতেও পারে না, মনের মতো জন কে হতে পারে। যেমন আপনার বাড়ির ছেলে, তেমনি আমার বাড়ির মেয়ে আর তেমনি হল পার্থ সেনের ভাইঝিটা।

গড়িয়ে চলে দিন, সমস্যাটাও তেমনি থিতিয়ে থাকে, দেখতে দেখতে একটা মাসও পার হয়ে যায়। শুধু পরমেশকে দেখা যায়, কখনও সঞ্জয়বাবুর বাড়িতে, কখনও বা পার্থবাবুর বাড়িতে, চা-এর নিমন্ত্রণে যায়। মুক্তার সঙ্গে চা-এর আসরে যেমন আলাপ পরিচয় হয়েছে পরমেশের, তেমনি বিতুলার সঙ্গেও হয়েছে। তু'দিকে তুই বাড়িতে তুই মেয়ের সঙ্গে শুধু নমস্কার বিনিময় করে চলে এসেছে মাঝের বাড়ির ছেলে পরমেশ।

ঘটনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে সন্দেহ করার মতোও কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। যারা নিন্দে করতে চায় তারাও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কোন বাড়ির চা বেশী মিষ্টি মনে হয়েছে পরমেশের ?

সঞ্জয় মিত্র ভাবেন, মাঝের বাড়ির পরমেশ এখানে দশ বছর থাকলেই বা কি হবে ? পার্থ সেন ভাবেন, ওরা ডিব্রুগড় চলে গেলেই বা কি আসে যায় ?

এক মাসের মধ্যে শুধু কয়েকটি দিন, তারপর আর চা-এর নিমন্ত্রণে কোনদিন তু'দিকের কোন বাড়িতেই পরমেশকে যেতে দেখা যায়নি। পরমেশের সঙ্গে পথে যদি দেখা হয়, তবে শুধু ভারত সরকারের ইকনমিক পলিসি সম্পর্কে পরমেশের সঙ্গে আলোচনা করেন সঞ্জয়বাবু। পার্থ সেনের সঙ্গেও পরমেশের মাঝে মাঝে দেখা হয়। পার্থ সেন বলেন—তা ডিব্রুগড়ই বা কি এমন খারাপ জায়গা ? শুনেছি ব্রহ্মপুত্রের ভিউ বড় চমৎকার।

নিন্দুকেরাও হতাশ হয়ে পড়ে। ঘটনার গায়ে একটুও রং ধরল না। মেলা-মেশির পালিশও চটেছে। চা-এর নেমতন্নের আর সেই হাঁকডাকও নেই। বোধ হয় কোন বাড়ির চা মিষ্টি মনে হয়নি পরমেশের।

তু'মাস কেন ? তারও বেশী হবে। সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন গল্প করতে করতে নতুন সড়কের উপর পায়চারী করেন এবং মাঝের বাড়ির গেটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ফেরিওয়ালার সঙ্গে জিনিসের দামের দরাদরি করেন, এবং চোখেও পড়ে যে, মাঝের বাড়িটা নিঝুম হয়ে রয়েছে। কিন্তু মনেও পড়ে না তু'জনেরই কারও, এই বাড়িতে মানুষ আছে, এবং পরমেশ নামে এক অল্প বয়সের ভদ্রলোক এখানে থাকেন। পরমেশের সঙ্গে যে এক মাসেরও বেশী হল তাঁদের একবার দেখাও হয়নি, তাও মনে পড়ে না।

কিন্তু মনে পড়ল হঠাৎ এবং দুই জনেই একটু লজ্জিত হয়ে চমকে উঠলেন। দেখতে পেলেন, ডাক্তারের গাড়ি এসে থামল মাঝের বাড়ির গেটের কাছে।

ডাক্তার বাড়ির ভিতরে চলে যেতে সঞ্জয় মিত্র বলেন—পরমেশই অসুখে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

পার্থ সেন বলেন—তাই তো অনেক দিন তার দেখা পাই না।

মাঝের বাড়ির ভিতরে স্বচক্ষে সব দেখার পর চিন্তিত হয়ে পড়লেন সঞ্জয়বাবু ও পার্থবাবু। টাইফয়েড হয়েছে পরমেশের। পরমেশের বিছানার দু'দিকে দুটি টুলের উপর বসে আছে পরমেশের ভাই আর বোন। মাথার কাছে বসে আছেন পরমেশের মা। উদ্বিগ্ন এক একটি মূর্তির চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, দিন রাতের কোন মুহূর্তেও এরা ঘুমোয় না। খাওয়া দাওয়ার পাটও বন্ধ হয়ে গিয়েছে বোধহয়।

সঞ্জয়বাবু আক্ষেপ করেন—আমাদের একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল।

পার্থ সেন বলেন—আপনাদের এখানে তো আর কারও সাড়া শব্দ পাচ্ছি না, রান্নাবান্না করে কে ?

পরমেশের মা বলেন—লোক আছে।

ডাক্তার বলেন—ক্রাইসিস পার হয়ে গিয়েছে, এখন আর চিকিৎসা বলে কিছু নেই, দরকার হল শুশ্রূষা।

পরমেশের দুই ভাই বোনের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলেন—এই দুটি বাচ্চা মানুষ যে কী এক্সপার্ট নার্স, তা আর কী বলব মশাই। ওদের দেখতে পেয়ে আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছি। খুব ভালো শুশ্রূষা চলছে।

নিশ্চিন্ত হলেন সঞ্জয়বাবু এবং পার্থবাবু। এবং খুশী মনেই চলে গেলেন। চলে গেলেন ডাক্তার। আবার নিঝুম হয়ে যায় মাঝের বাড়ি।

কিন্তু বোধহয় পনর মিনিটও পার হয়নি মাঝের বাড়ির গেটের দরজা হঠাৎ শব্দ করে ওঠে। তারপরেই একেবারে রোগীর ঘরের ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায় এক আগন্তুক।

পরমেশের মা বলেন—বস বিতুলা।

চেয়ারে বসে না বিতুলা। একবার পরমেশের মুখের দিকে তাকায়। ঘুমোচ্ছে পরমেশ। ঘরের ভিতরেই আস্তে আস্তে ঘোরা ফেরা করে বিতুলা। হঠাৎ থামে, রোগীর টেম্পারেচারের চার্ট টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পড়তে থাকে। ওষুধের শিশিগুলির দিকে একবার তাকায়। রোগীর দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে। তারপর পরমেশের ভাই-এর কানের কাছে আস্তে আস্তে বলে—বিছানার চাদরটা

বদলে দিলে ভালো হয় ভাই।

পরমেশের মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন—তুই এখন পাখা ছেড়ে দে মিনি। বিতুলাকে নিয়ে বাইরের ঘরে বসে গল্প কর। আমি আসছি এখনি।

চোখ মেলে তাকায় পরমেশ। পরমেশের শুকনো চোখ দুটোই যেন হঠাৎ বিস্ময়ে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে—আপনি কখন এলেন ?

বিতুলা বলে—এখুনি। এখুনি কাকার কাছে শুনলাম যে আপনি অসুখে পড়েছেন।

পরমেশ হাসে—পড়েছিলাম, কিন্তু এখন উঠেছি।

মিনি ডাকে—আসুন বিতুলাদি।

মিনির সঙ্গে বাইরের ঘরে ঢুকেই বিতুলা চমকে ওঠে—একি ?

মিনি বুঝতে পারে না—কি বলছেন বিতুলাদি ?

বিতুলা—এত সব তানপুরা এস্রাজ বেহালা এখানে কিসের জন্য ?

মিনি—দাদার জিনিস। দাদা খুব ভাল গাইতে বাজাতে পারেন। দাদা গানকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন।

বিতুলা—কিন্তু কই, পরমেশবাবুকে তো কোনদিন গাইতে শুনিনি ?

মিনি—না এখানে এসে গান আরম্ভ করতে পারেন নি। এই তো কদিন আগে যন্ত্রগুলি এসে পৌঁছলো, রেলের বুকিং-এর ভুলে পাটনা চলে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ অসুখে পড়লেন দাদা, কাজেই…।

পরমেশের মা এসে ঘরে প্রবেশ করেন—আমি যে তোমার নিন্দে শুনেছিলাম বিতুলা। তুমি নাকি অহংকারী, কখনও কারও বাড়ি যাও না।

বিতুলা হাসে—অহংকারী নই, তবে কারও বাড়ি যাই না ঠিকই।

মিনি হাততালি দিয়ে বলে—তাহলে আমরাই ফার্স্ট, বিতুলাদি আমাদের বাড়িতে ফার্স্ট এসেছেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় বিতুলা। সত্যিই তো। এবাড়িতে এমন করে ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবার কি দরকার ছিল ? মিনি আর মিনির মা আশ্চর্য হয়েছে। আরও অনেকেই হয়তো এক রকম আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করবে। বাড়ি ফেরা মাত্রই তো কাকিমা প্রশ্ন করবেন—কেমন দেখলি পরমেশকে ? ভুল করে হঠাৎ অনেক গুলি প্রশ্নের ভয় জীবনে ডেকে এনে ফেলেছে বিতুলা।

বড় অস্বস্তি বোধ করে, উঠে দাঁড়ায় বিতুলা। ব্যস্তভাবে বলে—আমি যাই।

মিনির মা বলেন—এস আবার।

মিনি প্রশ্ন করে—কবে আসবেন ?

—দেখি, কবে আসতে পারি। বিড়-বিড় করে বলতে বলতে চলে যায় বিতুলা।

মনে হচ্ছে বিতুলা সেনই বিতুলা রায় হয়ে যাবেন। আড়ালের নিন্দুকেরা যেদিন ফিসফিস করে, ঠিক সেইদিন সন্ধ্যায় মাঝের বাড়ির ভিতর থেকে গানের সুর আর এস্রাজের আওয়াজ উথলে ওঠে। আর, ও দিকের সন্ধ্যায় মিত্রের বাড়ির জানালায় একটি ছায়া হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। রঙীন শাড়ীর আঁচলের খুঁট আঙ্গুলে জড়িয়ে মাঝের বাড়ির একটি ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে মুক্তা কণা। আবার মন দিয়ে, আর সব আগ্রহ নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে। কে সাধছে এমন সুন্দর আশাবরী? পরমেশবাবু! ভদ্রলোক কি সত্যই গানের মানুষ? অল্প কথা বলেন, আস্তে কথা বলেন, কিন্তু গানের বেলায় একি দরাজ গলা! এই মানুষ যে সেই মানুষই নয়, একেবারে ভিন্ন এক জগতের মানুষ।

আর দেরী করে না মুক্তাকণা মিত্র। মাঝের বাড়ির গেটের দরজা আবার ঝন করে বেজে ওঠে। গেট খুলে বাড়ির ভিতরে চলে যায় মুক্তা। মুক্তা মিত্রের মনের সব কল্পনা যেন এতদিনের নির্বাসন থেকে বেড়া ভেঙ্গে ছুটে এসেছে; এক গমকে ভেসে এসেছে মুক্তা মিত্রের মনটাই।

যারা কদিন আগে দেখেছিল, মাঝের বাড়ির গেট খুলে বিতুলা সেন ঢুকছে বাড়ির ভিতরে, তারাই আজ মুক্তা মিত্রকেও সেই বাড়িতে যেতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। জমলো নাকি খেলা? তবে কি মুক্তা মিত্রই মুক্তা রায় হয়ে যাবেন?

পরমেশের ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় মুক্তা মিত্র। গান থামিয়ে পরমেশ বলে —বসুন।

মুক্তা বলে—কোন খবর না দিয়ে একেবারে অভদ্রের মতোই এসে পড়লাম পরমেশবাবু। আমি গানকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি।

চমকে ওঠে পরমেশ। মুক্তা মিত্রের মুখের দিকে বিস্ময়ের চক্ষু তুলে তাকায়। পৃথিবীতে তাহলে সত্যিই আরও একজন মানুষ আছে, যে তারই মতো প্রাণের চেয়েও গানকে বেশি ভালবাসে।

মুক্তা বলে—থামবেন না পরমেশবাবু। গেয়ে যান।

পরমেশ—আপনিও গাইবেন তো!

মুক্তা—নিশ্চয় গাইব।

মাঝের বাড়ির একটি ঘরে সেই সন্ধ্যার মুহূর্তগুলি যেন ঝংকার দিয়ে ঝরে পড়তে থাকে। পরমেশ গান গায়, তারপর মুক্তা, তারপর আবার পরমেশ।

সুরলোকের কুহকের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন আত্মহারা হয়ে যায় দুটি মানুষের সুর-পিপাসী প্রাণ।

কে না শুনতে পায়, মাঝের বাড়ির এই সন্ধ্যার সুরময় উৎসবের ধ্বনি? পথ দিয়ে যারা মাথা হেঁট করে চলে যায় তারা শোনে, যারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলে যায় তারা শোনে। সঞ্জয়বাবুও কি শুনতে পাননি? নিশ্চয়ই শুনেছেন। তা না হলে এরই মধ্যে ব্যস্তভাবে মুক্তার মাকে কাছে ডেকে এই কথা বলতেন না—এখন তো আর কোন বাধা নেই।

মুক্তার মা আশ্চর্য হন—কি?

সঞ্জয়বাবু—এবার পরমেশের মার কাছে তুমি কথাটা তুলতে পার।

মুক্তার মা বলেন—তুলবো।

সঞ্জয়বাবু ভাবেন, পরমেশকে এইবার মাঝে মাঝে চা খেতে ডাকলে ভালো হয়।

পিসিমা তাঁর জপের মালা থামিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করেন—তোমার মেয়েটি কি সত্যিই বিয়ে করতে রাজী হয়েছে?

সঞ্জয়বাবু বলেন—রাজি হবে বলে মনে হচ্ছে।

সবাই যখন শুনেছে, তখন বিতুলাও কি না শুনে আছে?

সারাদিন কাঁটা কুরুশ আর ছুঁচ নিয়ে ফুল তোলার আর নক্সা আঁকার খেলা নিয়ে মনটা যেন বেশ ভালোই মেতে থাকে। শুধু সন্ধ্যা বেলাটায় কেমন যেন হয়ে যায়। ভিতরের বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে থাকেন অধ্যাপক বড়দা। ফিজিক্সের ফরমূলা আবার ভুলে যেতে পারেন, তাই চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বড়দার মাথা টেপে বিতুলা। মাঝের বাড়ির একটি ঘরের সুরময় উল্লাসের ঝংকার শোনা যায়। বড়দা হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বলেন—প্যারালিসিস হল নাকি তোর। হাত থামিয়ে ভাবছিস কি?

যে-কথা ভাবছিল বিতুলা, সেই কথাই এত তাড়াতাড়ি সত্য হয়ে উঠবে, সেটা এই সন্ধ্যাতেও কল্পনা করতে পারেনি স্বয়ং পরমেশ, এবং মুক্তাও।

সন্ধ্যা শেষ হবার পরেও, এবং গান শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকে মাঝের বাড়ির একটি ঘর। চলে আসছিল মুক্তা, পরমেশই বাধা দিয়ে বলে—একটু বস না মুক্তা।

চুপ করে বসে রঙীন শাড়ীর আঁচলের খুঁট আঙ্গুলে জড়ায় মুক্তা।

পরমেশ বলে—একটি কথা বলবো?

মুক্তা—বলুন।

পরমেশ—আমিও গানকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি, তোমারই মতো।

মুক্তা—তা তো বাসবেনই, দেখতেই পাচ্ছি। তা না হলে···।

পরমেশ—কি ?

মুক্তা হাসে—তা না হলে আমিই বা এখানে আসব কেন ?

পরমেশ—কিন্তু গানের মানুষকেও কি ভালবাস ?

মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে ছটফট করে ওঠে মুক্তা—কেন বাসব না পরমেশবাবু ? আপনি মিছামিছি জিজ্ঞাসা করছেন।

পরমেশের দু'চোখের হাসি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—আজ তাহ'লে এস মুক্তা। কাল আবার···।

মুক্তা বলে—কাল আবার টোড়ি আর ছায়ানট ?

পরমেশ—অ্যাঁ ? আচ্ছা।

পরমেশ আজ বিশ্বাস করে, তার এতদিনের প্রতীক্ষা আজ সার্থক হয়েছে। কল্পনা একেবারে মূর্তি ধরে চোখের সামনে এসে ধরা দিয়েছে। তার নাম মুক্তা, গানের সুরে বাঁধা একটা সুন্দর জীবন। এই তো পরমেশের জীবনের প্রয়োজন, মনের মতো জন।

পরমেশের মা'ও আজ বুঝতে পারেন, কেন এতদিন বিয়ে করতে রাজি হয়নি তাঁর ছেলে। যেমনটি চেয়েছিল পরমেশের মন, ঠিক তেমনটি আজ ভগবান ওকে পাইয়ে দিয়েছেন। ভালোই হয়েছে। সঞ্জয় মিত্রের মেয়ে মুক্তা মিত্র দেখতেও বেশ সুন্দর।

মুক্তার পিসিমা কথায় কথায় কত কথাই বলেছেন।—আমাদের বাড়ির মেয়েটি সংসারের কুটোটিও নাড়তে শেখেনি। মেয়ে শুধু ছবির মতো সাজতে জানে! ও মেয়ে একটা চিৎকার শুনলে মূর্চ্ছা যায়।

—তাতে কি হয়েছে ? পিসিমার সব কথা মনে পড়লেও মনে কোন আপত্তি বোধ করেন না পরমেশের মা। এই সংসারে এসেও মুক্তাকে কোন ঝঞ্ঝাটের কুটো নাড়তে হবে না। থাকুক না ছবির মতো সেজে। পরমেশ যদি সুখী হয়, তা হলেই হল।

এইবার আর সন্দেহ করবার দরকার হয় না। যারা কিছুই জানতো না, তারাও সব জেনে ফেলেছে। মুক্তা মিত্রই মুক্তা রায় হয়ে যাবেন। ভালো জামাই প্রায় বাগিয়ে এনেছেন সঞ্জয়বাবু। কিন্তু কবে ? বিয়ে হবে কবে ?

বিয়ের দিন ঠিক করতে পরমেশের মা'র সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য এসেছিলেন সঞ্জয়বাবু। কিন্তু আলোচনা হল না। পরমেশের মা বললেন, —পরমেশের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আর ক'টা দিন যাক্, তারপর ওর কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়েই আপনাকে জানাব।

—তাই ভালো—চলে গেলেন সঞ্জয় মিত্র। তারপরেই এলেন ডাক্তার। পরমেশ জিজ্ঞাসা করে—রেস্ট নিতে অ্যাডভাইস করেছেন, কিন্তু কি রকম রেস্ট ?

ডাক্তার—অফিসে যাবেন না, আর গান-টান একেবারে কমিয়ে দিন।

পরমেশ—আমিও তাই ভাবছিলাম। কদিন থেকে দেখছি, গান বেশি হলেই হার্টের ব্যথাটা বাড়ে।

ডাক্তার—তাহলে কিছুদিন গান একেবারেই বন্ধ করে দিন।

পরমেশ বলে—বেশ।

গান কিছুদিন একেবারে বন্ধ রাখতে হবে, এর জন্য দুঃখ হলেও সে দুঃখ তেমন কিছু নয়। কারণ, তার গানের আশা তো সার্থক হয়েই গিয়েছে। গানের মানুষকেও ভালবাসে মুক্তা।

অসুস্থ শরীরটা বিছানার উপর এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকে পরমেশ। শরীরটা রেস্ট পায় ঠিকই, মনটা রেস্ট পায় না। কখন্ আসবে সন্ধ্যা ? কখন্ আসবে মুক্তা ? আজ সন্ধ্যায় সুরে সুরে মুখর হয়ে উঠবে না এই ঘর, কিন্তু তার জন্য কোন দুঃখ করবার দরকার হয় না। কল্পনা করতে পারে পরমেশ, গভীর নীরবতার মধ্যে, এই ঘরের ভিতরে একটা বুকজোড়া শান্ত অচঞ্চলতার মধ্যে মুক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা না বলে যদি সন্ধ্যাটা পার হয়ে যায়, তাই বা কি কম লাভ ? সে-ও এক নীরব সুরের আনন্দ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঘড়ির দিকে তাকায় পরমেশ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে চমকে ওঠে মুক্তা—একি ! গানের মেয়ে যেন ঘরের এই নীরবতায় ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে।

পরমেশ হাসে—কিছুই না মুক্তা। শরীরটা একটু অসুস্থ, এই মাত্র।

মুক্তা বলে—তাহ'লে আজ শুধু দুটো আশাবরী। বেশিক্ষণ থাকব না।

পরমেশ—ডাক্তার আমাকে রেস্ট নিতে বলেছেন। গান কিছুদিন বন্ধ রাখলেই ভালো হয়।

মুক্তা আশ্চর্য হয়—গান বন্ধ রাখবেন আপনি ? তা হ'লে···তা হ'লে আমি এখন কি করি ?

পরমেশ—তুমি সত্যি গান শুনতে চাও ?

মুক্তা হাসে—নিশ্চয় শুনতে চাই।

আস্তে আস্তে উঠে বসে পরমেশ। তানপুরা হাতে তুলে নেয়। আস্তে আস্তে বলে—কি বলছিলে মুক্তা? আশাবরী?

মুক্তা—হ্যাঁ।

সুরলোকের আশাবরী এই ঘরের বাতাসে মূর্চ্ছনা ছড়ায়। মুগ্ধ দুটি চক্ষু নিয়ে বসে থাকে মুক্তা। যেন সত্যিই দেখতে পাচ্ছে মুক্তা, পরমেশের গানের ভাষা সুরের ছোঁয়ায় রঙীন হয়ে ফুলঝুরির মতো ঝরে পড়ছে।

গান শেষ হয়। মুক্তা মিত্রের কালো চোখের চাহনি আর সুন্দর ভুরু যেন ব্যথিত হয়েছে। মুক্তা বলে—আপনার আজকের আশাবরীটা কেমন যেন হয়ে গেল।

পরমেশ বলে—কিন্তু গান গেয়ে বোধহয় ভুল করলাম। হার্টের ব্যথাটা সত্যিই বাড়ছে।

আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে পরমেশ। মুক্তা মিত্র বলে—আমি এখন যাই। কাল আবার...।

পরমেশের দু'চোখে যেন একটা যন্ত্রণার বিস্ময় দপ্ করে ফুটে ওঠে।

—কাল আবার গান গাইতে পারব না। গান কিছুদিন বন্ধ রাখতেই হবে।

মুক্তা হাসে—বেশ তো, গান বন্ধ রাখুন কিছুদিন। তারপর, যেদিন আবার গাইবেন, সেদিন আসব। চলে যায় মুক্তাকণা মিত্র।

সন্ধ্যা হয়েছে, তবু কেন মাঝের বাড়ির একটি ঘরে সুর আর স্বরের ঝংকার বাজে না? পার্থ সেনের বাড়ির বারান্দায় একটি ছায়া নিজের মনের চঞ্চলতায় এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। বিতুলা শুধু কল্পনা করতে পারে—আজ বোধহয় একসঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে দুটি মানুষ, যারা প্রাণের চেয়ে গান বেশি ভালবাসে। ওরা দুজন একই মালায় দুটি ফুল। বেশ হল, ভালোই হয়েছে।

ভালো লাগে না শুধু একটি কথা ভাবতে। কেন সেদিন অমন করে বেহায়ার মতো ছুটে গিয়েছিল বিতুলা, একটা রোগী মানুষকে দেখবার জন্য? শুধু নিজের মনের কাছে নয়, কাকিমার চোখের কাছেও যে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে বিতুলা।

কাকা আর কাকিমার চাপা গলার কথাবার্তাও শুনতে পেয়েছে বিতুলা। কাকীমা রাগ করেছেন, কাকার মনটাও কেমন একটু ব্যথিত হয়েছে। সঞ্জয় মিত্রের সঙ্গে আর তেমন করে জোর গলায় গল্প করতে পারেন না কাকা।

আক্ষেপ করেছেন কাকিমা।—এতদিন গম্ভীর হয়ে থেকে, হঠাৎ সেদিন এক দৌড়ে ছুটে চলে গেল কেন বিতুলা ? গেলই যদি, তবে হঠাৎ আবার এক দৌড়ে পালিয়ে এল কেন ? এসব মেয়ের মনের রকম বোঝা ভার !

কাকা বলেন—না গেলেই ভালো করতো। তা হলে কানাইবাবু আমাকে ওরকম একটা প্রশ্ন করতে পারতেন না।

কাকিমা বলেন—আমি মনে করেছিলাম, পরমেশই বুঝি ওকে ডেকেছে।

কাকা—না, কেউ ওকে ডাকেনি। আমিই ওকে খবরটা দিয়েছিলাম। আসল কথা হল, মেয়েটার মনটাই একটু অন্য রকমের কি না। দেখলে না, সে নিজের হাতে বার্লি তৈরী করে নিজেই মতিরামের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল।

কাকিমা—কি হয়েছে মতিরামের ?

কাকা—বসন্ত হয়েছে।

কাকা ও কাকিমার চাপা স্বরের বার্তালাপ শুনতে ভালো লাগে, খারাপও লাগে। বিতুলার মনটাই অন্য রকমের। সে মন নিয়ে চাকর মতিরামের বাড়িতে ছুটে যাওয়া যায়, কিন্তু সে মন নিয়ে এই রকম গানের মানুষের কাছে ছুটে যাওয়া নিতান্তই ভুল সাহস।

হঠাৎ শোনা যায়, ওদিকের বাড়ির একটি ঘরের জানালা দিয়ে গানের স্বর ছড়িয়ে পড়ছে সন্ধ্যার বুকে।

গান গাইছে মুক্তা। এরপর নিশ্চয় গান গাইবেন মুক্তার মনের মতো জন, সেই ভদ্রলোক। পার্থ সেনের বাড়ির বারান্দায় শান্তভাবেই ঘুরে বেড়ায় একটি উৎকর্ণ কৌতূহলের ছায়া। এক গানের পর অন্য গান গাইছে মুক্তা। কিন্তু পরমেশ রায়ের গান শোনা যায় না কেন ?

—একি ? নিজের মনেই চমকে ওঠে বিতুলা। গান বন্ধ করেছে মুক্তা আজ সন্ধ্যার মতো মুক্তার গানের পালা শেষ হল। তবে পরমেশ রায় এখন কোথায় ? মুক্তা কি একাই গাইছিল গান ? তার গানের আনন্দের কাছে আর একজন কেউ কি এতক্ষণ বসে ছিল না ?

কেমন করে কল্পনা করবে বিতুলা ? বিতুলা যে এখনও কিছুই শুনতে পায়নি। সেই ভদ্রলোক যে এখন তাঁর নিজের ঘরের বিছানার উপরে একা পড়ে আছেন, আর ছোট্ট মিনি শুধু তাঁর মাথার কাছে বসে পাখার বাতাস করছে !

আর, মুক্তার পিসিমাও যে ঐ মাঝের বাড়ির এক ঘরের ভিতরে বসে পরমেশ রায়ের মা-এর সঙ্গে এখন কথা বলছেন।

পিসিমা বলেন—আমাদের মেয়েটির ঠিক উল্টোটি হলেন ও বাড়ির মেয়েটি।

সংসারের যত কাজের কুটো কুড়িয়ে সারাদিন খাটবে। পাঁচ-রকমের পথ্যি আর দশ রকমের রান্না রাঁধবে। এর মাথা টেপ, ওর গা ধোয়াও, তার মুখে ওষুধ ঢেলে দাও, এই নিয়েই দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে পার্থ সেনের ভাইঝিটা। আমি বলি সংসারের পাঁচ কাজের জন্য যখন এতই শখ তবে বিয়ে করতে চাস না রে কেন ছুঁড়ি!

পরমেশের মা বলেন।—আহা, বড় সুন্দর মেয়ে তো!

পিসিমা—না গো, তেমন কিছু সুন্দর নয়, আমাদের মুক্তোর তুলনায় কিছুই নয়।

পরমেশের মা হাসেন—আমি দেখেছি বিতুলাকে, এখানেও এসেছিল এক দিন।

চলে গেলেন পিসিমা। তার পরেই পরমেশের ডাক শুনতে পান পরমেশের মা—শরীরটা খুবই খারাপ বোধ করছি মা। ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠাও।

আবার নিঝুম হয়ে যায় মাঝের বাড়ি। দিনে তিনবার ডাক্তার আসেন আর চলে যান। দশদিনেরও বেশি হয়ে গেল, জ্বর আর বুক ব্যথা নিয়ে বিছানার উপর ছটফট করে পরমেশ। সঞ্জয়বাবু আর পার্থবাবু, দু'জনেই এসেছিলেন। দেখে একটু চিন্তিত হয়ে চলে গিয়েছেন দু'জনেই।

মাঝে মাঝে আবছা ঘুমের মধ্যে যেন দরজার কাছে পায়েব শব্দ শুনতে পায় পরমেশ। মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকায়। মা বলেন—মুক্তা তো একবারও এল না।

পরমেশ—মুক্তার তো আসবার কথা নয়।

পরমেশের মা আশ্চর্য হন—তার মানে?

পরমেশ—এখন তো আমি গান গাইতে পারব না, মুক্তা এসে করবে কি?

পরমেশের মা আরও আশ্চর্য হন—এর মানে কিছু বুঝলাম না।

পরমেশ—মুক্তা এখন আসবে না, আসতে পারে না, তার এসেও কাজ নেই।

ছোট্ট মিনি চেঁচিয়ে ওঠে। তবে বিতুলাদি আসুক না কেন? সেদিন তোমার অসুখের সময় বিতুলাদিই তো এসেছিলেন!

চুপ করে থাকে পরমেশ! চুপ করে ভাবতে থাকেন পরমেশের মা। বিতুলা কি আসবে? অসম্ভব? আসবেই বা কেন? মুক্তার সঙ্গে যে মানুষের বিয়ের কথা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে এবং কেটেও গিয়েছে, তার কাছে সে বেচারী আসবে কেন?

কল্পনা করতে পারছেন না, জানেনও না, পরমেশের মা, ঠিক এই সময়েই

ওদিকের বাড়ির বাইরের ঘরের দরজার কাছে একটা অভিমানী বাধার মতো পথ আটক করে দাঁড়িয়ে আছেন বিতুলার কাকিমা—যেও না, যেতে পারবে না বেহায়া মেয়ে।

বিতুলা বলে—বেহায়া বৈকি! কিন্তু যেতে দাও কাকিমা।

কাকিমা—কেন যাবে?

বিতুলা হাসে—যেতে ইচ্ছে করছে, তাই।

কাকিমা—অপমানের ভয় নেই?

বিতুলা—না, অপমান যা হবার হয়েই গিয়েছে, আর নতুন করে অপমানের ভয় কোথায়?

কাকিমা—অপমানের ভয় না হয় নেই, কিন্তু ওখানে গিয়ে তোর লাভটা কি? ওর তো মুক্তার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েই গিয়েছে।

বিতুলা—জানি।

কাকিমা—তবে?

বিতুলা—একটা রোগী মানুষকে দেখতে যাব আর চলে আসব, এর মধ্যে ক্ষতিটাই বা কি?

হঠাৎ ছলছল করে চোখ, ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে বিতুলা—আমি একবার না যেয়ে, নিজের চক্ষে একবার না দেখে থাকতে পারছি না কাকিমা। জীবনে এই প্রথম বেহায়া হয়েছি, আর একটু বেহায়া হতে দাও।

আর বাধা দেন না কাকিমা।

পরমেশের অসুখ সারতে সময় নিল অনেক। প্রায় আরও একমাস। বেহালার নতুন সড়কের নিম আবার নতুন ফুলে ছেয়ে গিয়েছে।

শুধু সেদিন নয়, প্রতিদিনই মাঝের বাড়িতে এক রোগীর বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ওদিকের বাড়ির, ঐ পার্থ সেনের ভাইঝি বিতুলা। কাকিমাও আর রাগ করেন নি। বরং রোজই একই প্রশ্ন করেছেন—পরমেশ আজ কেমন আছে বিতুলা?

পরমেশের মা'ও নিজের চক্ষেই দেখেছেন, এই মেয়ে একেবারে অন্য রকম মনের মেয়ে। মুক্তার ঠিক উল্টোটি। ঠিকই বলেছিলেন মুক্তার পিসিমা। সংসারের যত জ্বর-জ্বালার গায়ে হাত বুলোবার জন্য পার্থ সেনের এই ভাইঝির হাত দুটো যেন নিসপিশ করে, সাগু জ্বাল দেবার জন্য আর বার্লি তৈরী করবার জন্য তৈরী দুটো পাকা-পোক্ত হাত।

বিদুলা সেনকে শুধু একটা বিপদে পড়তে হল শেষ সন্ধ্যায়। সেই সন্ধ্যায় ডাক্তার এসে পরমেশকে বলে গেলেন—কাল থেকে অফিসে যেতে পারেন।

চলে গেলেন ডাক্তার, কিন্তু চলে আসতে পারল না বিদুলা। পরমেশই অনুরোধ করে। আর কিছুক্ষণ থেকে যাও বিদুলা।

ঘর বড় নীরব। বড় বেশি সুরময় সেই নীরবতা। পরমেশ বলে—এ রকম সুন্দর মন তুমি কোথায় পেলে বিদুলা ?

বিদুলা যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে হাঁপাতে থাকে—আমাকে এসব কথা আপনার বলা উচিত নয় পরমেশবাবু।

পরমেশ—তোমাকেই তো বলব।

বিদুলা আশ্চর্য হয়—কেন ? আপনি তো প্রাণের চেয়ে গান বেশি ভাল বাসেন।

পরমেশও হাসে—ঠিকই সন্দেহ করেছ বিদুলা। গান আমার প্রাণের চেয়েও বেশি।

বিদুলা হেসে ফেলে—তবে আর কি।

পরমেশ—কিন্তু তুমি যে আমার গানের চেয়েও বেশী।

চলে গেল বিদুলা। এবং যারা আড়াল থেকে আর উঁকি ঝুঁকি দিয়ে অনেক কিছু বুঝে ফেলে, তারাই আর এক মাস পরে বলাবলি করে—আরে কি আশ্চর্যের কথা, শেষে বিদুলা সেনই বিদুলা রায় হয়ে গেল !

নমিতার সেতার

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরবার পথে মস্ত বড় বাড়িটার তেতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দেবেশবাবু।

তেতলার বারান্দার আলো ঝকমক করে। বড় বড় কৌচ আর সোফার রঙীন ভেলভেট জ্বলজ্বল করে। লাফ দিয়ে ছুটোছুটি করে একটি শিশু হাউণ্ড। একটা সোফার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। ঐ তেতলা বাড়ির প্রভু শ্রীমোহন সান্যালের মেয়ে লেখা সান্যাল।

বেশ তো দেখতে মেয়েটি। দেখতে থাকেন দেবেশবাবু। সুন্দর সাজে সেজে রয়েছে লেখা সান্যাল, আর হাতের কাছে একটা সেতার। সেতারটাও খুব দামী বলে মনে হয়।

দেখবার জন্য নয়, শোনবার জন্যই পথের উপর এক গাছের ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকেন দেবেশবাবু। দেবেশবাবুর সব কৌতূহল তাঁর দুই কানের মধ্যেই যেন ছটফট করছে। শুনতে চান দেবেশবাবু, লেখা সান্যালের হাতের সেতার কত মিষ্টি ঝংকার দিতে পারে। জানতে চান দেবেশবাবু, সেসন জজ শ্রীমোহন সান্যালের মেয়ে লেখা সান্যাল সেতারেতে তার মেয়ে নমিতার চেয়ে ভাল হাত তৈরী করে ফেলতে পেরেছে কি?

তেতলা বাড়ির বারান্দায় ঐ সুন্দর মেয়েটিই হলো দেবেশবাবুর মেয়ে নমিতার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। সেতার বাজনার এক প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে বাণীনিকেতন। কলকাতা শহরের চারজন বিখ্যাত গুণী, দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক, একজন সরকারী মন্ত্রী, একজন বিশিষ্ট মারোয়ারী ব্যবসায়ী, একজন সিনেমা-বিশেষজ্ঞ আর তিনজন অধ্যাপককে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি বিচার করবেন, এই বছরের সেতার বাজনার প্রতিযোগিতায় বাণীনিকেতনের স্বর্ণ-পদক কাঁকে উপহার দেওয়া হবে। যাকে মোট বিশজন প্রতিযোগিনীর মধ্যে সেতার বাজনায় শ্রেষ্ঠা বলে মনে হবে।

দেবেশবাবুর মেয়ে নমিতাও একজন প্রতিযোগিনী। তিনদিন অফিস কামাই করে অনেক দৌড়াদৌড়ি আর ধরাধরি করে তবে দেবেশবাবু এই প্রতিযোগিতায় নমিতার জন্য একটি স্থান যোগাড় কবতে পেরেছেন। বাণীনিকেতনের সদস্য-দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধর্না দিয়েছেন দেবেশবাবু। কিন্তু দেবেশবাবুর অনুরোধ বার বার ব্যর্থ হয়েছে। আজে-বাজে লোককে প্রতিযোগিতায় স্থান দেবার রীতি নেই। কোন বড় গুণী বা ওস্তাদের চিঠি চাই, কিংবা কোন গানের স্কুলের সার্টি-ফিকেট, নইলে শুধু দশটাকা ফী দিলেই প্রতিযোগিতায় কাউকে নেওয়া হয় না।

পাড়ার বিজনবাবুকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে, তাঁরই কাছ থেকে চিঠি নিয়ে, এক বিখ্যাত সুরশিল্পীর কাছে গিয়েছেন দেবেশবাবু। বিখ্যাত সুরশিল্পী ভ্রূকুটি করেছিলেন, কিন্তু বিজনবাবুর মতো এতবড একজন বড় লোকের চিঠির দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিলেন। সেতার হাতে নিয়ে বাজনার পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল নমিতা। কিন্তু সুরশিল্পী বলেন—ওসব থাক্, বিজনবাবু যখন বলেছেন ভাল সেতার বাজায়, তখন আর পরীক্ষা করার দরকার নেই।

সার্টিফিকেট যোগাড করতে যে সংগ্রাম করেছেন দেবেশবাবু, তার চেয়ে বেশি সংগ্রাম করতে হয়েছে দশ টাকা যোগাড় করার জন্য, প্রতিযোগিতায় ভর্তির ফী পুরো দশটি টাকা।

সত্যিই ঐ দশটি টাকা যোগাড় করতে গিয়ে দেবেশবাবুর ঘর অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এখানে ওখানে ধারের জন্য হাত পেতেও ধার পাননি। মাসের আর দুটি সপ্তাহের রেশন আনবার মতো আর ইলেকট্রিকের আলোর বিল শোধ করার মতো টাকা শুধু আছে। কিন্তু রেশনটা তো আর বাদ দেওয়া যায় না, পেটের দাবী কোন সেতারের সুরের ও মিষ্টি স্বরের কোন দাবীর ধার ধারে না। অগত্যা, এই মাসের ইলেকট্রিক আলোর বিলটাকেই উপেক্ষা করলেন দেবেশবাবু। ইলেকট্রিক কোম্পানীর লোক এসে তার কেটে দিয়ে গেল।

রেশন আনতে যার টাকার টান পড়ে, টাকার অভাবে ঘরের আলো বন্ধ হয়ে যায়, এ হেন মানুষের মনে ঐ এক সৌখীন স্বপ্ন এক মোহ হয়ে উঠেছে। অফিস থেকে ফিরে এক গেলাস চা খেয়ে নিয়ে কোলের কাছে তবলা-বাঁয়া টেনে নিয়ে বসেন দেবেশবাবু। আর মেয়ে নমিতা একটা ময়লা স্বরলিপির বই সামনে রেখে হাতের কাছে সেতার টেনে নিয়ে বসে। তবলাতে নানা তালের রকম আর কসরৎ ধ্বনিত করেন দেবেশবাবু। টুইলের ছেঁড়া কামিজের আস্তিন গুটিয়ে রোগা হাত দুটিকে নানা ভঙ্গীতে আর উৎসাহে খেলিয়ে খেলিয়ে তবলা বাজান দেবেশবাবু। আর মেয়ে নমিতা সেই মিষ্টি বোলের তাল ও মাত্রার প্রতিটি সূক্ষ্ম শিহরণের সঙ্গে তার সেতারের স্বর-ঝংকার লুটিয়ে দিতে থাকে। একটা ইমনকল্যাণ শেষ করতেই রাত দশটা বেজে যায়। দেবেশবাবু বলেন, আর আধঘণ্টা মাত্র আর একটু খেটে নে নমি, একটা বাগেশ্রী আলাপ কর দেখি।

এরই মধ্যে, মাত্র ছয় বছরের চেষ্টায় কী মিষ্টি হাত করে ফেলেছে মেয়েটা! দেবেশবাবু তাঁর ছেঁড়া টুইলের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছে হাঁপাতে হাঁপাতেও হাসতে থাকেন। বেশ গর্ব করেই বলেন—মাত্র আর দুটি বছর খেটে যা নমি। তার পর দেখবি, অল ইণ্ডিয়া মিউজিকে গিয়ে দাঁড়াতে তোকে একটুও ঘাবড়াতে হবে না।

তারপরেই যেন নিজের মনেই বলতে থাকেন—সাধনা থাকলে সিদ্ধি হয় আর গুণ কখনো চাপা পড়ে থাকে না।

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আর তেতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ দেবেশবাবুর বুকটা হঠাৎ একটি মিষ্টি শব্দ শুনে ছ্যাঁক করে ওঠে। সেতারে হাত দিয়েছে লেখা সান্যাল। বাজছে সেতার টুং-টাং টুং-টাং, মিষ্টি শব্দের ছোট ছোট ফুল যেন ফুটে উঠেছে। বোধহয় একটা টোড়ি ধরেছে লেখা সান্যাল। দুই কান সজাগ করে আর নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে শুনতে থাকেন দেবেশবাবু।

চমকে উঠলেন দেবেশবাবু। সেতারের শব্দ নয়, খিলখিল হাসির শব্দ।

দেখলেন দেবেশবাবু, তেতলার বারান্দায় কার্পেটের উপর গড়াচ্ছে লেখা সান্যালের সেতার। আর লেখা সান্যাল তার দুরন্ত শিশু হাউণ্ডকে কোলে নেবার জন্যে ছুটোছুটি করছে, কিন্তু ধরতে পারছে না হাউণ্ডকে।

তবু দাঁড়িয়ে রইলেন দেবেশবাবু। তাঁর মনের ভয় আর কৌতূহল একেবারে মিটিয়ে নিয়ে আজ নিশ্চিন্ত হবেন দেবেশবাবু। সত্যিই কি টোড়িতে হাত তৈরী করে ফেলেছে লেখা সান্যাল। আশ্চর্য নয়। সপ্তাহে তিন দিন ওস্তাদ আসে, আর ঐ এত দামী সেতার, তার উপর মেয়েটিও খুব স্মার্ট! ঐ হাত একটি টোড়িতেই মাৎ করে দেবে বাণী-নিকেতনের কমিটির আসর। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

আবার সেতার হাতে তুলে নিয়েছে লেখা সান্যাল। বাজছে সেতার! উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে হেসে ফেললেন দেবেশবাবু। নিতান্তই ছেলেমানুষী ব্যাপার। লেখা সান্যালের সেতার যেন একটা শখের পুতুল মাত্র। পলকা ও চটুল সুরে একটা থিয়েটারী ঢঙের গৎ বাজছে লেখা সান্যালের সেতারে। নিতান্তই ছেলে-মানুষী কাণ্ড। সুর নিয়ে ছেলেখেলার ব্যাপার। দু'দশ জন গুণীর আসরে ঐ সস্তা গৎ-এর কোন সম্মান নেই।

লেখা সান্যালের সেই চটুল গৎ-ও হঠাৎ যেন মরে গেল। দেখলেন দেবেশবাবু, চাকরের হাতে ট্রে থেকে চা-এর কাপ তুলছে লেখা সান্যাল।

চায়ে চুমুক দিয়েই সেতারটাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দেয় লেখা সান্যাল। আর, একটা রঙীন বই খুলে নিয়ে পড়তে থাকে।

হাসতে থাকেন, এবং একটু যেন কষ্টও হয় দেবেশবাবুর। বেচারা লেখা সান্যাল, এই সামান্য যোগ্যতা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামতে চায়! কিন্তু চেষ্টা করে শিখলেই তো পারতো। টাকা পয়সা আছে, সময় আছে, আর শখও যখন আছে, তখন সেতার নিয়ে এরকম একটা অবহেলার খেলা কেন?

মনে পড়ে দেবেশবাবুর, কাল সন্ধ্যাতেই বাণীনিকেতনের সেতার প্রতি-যোগিতার সময় ঠিক করা হয়েছে। আজ মাঝরাত পর্যন্ত সেতার সাধবে নমি। কাল অফিস কামাই করতে হবে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটানা চেষ্টা করে নমি যদি একটা টোড়ি আর একঠা মালকোষ রপ্ত করে নেয়, তবেই আর ভাবনা করার কিছু থাকে না। সেতারে লেখা সান্যালের কত সুখ্যাতিই না শুনেছিলেন দেবেশবাবু। কিন্তু নমির কাছাকাছি ঘেঁসবারও কোন যোগ্যতা আছে এই সব প্রতিযোগিনীর?

নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন দেবেশবাবু।

বাণী-নিকেতনের সেতার প্রতিযোগিতার আসরে স্বরঝংকারের উৎসব জেগে ওঠে। বিচারক কমিটি চোখ বন্ধ করে শুধু দুই কানে কৌতূহল জাগ্রত করে শুনতে থাকেন এক এক জন প্রতিযোগিনীর সেতারের সুর ও স্বর, মীড় গমক আর মূর্চ্ছনা। এক এক জনের জন্য মাত্র আধ ঘণ্টা সময়। কাগজের উপর লেখা প্রতিযোগিনীদের নামের পাশে নম্বর দেন বিচারকেরা।

অত্যন্ত নিরপেক্ষ বিচারক কমিটি। মাথা দুলিয়ে, বা তারিফ করে, কিংবা সামান্য একটু বাহবা ধ্বনি করেও মনের আনন্দ প্রকাশ করে ফেলেন না বিচারকেরা। করলে পক্ষপাতিত্ব করা হয়। একজন প্রতিযোগিনীকে উৎসাহিত করলে আর একজন প্রতিযোগিনী হতাশ হয়ে যেতে পারে। তাই অত্যন্ত সাবধান হয়েছেন বিচারক কমিটি। শুধু গুণ দেখেই গুণের বিচার করবেন তাঁরা।

টোড়ি বাজালো নমিতা। আসরে এক কোণে ছেঁড়া টুইলের আস্তিন দিয়ে মাঝে মাঝে আনন্দের আবেগে চোখের জল মোছেন দেবেশবাবু।

কি কাণ্ডই করছে নমি'টার হাতের সেতার। তারগুলিকে কী সুন্দর মিলিয়ে দিচ্ছে, একটুও ভুল হচ্ছে না।

নমিতার মা'ও এসেছেন। কেল্‌টি মেয়ে বলে দিনে তিনবার ধমক দেন যে কালো মেয়েটাকে, সেই মেয়েটারই মুখটা কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে। নমি'র শাড়ির আঁচলটা পিঠের কাছেই কত বড় একটা ছেঁড়া প্রকাশ করে দিয়ে ফরফর করে উড়ছে। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজের সেতারের শব্দে যেন মনপ্রাণ বিভোর হয়ে আছে মেয়েটার। সন্ন্যাসিনীর মতো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটার চোখ দুটো। এত গুণও ছিল এই কেল্‌টি মেয়েটার! নমিতার মা'র চোখ দুটো ঝকঝক করে হাসে।

দেখছেন দেবেশবাবু, মুগ্ধ হয়ে আর চোখ বন্ধ করে নমিতার টোড়ি শুনছেন বিচারক কমিটি। কোন সন্দেহ নেই, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে সবাই।

থামলো নমিতার টোড়ি। বিচারক কমিটি একবার তাকিয়ে দেখলেন নমিতাকে। কাগজের উপর নম্বর লিখলেন। দেবেশবাবুর চোখের সামনে একটা মধুর স্বপ্ন ঝক্ করে ভেসে ওঠে। কল্পনায় দেখতে থাকেন, নমিতার ছেঁড়া শাড়ির আঁচলের গায়ে একটি সোনার মেডেল ঝুলছে।

হঠাৎ একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল আসরে। বাণী-নিকেতনের কর্মীরা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একটু বেশি পাওয়ারের একটা আলো এনে রাখা হলো বাজনার আসরে। তবলা-বাঁয়া বদল করা হলো, এল নতুন একজোড়া তবলা-বাঁয়া। মাইক্রোফোনের মিস্তিরিও একটু ব্যস্ত হয়ে মাইক্রোফোনকে নানাভাবে

নাড়াচাড়া করে। সেসনজজ শ্রীমোহন সান্যালের মেয়ে লেখা সান্যাল বসলো সেতার হাতে নিয়ে। সান্যাল বাড়ির মোটর ড্রাইভার দেশী মহারাজার মতো যার সাজ-পোষাক, সেই এসে দশটা ফুলের তোড়া আসরের উপর সাজিয়ে রেখে গেল।

তাকিয়ে রইলেন বিচারক কমিটি।

তাকিয়ে রইলেন দেবেশবাবু। কি সুন্দর সাজ করেছে লেখা সান্যাল। নমিতার মা দেবেশবাবুর কানে কানে বললেন—উমা বলেছে, আজ দুপুর থেকেই সাজতে আরম্ভ করেছিল লেখা।

প্রতিযোগিতার আনন্দের উপর দিয়ে যেন মুহূর্তের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। বসে আছেন সেসনজজ শ্রীমোহন সান্যাল, কোলের উপর শিশু হাউণ্ড। দাঁড়িয়ে আছে দেশী মহারাজার মতো পোষাক, সান্যাল বাড়ির ড্রাইভার। তার উপর, বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো বাতি, লেখা সান্যাল সেতার হাতে তুলে নিতেই লেখার হাতের চার আঙ্গুলে চারটে হীরার আংটি ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠলো। তাকিয়ে রইলেন বিচারক কমিটি।

মাৎ করে দিল লেখা সান্যালের গৎ। লেখার সেতারের প্রতি ঝংকারের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে আর বাহবা দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকেন বিচারক কমিটি। বাণী-নিকেতনের কর্মীরা মুগ্ধ হয়ে লেখা সান্যালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। গৎ থামতেই করকাপাতের মতো করতালির শব্দে মুখর হয়ে ওঠে আসর।

উল্লাস জাগে। ধন্যবাদ শুভেচ্ছা ও প্রীতির উচ্ছ্বাস বর্ষিত হতে থাকে। পুরস্কার ঘোষণা করেন বিচারক কমিটি। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকেন আর পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকেন দেবেশবাবু।

সেতার বাজনায় শ্রেষ্ঠ হয়েছে লেখা সান্যাল। সোনার মেডেল ঝুলছে লেখা সান্যালের কাঁধের কাছে, রঙীন সিল্কের শাড়ির কুঞ্চিত আঁচলের একটি স্তবকের উপর। পাথরের মতোই চোখ নিয়ে দেখতে থাকেন দেবেশবাবু।

যেন পৃথিবীর সব সেতারের তার ছিঁড়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছে আর সেই ভস্ম উড়ছে দেবেশবাবু হৃৎপিণ্ডের ভিতরে। নমিতার মা ঠেলা দিয়ে বলেন—বাড়ি চলো।

নমিতা সেতার হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বলে—চলো বাবা।

দেবেশবাবু বলেন—চল।

রাত হয়েছে। দেবেশবাবুর সৌখীন স্বপ্নকে বিদ্রূপ করে ইলেকট্রিক বাতি নিভে গিয়েছিল কদিন আগেই। কিন্তু ঘরের এই অন্ধকারকেই বিদ্রূপ করে

ঘরের বাইরে এক ফালি উঠানের এক কোণে এসে বসলেন দেবেশবাবু। হাতের কাছে রাখলেন তবলা আর বাঁয়া। নমিতা বসলো সেতার নিয়ে।

ছেঁড়া টুইলের আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে দেবেশবাবু যেন হুংকার দিলেন—ধর একটা পুরিয়া।

পাড়ার লোক শুনে আশ্চর্য হয়, হেরে গিয়ে আবার এত আনন্দের ঝংকার কেন? মাঝরাত পর্যন্ত বাজনা নিয়ে মাতামাতি?

হ্যাঁ, সেই মাঝরাতের পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত নমিতার সেতারের পুরিয়া দেবেশবাবুর তবলার বোলের সঙ্গে যেন এক স্নেহের উৎসবে লুটোপুটি করে পাড়ার নিস্তব্ধতাকে ঝংকারে ঝংকারে শিউরে দিতে থাকে। উমাদের বাড়ির চিলকোঠার পাশ দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখা যায়। যেন ভিন জগতের একটা উপহার, সোনার মেডেল হয়ে ফুটে উঠেছে অনেক রাতের চাঁদ।

দেবেশবাবুর দুই চোখ ঝকঝক করে—এইবার জলদে নিয়ে চল্ নমি।

বলিহারি! মরি মরি! বাহবা বাহবা! দেবেশবাবুর মনের উল্লাস যেন নিজের আবেগেই মুখর হয়ে আর আত্মহারা হয়ে বাতাস শিউরে দিতে থাকে।

বিভোর হয়ে সেতার বাজাতে থাকে নমিতা।

কিছ্ছু ভাবিস না নমি। নমিতার হাতের সেতারে যেন নতুন প্রাণের আশ্বাস ছড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন দেবেশবাবু। যেন এই মাঝরাতের আসরে নমিতার হাতে সেতারের গুণ বিচার করছেন সত্যিকারের এক বিচারক এবং সেই বিচারককে দেখতে পেয়েছেন দেবেশবাবু, নইলে তাঁর চোখে-মুখে এরকম উল্লাস জেগে উঠবে কেন?

মি থ্যা মা

ঠাকুরপুরের রাজবাড়ি, অর্থাৎ সেই বিখ্যাত ঠাকুরপুর জমিদারীর তিনআনি শরিক অজিত রায়চৌধুরীর বাড়ি। রাজবাড়ি নামটা এখন প্রায় অচল হয়ে এসেছে। আর ক'দিন পরে হয়ত একেবারে লুপ্ত হয়েই যাবে। শুধু আশেপাশের দু'চার গ্রামের অতিবৃদ্ধ এবং চাষাভূসো মানুষ ছাড়া আজ আর কেউ ঐ বাড়িকে রাজবাড়ি বলে না।

সদর শহরের মধ্যে নয়, একটু দূরে, শহুরে জীবন এবং গেঁয়ো জীবনের মাঝা-

মাঝি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তিনপুরুষ আগের এই রাজবাড়ি। সদরের আদালতে ওকালতি করেন অজিত রায়চৌধুরী। প্রবীণ উকীল অজিতবাবুর পশারও এতদিনে বেশ প্রবীণ হয়ে উঠেছে। রাজবাড়ি নামটা ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হয়ে উঠতেই উকীলবাড়ি নামটা বেশ প্রবল ও মুখর হয়ে উঠছিল, এবং এই নামটাই পাকা হয়ে যেত নিশ্চয়, কিন্তু হতে পারেনি। ঠাকুরপুরের ছেলেমেয়েদের ভাষায় নতুন একটা আখ্যা সবচেয়ে বেশি মুখর হয়ে পুরনো নামগুলিকে চাপা দিয়ে একেবারে নীরব করে দিয়েছে। ঐ নাম এখন জয়া মায়ের বাড়ি।

এই বাড়ির বড় ছেলে মানিক, অজিতবাবুর ছেলে নয়। মানিক হলো অজিতবাবুর স্ত্রী জয়া দেবীর বড়দির সেজ ছেলে। মানিকের মুখের ভাষাটাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। জয়া মাসীমাকে জয়া-মা বলে ডাকে মানিক। তাই ঠাকুর-পুরের সব ছেলেমেয়ের কাছে, এবং সদরের কাছে এই বাড়ি জয়া-মায়ের বাড়ি হয়ে গিয়েছে। কে না চেনে মানিককে? অতি ভাল ছাত্র এবং খেলতে পারেও কত ভাল, সেই মানিক তার যে জয়া-মায়ের বাড়িতে থাকে, সেই জয়া-মায়ের নামের গৌববই আজ প্রাচীন রাজবাড়ি আব কিছুকালের উকীলবাড়ি নামের গৌরব ছাপিয়ে গিয়েছে।

জয়া-মায়ের নামে যে-সব গল্প আর সংবাদ আজ প্রায় বাইশ বছর ধরে ঠাকুরপুরে, আশে-পাশের গাঁয়ে, আর সদর শহরেরও মনে মনে স্মৃতি হয়ে রয়েছে, সেই সব গল্প আর সংবাদের গৌরবই জয়ী হয়েছে বলা যায়। সে এক আশ্চর্য মনের ইতিহাস। পরের ছেলেকে সত্যিই খাঁটি মায়ের-মন দিয়ে নিজেরই সন্তানের মতো আপন করে নিতে পেরেছে, এমনই এক নারী জীবনের আগ্রহের ইতিহাস।

এই বাড়িতে যেদিন বধূবেশে প্রথম এসেছিলেন জয়া দেবী, সেই দিনটি হলো আজ থেকে ত্রিশ বছরেরও বেশি অতীতের একটি দিন। শান্তি ছিল, আনন্দও ছিল, কিন্তু একটি শূন্যতাও যেন অদেখা স্বপ্নের মতো এই বাড়ির জীবনের সব চঞ্চলতার মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকতো। আত্মীয়-স্বজনেরা চিন্তান্বিত হয়েছিলেন, এবং অজিতবাবুও মাঝে মাঝে কি-যেন ভাবতেন। বছরের পর বছর পার হয়, তবু কোন শিশুর কলরব জাগে না কেন এই বাড়ির বাতাসে? চিঠি-পত্রে অনেক স্বজনের কাছ থেকে অনেক উপদেশ আসতো, জয়া একটা মানত করুক। নইলে এত বড় বাড়ির এই ফাঁকা ফাঁকা আর নেড়া-নেড়া ভাব ঘুচবে না। জয়ার কোল ভরে না উঠলে এই বাড়ির বুকের শূন্যতাও ভরে উঠবে না।

অজিতবাবু গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতেন, কিন্তু জয়া হেসে ফেলতেন। মানত করতে হবে কেন? দরকারই বা কি? একেবারে স্পষ্ট করে এবং অদ্ভুত ও

তীব্র এক আগ্রহের ছোঁয়ায় যেন ছটফট করে জয়া বলে ফেলতেন একটা কথা, আর শুনে চমকে উঠতেন অজিতবাবু। জয়া বলতেন—যেখান থেকে পার একটা বাচ্ছাকে নিয়ে এসে ফেলে দাও না আমার কাছে।

নীরব ও নিরুত্তর অজিতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে জয়া তেমনি অতি সহজে অবাধে আর স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে বলতেন—কোন জ্বালা-যন্ত্রণার দুর্ভোগ ভুগতে হবে না, অথচ একটা ছেলে চলে এল কোলে। এই তো ভাল।

অজিতবাবু হাসেন—তা না হয় হলো, কিন্তু···।

—কিন্তু আবার কি ?

—তুমি কি সত্যিই মায়ের মন নিয়ে পরের ছেলেকে মানুষ করতে পারবে ?

—কেন পারবো না ?

—হয় না জয়া, তাতে পরের ছেলেকে শুধু মানুষ করা হয়, কিন্তু মায়ের-মনের আনন্দ পাওয়া যায় না।

জয়া বলেন—খুব হয়, খুব পাওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত জয়ারই এই অবাধ হাসির আগ্রহ সত্য হয়ে উঠলো, সে সত্য আজ এই বাড়ির জীবনের দিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়। দেখে মনে হয়, অজিতবাবু আর জয়াদেবী হলেন তিনটি ছেলের ও একটি মেয়ের বাপ ও মা।

বড় ছেলে মানিক হলো জয়া দেবীর বড়দির সেজ ছেলে। মেজ ছেলে তপেশ হলো জয়া দেবীর সেজ ভাসুরের ছেলে। একমাত্র মেয়ে মালতী হলো জয়া দেবীর ন'দার মেয়ে। আর সবচেয়ে ছোটটি, নিতু যার নাম, সে হলো আরও দূরসম্পর্ক এক আত্মীয়ের সংসারের এক মা-মরা ছেলে। নিতুর ভাষা অনুসারে মানিক হলো বড়দা, তপেশ মেজদা এবং মালতী হলো দিদি। বাড়ির ঝি-চাকরের কাছে অজিতবাবু আর জয়া হলেন বাবা আর মা, এবং মানিক, তপেশ, মালতী আর নিতু হলো, বড় খোকাবাবু, মেজ খোকাবাবু, দিদিমণি আর ছোট খোকা-বাবু। এই পৃথিবীর নানা আঙিনা থেকে যেন এক একটি জ্যোৎস্না ছায়া আর শিশিরের কণা কুড়িয়ে নিয়ে এসে আপন সংসারের এক মায়াভরা আঙিনা তৈরি করে নিয়েছেন জয়া দেবী। আপন-পর সম্পর্কের নানা বিচিত্র আখ্যাগুলিও যেন এইখানে এসে এক নারীর স্নেহের কাছে সব ভিন্নতা হারিয়ে এক হয়ে গিয়েছে। জয়া হয়েছেন জয়া-মা। এই বাড়ির তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ের কাছে এই জয়া-মা নামটিই মানুষের ভাষার মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি আর মায়াময় নাম। মানিক জানে, তপেশ জানে, মালতীও জানে যে, শুধুই মা নামে ওদের কেউ একজন আছেন, দূরেই আছেন, এবং চিরকাল দূরেই থাকবেন। তাঁরা আসেন মাঝে

মাঝে, তাঁদের দেখতেও পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার বেশি কিছু নয়। জয়া-মার চেয়ে এরা বেশি আপন-জন নয়, হতেই পারে না। তপেশের আপন মা একবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, পূজার সময় তপেশকে ক'দিনের জন্য নিয়ে যেতে। তপেশই গোঁ ধরে বসে রইল। পরের বাড়ি গিয়ে থাকতে ওর একটুও ইচ্ছে করে না।

মা না হয়েও এত বড় মায়ের-মনের গৌরব লাভ করেছে, এমন ব্যাপার কোথাও দেখা যায় না। প্রতিবেশীরা তাই বলে থাকেন। জয়ার নাম করতে বেশ একটু শ্রদ্ধাই অনুভব করেন ঠাকুরপুরের অনেক সত্যিকারের মা।

এপাড়া আর ওপাড়া, অনেক বাড়িতেই অনেক সময় আলোচনা হয়। বিনোদের মা বলেন—এর মধ্যে একটা কথা আছে, যা তোমরা কখনো ভেবে দেখনি।

সুধার মা বলেন—কি ?

—আগের জন্মে জয়া সত্যিই ওদের মা ছিল, নইলে পরের ছেলের জন্য এতটা কেউ করতে পারে না। মায়ের-মন কি এমনিতেই হয় ভাই !

এই সব আলোচনার কিছু কিছু কলরব মাঝে মাঝে জয়া দেবীর কানেও আসে। শুনে জয়া দেবীর মনের ভিতরটাও যেন কেমন করে ওঠে। অদ্ভুত এক বিশ্বাসের বিস্ময় যেন বুকের ভিতর তৃপ্তি ছড়াতে থাকে। সত্যিই কি, মানিকটা, তপেশটা, মালতীটা আর নিতুটা আগের জন্মে তাঁরই কোলে প্রথম দেখা দিয়েছিল ? তাই নিশ্চয় ! হয়ত সেই আগের জন্মে ওদের পুরো আদর করতে পারেনি জয়া দেবী। তাই অদৃষ্ট আজ এই জন্মে ওদের আবার জয়া দেবীর কাছে এনে ফেলেছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবেন জয়া দেবী, সত্যিই তো বড়দি আজ ছ'মাসের মধ্যেও চিঠি দিয়ে একবার খোঁজও নিলেন না কেমন আছে মানিকটা। ও তো বড়দিরই আপন ছেলে।

যাক্ গিয়ে, ওসব প্রশ্ন এখন আর জয়া দেবীর চিন্তারই প্রশ্ন নয়। দুপুরের রোদে ঝলসানো আঙিনার দিকে তাকিয়ে, বাড়ির ভিতরের বারান্দায় পাতা মাদুরের উপরে বসে জয়া দেবী চশমা-চোখে পড়ছিলেন কতগুলি চিঠি। মানিকের বিয়ের জন্য পাত্রীর পরিচয় নিয়ে এসেছে অনেকগুলি চিঠি। বড় ছেলের বিয়ে, এই বাড়ির বউ হয়ে আসবে যে মেয়ে, সে মেয়ে যেমন-তেমন হলে চলবে না। বড়দি একটি পাত্রীর খোঁজ জানিয়েছেন। চিঠি পড়ে খুব ক্ষুণ্ণ হলেন জয়া দেবী। নিতান্তই বাজে একটা সম্বন্ধ। বড়দি কি বুঝবেন ছাই, মানিকের সঙ্গে কেমন মেয়েকে মানাবে ভাল ? বড়দি শুধু নামেই মা।

—মা, ওগো মা।

অদ্ভুত একটা ডাক। বাড়ির বাইরের বারান্দার দিক থেকে ভেসে আসছে এই আহ্বানের স্বর। ভিখিরীর গলার স্বর তো এরকম নয়। যেন অনেকদিন পরে দূর থেকে ঘরে এসে ব্যস্তভাবে কেউ তার মাকে ডাকছে—মা, ওগো মা!

মাদুর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জয়া দেবী। ধীরে ধীরে হেঁটে এসে বাইরের বারান্দার উপর দাঁড়ালেন। দেখে আশ্চর্য হলেন। সত্যিই ভিক্ষুক-টিক্ষুক নয়—বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, মানিকের চেয়ে কিছু বড়, রোগা চেহারার একটা লোক বারান্দার সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নোংরা একটা গেঞ্জি গায়ে, ছেঁড়া জুতো, একটা খাটো বহরের কোরা ধুতি। অসুখে ভোগা চেহারা নয়, মনে হয় উপোসী চেহারা। লোকটার চোখ দুটো বেশ ডাগর, নাকটাও বেশ টিকালো। রুক্ষ-সুক্ষ চুলে লম্বা একটি তেড়ি এলোমেলো হয়ে রয়েছে।

জয়া বলেন—কে গো তুমি?

লোকটা বলে—আমি তোমাকে এতদিনে চিনতে পেরেছি মা, কিন্তু তুমি আমাকে দেখেও চিনতে পারছো না!

লোকটার দুই চোখ ছলছল করে উঠলো। জয়া বলেন—কি চাও বলো?

লোকটা হাঁউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে—আপন মার কাছে মানুষ যা চায়, তাই চাই, আর কিছু চাই না।

জয়া—তার মানে?

লোকটা বলে—স্নেহ চাই মা।

অস্বস্তি বোধ করেন জয়া দেবী—তুমি কে?

—নদীর ওপারে পলাশপুরের করুণা কালীর কাছে পনের দিন ধরনা দিয়েছিলুম মা। এক ফোঁটা জলও মুখে দিইনি, পনেরটি দিন আর পনেরটি রাত্রি করুণা কালীর পায়ের কাছে পড়েছিলুম। শেষে স্বপ্নে দেখা দিলেন করুণা কালী আর বললেন···। লোকটা হঠাৎ চুপ করে।

জয়া দেবী—চুপ করলে কেন? বল।

—করুণা কালী বললেন, যা তোর আগের জন্মের মায়ের কাছে যা, তোর সব দুঃখু ঘুচে যাবে।

লোকটা কয়েকটা সিঁড়ি উপরে উঠে এসে বলে—করুণা কালী বললেন, ঠাকুরপুরের রাজবাড়ির মা হলেন তোর আগের জন্মের মা। তাই ত ছুটে এলেম মা, মাগো।

চেঁচিয়ে ছটফট করে জয়া দেবীকে প্রণাম করার জন্য সিঁড়ি ধরে উপরের

বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে লোকটা।

জয়া বলেন—থাম, বসো। ওসব কথা আমি বিশ্বাস করি না।

লোকটা ধপ্ করে বসে পড়ে। বিশ্বাস করতেই হবে মা।

জয়া দেবী হেসে ফেলেন—বিশ্বাস করি আর নাই করি, তুমি কি চাও বলো।

লোকটা কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মোছে এবং অভিমানের স্বরে বলে ওঠে—কিছু চাই না।

চুপ করে অনেকক্ষণ ধরে এই অদ্ভুত আবির্ভাবের রহস্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন জয়া দেবী। এত কাঁদে কেন লোকটা? কেন এত অভিমান? পনেরটা দিন কিছু খায়নি। মাথা খারাপ হয়েছে বোধহয়; তবু ত মানুষ। ভুল স্বপ্ন দেখে আবোলতাবোল বকছে, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, একটা মিথ্যে স্বপ্নের জন্য কত কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা।

জয়া দেবী বলেন—কিছু খাবে?

—হ্যাঁ।

থালায় ভরে মিষ্টি নিয়ে আসেন জয়া দেবী। মিষ্টিগুলি খেয়ে নিয়ে ঢকঢক করে জল খায় লোকটা। হঠাৎ বলে—এবার যাই মা।

জয়া বলেন—বসো।

একটা নতুন ধুতি, মানিকেরই জন্য কেনা, এক জোড়া নতুন চটি আর একটা সিল্কের কামিজ নিয়ে আসেন জয়া। লোকটা ব্যস্তভাবে নতুন সাজ গায়ে চড়িয়ে আবার চুপ করে অন্যমনা হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু চলে যায় না লোকটা। এবং আরও অদ্ভুত, জয়া দেবীও লোকটাকে চলে যাবার জন্য বলতে পারে না। হয়ত পাগল, হয়ত একটা স্বপ্ন দেখেছে ছেলেটা কিন্তু সেই স্বপ্নটাকে মিথ্যে মনে করবারই কি আছে? আগের জন্মে একটা মায়ের কোলেই তো এসেছিল ছেলেটা, সে মা পৃথিবীতে এখন থাকতেও তো পারে।

জয়া বলেন—আজ যাও তুমি।

উদাসভাবে বলে লোকটা—যদি কয়েকটা টাকা দাও মা।

—কেন?

—কেন আবার কি? আমি তোমার ছেলে, টাকা চাইছি তোমার কাছে, দিতে হবে—রাগ করে চেঁচিয়ে আবার কেঁদে ফেলে লোকটা।

জয়া দেবী আর দেরী করেন না। তার মনের ভিতরটা যেন একটা মূর্খ বিশ্বাসের বেদনায় ফুঁপিয়ে উঠছে। এক্ষুণি বিদায় করে দেওয়া ভাল। দশ টাকা

লোকটার হাতে তুলে দিয়ে জয়া বলেন—এবার যাও, আর বিরক্ত করো না।

লোকটা প্রসন্নভাবে অথচ তেমনি করুণ ও ছলছল চোখ নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। বোধহয় আগের জন্মের মাকে প্রণাম করতে চায়।

হঠাৎ একটা কঠোর গর্জনের আঘাতে চমকে ওঠে দুপুরের নীরবতা। ফটক পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন চন্দননগরের ধীরেন ঠাকুরপো—এ বেটা, এ বেটা এখানে কেন, অ্যাঁ?

তার পরেই এসে দাঁড়ায় শ্রীরামপুরের প্রতুল—এ কি, এ বেটা এখানে এসে কি চাইছে বড়দি?

জয়া বলেন—ওকে চেন নাকি তোমরা?

প্রতুল বলে—চিনি বইকি, এটা একটা মহাপুরুষ।

জয়া দেবীর গলার স্বর ভয়ে কেঁপে ওঠে—তার মানে?

ধীরেন ঠাকুরপো বলেন—মিথ্যে দুঃখের কথা বলে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করাই ওর কাজ।

প্রতুল বলে—আজ তিন বছর দেখছি, ট্রেনে ট্রেনে ঘোরে, আর লোকের কাছ থেকে পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চায়।

ধীরেন ঠাকুরপো বলেন—সেদিনও আমাদের অফিসে গিয়েছিল, রুগ্না স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতে। আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল।

লোকটা নির্বিকার। কোন ভয় বা উদ্বেগের ছায়ামাত্র নেই লোকটার চক্ষে।

ধীরেনবাবু বলেন—নিশ্চয়ই ওকে এই জুতো জামা আর কাপড় আপনি দিয়েছেন বৌদি?

প্রতুল বলে—নিশ্চয় কিছু টাকাও আপনার কাছ থেকে আদায় করেছে?

জয়া দেবী বলেন—হ্যাঁ।

লোকটার ঘাড়ে হাত দেয় প্রতুল—বের কর টাকা! ফেরত দাও!

লোকটা বলে—কেন দেব? আমার আগের জন্মের মা আমাকে দিয়েছেন, আপনারা সে টাকা কেড়ে নেবার কে মশাই?

ধীরেনবাবু লোকটাকে একটা ধাক্কা দেন—ছাড়, নতুন কাপড়-চোপড় জুতো সব ছাড়!

ধাক্কার চোটে লোকটার পা থেকে নতুন চটি খসে যায়। ধীরেনবাবু এক টান দিয়ে সিল্কের কামিজটাকে লোকটার গা থেকে খুলে নিলেন।

চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা—মা, ওগো মা, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছো মা? এদের মানা কর মা!

জয়া দেবী নীরবে দাঁড়িয়ে শুধু তাঁর দু'চোখের একটা অর্থহীন চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকেন। প্রতুল লোকটার হাত ধরে টান দেয়। লোকটার শক্ত মুঠো কঠোর এক পেষণে চূর্ণ করে দিয়ে টাকা কেড়ে নেয় প্রতুল। ধীরেনবাবু আবার একটা ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ফটকের দিকে টেনে নিয়ে চলেন।

লোকটা চিৎকার করে—মা, ওগো মা, এরা যে আমার সব ছিনিয়ে নিল মা। তুমি ওদের মানা কর মা।

জয়া দেবীর মনের ভিতরে যেন একটা বোবা বিস্ময় দুঃসহ বেদনায় ছটফট করছে। কোন কথা বলতে পারছেন না জয়া দেবী। মিথ্যাবাদী একটা লোক ধরা পড়ে গিয়েছে আর জব্দ হয়েছে, জয়া দেবী বাধা দেবেন কেন?

ফটকের কাছে লোকটাকে ঠেলে নিয়ে এলেন ধীরেনবাবু। এইবার ধীরেনবাবুর হাতের আর একটি ধাক্কায় অদৃশ্য হয়ে যাবে জয়া দেবীর দুই চক্ষুর সম্মুখ থেকে এক মিথ্যা আগের জন্মের ছেলে।

লোকটা মুখ ফিরিয়ে জয়া দেবীর দিকে হতাশভাবে তাকায়—তুমি আমার আগের জন্মের মা, কিন্তু তুমি মা হয়েও কি করেছিলে জান? করুণা কালী স্বপ্নে আমাকে কি বলেছেন, শুনবে?

লোকটার ছলছল চোখ দুটো হঠাৎ কটমট করে ওঠে! ধীরেনবাবু ও প্রতুল হঠাৎ হাত নামিয়ে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে থাকেন। জয়া দেবী অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। কি বলতে চায় লোকটা?

লোকটা বলে—তুমি মা হয়েও নিজের হাতে আমার মুখে বিষ দিয়ে আমাকে মেরে ফেলেছিলে।

লোকটাকে কঠোর একটা ঠেলা দিয়ে ফটকের বার করে দেন ধীরেনবাবু। প্রতুল হাত তুলে তাড়া করে যায় আরও কয়েক ঘা দেবার জন্য।

বাধা দিয়ে জয়া দেবীই আর্তনাদ করেন—আর মের না ধীরেন ঠাকুরপো, চলে এস প্রতুল। যেতে দাও ওকে।

জয়াদেবীর চোখ ঝাপসা হয়ে যায়, তাই দেখতে পান না, লোকটা চলে গিয়েছে কি না। জয়া-মাকে মিথ্যা-মা বলে রটাতে চায়, কি ভয়ানক মিথ্যেবাদী ঐ ছোঁড়া! কিন্তু জয়া দেবীর বুকের ভিতরটা কাঁপতে থাকে। মিথ্যে একটা গল্প, কিন্তু কি ভয়ানক সত্যের মতো একটা মিথ্যা!

তখন চুংফিংয়ের তাঁতিরা নিশ্চিন্তমনে রেশমী চাদর বুনছে। মাদ্রিদের অপেরা ঘরে বেহালার সুরের খেলা নিরুদ্বিগ্ন নাগরিকের দিনের ছুটি মধুর করে তুলেছে। আকাশে উঠে মাটির মানুষের মাথায় বোমা ফাটাবার খেলাটা তখনো পৃথিবীতে এত ভালভাবে জমে ওঠেনি। নরহত্যার শিল্পে এই নতুন পদ্ধতিতে হাত-পাকাবার কাজটা মাত্র তখন চলেছে, যে দেশের কাঁচা মাথার ওপর, যেখানে এবং যে সময়ে —সেই সময়!

সেই সময়, বেস কম্যাণ্ডারকে স্যালুট জানিয়ে ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান ফ্লাইং কোরের একটি স্কোয়াড্রন উড়লো আকাশে! নীচে ভোরের পেশোয়ার কুয়াশার বোরখায় মুখ লুকিয়ে পড়ে রইলো চুপ করে। এই শ্বেতাঙ্গ বিমানবিহারীদের মধ্যে মাত্র একটি কৃষ্ণের জীব রয়েছে—অফিসার দিলীপ দত্ত।

ভারতভূমির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে আজাদ এলাকা। সভ্য শাসনের শান্তিকে অপমান করবার স্পর্দ্ধায় দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে কতগুলি রাষ্ট্রহীন যূথচারী মানুষ। তাদের দুর্বৃত্তি সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে। খাড়া পাহাড়, সরু নালা আর চোরা পথের গোলকধাঁধাঁর মতো এই দেশ। কাদার কেল্লার গর্বেই লোকগুলি আত্মহারা। চুক্তির সম্মান জানে না, সরহদ্ মানে না, মজুরী নিয়ে খাটতে জানে না। বন্দুক বগলে, কার্তুজ দাঁতে কামড়ে—পাহাড়ের মাথায় পাথরের মতো নিঃশব্দে মিশে থাকে। ক্রোশের পর ক্রোশ ছাড়িয়ে ওদের চোখের দৃষ্টি যেন ইংরিজি সড়কের ধূলো শুঁকতে থাকে। সড়ক দিয়ে একটা সদাগরের কাফিলা পার হয়। আচম্বিতে নেকড়ের দলের মতো হানা দিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে।

ডেরা ইয়াসিনের নাম-করা মহাজন তিলক সাহু আজও বুক চাপ্ড়ে বেড়ান। বিয়ের আসর থেকেই তাঁর ছেলে আর ছেলের বউকে ধরে নিয়ে গেছে। তিলক সাহু আপ্শোষ করেন—ছেলের কানে এক জোড়া হীরের মাকড়ি ছিল। সেটাই ভুল হয়েছে, নইলে রক্ষা পেত ছেলেটা। আর মেয়েটা—সেসব মেয়ের বাবা রাজারামের ভাবনা। সে ইচ্ছে করলেই মেয়েকে ছাড়িয়ে আনতে পারে, ওর টাকার ভাবনা নেই।

ছেলের মায়ের কান্নাকাটি আর চীৎকারেই তিলক সাহু ব্যতিব্যস্ত। জীবন-ব্যাপী মহাজনী সাধনার যা-কিছু সিদ্ধি এইবার শেষ হতে বসেছে। সত্বর তোলা

সোনা নিয়ে এক মুন্সীকে পাঠিয়েছেন আজ সাতদিন হলো। কে জানে কোন্ এক খেলের মালিকের খোঁয়াড়ে ছেলেটা পড়ে আছে। ছাড়িয়ে আনতে হবে। মুন্সী ফিরলে হয়। ভয় হয়—ছেলেটা তো গেছেই, এবার সোনাটাও যাবে, মুন্সীও বোধহয় আর ফিরলো না।

রাজমাক রোডের সব কালভার্টগুলি ভেঙ্গে দিয়েছে। রোডের ধারে পর পর তিনটে খসাদারকে মেরে ফেলেছে। কারা করেছে, বুঝতে দেরী হয় না।

এ সবই সহ্য করা যায়। সুসভ্য চিকাগো কত আল কাপোনকে সহ্য করে। সাম্রাজ্যওয়ালা ইংরাজের স্নেহাধীন কলকাতা কত মীনা পেশোয়ারীকে সহ্য করেছে। তার জন্য আকাশে এক ঝাঁক বম্বোরু বিমান ছাড়তে হয়নি। কিন্তু আজাদী বদমাসদের নতুন একটা অপরাধের খবর পাওয়া গেছে, কোনমতে তার আর ক্ষমা হতে পারে না। পূব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ থেকে তিনশো মালিক আর মেহ্‌তরের এক জীর্গা হয়ে গেছে। চেনারের ছায়ায় বসে আইন তৈরী করেছে তারা, পীরগলের চূড়ার ছবি আঁকা সোনার মোহর চালু করেছে। নতুন একটি বাজার বসিয়েছে কুনার নালার ধারে। দর-বাঁধা পণ্যের লেনদেন হয়। মেহ্‌-মন্দেরা বস্তা বস্তা বাদাম আনে, ইয়ুসুফজাইরা নিয়ে আসে পশম। বিবাদে বিচার করার জন্য এক প্রবীন মুল্লা কাজীর আসনে বসেছেন—জির্গার প্রস্তাবই তাঁর কাছে হাদিস।

মারামারি ভুলে নতুন করে এক মিতালীর আনন্দে এক লক্ষ ডানপিটে যেন এক রাজ্য গড়ার খেলাপাতি খেলছে। ছোট্ট একটি রাষ্ট্রের পুতুল গড়েছে তারা। এই নতুন বিধান নতুন অহঙ্কারের পতাকার মতো তাদের মনে মনে উড়তে থাকে। জির্গার বৈঠক শেষ হয়—শত শত উদ্ধত শির নেমাজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভরসা ও আশ্বাসে নত হয়ে আসে।

তাই মৃত্যুগর্ভ শাস্তির মেঘ উড়ছে আকাশে। এক দানবের সংসার ছিন্নভিন্ন করতে চলেছে। ভাস্কো-ডা-গামার নখায়ুধ প্রেতাত্মা যেন এক নতুন ভারতের রক্তের গন্ধ পেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে।

বায়ুসমুদ্রে ডানা ঝাপটে দিলীপ দত্তের মন সুখে উড়ে চলেছে। সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বাঁয়ে ছক বেঁধে এক ধূমকেতুর পরিবার যেন সীমাহীন নীলে পাড়ি দিয়ে চলেছে। নীচের দিকে তাকালে তখনো দেখা যায় দু'একটা মিনারের গায়ে হিমকাতর প্রভাতের একটু আড়ষ্ট আলোকের প্রলেপ লেগেছে মাত্র। তারপর যব আর জাফরাণের ক্ষেত—কতগুলি মখমলের জাজিম যেন

এখানে ওখানে পাতা রয়েছে। স্বাত উপত্যকার গিরিনদীটা রূপালী ফিতার মতো একবার চক্‌চক্‌ করেই মিলিয়ে গেল।

এমনি করে হেসে বিদায় নিয়েছিল ডোরা। প্ল্যাটফর্মের শত শত মুখের ভীড়ের মধ্যে সেই স্মিতমুখের ছবি ভোলা যায় না। ডোরা কাঁদেনি, মুখভার করেনি। কোন উদ্বেগ কোন অভিমানবাণী মুখ ফুটে বার হয়নি। শুধু ট্রেন ছাড়বার আগে হেসে হেসে এক মুঠো প্রীতির কণিকা দিলীপের যাত্রাপথে মাঙ্গলিকের মতো ছিটিয়ে দিয়েছিল। ডোয়ার বাবা মিস্টার নন্দীও সঙ্গে এসেছিলেন। পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে সমাদরে বিদায় দিয়েছেন।—যাও, বড় হও, সুনাম কর, জীবনের সব ব্রত সফল কর। বাঙালীর মর্যাদা বাড়িয়ে তোল। তারপর সুস্থদেহে আমাদের কাছে আবার ফিরে এস দিলীপ।

দিলীপ ভাবছিল- -ডোরা যখন পরের ডাকে তার চিঠি পাবে, বিবরণ পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

দিলীপ দত্তের ভাবনায় পুলকের বিদ্যুৎ শিউরে ওঠে। তার কারণ আছে। চিরকালের সাহসী ছেলে দিলীপ। তার গায়ের জোরের খ্যাতি সুজাবাগের মৌমাছিটিও জানে। হারু ফটোগ্রাফারের দোকানে শো-কেসের ভেতর দিলীপের একখানি ফটো যেন পৌরুষ ও রূপের নমুনা হয়ে এখনো সুজাবাগের বুকে মেডেল হয়ে ঝুলছে। তাইতো ডোরা নন্দীর মতো মেয়ে—আজ নয়, দিলীপ যখন সেণ্ট ডেনিসে পড়তো, তখন থেকেই।

বিলিতি ছাত্র। চালিয়াতির সব কায়দাগুলি বেশ দুরস্ত ছিল দিলীপের। সার্জের স্যুট ছাড়া ক্লাসে আসতো না। কোটের বুকের ওপর আল্‌মামেটারের ইনসিগ্‌নিয়া হলদে সুতোয় আঁকা থাকতো। কলেজ ইউনিয়নের বার্ষিক উৎসবে হুড্‌রু ঝর্ণাতে যখন পিকনিক জমে উঠতো, পথে যেতে মোটর লরীর ছাদে বসে জ্যাক উড়িয়ে সবচেয়ে বেশী গলা ফাটিয়ে হুর্‌রা দিত দিলীপ। নন্দী সাহেবের বাংলোর বারান্দায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতো ডোরা। দিলীপের সব চপলতা ধন্য হয়ে যেত। মিষ্টি মিষ্টি হাসতো ডোরা, তাকিয়ে থাকতো ঘাড় হেলিয়ে।

হঠাৎ শোনা গেল, ডোরা নন্দীর বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। মোমের মতো সাদা ও সিড়িঙ্গে সেই পাঞ্জাবী প্রফেসর আর্থার সিংহের সঙ্গে। দিলীপের বিহ্বল যৌবনের অভ্যর্থনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক চারুমুখী অ্যাফ্রোদিতে যেন হঠাৎ অকারণে মুখ ভেংচে দিল। সাহেবিয়ানার পালেস্তারার নীচে চিড় খেয়ে ফেটে উঠলো একটি মেটে-মলিন বাঙালী-অভিমান।

সেইদিন প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবী প'ড়ে ক্লাসে দেখা দিল দিলীপ। সেইদিন সেণ্ট

ডেনিস নতুন চোখে দেখলো দিলীপকে। দিলীপও সেণ্ট ডেনিস-এর এক নতুন রূপ দেখলো।

সংস্কৃতের অধ্যাপক মিষ্টার শর্ম্মা অর্থাৎ পণ্ডিতজী দিলীপকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন।—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তুম্‌হারা হৃদয় গগনমে বিবেককা সূর্য চমক্ উঠা হ্যায়। সম্‌ঝা ?

মৌলবীসাহেব দিলীপকে দেখেই খুসীতেই থম্‌কে দাঁড়ালেন।—বাহবা বাহবা। কেয়া বাৎ হ্যায়—জওয়ান-ই-বঙ্গাল।

ফাষ্ট ইয়ারের কয়েকটি ছেলে কমনরুমে দিলীপকে ঘিরে দাঁড়ালো—ধুতি-পাঞ্জাবীতে আপনাকে কী সুন্দর মানিয়েছে দিলীপদা !

দিলীপদা ! এই সামান্য একটি সম্বোধনের আবেদন দিলীপকে যেন প্রীতিভরে গলা জড়িয়ে ধরলো।

যে রমেশ খদ্দরের উড়ুনি গায়ে খালি-পায়ে কলেজে আসতো, কোনদিনও দিলীপের দিকে অবহেলাভরেও চোখ তুলে তাকাতো না, সেই রমেশ দিলীপকে নেমন্তন্ন করে বাড়ি নিয়ে গেল। রমেশের মা এসে দিলীপের কুশল-পরিচয় নিলেন। রমেশের বোন শোভা খাবার এনে দিল। বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পড়ে, আলোচনা করে, রমেশ দিলীপ ও শোভার একটি সুন্দর সন্ধ্যে কেটে গেল।

তোচিখেল পার হয়ে গেল। উদ্‌গ্রীব পাথুরে কেল্লাটা যেন নিঃশব্দে চুপিচুপি দেখলো, ব্যোমচর গ্রহের মতো রুষ্ট বিমানবহর গোঁ গোঁ করে উড়ে পার হয়ে যাচ্ছে। দেখা যায়, উঁচু উঁচু পাহাড়ের সর্পিল বিস্তার—একটা কবচাবৃত সরীসৃপ যেন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সূর্য ওপরে উঠছে। পূবদিক থেকে একটা আলোর ঝালর হেলে পড়েছে মাটির দেশের কুহকের ওপর। সবই ছলনা বলে মনে হয়। নীচে হাজার মিটারের ব্যবধানে মহীতল যেন মিথ্যে হয়ে গেছে।

আজ তেমনি মিথ্যে হয়ে গেছে শোভা।

ডানাভরা নতুন পরাগের আবেশে প্রজাপতি যেমন খানিক ওড়ে, খানিক বসে—কাছে আসে না, দূরেও সরে যায় না, শোভার ব্যবহারটা ছিল সেই রকম। সেই যেদিন প্রথম দেখা, সেদিন থেকে। কথা বলে যায় ঠিকই, কিন্তু উত্তরটা শোনে কিনা বোঝা যায় না। দুটো কথা বলেই হয়তো দেরাজের দিকে এগিয়ে এল; চোখে পড়লো আয়নাটা, তখুনি সরে গিয়ে ঘরের কোণের দিকে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। দিলীপদের বাড়িতে বেড়াতে আসতো শোভা, ড্রইং-রুমের নিভৃতে গল্পের ভেতর দিয়ে কত দুপুর সন্ধ্যে হয়ে যেত।

দিলীপ কতবার অনুযোগ করতো—একটু সুস্থির হয়ে বসো শোভা। এ রকম ছটফট কর কেন ?

শোভা—ভয় করে।

—কেন ? যদি ধরে ফেলি, তাই কি ?

—না, যদি ধরা পড়ে যাই।

সেদিন এই দূরে-সরে-থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। হৃদয়ের দিক দিয়ে এত সান্নিধ্য ছিল বলেই। শোভার ভালবাসার হাওয়া দিলীপের মনের গায়ে গিয়ে লেগেছে। দিলীপের সাজপোষাকের রেশমী বাহার কবে যে সাদা খদ্দরে এসে শুচিতা লাভ করেছে, তা সে নিজেই ঠিক বলতে পারে না। দিলীপ একেবারে বদলে গেছে।

কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন ধীরাজের বাড়ির সবাইয়ের সঙ্গে শোভাও গিয়েছিল মধুবনের মেলা দেখতে। মাত্র একটি বেলার জন্য দশ মাইল দূরে একটু ঘুরে আসা। কিন্তু যাবার আগে দিলীপের মুখভার শোভার মেলা দেখার আনন্দটুকু মাটি করে দিল। শোভার মনে হলো—ভালবাসার রীতিই বুঝি এই রকম। একটু মাত্রা ছাড়া, একটু অভিমান-ভীরু !

তাই যদি না হয়, তবে দিলীপ এত বদলে যায় কি করে ?

মামুদদের একটা গ্রাম। দূরবীনটা একবার চোখে লাগালো দিলীপ। অনেক দূরে একটা চেপ্টা পাহাড়ের মাথায় হাজারখানেক লোক হাঁটু মুড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে আছে। পাশে এক একটি লম্বানল রাইফেল শোয়ানো আছে। আজ জুম্মার দিন। সকালবেলার নেমাজ সারছে একটা লস্করের দল। স্কোয়াড্রন উল্কার মতো ঝাঁপ দেবার আবেগে স্পীড বাড়িয়ে দিল। চোখের পলক ফেরাতেই দেখা গেল—ত্রস্ত চতুর হরিণের পালের মতো তর্‌তর্‌ করে নেমে লস্করের দল লুকিয়ে পড়লো একটা সুগভীর পাহাড়ী খাদের ভেতর।

প্রতিবছর রামনবমীর মিছিলের দিনে কসাইপাড়ার মসজিদের কাছে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা করে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাতো। জের চলতো চারদিন ধরে। সাঁজবাতির অর্ডার আর মিলিটারী পাহারা তুচ্ছ করে সুজাবাগের অলি-গলিতে অন্ধকারের মধ্যে ছুরির উৎসব চলতো।

গত বছর দাঙ্গার সময় দিলীপ খুব নাম কিনেছিল। চকের ওপর যে ভয়ানক দাঙ্গাটা হয়েছিল, তাতে হিন্দুপক্ষের নেতা ছিল দিলীপ। বড় হিংস্র আর বেপরোয়া দিলীপের হাতের লাঠির মার। বাছবিচার নেই। চেনামুখ, অচেনা-

মুখ, বুড়ো হোক্, জোয়ান হোক্, রোগা বা মোটা—একবার সামনে পড়লেই হলো। শিক্ষিত ডেনিসিয়ানের রুচির মুখোস যেন কিছুক্ষণের জন্য খুলে পড়ে যেত। শুধু খুলি ফাটাবার নেশায় পাগল হয়ে যেন বারভূঁয়ে বাংলার একটা লেঠেল সর্দার লাফঝাঁপ দিয়ে বেড়াত।

মিলিটারী এসে গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, প্রতিবেশীর হিংসার চেয়ে বীভৎসতর বুঝি আর কিছু হয় না। তাই সারারাত্রি গলিতে গলিতে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি কোপাকুপি চলে। পথের উপর বোবা ভিখারী, বদ্ধ পাগল আর ছোট ছেলের লাস পড়ে থাকে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সুজাবাগ সহরের হিন্দু-মুসলমানের মতো চিরকালের ভীরু মেনিমুখো প্রাণগুলি হঠাৎ খুনী তাতারের মতো হত্যার প্রেরণায় এত উতলা হয়ে উঠলো কি করে? এই চকের উপরেই গত মাসে এক মাতাল সাহেবের মোটর ইশাকের ছেলেটাকে চাপা দিয়ে মেরেছিল। এক হাজার হিন্দু-মুসলমানের ভীড় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা হজম করেছিল। সাহেবটাকে ধরে থানায় নিয়ে যেতেও কেউ এগিয়ে যায়নি। শুধু এক হাজার পদদলিত ব্যাঙের ফুসফুস যেন মোটর ঘিরে দাঁড়িয়ে সুনীচ সৌজন্যে ফিসফাস্ করে আপশোষ করছিল। এখনও একটা কাবুলিওয়ালা একা ছুতোরপাড়ায় ঢুকে পেটে লাঠি খুঁচিয়ে সুদ আদায় করে আনে। সেই ইশাক্ আজ যদি দিলীপকে একবার বাগে পায়? থাক্ সে কথা। দিলীপের কথাই ধরা যাক্—খুড়িমার কার্বঙ্কল অপারেশন দেখে যার মাথা ঘুরে গিয়েছিল! সেই দিলীপ আজ ।

শোভা বললো—তুমি এসব নোংরা কাজে থেক না দিলীপদা।

দিলীপ—আমি গায়ে পড়ে কাউকে ঠেঙ্গাতে যাব না। তবে পাড়ার ভেতর ঢুকে কেউ উপদ্রব করতে এলে বা বেলতলার ঐ মন্দিরটাকে কেউ ভাঙ্গতে এলে বাধা দিতে হবে অবশ্য। নইলে বৃথাই এতদিন এক্সারসাইজ করে হাতের গুলি পাকিয়েছি।

—কিছু করতে হবে না তোমাকে।

—এসব ব্যাপারে তোমার গান্ধীমার্কা অহিংসা কিন্তু কোন কাজের কথা নয় শোভা।

—বেশ তো, তোমার গায়ের জোর যখন আছে, তখন দু'দলকেই লাঠিপেটা করে শায়েস্তা কর।

—কি রকম?

—হিন্দুরা যখন মুসলমান পাড়ায় আগুন দিতে দৌড়য়, তখন ওদের ঠেঙ্গিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দিও। মুসলমানদেরও তাই কর।

—তা হয় না।

—তা হয় না যখন, তখন দু'দলকেই হাতজোড় করে বাধা দাও।

—তাতে কোন ফল হবে কি?

—তুমি একবার করেই দেখ, ফল হয় কি না?

দিলীপের মুখে মৃদু হাসি দেখে বোঝা যায়, শোভার কথাগুলি তার বিশ্বাসের মধ্যে আমল পাচ্ছে না। হাসিটা ভদ্রগোছের বিদ্রূপের মতো মনে হয়।

শোভা বলে—শুনেছি, হিন্দুরা তোমাকে একটা বীর বলে শ্রদ্ধা করে। মুসলমানেরাও নাকি তারিফ করেছে—সাবাস্ দিলীপবাবুর হিম্মৎ! তাতেই বোধহয় গলে গেছ! মেকলে সাহেবের টিটকারী মিথ্যে করে দিতে গিয়ে তোমরা শেষে গুণ্ডাগিরির মধ্যে গিয়ে পড়েছ। এটাও এক ধরনের পাঁঠা মেরে শক্তিপূজা। ছি ছি!

দিলীপ আর উত্তর দিল না। শোভার কথাগুলির রূঢ়তায় প্রথমে রাগ হলো। তারপর কিছুক্ষণের জন্য যেন একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লো। তারপর একটা অস্বস্তি। কিছুক্ষণ চঞ্চল হয়ে পড়লো দিলীপ। উঠে গিয়ে জানালার ধারে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালো।

শোভা বললো—সত্যিই তুমি সিগারেট ছাড়তে পারবে না দিলীপদা?

জ্বলন্ত সিগারেটটা আর সিগারেটের প্যাকেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল দিলীপ।

শোভা—আমার উপর রাগ করো না। যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, তবে আমায় মাপ করো।

দিলীপ—না, কোন অন্যায় হয়নি। আমি কাল কসাইপাড়ায় মসজিদের সামনে একা দাঁড়িয়ে মিছিল পার করবো।

শোভার মুখ আশঙ্কায় কালো হয়ে এল—এরকম করো না দিলীপদা।

—ভয় নেই। তুমিও আমার সঙ্গে থেক শোভা।

শোভার মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মিলিটারী পুলিশের ট্রাকগুলি বৃথাই সিন্দুক ভরা বুলেটের বোঝা নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ালো। পেট্রল পুড়লো শুধু শুধু। কোতোয়ালী কর্ত্তাদের তোড়জোড় এবারের শোভাযাত্রায় নতুন একটা সঙের মতো মনে হলো। মসজিদের সিঁড়িতে পাশাপাশি বসেছিল দিলীপ আর শোভা। মুসলমান ছাত্রেরা এসে মাঝে মাঝে হেসে গল্প করে যাচ্ছিল। কাতার বেঁধে মুসলমান জনতা রামনবমীর শোভাযাত্রা দেখলো। শোভাযাত্রার আগে আগে লাঠিধারী পুলিশগুলি বেকুবের মতো মাথা

নীচু করে হাসছিল।

বেতারের অপারেটর দিলীপের হাতে একটা নোটিশ গুঁজে দিয়ে গেল। আর নাহি দূর। একটি সুকোমল সবুজ বেজাই দিয়ে ঢাকা আকা-খেল প্রান্তর। ঠাসা গমের খেত। মাঝে মাঝে এক একটা বুড়ো দেওদারের মাথায় তখনো লম্বা লম্বা কুয়াসার জট ঝুলছে।

বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে নন্দী সাহেবের আলাপের হর্ষ ও উচ্ছ্বাস শোনা যায়। ডোরাও নিশ্চয় এসেছে—ওর চুলের ক্রীমের মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে।

ওঁরা এসেছেন অভিনন্দন জানাতে। দিলীপের চাকরীর কথাটা শুনেছেন। আজ পর্যন্ত কোন বাঙালীকে যে সুযোগ দেওয়া হয়নি, দিলীপ তা পেয়েছে। এক অভাবিত গৌরবে আজ দিলীপের কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। ফৌজী গৌলিগ্যের ফুলের মুকুটটি যে বিমানসেনা দিলীপ, আজ সেই সেব পদ ও পংক্তির সম্মান গ্রহণ করতে আহ্বান লিপি পেয়েছে। শীঘ্রই পেশোয়ার গিয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য কাজে যোগ দিতে হবে।

প্রফেসর আর্থার সিংহ অসুখে পড়ে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছে। তাই ডোরা নন্দী এখনও সিংহ হয়নি।

—সুপ্রভাত।

অপ্রতিভভাবে হেসে ডোরা দিলীপের পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো। ঠিক আগের মতো মুখ ভরে হাসির ঝলক্ ফুটিয়ে তুলতে পারছে না ডোরা। চেষ্টা করলেও দ্বিধায় জড়িয়ে যায়।

—কেমন আছেন?

দিলীপের প্রশ্নে আরও লজ্জিত হয়ে পড়লো ডোরা। বললো—এবার একেবারে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে গেলেন, ঘাসের ফুলকে কি আর চিনতে পারবেন?

—মাটির ঢেলা আকাশে উঠলে ঝুপ্ করে মাটিতেই পড়ে যায়।

—না-ও পড়তে পারেন। যদি আকাশকুসুম হয়ে যান?

দিলীপ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। সেই প্রথম জীবনের স্বপ্নে দেখা মাটির কোহিনুর আজ ঘাসের ফুলের মতো সুলভ হয়ে গেছে।

ডোরা বললো—আমার একটা অনুরোধ আছে দিলীপবাবু।

দিলীপ—বলুন।

—দূরে গিয়েই একেবারে পর হয়ে যাবেন না। অন্ততঃ সপ্তাহে একটিবার

করে যাতে আপনার খবর পাই তার ব্যবস্থা করবেন। ভুলবেন না, আমি কিন্তু আশা করে থাকবো।

—সত্যি আশা করে থাকবে তুমি?

—হ্যাঁ দিলীপ।

—তুমি এতদিন এই আশার কথা আমাকে বলনি কেন ডোরা? তা'হলে আমি হয়তো এ কাজটা নিতাম না। অবশ্য, এখনো নেব কিনা ঠিক নেই।

—ভুল করো না দিলীপ। তোমার জীবনের উন্নতির পথে আমি কোন বাধা দিতে চাই না, তাতে আমার যত দুঃখই হোক্ না কেন, সব সইতে পারবো। জানি, একদিন তোমায় ফিরে পাব।

স্কোয়াড্রন ক্রমেই ওপরে উঠছে—রাবণের সিঁড়ির মতো যেন ঊর্দ্ধতো স্বর্গের দিকে মাথা ফুঁড়ে চলেছে। হিমাক্ত বাতাসের জীব যেন ছুরির মতো গায়ের চামড়া ছুলে ফেলবে। একটা কাপুনির বেগ পুরু ফ্লানেলের কিট ভেদ করে দিলীপের হাড়ে গিয়ে বিঁধছে। মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগলো। বমির তোর এল গলা ঠেলে অসাড় নাকের নালা দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। অক্সিজেনের মুখোসটা চাপিয়ে কোন মতে সুস্থির হয়ে নিল দিলীপ।

শোভার জন্য দুঃখ হয়, রাগও হয়। কিরকম যেন ওর প্রকৃতি। নানা বয়েসের দেশ-জাতি সমাজ স্বাধীনতার কতগুলি বুলি শিখে তোতাপাখীর মতো শুধু আওড়ায়।

সুজাবাগের কে না শুনে খুসী হয়েছে? প্রত্যেক বাঙালীই শুনে বোধহয় খুসী হবে—দিলীপ দত্ত যোদ্ধা হয়েছে। এমন বুকের ছাতি, এমন নির্ভীক দুঃসাহসী ছেলে, ওকি কলম পিষে পিষে জীবনটা ব্যর্থ করে দেবে? যোগ্য কাজই পেয়েছে দিলীপ।

এতদিন পরে অনেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। পাঁচু ডাক্তারের সেই তোখড় মেয়েটার পাল্লায় পড়ে স্রেফ ভোতা হয়ে যাচ্ছিল। ঐ মেয়েটারই নাম শোভা—এক নম্বরের স্বরাজওয়ালী। ভাই বোনে মিলে শুধু গান্ধী গান্ধী করে। পাঁচুডাক্তারের পসার তো জানা আছে—ফুটো ষ্টেথিস্কোপ। দেনার দায়ে ভিটে বিকোতে বসেছে। মেয়েটাকে যদি দিলীপের মতো ছেলের কাছে গছিয়ে দিতে পারে তবে আর ভাবনা কি? ভাউচারে হাতী কেনা হয়ে গেল।

ডোরার সঙ্গে দেখা হবার কয়েকদিন পরেই শোভা উপস্থিত। দিলীপ বেড়াতে যাবার জন্য সবে সাজ সেরে গ্যারেজের দিকে চলেছে—আজ টু-সীটার নিয়ে বার হবে। আজকের সাজটার মধ্যেও নিদারুণ এক ব্যতিক্রম। সন্ধ্যে

হতেই ট্রাই-কলার-টাউজারে একটি আধ-ময়লা বৈলাতিক সন্ধ্যাতারার মতো আবার বহুদিন পরে নতুন করে চমকে উঠেছে দিলীপ।

শোভা বুঝে বুঝে এই অসময়েই এসে দাঁড়িয়েছে, যেন পথ রুখে।

—তোমার চিঠি পেয়ে আসছি, অবশ্য আসতে লেখনি। কিন্তু ক্ষমা চেয়েছ কেন? লিখেছ, ভাগ্য তোমাকে ভিন্ন পথে টেনে নিয়ে চললো, সেই চরম দণ্ড বরণ করে নিয়েছ—তবু আমাদের ভালবাসার স্মৃতি চিরন্তন হয়ে থাকবে···। বেশ সুন্দর লেখাটা।

দিলীপ—তুমি ভুল বুঝে ঠাট্টা করছো, কিম্বা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে···

কথাগুলি তোতাপাখির মতো শোনালো। যেন একটা আত্মগ্লানির লাঞ্ছনাকে জোর করে এড়িয়ে যাবার জন্য ফাঁক খুঁজছে দিলীপ।

শোভা—আজ সুজাবাগের কাক-কোকিলও জানে যে তোমার সঙ্গে আমার নাকি প্রেম হয়েছে।

—তাদের এই জানা তো মিথ্যে নয় শোভা।

—বেশ তো, এখন তারা যদি কেউ তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে, সেই প্রেম-যমুনা এক লম্ফে ডিঙিয়ে তুমি চললে কোথায়?

—বলবো, জীবনে একটা কঠোর পরীক্ষার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, তাই এই বিচ্ছেদ মেনে নিতে হলো।

—বাপ্‌রে বাপ্‌। পরীক্ষা? তার ওপর কঠোর? সোজা কথায় যাকে বলে, একটা চাকরী পেয়েছ মাত্র। বাঙালীর ভীরুতার অপবাদ ঘোচাবে, মিছে কেন এত সব বড় বড় কথা বলছো দিলীপদা? বল, তোমার নিজের অপবাদ ঘুচবে, তুমি নিজে বীর হবে, যোদ্ধা হবে। তাই দিয়ে বাঙালীর বীরত্ব বোঝায় না।

—কেন বোঝায় না?

—যেমন তুমি মোটর গাড়ীতে বেড়াও মানে বাঙালী জাতির মোটর গাড়ীতে বেড়ানো বোঝায় না।

—আমার একটা খুব সোজা কথার উত্তর দেবে শোভা? সত্যিই কি বিশ্বাস কর তুমি, চরকায় সুতো কেটে স্বরাজ পাওয়া যাবে?

—মেনে নিচ্ছি পাওয়া যাবে না। এবার তুমিই বল, কি করে পাওয়া যাবে।

—যুদ্ধ করেই পেতে হবে, পৃথিবীর আর পাঁচটা পরাধীন জাত যে ভাবে লড়াই করে স্বাধীনতা পেয়েছে, সেই ভাবে।

—তা'ও মেনে নিলাম।

—তাই বাঙালীকে শুধু কলমবাগীশ কেরাণী হয়ে থাকলে চলবে না। যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হবে।

—অন্য সময় হলে তোমার মতো লোকের মুখে একথা শুনলে রসিকতা মনে করে হাসতাম। কিন্তু আজ সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। যুদ্ধে চাকরী করা আর যুদ্ধবিদ্যা শেখা কি একই ব্যাপার দিলীপদা? এই তত্ত্বটা কি তোমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে? তুমি তোমার মনকেই প্রশ্ন করে দেখ একবার।

সুবিজ্ঞা আচার্যার মতো শোভা উপদেশ শুনিয়ে যাচ্ছে। দিলীপের মনের তারগুলি ক্রমেই বিরক্তিতে মোচড দিয়ে কড়া হয়ে উঠতে লাগলো। বললো—তুমি কোন নতুন কথা শোনাচ্ছ না শোভা, তোমারই মতো গোঁড়া ঠাকুরমাদের ঠাকুরমায়েরা এই যুক্তি দিয়েই হিন্দু ছেলের সমুদ্রযাত্রাকে পাপ মনে করতেন। সব বিদ্যারই অধিকারী হতে হলে আগে ছাত্র হতে হয়। ছাত্র হওয়াকে চাকরী করা বলে না।

শোভাকে এতক্ষণ সত্যিই যেন আততায়িনীর মতো দেখাচ্ছিল। দিলীপের বিরক্তিভরা উত্তর শুনে চোখ নামিয়ে নিল। না, আজ আর দাবী করে বলবার কিছু নেই। চুপ করে হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইলো শোভা। দিলীপের মনে হলো, বড় বেশী কালো দেখাচ্ছে শোভাকে। বোধহয় এত ঘামিয়েছে আর হাঁপাচ্ছে তাই। মমতা হয়, কেন এরা মানুষকে শুধু পেছনে টেনে রাখতে চায়। জানে না, তাতে কোন ফল হয় না। দিলীপ একটু অনুনয় করে বললো—দুঃখ করো না শোভা।

শোভা—যুদ্ধ শিখতে হলে মানুষ মারতে হয়, সেটা জান তো?

দিলীপ—শত্রুকে মারতে হয়।

—তুমি শত্রুকে চেন?

—চেনবার কোন প্রয়োজন হয় না।

—আমাকে জব্দ করার জন্য গায়ের জোরে কিছু বলো না দিলীপদা। আমার কথার উত্তর দাও।

—না, উত্তর দেবার কিছু নেই।

দিলীপের কথাগুলি ক্রমেই রুক্ষ হয়ে উঠছে, পালাবার পথ না পেলে বেড়াল যেমন রুষ্ট হয়ে ওঠে। শোভাও তেমনি টিট মেয়ে, সব অপমান সহ্য করে আজ যেন একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যই সে এসেছে। বললো—তুমি এই চাকরী নিও না। তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না যে, তোমার দ্বারা এসব কাজ হতে পারে না।

—কেন?

—দশজনের বাহবা আর হাততালির উস্কানিতে দাঙ্গা করতে গিয়েছিলে, ভুল

বুঝতে পেরেছিলে। এবারও হাততালির তারিফ পেয়ে যোদ্ধা হতে চলেছ।

দিলীপ শোভার কাছে এগিয়ে এসে সান্ত্বনার সুরে বললো—আজ অন্য কথা কি আর কিছু বলবার নেই শোভা? শুধু আমার চাকরীটা নিয়েই তোমার দুঃখ? আমি চলে যাব, শুধু এই কথাটা ভেবে তোমার কি ··।

শোভা এইবার হেসে ফেললো—সে দোহাই দেবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে ডোরা। থাক্, সে সব কথা।

একটি কথার আঘাতে দিলীপের সব মুখর চপলতা স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছু একটা বলবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

শোভা—এইবার আমি যাই। অনেক সময় নষ্ট করলাম।

থার্মোমীটারের পারা শূন্য-সেন্টিগ্রেড-এর নীচে বিশ ডিগ্রী নেমে গেছে। সময়ের প্রবাহ যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে এক চরম লুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিমানবহরের সেই একটানা সরোষ গুঞ্জন আর নেই। অদ্ভুত এক শব্দের উৎসবে মহাব্যোম স্পন্দিত হচ্ছে, যেন গান গাইছে একটা বিদেহী পরমাণুর জগৎ। আলোক ও শব্দের গুঁড়ো ছড়ানো এই বায়ুর দেশে পৃথিবীর জ্ঞানবুদ্ধি অসহায় হয়ে পড়ে। দিলীপ দত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকে। বিজ্ঞানী হওয়া উচিত ছিল তার, তবেই না এই পদার্থ-প্রপঞ্চের কিছু রহস্য লুঠ করে নিয়ে যেতে পারতো। যদি এখানে কেউ আসে, সে যেন এই অগোচরের অহঙ্কার ভেঙে এক মুঠো আলোক-কণিকা বন্দী করে নিয়ে যায়। মাটির দুনিয়ার মান রাখতে হলে তার চেয়ে বড় কাজ আর কিছু নেই।

ডোরাকে এইসব কথা লিখতে হবে। কিন্তু সে কি খুসী হবে? খুসী হতো যে সে আজ তার পথ থেকে সরে গেছে। বোধহয় এখন বিলিতি-কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করছে। হয়তো ছ'মাস জেলও হয়ে গেছে।

স্কোয়াড্রেন বধ্যভূমির ওপর পৌঁছে গেছে। নীচে ওয়াজিরিস্তানের বিচিত্র প্রান্তর—ছোট ছোট গ্রাম ক্ষেত আর বাগিচা। পাহাড়ের ঢালুতে ভেড়া চড়ছে। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে একটা আবেশ আসে। শিল্পী হয়ে ছবি এঁকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বিশ্বাস হয় না পৃথিবীতে ধুলো আছে কাঁটা আছে বিষ আছে। সবই মিথ্যা অপবাদ বলে মনে হয়। মাটির পৃথিবীর এই রূপ মানুষেরা জানে না। তাই তারা স্বর্গ কামনা করে। শিল্পী হওয়া উচিত ছিল দিলীপের।

একটা বাজার। তাজটুপি আর পাগবাঁধা শত শত মাথা কিলবিল করছে। বাজারের পাশে খাড়া পাহাড়টার মাথায় একটা জীর্ণ বৌদ্ধ স্তূপ। পাথরের গায়ে

ঘুলঘুলির মতো কতগুলি গুম্ফা, কতগুলি কালো চোখের কোটর যেন আকস্মিক দুঃস্বপ্নে বিক্ষত হয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষের কোন্ ছাত্র না ইতিহাসে পড়েছে? মীরাগ্রাম থেকে তক্ষশীলা—তক্ষশীলা থেকে পুরুষপুর—পুরুষপুর থেকে রাজগৃহ। এই সেই পুরাতন হৃদয়ের পথ আজও পড়ে রয়েছে—অবহেলা ও অপরিচয়ের কাঁটায় ঢাকা। সেই যুগ যুগের কুটুম্বিতার সুখস্মৃতি যেন বিষণ্ণ বেদনায় পাহাড়টার মাথায় ভেঙে পড়ে আছে। আজ কিন্তু সেই···।

দিলীপের হঠাৎ মনে পড়ে যায়—রসিদ খলিফার মামাবাড়ী এই দেশে।

রসিদ খলিফা। দিলীপের ঠাকুরদার আমলের দরজী। আজও সে বেঁচে আছে। সাদা শনের মতো ফুরফুরে তার দাড়ি, পাকা ডালিমের মতো গায়ের রঙ। ছেলেবেলায় পূজোর সময় জামা সেলাই নিয়ে রসিদের সঙ্গে দিলীপের প্রতি বছর একটা সংঘর্ষ বাধতো। জামার ছাঁট মোটেই পছন্দসই হতো না দিলীপের। বুড়ো রসিদকে খিম্‌চে চড়ঘুঁসি মেরে নাজেহাল করতো দিলীপ। তারপর দেয়ালীর সময়, লেপ সেলাই করতে আসতো রসিদ। দিলীপ বসে বসে রসিদের কাছে গল্প শুনতো—রসিদের মামাবাড়ী ওয়াজিরিস্তানের গল্প।

শত্রুপুরী নয়, সেই রূপকথার দেশ আজ তার পায়ের নীচে। রাবণের সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে দিলীপ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে সেই দেশ। কখন্ আবার বিদ্যুতের-ঘন্টি বেজেছে, কাজের অডার এসেছে, দিলীপ কিছুই জানে না। ঠাণ্ডা আয়নার মতো তার চোখ দুটোতে শুধু নীচের পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি চিক্‌চিক্ করছে। বোমা পড়ছে—এক একটি বিস্ফোরণে এক একটি প্রকাণ্ড ধোঁয়ার গোলাপ হঠাৎ পাপড়ি মেলে উঠছে। বাজারটা আর নেই। শুক্‌নো পাতার মতো কতগুলি নিরুপায় ভূচর প্রাণ এক ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ছিট্‌কে পড়ছে চারদিকে।

দিলীপের সহকর্মী দুজন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ওদের চোখে মুখে কী অকপট সংহারের আনন্দ। শুধু দিলীপের অন্তরাত্মা যেন ধরা-পড়া চোরের মতো আসরের এক কোণে মাথা গুঁজে পড়ে রইল।

শুধু মনে পড়ে—রসিদ খলিফার মামাবাড়ী। হিংসে নয়, বৈরাগ্যে নয়, নিতান্ত এক পার্থিব মমতার আবেশে দিলীপের সম্বিৎ অসাড় হয়ে রইল। নীচে যে জীবনের সুখদুঃখের নর্তন চলেছে, সে নিজেই যে তার একটি উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত জীবাণু। সেখানে রসিদ খলিফার মামার বাড়ী—মৃত্যুর ঢিল ছুঁড়ে মারতে হাত ওঠে না। একেই বলে ভীরু কাপুরুষ, একেবারে হৃদয় তাপের ভাপে ভরা ফানুষ।

বোম্বারের দল ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। বিমানের ভেতর থেকে মূর্চ্ছাহত দিলীপ দত্তকে বের করে একটা ষ্ট্রেচারের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। ধরাচূড়া ছেড়ে কয়েকটি গগনবিহারী চণ্ডা চণ্ডা ডাবিশায়াব দুলাল চায়ের বাটি হাতে নিয়ে আরামে চুমুক দিচ্ছে। দিলীপের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ঠিক মূর্চ্ছা নয়, চোখে মেলে তাকাতেই পারছিল না দিলীপ। অভিযান এখনও শেষ হয়নি, আরো পথ বাকী আছে। এখান থেকে হাসপাতাল, তারপর হেড কোয়ার্টারে চালান, তারপর তদন্ত। তদন্তের শেষে বরখাস্ত। একটি মেকি বীর্য্য-বন্তের কুশপুত্তলিকা আবার চুপি চুপি হাওড়া এক্সপ্রেসে চড়ে বসবে। আবার সুজাবাগ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। টেলিগ্রাম পেয়ে বাবার আর্দালি আর টু-সীটার এসে অপেক্ষায় বসে থাকবে।

ডোরা আসবে, নন্দীসাহেবও বোধহয়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ডোরা ফুলের তোড়া হাতে তুলে? কতক্ষণ তার সুন্দর ঠোঁট দুটিতে হাসি ফুটে থাকবে? এক মিনিট দুমিনিট···পাচ মিনিট। তারপর আর বুঝতে বাকী থাকবে না।

দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে ডোরার হাত কাঁপতে থাকবে। সেই ধিক্কারে ফুলের তোড়া লুটিয়ে পড়বে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপর। ফুলের তোড়াটা হাত তুলে দিলীপ নিতেও পারবে না, মাটি থেকে তুলে ফিরিয়ে দিতেও পারবে না। শুধু নিঃশব্দে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে দিলীপ।

রি তা

জল নেবার জন্য রিতা ছোট পাহাড়ী নদীটার বালির ওপর এসে দাঁড়ালো।

মাঝ নদীতে বালির ওপর দিয়ে সরু একটা জলস্রোত, ঘড়া ডোবে না। অনেকক্ষণ হাত দিয়ে খুঁড়ে খুড়ে একটা গর্ত করলো রিতা। তারপর সেখানে ঘড়া ডুবিয়ে দিয়ে নিজে একটু দূরে নীচের স্রোতের ধারে বসে হাত পা ধুয়ে নিল। মুখটা ভাল করে মেজে নিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো, দূর মহুয়ার ভিড় অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একফালি চাঁদ উঠেছে মাথার ওপর। ভরা সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠেছে।

কলসীটা কাঁখে তুলতে আর ইচ্ছে করলো না। কানাটায় হাত দিয়ে হেঁচড়ে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে একটা কালো পাথরের চটানে এসে দাঁড়ালো। আজ

তার আর কিছু ভালো লাগছে না।

অনেকদিন থেকেই তার ভাল লাগছিল না। সাঁওতাল চাষার মেয়ে রীতা। পাহাড়ের ঢালুতে ছোট একটা ডিহি। এ ডিহিতে যে সাঁওতালদের বসতি তারা তাদের জংলীপনা হারিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু চাষ আবাদেও হাত পাকেনি। আইন কানুনকে ভয় খায় বেশি। জংলীদের মতো বেপরোয়া মহুয়ার মদ চোলাই করতে পারে না। ট্যাক্স দেয় বেশি, কাপড় চোপড়ের প্রয়োজন বেড়েছে, অথচ আয় নেই। বার মাসে একটা ফসল তাদের ক্ষিধে মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তাই মাঝে মাঝে কুলি রিক্রুটারের ক্যাম্প বসে। টাণ্ডেলেরা ডিহি বস্তি ঘুরে ঘুরে জোয়ান খাটিয়ে লোক যোগাড় করে আনে। কিছু আগাম পায়, খাকি কোট আর পাগড়ী পায় বিনা পয়সায়। তিন বছরের কণ্ট্রাক্টে ফিজি দ্বীপে চালান হয়।

রিতা শুধু শুনেছে তার বিয়ে হয়েছে। চাষী সাঁওতালেরা প্রায় হিন্দু হয়ে গেছে। অল্প বয়সেই ছেলে মেয়ের বিয়ে দেয়। লগন মাঝির মেয়ে রিতার বিয়ে হয় মাত্র সাত বছর বয়সে।

তারপর থেকেই রিতা আজ দশ বছর ধরে শুনে আসছে মুনার কথা। বিয়ের কয়েক মাস পরে সেও তিন বছরের কণ্ট্রাক্টে ফিজি চলে গেছে। রিতার শ্বশুর-বাড়ির ভিটের ওপর এখন একটা ধুতুরার জঙ্গল। সে বাপ মায়ের কাছেই থেকেছে আর বড় হয়েছে। দিনের পর দিন শুনে আসছে,—মুনা এবার ঘরে ফিরবে। চিঠি এসেছে।

সত্যিই মুনার চিঠি আসে। সে খুব ভাল আছে। কাজের অনেক উন্নতি হয়েছে, পয়সা জমেছে কিছু। সে লেখাপড়াও কিছু কিছু নাকি শিখেছে। সাহেবরা তাকে ভালবাসে। সাহেবরা কত বকশিশ দেয়, দামী দামী পোশাক বাঁশী টুপি···

চিঠিতে প্রবাসী পতির এইসব কুশল সংবাদ দিনের পর দিন শুনে আসছে রিতা। লগন মাঝি সমস্ত ডিহি ঘুরে সগর্বে এইসব বার্তা আরও বেশী করে রটিয়ে বেড়ায়। রিতার সৌভাগ্যের কথা সকলে আলোচনা করে।

কৌতূহলের পালা শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন। ওসব সংবাদে রিতার আর মন ভরে না। এতদিনে তার আসা উচিত ছিল।

পাথরের চটানে দাঁড়িয়ে রিতার মনে এই চিন্তাই মন্থর কুয়াসার মতো ভর করেছিল। আর কতদিন এই ভাবে, এই মনে মনে দেখার একটানা অভিনয়

চলবে ?

রিতা আবার চলতে শুরু করলো। উঁচু নীচু মেঠো জমি পার হয়ে ডিহির কাছাকাছি পৌঁছেছে। কাঠগোলাপের বনে হালকা ঝড়ের দোলা লেগেছে। কাকের ঝাঁক কলরব করে দেওদারের মাথায় এসে আড্ডা নিচ্ছে। রিতা রাগ করে একটা হোঁচট খেল।

আর একটু দূর এগুতেই দেখা গেল, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে হুটু। একথা রিতার জানাই ছিল। শুধু আজ নয়—আজ তিন বছর ধরে হুটু তার পেছনে ঘুর ঘুর করছে।

হুটু বাঁশী বাজিয়ে রিতার নামে গান গায়। উত্তরে রিতা ওকে গালাগালি দেয়। হুটু খরগোস শিকার করে এনে লগন মাঝির বাড়িতে দিয়ে যায়। ঘরশুদ্ধ লোক মাংস খায়, রিতা ছোঁয় না। হুটু যতবার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে, রিতা তাকে বিমুখ করেছে।

হুটুর উপদ্রবে রিতার রাগ পড়তো গিয়ে ফিজি প্রবাসী মুনার ওপর। হুটুর এই দুঃসাহস কি করে সম্ভব হয়? হয় ও জানে মুনা আর আসবে না, নয় মনে করে রিতা বুঝি মুনাকে ভালবাসে না।

মুনাকে ভালবাসে রিতা। কিন্তু মুনাকে তার প্রথম যৌবনের চোখে সে আজও দেখতে পায়নি। মুনা তার কাছে কল্পনা মাত্র। কিন্তু সে কল্পনার মধ্যে রামধনুর মতো কত না বিচিত্র মোহ মিশিয়ে আছে। সমস্ত ডিহি যার নামে স্তুতিমুখর, সেই মুনা তার স্বামী। মুনা জোয়ান মরদ, মুনা রোজগার করে, পয়সা জমিয়েছে। যখন দেশে ফিরবে মুনা, সমস্ত ডিহির দাম যেন বেড়ে যাবে। ভাগ্যিস অনেকদিন আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, নইলে ঝড়ু মাঝির মেয়েই হয়তো মুনার ঘরনী হয়ে যেত! রিতার চেয়ে সে অনেক সুন্দর।

হুটুকে ডিহির লোকে দেখতে পারে না, গরীব বলে নয়, বেজায় কুঁড়ে আর বখা। রিতার ওপর ওর অনুরাগের কথা ডিহির অনেকে টের পেয়েছে। ওকে কড়া কথায় অনেকে শাসিয়েও দিয়েছে—সামলে চল। নিজে ভাল হতে শেখ তবে রিতার মতো ভাল মেয়ে তোকে বিয়ে করতে চাইবে। তা ছাড়া পরের বউ, অত মাথামাথি ভাল দেখায় না। মুনা মাঝিও শীগগির আসছে। শেষকালে কি ডিহির মধ্যে একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটাবি।

দূর ফিজির বাগানেও চাঁদ ওঠে। মুনা দেশের কথা ভাবে নিশ্চয়। কিন্তু বেশি করে ভাবে রিতার কথা। চিঠিতে খবর পেয়েছে—রিতা ডাগর হয়েছে,

তার ওপর নাকি রাগ অভিমান করে আর মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে।

সমস্ত বছরে তিনটে বা চারটে চিঠি পায়। তার মধ্যে শেষ চিঠিগুলিই মুনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। রিতা নাকি খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। তবে বাপ-মার সঙ্গে প্রায়ই কোঁদল করে—মুনা কেন দেশে ফিরছে না।

রিতাকে মনে পড়ে। কিন্তু আট বছর আগে বিয়ের দিনে দেখা রিতার সে-মুখটি আর মনে পড়ে না। হলুদ ছোপানো কাপড় পরে কাকার কোলে চড়ে বিয়ের আসরে এল রিতা। তারপর পূজোপাঠ হয়েছে, মাদল বেজেছে, ঝুমুর হয়েছে, আর অন্য কিছু মনে পড়ে না।

রিতাকে এইভাবে শুধু চিঠির মধ্যেই পেয়ে এসেছে মুনা—আর ছুটির পর বাগান থেকে ঘরে ফিরতে একা পথে কল্পনায় অনেক কিছু পেয়েছে।

মুনা তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা পরিকল্পনা করে রেখেছে। তাই সে শুধু মুখ বুজে কঠোর পরিশ্রম করে। কিছু পয়সা জমানো চাই। সেই সঙ্গে লেখাপড়া শিখে নিতে হবে। তারপর দেশে ফিরে নিজের সঙ্গিনীকে আবার কাছে টেনে নেবে।

কিন্তু ডিহিতে থাকা আর চলবে না। শহরে একটা ছোট ভাড়া ঘরে সে নতুন সংসার পাতবে। বিনা মাইনেতে এপ্রেন্টিস খেটে বয়লার মিস্ত্রির কাজটা সে ভাল করে শিখেছে। আর জীবনে বাগানের কুলিগিরি নয়।

একটা সিঙ্গল রীডের হারমোনিয়ম কিনেছে মুনা। মাদ্রাজী গান, হিন্দী গান গাইতে শিখেছে। সাহেবদের দেওয়া ট্রাউজার পরে নাইট ক্যাপ মাথায় দিয়ে মাঝে মাঝে পোর্টেতে সিনেমা দেখে আসে।

মুনার কুলিদের টাণ্ডেল অনেক সময় ঠাট্টা করে বলেছে—কুলি হয়ে এসব কাপ্তেনী ভাল নয় রে ছোঁড়া। দেশে ফিরলে বউ আর চিনতেও পারবে না! ঘরেও নেবে না।

মুনা জানতো দেশে ফিরে আর থাকছে কে? রিতাকেও তারই মতন কায়দা দুরস্ত করে নেবে। তাকে কুলির বউ করে রাখবে না সে। পাহাড়িয়া চাষী জীবনে ফিরে যাবার মতো মতিগতি তার আর নেই। কিন্তু এবার বোধহয় ফেরা উচিত। বেচারী রিতা।

মুনার মনে তার কল্পনার রিতা সমস্ত রূপ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ডিহির পঞ্চায়েতের বৈঠকে সুটুর সাজার নির্দেশ হয়েছে। দশ টাকা জরিমানা। যেমন করেই হোক, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে পাথর ভেঙে ওকে দশ

টাকা রোজগার করতে হবে আর জরিমানা দিতে হবে। নইলে এ ডিহিতে ওর স্থান নেই।

ঝুটু বললো—আমি রিতার কাছে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা করে দিক। জরিমানা যেন না করা হয়। গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে দিলে আমি মরে যাব।

কিন্তু অপরাধ বড় কঠিন। সহজে মুক্তি দেওয়া যায় না। নোংরা চেহারা, কাজে কুঁড়ে, ঝুটুর জংলী স্বভাব আজও গেল না। উপোসেও ওর পাথুরে শরীর যেন কাবু হয় না। দিন গেলে দুটো কাঠবিড়ালী মেরে পুড়িয়ে খেয়ে নিলেই ওর চলে গেল। চুলের ঝুঁটিতে সর্বদা বাঁশী গুঁজে রাখে। সকলে যখন মাঠে খাটতে বের হয় ঝুটু তখন একটা আলের ওপর শুয়ে বাঁশী বাজায়।

এসব অপরাধ ক্ষমার্হ। কিন্তু পরের বিয়ে করা বউয়ের পেছনে একটা উপদ্রবের মতো লেগে থাকা, কোন পঞ্চায়েত ক্ষমা করতে পারে না।

রিতা সেদিন স্রোতে স্নান করতে গিয়েছিল। বনের নিরালায় নিশ্চিন্ত মনে সে স্নান করছে, একটা কুলের ঝোপ থেকে এক ঝাঁক তিতির উড়ে পালিয়ে গেল, যেন ভয় পেয়ে! রিতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তখুনি ধরে ফেললো অপরাধীকে। ঝোপের ভেতর ঝুটুর ঝাঁকড়া চুলের মাথা দেখা যাচ্ছে।

ঘরে ফিরে এসেই রিতা লগন মাঝিকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে।

এই অপরাধেই ঝুটুর শাস্তি। ঝুটু হাত জোড় করে পঞ্চায়েতের কাছে নিবেদন করলো—আমি রিতাকে বহিন বলে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা করে দিক।

রিতা বললো—না।

ঝুটু ডিহি ছেড়ে চলে গেছে। রিতা তার ঔদ্ধত্যকে মাপ করতে পারেনি, এর জন্য রিতার মনেও কোনো আপসোস নেই। ঝুটুর এই অপরাধ, এই আবদার অনেকটা বামন হয়ে চাঁদ ধরার সখের মতো। তার স্বামী মুনার কথাও তো ঝুটু সবই শুনেছে। তবে কেন সে প্রতিযোগিতায় নামে, কোন সাহসে?

চিঠিও এসে গেল, মুনা আসছে। আগামী সপ্তাহে ওদের জাহাজ ছাড়বে।

রিতার বুক দুরদুর করে উঠলো। এ কী অদ্ভুত চাঞ্চল্য। মুনা আসছে। ফিজি দ্বীপের চাঁদ নীল আসমানে ভেসে এসে এই মহুয়ার মাথায় এসে দাঁড়াবে।

জঙ্গল থেকে কোঁচড় ভরে রিঠা ফল কুড়িয়ে এনে ঘরে রাখলো রিতা। মোটা মুক্তার মালা একটা ধুয়ে রাখলো।

খিদিরপুর থেকে চিঠি এসে গেছে। জাহাজ পৌছে গেছে। মুনা তিনদিন পরে পৌছচ্ছে দেশে।

ডিহির সব মাঝিরা রাত থাকতে স্টেশনে এসে বসে রইল। ভোরে কলকাতার ট্রেন থামে। লগন মাঝি একটা পালকী খুঁজেছিল, কিন্তু ভাড়া বেশি বলে আর যোগাড় হলো না।

ট্রেন থেকে একদল কুলি নামলো। নানা গাঁ ও ডিহি থেকে কুলিদের মা বউ ও ছেলে মেয়েরা এসেছে। বুড়ীরা তাদের ছেলেদের কাঁধে মুখ রেখে একচোট কেঁদে নিল। যাদের ছেলেরা আসেনি তারাও কাঁদলো। সোরগোল শেষ হবার পর নানা দিকের পথে মাঠে জঙ্গলে যে যার ঘরে চললো।

আর নামলো মুনা। কালো ফুল প্যান্ট পরা, গায়ে কোট আর কম্ফোটার জড়ানো। পায়ে জুতো আর মোজা। বিবর্ণ একটা পুরানো ফেল্টের টুপি মাথায় মোটা বর্মা চুরুট হাতে।

মাঝিরা হাঁ করে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। মুনা লগন মাঝির কাছে এগিয়ে এসে হাঁটুতে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সকলের জড়তা যেন একটু ভাঙলো। বুড়ো মাঝিদের দু'একজন মুখ ফুটে সাহস করে কুশল প্রশ্ন করলো।

তারপর ডিহির পথ। মুনা আগে আগে চলেছে। মাঝিরা সকলে পেছনে দল বেঁধে চলেছে। সাড়াশব্দ বড় কিছু নেই। মুনা এক একবার থেমে তাদের সঙ্গ নিলেও তারা যেন থেকে থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

কথা ছিল মুনা ডিহিতে ঢোকা মাত্র ছেলেরা মাদল বাজাবে। তারপর তো সমস্ত দিনের উৎসব লাগবে। লগন মাঝি একটা পাঁঠা কিনে রেখেছে।

রিতা তার মায়ের নির্দেশ মতো সাজ করেছে। ভয়ে বুক কেঁপেছে, লজ্জা করেছে, তবুও। নিজেকে জোর করে শান্ত করে আনে রিতা। বেশী লজ্জা করে প্রথম দেখার সব আনন্দটুকু যেন নষ্ট না হয়। সে হয়তো রাগ করবে।

বটতলার নীচে লোকজনের গলার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কিন্তু ছেলেদের মাদল বাজলো না। রিতা কৌতূহলী হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

•

লগন মাঝি আর সঙ্গে আরও দুতিনজন মাঝি ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে অদ্ভুত ইংরাজী পোশাকে একজন লোক। রিতা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। এরা মুনার খবর নিয়ে আসছে।

মুনা হয়তো তুলসী মাঝির গোলায় বিশ্রাম করছে।

লগন মাঝিরা রিতার সামনে এসে দাঁড়ালো। রিতা বোকার মতো তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে একজন মাঝি চোখ টিপে ইসারায় জানালো—ঘরের ভেতর যা।

রিতা তবু দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। লগন মাঝি আবার মুখের ইসারায় জানিয়েছিল—মুনা।

এক দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে রিতা থরথর কাঁপতে লাগলো। ওর মা এসে ধরে দু'বার ঝাঁকুনি দিল—ওকি হচ্ছে?

সমস্ত ডিহিটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। মুনা ফিরেছে, ডিহির ছেলে মুনা। কিন্তু আমোদ তো জমল না। ছোট ছেলেরা দেয়ালে মাদল ঝুলিয়ে রাখলো। পাহাড়ের ওপারে গির্জার একটা দেশী সাহেব আজ তাদের ডিহিতে ঢুকেছে, ভয় দেখাবার জন্য।

আট-হাতি খেরো কাপড়ে রিঠে মাজা শরীর জড়ানো, শালবনের জংলী চাষীর মেয়ে রিতা। চোখে জল দেখা দেবার আগেই মাকে বললো—ছেড়ে দাও আমি ঠিক আছি।

তবু চোখের জলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আর একটা কল্পনার ছবি চকচক করে উঠলো—ডিহি ছাড়িয়ে বহু দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের পাশে রোদের মধ্যে বসে জংলী মুটু একা পাথর ভাঙছে। ওর পাশে ঝুড়ি হাতে সে যদি গিয়ে একবার দাঁড়াতো, খারাপ কিছু বোধহয় হতো না।

প ণ র ক্ষা

এক একবার সত্যিই আজ মনে হয়, কী কুক্ষণে সেদিন সরযূদের বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। সেদিন সরযূর ওই মিষ্টি অনুরোধের কথা শুনে আর খুশি হয়ে যদি সরযূদের বাড়িতে চা খেতে না যেত অলকা, তবে আজ আর এভাবে এই ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে মনের এই যন্ত্রণার সঙ্গে এত লড়াই করতে হতো না।

বেশ দূরে কাদের বাড়িতে রেডিওর গান বাজতে শুরু করেছে; গানের ভাষাটা বোঝা যায় না। কিন্তু সুরটা বোঝা যায়। বেশ মিষ্টি সুর! অলকার মনের যন্ত্রণাটা তখনি যেন নিজেই লজ্জা পেয়ে শান্ত হয়ে যায়। এই তিন বছর ধরে অলকার মনটা যে তৃপ্তিতে ভরে আছে, সেটা যে সেই সেদিনেরই ঘটনার দান। আজ হঠাৎ রাগ করে ওকথা ভাবলে চলবে কেন? এই তিন বছরের জীবনে অলকার মনের ভিতরে যে আলো হাসছে, সেটা যে সেই সুক্ষণেই জ্বলে উঠেছিল। সরযূর কাকা অবনীশের সঙ্গে যদি সেদিন দেখা না হতো, তবে অলকার

মন আজ এই গর্বের সুখে ভরে উঠতে পারতো না যে, তার মতো একটা কুরূপা মেয়েকে একজন সুন্দর মানুষ এত ভালবাসতে পারে। সেদিন সরযূর মনের কোন কল্পনাতেও এ সন্দেহ ছিল না যে, ওর কাকা অবনীশের চোখে বা মনে এমন ভুল কখনও সম্ভব হতে পারে। সন্দেহ হলে সরযূ নিশ্চয়ই সাহস করে অলকাকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করতো না।

শুধু সরযূ কেন, পৃথিবীর যে কোন মানুষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে দেবে, অবনীশের মতো ছেলের পক্ষে অলকাকে ভালবেসে ফেলা সম্ভবই নয়। সম্ভব হলে ওটা একটা নিয়ম-ছাড়া কাজ হবে, একটা দুর্ঘটনার মতো ব্যাপার হবে।

কিন্তু এমন অসম্ভবই তো সম্ভব হয়েছে। আজ সরযূও অস্বীকার করতে পারবে না, ওর কাকা অবনীশ অলকাকেই চিরকালের আপনজন করে কাছে ডেকে নেবার জন্য তৈরী হয়ে আছে। সরযূ আর সরযূর মা, দুজনেই প্রথমে বোধহয় সন্দেহ করেছিল, না অবনীশ বোধহয় একটা খেয়ালের খুশিতে অলকার জন্মদিনে ফুল আর বই উপহার পাঠিয়েছে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে অবনীশের বিয়ের জন্য বাড়ির মানুষের সব চেষ্টা যখন বিফল হয়ে গেল, তখন সকলেই বুঝতে পেরেছেন আর ভয়ানক আশ্চর্যও হয়ে গিয়েছেন, অলকা তাহলে অবনীশের কাছে একটা খেয়ালের খেলনা মাত্র নয়।

তবু সবাই আশা করেছিলেন, ভালবাসার মধ্যেও তো কোন ভুল থাকতে পারে। সে ভুল নিজেই একদিন ভালবাসার মোহটা ভেঙ্গে দেবে। অলকা আর অবনীশের সঙ্গে দেখা করতে আসবে না, অবনীশও আর মাঝে মাঝে অলকার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবার অভ্যাস বন্ধ করে দেবে।

কিন্তু তা হয়নি। আর অবনীশের বাড়ির কেউই যে তাতে খুশি হয়নি, এটাও বোঝা যায়। সরযূর সঙ্গে এই তিন বছরে আরও কতবারই তো দেখা হলো, কিন্তু সরযূ হেসে কথা বললেও সে হাসির মধ্যে যেন একটা গম্ভীর অভি-যোগের ছায়া লুকিয়ে থাকে। সরযূ আর সরযূদের বাড়ির কেউই চায়নি যে, অবনীশ শেষে অলকাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠুক।

সরযূদের বাড়ির সবারই মনের এই ধারণা কিন্তু খুব ঠিক ধারণা নয়। অলকাকে বিয়ে করবার জন্যে অবনীশের ব্যস্ততা এখনও শুধু মনেরই একটা ব্যস্ততা। তিনটি বছর পার হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত সরযূর বাবাকে কিংবা মাকে, এমনকি সরযূকেও মুখ খুলে বলে দিতে পারেনি অবনীশ, এবার একটা দিন ঠিক করে ফেললেই তো হয়।

সরযূরাও একটু আশ্চর্য হয়েছে বৈকি ; অবনীশ এখনও কথাটা বলে দিচ্ছে না কেন ! কিসের বাধা ? বাড়ির কেউ তো আপত্তি করবে না। আপত্তি করবার দিন পার হয়ে গিয়েছে। সকলেই জেনে গিয়েছে, অলকা ছাড়া আর কোন মেয়ে অবনীশের জীবনের কামনা হয়ে ওঠেনি, উঠবেও না।

সরযূর বাবা অনন্তবাবু বলেছেন, অবনীশের মনের রকম-সকম আমার পছন্দ হচ্ছে না। যখন অলকাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তখন করে ফেললেই তো হয়। জীবনের এরকম একটা ইচ্ছার কাজ এভাবে তিন বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখার কোন মানে হয় না।

না হয় তো স্পষ্ট করে বলে দিলেই পারে অবনীশ, এ বিয়ে হবে না। তাহলে দুঃখিত হবেন না অনন্তবাবু, সরযূদের বাড়ির একটিও মানুষের প্রাণ ব্যথিত বা দুঃখিত হবে না। কারণ এ-বাড়িতে কেউই ঠিক অন্তর থেকে কোনদিনও অবনীশ ও অলকার এই ভালবাসার সম্পর্কটাকে পছন্দ করেনি, সমর্থনও করতে পারেনি।

অলকা একটি অসামান্যা মেয়ে নয়, আই-এ পরীক্ষায় ফেল করেছে, প্রায় ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, আর ঘরে বসে আছে ; এমন মেয়ের অভাব পৃথিবীতে নেই। দেখতেও তো নিতান্ত একটি সাধারণ চেহারার মেয়ে, আর গুণ বলতে যা আছে সেটাও অসাধারণ রকমের কিছু নয়। কিছুদিন এক প্রাইমারী স্কুলের টিচার হয়ে চাকরি করেছিল। অলকার হাতের আঁকা কয়েকটা ছবি কলকাতায় বড়দিনের এগজিবিশনে প্রাইজও পেয়েছিল। পাড়ায় কোন সভায় উদ্বোধনের গান গাইতে হলে অলকাকেই ডাকাডাকি করে নিয়ে আসতে হয়। এসবও এমন বিরল কোন প্রতিভার কীর্তি নয়। স্থলেখা, প্রতিমা আর উৎপলা আরও ভাল ছবি আঁকতে পারে, আরও ভাল গান গাইতে পারে, দেখতেও অলকার চেয়ে অনেক সুন্দর।

এই তিন মেয়ের সবারই সঙ্গে তো অবনীশের পরিচয় ছিল, আজও আছে। কিন্তু কই, সেই পরিচয় তো ভালবাসার কোন সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি ?

সরযূর মা বলেন, আমি কোনও আপত্তিই করতাম না, যদি দেখতাম যে অবনীশ প্রতিমাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সরযূর ধারণা, স্থলেখার সঙ্গে কাকা অবনীশের বিয়ে হলে ভাল হতো। আর অনন্তবাবুর ধারণা, সবচেয়ে ভাল হতো যদি উৎপলার সঙ্গে অবনীশের বিয়ে হতো।

অলকাকে কেন যে ঠিক মন থেকে পছন্দ হয় না, সেটা অবশ্য-এ বাড়ির কেউ বুঝতে অথবা জানতে চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না। অলকা একদিন চা খেতে এলো, সেদিনই অবনীশের সঙ্গে আলাপ হলো, আর সেদিনই অবনীশের

দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে চলে গেল; শুধু এই সামান্য একটু চেষ্টার জোরেই অবনীশের মতো ছেলের মন জয় করে নিয়ে চলে গেল অলকা, ঘটনাটাকে প্রায় এইরকমের একটা বিস্ময়ের কাণ্ড বলে মনে হয়। সরযূর মার মনে আছে, ঠিক পরের দিনই দমদমে অলকাদের বাড়িতে গিয়েছিল অবনীশ। অলকার মতো মেয়ের জীবনে এটা যে প্রচণ্ড একটা জয়েরই গৌরব। কত সহজে বিজয়িনী হয়েছে দেবকীবাবুর এই মেয়ে, এই অলকা।

দেবকীবাবুর মতো মানুষকেও যে একটুকুও পছন্দ করে না এ-বাড়ির কোন মানুষ। অলক কোন দিনও সরযূকে বাড়িতে চা খেতে ডাকতে পারেনি। কেন পারেনি, সেটা সরযূ ভাল করেই জানে। দেবকীবাবুর মতো কৃপণ স্বভাবের মানুষ খুব কমই আছে। আছে কিনা সন্দেহ! অলকা জানে, যদি বিনা আহ্বানেও কোনদিন অলকাদের বাড়িতে যায়, তবে সরযূকে এক পেয়ালা চা আর একটা সন্দেশও খাইয়ে বন্ধুত্বের একটা সামান্য ইচ্ছাকে সফল করতে পারবে না অলকা। এটা অনুমান নয়, এটা চোখে দেখা একটা বাস্তব সত্য। একদিন উৎপলা আর সরযূ দুজনেই ইচ্ছে করে দমদমে অলকাদের বাড়িতে গিয়েছিল। দুটি ঘণ্টা ছিল আর গল্প করেছিল। অলকার বাবা আর মা, দুজনেই কাছে এসে উৎপলা আর সরযূর সঙ্গে হাসাহাসি করে অনেক গল্প করেছিলেন, কিন্তু ওই পর্যন্ত। মুখ খুলে এমন একটা কথাও বলেননি যে, চা না খেয়ে চলে যেও না। নিজেদেরই মেয়ের দুটি বান্ধবী, যারা বিকেলবেলা বাগবাজার থেকে দমদম গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রইল, তাদের এক পেয়ালা চা খাওয়াবারও কোন আগ্রহ দেখা গেল না, অলকার বাবা আর মার একটিও কথায় কিংবা একটিও আচরণে।

কিন্তু অলকাও তো মুখের কথায় একটা অনুরোধ করতে পারতো। তাও করেনি অলকা। শুধু অলকার মুখটা যেন দুঃসহ একটা লজ্জার বেদনা চাপতে গিয়ে করুণ হয়ে উঠেছিল। অলকার জন্যে একটু দুঃখ বোধ করতে হয়েছিল বটে, তবু মনে মনে অলকার এই অক্ষমতার চেহারাটাকে ক্ষমা করতে পারেনি উৎপলা আর সরযূ। বাপ-মার বাধ্য মেয়ে অলকা, কিন্তু বাপ-মার অভদ্রতার কাছেও এতটা বাধ্য না হলেই ভাল ছিল। না হয় একটু বিরক্তই হতেন অলকার বাবা আর মা, তবু চেষ্টা করা উচিত ছিল অলকার, যেন এক পেয়ালা চা না খেয়ে না চলে যায় ওরই পাঁচ বছরের চেনা জানা দুটি বান্ধবী।

অনন্তবাবুর মনে এমন কোন স্পৃহা নেই যে, তাঁর ভাইয়ের বিয়েতে তিনি পাত্রীর বাপের ঘাড় মুচড়ে একগাদা দানসামগ্রী আর পণ আদায় করবেন। এমন ইচ্ছা থাকলে ক্ষিতীশবাবুর মেয়ের সঙ্গে অবনীশের বিয়ে দেবার চেষ্টা

করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। ক্ষিতীশবাবু শুধু বরপণ হিসাবে নগদ দশহাজার টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন, তা ছাড়া দানসামগ্রীর বিপুল একটা ফর্দও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু অনন্তবাবু কোন উৎসাহ বোধ করেননি। অবনীশ নিজেই ওর জীবনের সঙ্গিনী বেছে নিক, কোন আপত্তি নেই অনন্তবাবুর। তিনি খুশি হয়ে সেই মেয়েরই সঙ্গে অবনীশের বিয়ে দেবেন। এর মধ্যে টাকা আদায়ের কোন প্রশ্ন নেই। অলকার সঙ্গে বিয়ে হলেও যে কি ব্যাপার হবে সেটা অনুমান করতে পারেন অনন্তবাবু। বরযাত্রী হয়ে মেয়ের বাড়িতে যারা যাবে, তাদের হয়তো হোটেলে নিয়ে গিয়ে নিজেদেরই খরচে খাওয়াতে হবে। দেবকীবাবু কাউকে এক পেয়ালা চা দিয়ে অভ্যর্থনা করবেন কিনা সন্দেহ।

তবু, অবনীশের যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন অলকার সঙ্গেই বিয়েটা হয়ে যাক্। কোনও আপত্তি নেই অনন্তবাবুর। কিন্তু কোন উৎফুল্লতাও নেই, খুশিও নেই। দেবকীবাবুর মতো মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা হবে, এটা অনন্তবাবুর পক্ষে নিতান্তই একটা অকাম্য দুর্ঘটনা।

যাই হোক, তিনটি বছর তো পার হতে চললো। এবার অবনীশ বলে দিলেই তো পারে, তাহলে বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেলতে পারেন অনন্তবাবু।

দুই

অলকার মনেও আজ এটা একটা করুণ বিস্ময়ের প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, কি ভাবছে অবনীশ? ভালবেসেও কারও প্রাণ কি এত অলস হয়ে তিনটে বছর শুধু ভেবে ভেবে পার করে দিতে পারে?

একটুও মিথ্যে নয়, নিজের মনের কাছে তো আর মিথ্যে কৈফিয়ত দেওয়া যায় না! ভুলেও যায়নি অলকা, সেদিন সরযূর কাকাকে প্রথম চোখে দেখতেই বুকের ভিতরে নিশ্বাসের বাতাসটা হঠাৎ কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে-কথা তো চেঁচিয়ে পৃথিবীর কোন মানুষের কানের কাছে বলে দেয়নি অলকা। ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে; জীবনে কত মানুষেরই সঙ্গে তো দেখা হয়েছে। কিন্তু একদিনের হঠাৎ দেখার অনুভব কখনও এমন করে সারা শরীরটাকে লজ্জা পাইয়ে দেয়নি, মনের গোপনে এমন একটা অদ্ভুত ইচ্ছাও জাগিয়ে তুলতে পারেনি।

কিন্তু অবনীশের কাছে তো কোন দাবি জানায়নি অলকা। অবনীশকে এমন আহ্বানও করেনি যে, একদিন আমাদের বাড়িতে যাবেন। অবনীশ নিজেই হঠাৎ উপস্থিত হয়েছিল। আর অলকাও আশ্চর্য হয়ে ভেবেছিল, এ কেমন করে সম্ভব? অবনীশ কি অলকার স্বপ্নের ভিতরে লুকানো ইচ্ছাটাকে চোখে দেখে

ফেলেছে ?

আশ্চর্য হয়েও কিন্তু বিশ্বাস করবার সাহস হয়নি। খুবই সন্দেহ হয়েছিল ; খুবই ভয় পেতে হয়েছিল। কেন, কিসের জন্য আর কী দেখে মুগ্ধ হয়ে অলকার মতো মেয়ের কাছে মনের কথা বলতে এসেছে অবনীশ ? এত সুন্দর এত ভাল রোজগারের চাকরী করে, আর সাজে-পোষাকেও এমন একজন শখের মানুষ। অলকার মতো মেয়ের কাছে তার মনেরও বা কি দাবি থাকতে পারে ? খুবই ভয় হয়েছিল, অবনীশ হয়তো অলকাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাইবে। চেনাজানা জগতের কোন এক ভয়ানক অন্তরালে নিয়ে গিয়ে ভয়ানক একটা অনুরোধ করে বসবে। অলকার স্বপ্নটাই আর্তনাদ করে উঠবে ; আর দেখতে পাবে অলকা, একটা নির্মম কৌতুক অলকার কাছ থেকে শুধু দুদিনের তৃপ্তি পেতে চাইছে। মনে মনে একটা অপমানের ছবি কল্পনা করে সেদিন অলকার প্রাণটা সত্যিই শিউরে উঠেছিল।

কিন্তু এই ভুল ধারণার জন্যেও কী লজ্জাই না অলকাকে পেতে হয়েছে। কোনদিনও অলকাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়নি অবনীশ। কেউ দেখতে পায়নি, এই ঘরেরই ভিতরে, সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপ করে বসে অলকাকে কেঁদে ফেলতে হয়েছে। অবনীশ যে-কথা বলেছে, তার চেয়ে সম্মানের কথা জীবনে কোন দিনও শুনতে পায়নি অলকা। বলেছিল অবনীশ—তোমার সঙ্গে যদি আর কারও বিয়ে হয়েও যায়, তবুও আমি তোমার উপর রাগ করতে পারবো না।

সত্যি রাগ করে জবাব দিয়েছিল অলকা।—হঠাৎ এরকম একটা সাংঘাতিক বাজে কথা বলে ফেলতে পারলে কেমন করে ?

—একটুও বাজে কথা নয়। আমার রাগ হবেই না।

—কেন ?

—তোমাকে সত্যি ভালবাসি বলে।

—কোন দুঃখও হবে না বোধহয় ?

—সেটা আর তোমাকে বলে লাভ কি ? বললেও তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না।

—তখন আমাকে ঘেন্না করতেও পারবে না ?

—না।

—তবু নিজে একটা বিয়ে করতে পারবে তো ?

—তোমার তাই মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি পারবো না।

—কিন্তু যা কখনও হবে না, তাই নিয়ে এত কল্পনাই বা করছো কেন?

হেসে ফেলেছে অবনীশ—কল্পনা করতে একটুও ভাল লাগে না।

—তবে এসব কথা তুলছো কেন?

—না, আর তুলবো না।—তা হলে এবার দাদাকে স্পষ্ট করে বলে দিই কেমন?

—কি বলবে?

—বলবো অলকাকে আর অপেক্ষা করিয়ে রাখা ভাল দেখায় না।

অবনীশের এই প্রতিশ্রুতির কথাও তো প্রায় দুবছর আগের কথা। তারপর আরও একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এতদিনের মধ্যেও অবনীশ তার দাদার কাছে কথাটা স্পষ্ট করে বলে দিতে পারেনি। এমন ধৈর্য কি করে সম্ভব হয়?

তাই তো আজ হঠাৎ এক-একবার অলকার ভাবনার এক কোণে ভয়ানক নির্মম একটা কৌতুকের ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে অলকার মন। অবনীশ কি একটা হেঁয়ালি? ওর ভালবাসার ভাষাকেও যে সত্যিই হেঁয়ালি বলে মনে হয়। অলকার সঙ্গে আর কারও বিয়ে হবে, এমন একটা অসম্ভব ঘটনাকে কল্পনা করে কী আনন্দ পায় অবনীশ?

কিন্তু অবনীশকে সন্দেহ করবারও সাধ্যি নেই। সন্দেহ করবার মতো কিছুই যে হয়নি! অবনীশের অফিসের ঠিকানাতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটি চিঠি লিখতে হয়। অবনীশের চিঠি প্রতি সপ্তাহে আসে। অলকার চিঠিগুলি যেমন নিশ্চিন্ত ভালবাসার একটা অপেক্ষার আনন্দ, তেমনি অবনীশের চিঠিগুলিও ভালবাসার অটুট প্রতিশ্রুতি! লিখেছে অবনীশ, আমি ইচ্ছে করে অনায়াসে মরে যেতে পারি, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না, অসম্ভব। আমি তোমাকে কোনদিন অপমান করতে পারবো না।

যেদিন অলকাদের বাড়িতে আসে অবনীশ, সেদিন চলে যাবার আগের একটি মুহূর্তে অলকার মুখের দিকে নিবিড় আগ্রহের একটি দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে একটি কথা খুব মৃদুস্বরে, যেন চিরক্ষণের স্বপ্নে ধরে রাখা একটি অঙ্গীকারের সুরে বলে দিয়ে যেতে ভুলে যায় না অবনীশ—সামান্য একটা অসুবিধে আছে, সেই জন্যেই দেরি হচ্ছে অলকা। তুমি কিছু মনে করো না।

অলকার মন বলে, হোক দেরি, এমন দেরি অনন্তকাল ধরে চললেও ক্ষতি নেই, যদি তুমি এভাবে এসে আর এই কথা বলে অলকার ভালবাসার মনটাকে সুখী করে আর ধন্য করে দিয়ে চলে যাও।

কী অসুবিধে আছে, সেটা অবশ্য জিজ্ঞাসা করে জানবার জন্যে কোনদিন জেদ করেনি অলকা। বিশ্বাসও করেছে, নিশ্চয় কোন অসুবিধে আছে। অবনীশ যে জানে, অলকার কাছে মিথ্যে কথা বলবার দরকারই নেই। অলকা যে কতবার বলেই দিয়েছে, তোমার জীবনের কোন অসুবিধে, কোন ক্ষতি, কোন দুশ্চিন্তা ঘটাতে আমি চাই না। সেজন্যে যদি আমাকে চিরকুমারী হয়ে থাকতে হয়, আমি তাতেও রাজি আছি। আমাকে বিয়ে করো না, তবু তুমি সুখী হও।

তবু জানতে ইচ্ছে করে, সত্যি কি অসুবিধে আছে ? একটা অসুবিধের কথা জানাই আছে, কেউ চায় না অবনীশের সঙ্গে অলকার বিয়ে হোক্। অবনীশ আর অলকার ভালবাসার উপর যেন এই পৃথিবীর কারও কোন আশীর্বাদ নেই, কোন মায়া নেই, সমাদর নেই। সরযূর বাবা, সরযূর মা আর সরযূ, কেউ খুশি নয়। আরও অনেকের মনের খবর কিছু না কিছু পেয়েই গিয়েছে অলকা, তারাও কেউ খুশি নয়। প্রতিবেশী কান্তিবাবু আর ভবতোষবাবু, যাঁরা অলকার বাবার বন্ধু, তাঁরাও খুশি নন। তাঁদের ধারণা, তিন বছর ধরে দেবকীবাবুর মেয়ে একটা ছলনার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক বাধিয়ে বসে আছে।

হাওড়া থেকে অলকার মামা এসেছিলেন। তিনিও যে কথা বলেছেন, সে কথা বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছে অলকা। দেবকীবাবুর কাছে একেবারে গলা খুলে চেঁচিয়ে কথা বলেছেন মামা—মিথ্যে, মিথ্যে, একেবারে বাজে ব্যাপার। অবনীশকে আমি চিনি, বেশ ভাল ছেলে, কিন্তু তিন বছর ধরে শুধু অপেক্ষা করবার অর্থ এই যে, বিয়ে করতে সে রাজি নয়।

দেবকীবাবু খুবই গম্ভীর হয়ে আর বেশ কঠোরস্বরে কথা বলে মামার সন্দেহকে সমর্থন করেন—আমি অনেকদিন আগেই বুঝেছি। কিন্তু আসল দোষ হলো অলকার। মূর্খ মেয়ে নিজেরই বুদ্ধির ভুলে একটা ব্লাফকে বিশ্বাস করে বসে আছে।

অলকার বুক কেঁপে ওঠে। চোখের সামনের সব কিছুই ঝাপ্সা হয়ে যায়। সত্যিই কি বুদ্ধির ভুল ? অবনীশ একটা বঞ্চনা ?

তিন

দেবকীবাবু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, তাঁর মেয়ে ভুল করে জীবনের একটা অপমানের আঘাতের সঙ্গে ভালবাসার কাণ্ড করে বসে আছে। অবনীশের মতো ছেলে কেন যে অলকাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল, এ প্রশ্নের কোন জবাব তিনি অনেক চিন্তা করেও খুঁজে পাননি।

অবনীশের দাদা অনন্তবাবু উকিল মানুষ। কিন্তু তেমন কিছু রোজগেরে উকিল নন। সংসার চালিয়ে যাবার মতো রোজগার আছে, এই মাত্র। বরং আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি! আর বাগবাজারের যে বাড়িতে থাকেন অনন্তবাবু, সেটাও ভাড়া বাড়ি। তা ছাড়া নিজেরই মেয়ের বিয়ে দেওয়া বাকি আছে। সুতরাং, অনন্তবাবুকেও সন্দেহ না করে পারেন না অলকার বাবা, সে ভদ্রলোক কি ভাইয়ের বিয়েতে কিছু টাকা আদায় করবার স্বপ্ন ছেড়ে দিতে পারেন?

অবনীশ একটি কারখানার ক্যাশ বিভাগের হেড। মাইনে মন্দ নয়। সাত বছরের চাকরিতে চারশো টাকা মাইনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অনন্তবাবু ও তাঁর এই ভাই, আর বাড়ির মেয়েরাও যে ষ্টাইলে থাকেন, সেটা দেখে মনে হবে, যেন মস্ত বড় এষ্টেট আছে এঁদের। পয়সাতে বড়মানুষ নয়, কিন্তু বড়মানুষী চাল-চলন। এঁরা ফাঁকা মানুষ, শূন্য মানুষ। উপরে রঙ, ভিতরে ঘুণ।

অনন্তবাবুর সঙ্গে দেবকীবাবুর দূর সম্পর্কের কুটুম্বিতাও আছে। কাজেই অবনীশ দেবকীবাবুর কাছে একেবারে অচেনা-অজানা জগতের কোন মানুষ নয়। কিন্তু অবনীশের চাল-চলন দেখে অবনীশকে অচেনা-অজানা জগতের মানুষ বলে মনে না করে পারবেন কেন দেবকীবাবু? দু'হাতে যথেষ্ট পয়সা খরচ করা, তার মানে অপব্যয়ের ছন্নছাড়া আনন্দে ভরা একটা শখের জীবন। জানেন দেবকীবাবু, ট্যাক্সি ছাড়া এক-পা হাঁটে না অবনীশ। বছরে একবার করে শিলঙ-আলমোড়া বেড়াতে যাবেই অবনীশ। অবনীশ যখন দেবকীবাবুর এই বাড়ির বারান্দাতে বসে অলকার মার সঙ্গে গল্প করে, তখন অবনীশের জামা-কাপড়ের সুগন্ধ সারা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এক বছরের মধ্যে চার রকমের ঘড়ি অবনীশের হাতে দেখতে পেয়েছেন দেবকীবাবু।

দেখতে ভাল লাগেনি; অবনীশকে নিতান্ত লঘু স্বভাবের একটি ছেলে বলে সন্দেহ হয়েছে দেবকীবাবুর। দেবকীবাবু সাবধানী মন বিশ্বাসও করতে পারেনি যে, এ ধরনের ফ্যাশনবিলাসী ছেলের মনের কোন ইচ্ছের মধ্যে কোন বলিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা থাকতে পারে। অলকার মা অবশ্য মাঝে মাঝে বলেন, না অবনীশের মনটা খাঁটি; চালচলনে বিলাসিতা যতই থাকুক না কেন অলকার জন্যেই অপেক্ষা করছে অবনীশ। তা না হলে, এতদিনে ক্ষিতীশবাবুর মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে যেত।

কিন্তু দেবকীবাবুর পক্ষে বিশ্বাস করতে অসুবিধা আছে। তাঁরও মনের সব-চেয়ে বড় অভিযোগের প্রশ্ন এই যে, তবে এই তিন বছরের মধ্যে একদিনও আমার কাছে এসে একথা বলতে পারলো না কেন অবনীশ, অলকাকে সে বিয়ে করতে

চায়, আর বিয়েটা হয়েই যাক্ ?

দেবকীবাবু বেশ একটু অপমানিত বোধও করেছেন। এর জন্য অবনীশের বিরুদ্ধে তাঁর যতখানি অভিযোগ, তার চেয়ে বেশি অভিযোগ নিজের মেয়ের বিরুদ্ধে।

তিন বছর আগে অলকার বিয়ের সব আয়োজন করে ফেলেছিলেন দেবকী-বাবু। সে ছেলেও দেবকীবাবুর এক কুটুম্বের ছেলে। দেখতে শুনতে অবনীশের মতো একটা সুন্দরতা আর চমৎকার ফ্যাশন না হলেও হালিসহরের মঙ্গলবাবুর ছেলে সলিল একজন কৃতী ও গুণী ছেলে। মঙ্গলবাবুর কারবারের একমাসের রোজগার অনন্তবাবু আর অবনীশের এক বছরের রোজগারের সমান। সলিলের শুধু একটু বয়স হয়েছে, চল্লিশ বছর। বিয়ে হয়েছিল সলিলের ; বিয়ের তিনমাস পরেই স্ত্রী মারা গিয়েছে। এছাড়া সলিলের জীবনের আর কোন খুঁত আছে কি ? অলকার মতো মেয়ের পক্ষে সলিলকে কোনদিনই অকাম্য মনে করবার যুক্তি নেই।

হালিসহরের মঙ্গলবাবু তাঁর ছেলের বিয়েতে একটি পয়সাও দাবি করবেন না, করেনও নি। তিনি দেবকীবাবুর মেয়ে অলকার সঙ্গে তাঁর ছেলে সলিলের বিয়ে দিতে খুবই আগ্রহ দেখিয়েছেন ; কারণ অলকাকে তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

কিন্তু অলকা কিছুই বুঝতে রাজি নয়। হালিসহরের মঙ্গলবাবুর মতো সজ্জন মানুষের একটা শুভ সদিচ্ছার আহ্বান অলকাকে একটুও বিচলিত করতে পাবে নি। মঙ্গলবাবু নিজেও একদিন এসে অলকার কাছে হেসে হেসে তাঁর ইচ্ছের কথাটা বলে ফেলেছিলেন—তোমার মতো মেয়ে আমাদের আপন-জন হলে আমরা খুবই খুশি হব অলকা।

দেবকীবাবু জানেন, এই মেয়ে ওর বাবার ইচ্ছারও কোন সম্মান দিতে রাজি নয়। মার কাছে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, ওখানে বিয়ে হতে পারে না।

দেবকীবাবুর এই বাড়িও ভাড়া বাড়ি। জীবনের চল্লিশটি বছর পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি করে পার করেছেন। হ্যাঁ, গায়ের রক্ত জল-করা কিছু টাকাও জমিয়েছেন। চারটে পয়সা খরচ করতে তাঁর বুক টনটন করে, এটাও মিথ্যে নয়। কিন্তু অলকা কি মনে করে, বিনা খরচে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন বলেই হালি-সহরের মঙ্গলবাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে তিনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ?

মঙ্গলবাবুর ছেলে সলিলের এখনও বিয়ে হয়নি। এখনও অলকা যদি রাজি হয়, তবে দশদিনের মধ্যে সলিলের সঙ্গে অলকার বিয়ে হয়ে যেতে পারে। এই সেদিনও মঙ্গলবাবুর চিঠি পেয়েছেন দেবকীবাবু ; কি খবর দেবকীবাবু ? আমরা কি আরও অপেক্ষা করবো ?

দেবকীবাবু জানেন অলকার ভুল একদিন নিজেই ভয় পেয়ে চমকে উঠবে আর ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু ততো দিন কি অপেক্ষায় থাকবেন মঙ্গলবাবু?

বুঝতে আর কোন কি অসুবিধে আছে, অবনীশ কেন আজও নীরব হয়ে রয়েছে? অনন্তবাবু নীরব কেন? ওরা কি মনে করেছে যে, এভাবে অলকাকে ধৈর্যহারা করে দিলে শেষে অলকার বাবা দেবকীবাবু বাধ্য হয়ে থলেভরা বরপণের টাকা আর দানসামগ্রীর বিরাট ফর্দ নিয়ে অনন্তবাবুকে সাধাসাধি করবেন? দেবকীবাবু যে পাগল হয়ে গেলেও হাজার দশ-বারো টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দেবেন না; এই কঠিন সত্যটা অনন্তবাবু আর অবনীশের জানা উচিত ছিল।

অলকার মার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেবকীবাবু তাঁর এই প্রতিজ্ঞার অটলতার কথা আজও একবার বলে দিলেন।—অসম্ভব, অবনীশের মনে কিংবা ওর দাদার মনে যদি এরকমের কোন মতলব থেকে থাকে, তবে ওরা পশ্চিমদিকে সূর্য উঠবে বলে আশা করছে।

অলকার মা বেশ ভয়ে ভয়ে একটা যুক্তির কথা তুলতে চান—কিন্তু যেখানেই মেয়ের বিয়ে দা'ও না কেন, কিছু টাকা খরচ করতেই তো হবে।

—না, পারবো না। এখানে তো আরও পারবো না!

—তার মানে?

মঙ্গলবাবু যদি কিছু বরপণ দাবি করতেন, তবু তাব একটা মানে হতো। হয়-তো আমি রাজিও হতাম। কিন্তু এখানে রাজি হতে পারি না। এরা কপটতা করবে, ভালবাসার নাম করে একটা চক্রান্ত করবে, সে ফাঁদে পা দিতে আমি রাজি নই। তারচেয়ে ভাল, মেয়ের বিয়েই হবে না।

পাশের ঘর থেকে বের হয়ে এঘরে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠেছে অলকা। দেবকীবাবুর গলার ভয়ানক রুষ্ট স্বরের শব্দ শুনতে পেয়েছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে অলকা।

চেঁচিয়ে উঠলেন দেবকীবাবু।—ছিঃ, এর নাম ভালবাসা? তবে জোচ্চুরি আর কাকে বলে? তিন বছর ধরে মেয়েটাকে আশা দিয়ে দিয়ে হয়রান করেছে একটা চালাক ফাঁকি।

অলকার মা—আস্তে কথা বল, অলকা শুনতে পাবে।

দেবকীবাবু—আমি যে কৃপণ, সে-কথা কে না জানে? কিন্তু সেজন্যে কি আমি মেয়ের বাপও নই? অবনীশ যে কাণ্ড করেছে, সেটা আমার পক্ষে যে কত অপমানের কথা, সেটুকু বোঝবার মতো মনুষত্ব অবনীশের নেই!

দরজার আড়াল থেকে দেখতে পেয়েছে অলকা, দেবকীবাবুর চোখ দুটো

ছলছল করছে।

অলকার চোখ ভিজে যায়। সারা শরীরটা ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকে। চেঁচিয়ে বলে দিতে ইচ্ছে করে—তুমি অবনীশের উপর রাগ করো না। ওর কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার। আমাকে যত খুশি ঘেন্না করো, সে বেচারাকে ঘেন্না করো না।

চলে যায় অলকা। আর বাইরের ঘরে ঢুকেই দেখতে পায়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে অবনীশ।

চার

অলকার মনে আজ একটা প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত হয়েছে। চরম মীমাংসা হয়ে যাওয়াই ভাল। ভালবাসার নামে এমন ভয়ানক একটা গ্লানির উৎপাত সৃষ্টি করে রাখবার আর কোন মানে হয় না।

পৃথিবীর মুখে যত শক্ত কথা আছে, সবই মুখর হয়ে অলকাকে যত খুশি গাল মন্দ করুক, চুপ করে সহ্য করতে পারবে অলকা। কিন্তু অবনীশকে যেন এমন অভিশাপ স্পর্শ করতে না পারে। অবনীশ একটা ফাঁকি, এই ধিক্কার যেন আর কানে শুনতে না হয়।

অলকা বলে—যদি রাগ না কর, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি।

অবনীশ হাসে—তোমার ওপর রাগ করতে পেরেছি কি কোনদিন ?

অলকা—কবে বিয়ে হবে ?

অবনীশের দুই চোখ সেই মুহূর্তে যেন সাদা হয়ে যায়।—আমি নিজেই আজ একথা তুলতাম। সেজন্যই আজ এসেছি।

অলকা—বল।

অবনীশ—বিয়ে হবে না।

—কেন ?

—অসুবিধে আছে।

—কিসের অসুবিধে ?

—তোমার না জানাই ভাল।

—না, জানতে হবে।

—আমি না বললেও দু'চার দিনের মধ্যেই জানতে পারবে।

—তার মানে ?

—তার মানে, আমি গ্রেপ্তার হব। আর জেলও হয়ে যাবে।

—কে বললে ?

—আমি বলছি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমি অফিসের প্রায় দশ হাজার টাকা নিজের দরকারে খরচ করে বসেছি।

দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে অলকা।—তুমি একাজ করতে পারলে ?

—আমার হাতেই তো সব হিসেব, তাই কেউ জানতে পারেনি। প্রত্যেক বছর অনেক চেষ্টায় ধার-কর্জ করে দশ হাজার টাকার ঘাটতি পুরিয়ে হিসেব ঠিক করেছি। কিন্তু এবারে আর পারলাম না। আর পারবোও না। আর চেষ্টা করবার সময়ও নেই। কালই আমার সব হিসেবের খাতা অডিট হবে। অডিটার এসে সবার আগে ব্যাঙ্কের বই দেখবেন।

—তারপর কি হবে ?

—আগেই তো বলেছি। গ্রেপ্তার হব আর জেল হবে।

—এই জন্যেই কি এতদিন······।

—হ্যাঁ, বিশ্বাস কর অলকা। এই জন্যেই এতদিন বিয়ের কথা বলতে পারিনি। বিশ্বাস ছিল, দেশের জমি বিক্রী করে হাজার পনেরো টাকা একসঙ্গে পেয়ে যাব আর হিসেবও ঠিক করে ফেলতে পারবো। কিন্তু দেশের জ্ঞাতিরা আপত্তি করে আর মামলা বাধিয়ে জমি বেচতে দিলো না। কাজেই আর কোন উপায় নেই।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় অবনীশ। তারপরেই চোখ ঢাকতে চেষ্টা করে। চোখ দুটোও যেন ভিজে রক্তমাখা হয়ে গিয়েছে।—তোমার কাছে ক্ষমা চাই অলকা। তোমার বাবা আর মা যেন ক্ষমা করেন।

অলকা—কেমন করে ক্ষমা করবো বল ?

অবনীশ—তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি।

অলকা—এখন আমি কি করবো ?

অবনীশ—আমার অনুরোধ শুনবে ?

অলকা—বল।

অবনীশ—তুমি তোমার বাবার কথা মেনে নাও।

অলকা—তার মানে, মঙ্গলবাবুর ছেলেকে বিয়ে করবো ?

অবনীশ—হ্যাঁ।

অলকা—কেন ? যদি আরও অপেক্ষা করি ?

অবনীশ—না। আমাকে আর বিশ্বাস করো না।

অলকা—ঠিক কথা. তোমার সবই অবিশ্বাস্য। তোমার ভালবাসাও একটি মিথ্যে।

অবনীশ—আমার আর কিছু বলবার নেই। বলবার মুখও নেই।

অলকা—আমারও আর কিছু বলবার নেই।

চলে গেল অবনীশ।

কিন্তু দেখতে পেলেন দেবকীবাবু, চালাক-ফাঁকি অবনীশ কেমন যেন ভয় পেয়ে আর একবারে উপোষী ভিখারীর মতো একটা শুকনো করুণ মুখ নিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যাচ্ছে। ট্যাক্সি নেই, অবনীশের পায়ে জরিদার নাগরাও নেই। পায়ে ধুলো-মাখা আর ছেঁড়া-ছেঁড়া চেহারার চটি, গায়ে একটা আধময়লা কামিজ; অবনীশ যেন একটা কাঙালপণার আতঙ্কিত মূর্তি হয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

বাইরের ঘরে এসে ঢুকতেই দেখতে পেলেন দেবকীবাবু, টেবিলের উপর মাথা ঠেকিয়ে দিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে অলকা।

—অলকা! ডাক দিলেন দেবকীবাবু। তাঁর দু'চোখে নিদারুণ সন্দেহের ছায়া।

অলকা কথা বলে না। চেঁচিয়ে ওঠেন দেবকীবাবু—অবনীশ কেন এসেছিল? কী বলে গেল? ওভাবে চোরের মতো ছুটে পালিয়ে গেল কেন অবনীশ?

অলকা—বিয়ে হবে না।

দেবকীবাবু—এটা তো জানা কথা। কিন্তু কেন হবে না?

অলকা—ওর জেল হবে।

—কে বললে?

—নিজেই বললে।

—কি করেছে, যে জন্যে জেল হবে?

—অফিসের ক্যাশ খরচ করে ফেলেছে! কাল অডিট হবে।

—বেশ তো, আজই টাকা নিয়ে গিয়ে হিসেব ঠিক করে ফেলুক।

—টাকা নেই।

—ধার করুক।

—চেষ্টা করেছিল, ধার পায়নি।

—তা হলে জেলে যাক!

—হ্যাঁ।

—সে কথা তোমাকে জানাবার কি দরকার ছিল?

—জানি না।

—আর কি বলেছে?

উত্তর দেয় না অলকা। রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন দেবকীবাবু—তোমার লজ্জা করবার কোন মানে হয় না।

অলকা—বলেছে—

—কি ?

—ক্ষমা চেয়েছে।

—কার কাছে ?

—আমার কাছে—তোমাদের সবারই কাছে।

—আর কি বলেছে ?

উত্তর দেয় না অলকা, দেবকীবাবুর দুই চোখের তারা জ্বলতে শুরু করেছে। দেবকীবাবুর গলার স্বরও এইবার তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে।—কি বলেছে বল ?

অলকা—অনুরোধ করেছে।

—কিসের অনুরোধ ?

—তোমার ইচ্ছে মেনে নিতে।

—তার মানে ?

—বিয়ে করতে।

—কার সঙ্গে বিয়ে ?

—হালিসহরের···।

—তুমি কি বলতে চাও, তোমারও তাই ইচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

চমকে ওঠেন দেবকীবাবু। অলকার কাছে এগিয়ে এসে, আর অলকারই মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন।—মন থেকে একথা বলছো ?

—হ্যাঁ।

—মিথ্যে কথা। তুমি আমাকে ভয় করে আর নিজেকে ঘেন্না করে একথা বলছো। কিন্তু সবচেয়ে ভুল করবে যদি ···।

দেবকীবাবুর চোখ দুটোর চেহারাও হঠাৎ অদ্ভুত হয়ে যায়।—খুব ভুল হবে যদি এমন ধারণা কর যে অবনীশ একটা ফাঁকি।

চমকে উঠে দেবকীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অলকা।

দেবকীবাবু বলেন—অবনীশ বেচারার মনে কোন ফাঁকি নেই। সাবধান, যাই কর, অবনীশকে ভুল বুঝবে না। অবনীশকে ঘেন্না করবে না।

ভিতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দেন দেবকীবাবু—শুনছো ?

অলকার মা ব্যস্তভাবে ছুটে আসতেই দেবকীবাবু হেসে ফেলেন—আমার চেক বইটা দাও।

—কেন?

—এখনই একবার বের হতে হবে।

—কোথায় যাবে?

—পাগলা অবনীশকে খুঁজে বের করতে হবে।

—কেন?

—হাতে হাতে বরপণ ধরিয়ে দিয়ে আসি। তা না হলে 'তোমার মেয়ে অলকা যে ভাবতেই লজ্জা করবে, ওর বাবাটা কি সংঘাতিক কিপটে।

—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তবে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও। এখন তাড়াতাড়ি চেক বইটা এনে দাও।

অ মা নি শা

ডাক্তার বিভূতিবাবু বলেছেন, না, কোনমতেই না. রাত ন'টার পর আর এক মিনিটও জেগে বসে থাকা উচিত হবে না। চুপচাপ, একেবারে শান্ত হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। ঘুম যত বেশি হবে, শরীরের তত বেশি উপকার হবে।

এবাড়ির রোগিণী মেয়ে দেবিকাও জানে, বিভূতি ডাক্তারের নির্দেশ তুচ্ছ করবার মতো শক্তি তার এই রক্তহীন শরীরের হাড়মাংসে নেই। একদিন সত্যিই রাত একটা পর্যন্ত বই পড়েছিল দেবিকা, কিন্তু পরের দিন সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে তিনবার জ্ঞান হারাতে হয়েছিল। একবার শ্বাসকষ্ট হয়ে, একবার বমি করে, আর একবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল।

দেবিকার শরীরের এই অবস্থাটা এবাড়ির প্রাণের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ। শুধু বিভূতি ডাক্তার নয়, কলকাতার বড় বড় ডাক্তারও সত্য কথাটা চাপা না দিয়ে মোহিতবাবুকে বলে দিয়েছেন, এখন শুধু নিয়ম আর সাবধানতাই আপনার মেয়ের প্রাণ। একটু এদিক ওদিক হলেই আপনার মেয়ের জীবন বিপন্ন হবে।

একথা দেবিকারও অজানা নয়। পঁচিশ বছর বয়সের শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে অনুমানেও অনেক কিছুই বুঝে নেওয়া সম্ভব। বুঝে নিতে দেরি হয়নি দেবিকার,

বাবা আর মা হেসে-হেসে যা-ই বোঝাতে চেষ্টা করুক না কেন, এই সত্যটি বুঝতে একটুকুও অসুবিধে নেই যে, আর দেরি নেই। যেমন দেবিকার সাধের সেতারের তারে মরচে ধরেছে, তেমনই দেবিকার এই শরীরের পাঁজরের হাড়েও মরচে ধরেছে। যে-কোন মুহূর্তে ঠুং করে একটি ব্যথার নিঃশ্বাস ছেড়েই দেবিকার রুগ্ন প্রাণের তার ছিঁড়ে যাবে।

দু'বছর আগেও দেবিকার মুখের দিকে তাকালে কোন মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সাধ্য ছিল না যে, এই মেয়ের এমন সুন্দর স্বাস্থ্য একটি বছরের মধ্যে একটা করুণ রুগ্নতার চেহারা হয়ে উঠবে। সেই টানা-টানা চোখ দুটির তারার কালো নিবিড়তা ফিকে হয়ে গিয়েছে। গলার শিরাগুলি যেন ছেঁড়া জালের সুতোর মতো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। হাতের কব্জির হাড় কাঠের গাঁটের মতো উঁচু, তাই সোনার সরু বালাটা গড়িয়ে পড়ে না গিয়ে কোনমতে ঠেকে আছে।

মেঘলা দিনে আকাশের দিকে তাকাতে ভয় পেত এই মেয়ে। যখন সাত বছর বয়স ছিল, তখন থেকেই আকাশের বিদ্যুৎকে বড় ভয় করতো দেবিকা। বিদ্যুৎ চমকালেই মেয়েব বুক চমকে উঠতো, সারা মুখে রক্তের ঝলকের আভা রাঙা হয়ে ফুটে উঠতো। আজও, এখনও বিদ্যুতের ঝিলিক দেখলে ভয় পেয়ে চমকে ওঠে দেবিকা। কিন্তু দেবিকার মুখ আর একঝলক রক্তের আভার ছোঁয়া লেগে রাঙা হয়ে ওঠে না। ওই শরীরে যেটুকু রক্ত আজও আছে, সে রক্তের পক্ষে ঝলক দিয়ে উথলে ওঠবার কিংবা মুখ রাঙা করে দেবার শক্তি নেই।

কিসেব অসুখ? এই প্রশ্নটাব কোন সহজ উত্তর থাকলে দেবিকার বাবা মোহিতবাবু একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, আব দেবিকার মা'ও বোধহয় তাঁর আড়ালের কান্নাকাটি একটু কম করে দিতে পারতেন। নানা ডাক্তারের অভিমতে অসুখটা এখন একটা দুজ্ঞেয় রহস্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ কিসের অসুখ নয়? দেবিকার এই পঁচিশ বছর বয়সেব শরীবেব সবই যেন ভয়ানক এক অভিশাপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। হার্ট খারাপ, লিভার খারাপ। ডান পাঁজরের একপাশে সব সময় একটা ব্যথা। ক্ষুধা হয় না, সামান্য তাপের জ্বর সব সময় গায়ে লেগে আছে। ঘুম কম। যখন তখন হাঁপ ধরে পিঠে ফিক ব্যথা দেখা দেয়। তার ওপর রক্তাল্পতা; হাত-পা প্রায়ই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এইতো সেই মেয়ে, মোহিতবাবুর মেয়ে সেই দেবিকা, যে-মেয়ে কোনদিন রঙীন নখ-পালিশ ছোঁয়নি; তবু কলেজের বান্ধবীরা সন্দেহ করতো, দেবিকা রোজই হাতের দশ আঙুলের নখে রঙীন পালিশ লাগায়।

আজ বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসতে হলে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

কেউ একজন সামনে না থাকলে এতটা নড়াচড়া করতে সাহস করে না দেবিকা। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকাও সম্ভব নয়, ডাক্তারের নিষেধ আছে। তাই চুপ করে বসে থাকতে হয়, যতক্ষণ না মা এসে ঘরে ঢোকেন। তখন উঠে দাঁড়ায় দেবিকা। —আমি এখন বাইরের বারান্দায় একটু বসবো, মা। আমার হাতটা ধর।

এই বারান্দায় বসলে আজও দেখতে পাওয়া যাবে, সামনে ব্যাডমিণ্টনের লন। সেই লন এখন জংলী আগাছায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মোহিতবাবুও আজ কাল আর মালীটাকে বলেন না যে ব্যাডমিণ্টন লনটাকে একটু পরিষ্কার করে রাখুক। হাঁা, কিছুদিন আগে একবার বলেছিলেন কিন্তু বলতে গিয়ে মোহিত-বাবুর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। গলায় স্বর বন্ধ হয়ে এসেছিল। আর কী হবে ওই ছাই ব্যাডমিণ্টনের লন পরিষ্কার করে? যে মেয়ে দু বছর আগেও ছুটোছুটি কবে হেসে আর চেঁচিয়ে ওই লনে রায়সাহেবের বউ নমিতার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলেছে, সে মেয়ে আজ বারান্দার সিঁড়িতে একটানা দু মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মোহিতবাবুর বুকের ভিতরে একটা করুণ নিঃশ্বাস যেন কথা বলে ছটফট করে—আর কি কোনদিনও মেয়েটাকে ব্যাডমিণ্টন খেলতে দেখতে পাওয়া যাবে?

দীপ নিভছে। মোহিতবাবু জানেন, দেবিকার মা জয়াও জানেন, এই অসুখটা একটা ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর অসুখ। একটা নামহীন অভিশাপ। কোন ঠিক নেই, যে-কোন মুহূর্তে একটি ভয়ানক ফুৎকার হেনে দীপ নিভিয়ে দেবে। তবু আশা ছেড়ে দিতে প্রাণ চায় না। দেবিকা আবার সুস্থ হবে ও বেঁচে থাকবে, এটা আশা করা একটা অসম্ভবকে বিশ্বাস করা মাত্র। কিন্তু অনেক সময় অসম্ভবকে তো সম্ভব হতে দেখা গিয়েছে। চারুবাবুর মা, সত্তর বছর বয়সের বুড়ো মানুষটি অসুখে ভুগে ভুগে হাড়সার হয়ে গিয়েছিলেন, এক মাস ধরে যাঁর বুকটা শুধু ধুকধুক করতো, জীবনের আর কোন লক্ষণ ছিল না, সেই মানুষও তো সেরে উঠলো। চারুবাবুর মায়ের হিক্কা দেখে এই বিভূতি ডাক্তারই একেবারে পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন—আর বড়জোর এক ঘণ্টা। কিন্তু তারপর, প্রায় সাত মাস পরে এই পাঁচ দিন হলো চারুবাবুর মা কাশী বেড়াতে গিয়েছেন।

তাই আশা ছেড়ে দিতে পারেননি মোহিতবাবু আর জয়া, যদিও আশা করবার মতো কোন কারণ খুঁজে পাননি, কোন লক্ষণও দেখতে পাননি। আল-মারির একটা তাক ভরে এক্স-রে প্লেটগুলি ছড়িয়ে পড়ে আছে। প্রেসক্রিপসনের ফাইলগুলি আর-একটা তাক ভরে রেখেছে। সেই সঙ্গে এই বাড়ির মন আর প্রাণের উপরেও একটা করুণ আতঙ্কের ভার চেপে রয়েছে।

ঠিক কথা ; শুধু নিয়ম আর সাবধানতা এখন দেবিকার প্রাণ। ওষুধ খেতে হয়, কিন্তু দেবিকার মা জয়া কতবার নিজের চোখে দেখেছেন, ওষুধ খেতে গিয়ে দেবিকার সাদা ও শুকনো ঠোঁটে একটা শীর্ণ হাসির রেখা শিউরে উঠেছে। দেবিকা নিজেও জানে দীপ নিভছে। পঁচিশ বছর বয়সের মেয়ের মুখের এই হাসি যেন এতদিনের এই জীবনটারই উপর একটা ঠাট্টার হাসি। একটা অভিমানও বটে। অসুখের প্রথম বছরটা দেবিকার চোখে মুখে যে ভয় ঘনিয়ে রেখেছিল, সেই ভয়ের কোন চিহ্ন আজ আর নেই। সেই ভয় আজ একটা ঠাট্টার হাসি হয়ে উঠেছে। দেবিকা জানে, সেই অবধারিত লগ্নটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বিভূতি ডাক্তারের ওষুধ, আর নিয়ম ও সাবধানতা বলতে গেলে একটা মিথ্যে চেষ্টার ব্রত মাত্র।

দেবিকার স্বামী সুমন্ত চৌধুরীও জানে, দীপ নিভছে। সুমন্তকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিভূতি ডাক্তার যে-সব কথা বলেছেন, তার মধ্যে মিথ্যে আশার কোন ছলভাষণ ছিল না। বিভূতি ডাক্তার খুবই স্পষ্টবাদী মানুষ, যদিও খুব নরম মনের মানুষ। দেবিকার বাঁচবার আশা নেই, কথাটা সুমন্তকে বলতে গিয়ে বিভূতি ডাক্তারের চোখ দুটোও ছলছল করে উঠেছিল।

আজ নয়, দেবিকার সঙ্গে সুমন্ত চৌধুরীর বিয়ে হবার প্রায় এক বছর আগেই সত্য কথাটা খোলাখুলি ভাষায় সুমন্তকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বিভূতি ডাক্তার। সুমন্ত বিভূতি ডাক্তারের জেঠতুতো দাদার ছেলে; সুতরাং সুমন্ত ছেলেটির জীবনের জন্য বিভূতি কাকার মনে একটা মায়ার ভাবও ছিল। বিভূতি ডাক্তার বরং চেষ্টাই করেছিলেন, মোহিতবাবুর মেয়ে দেবিকার সঙ্গে সুমন্তর যেন বিয়ে না হয়। তাঁর মতে, এমন বিয়ের কোন মানে হয় না। সুমন্তর পক্ষে দেবিকাকে বিয়ে করার অর্থ সুমন্তর জীবনে মিছিমিছি একটা শোকের আঘাত আহ্বান করা।

যেমন বিভূতি ডাক্তারের আপত্তি ছিল, তেমনই দেবিকার বাবা আর মারও আপত্তি ছিল। তাঁরাও বুঝেছিলেন, এমন বিয়ের কোন মানে হয় না। কিন্তু দুজনেই শেষ পর্যন্ত মেয়ের ইচ্ছা আর সুমন্তরও ইচ্ছার কাছে হার মেনে নিলেন।

ত্রিশ বছর বয়স সুমন্ত চৌধুরীও কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি যে একদিন গিরিডিতে বেড়াতে এসে একটা অদ্ভুত ঘটনার মায়ায় পড়তে হবে, আর মোহিত-বাবুর মেয়েকে ভালবেসে ফেলতে হবে। মোহিতবাবুর সঙ্গেও সুমন্ত চৌধুরীর একটা কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে। মোহিতবাবুর স্ত্রী জয়া হলেন সুমন্তর লক্ষ্মী মামীর দিদি। লক্ষ্মীমামীকে গিরিডিতে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল সুমন্ত। দুটো দিন গিরিডির বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। তারপর আবার নিজের কাজের জায়গায় ফিরে আসতে হয়েছিল।

জায়গাটা হলো সিজুয়া কলিয়ারী, গিরিডি যেতে বেশি সময় লাগে না। সিজুয়া কলিয়ারীর ম্যানেজার সুমন্ত চৌধুরী কিন্তু সিজুয়াতে ফিরে এসেও দুদিনের গিরিডির জীবনের স্মৃতিটাকে ভুলে যেতে পারেনি। সব সময় মনে পড়েছে, লক্ষ্মী মামীর দিদির মেয়ে দেবিকা এখন সেই রঙীন আলোয়ানটি গায়ে জড়িয়ে, বারান্দার চেয়ারে বসে সামনের লনের দিকে তাকিয়ে আছে। পাখি ডাকছে, লনের জংলী আগাছার উপর ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে, চারদিকে সকালবেলার রোদ ঝলমল করছে ; আর দেবিকার চোখের কালো তারা দুটো যেন করুণ বিষাদে সাদা হয়ে গিয়ে একটি আসন্ন অন্তিমের পায়ের শব্দ শুনছে।

দেবিকাকে দেখলে একটা সাদা মোমের পুতুল বলে মনে হয়। কিন্তু কী সুন্দর মুখটা। সেই রক্তহীন সাদা মুখেও যেন অদ্ভুত এক মায়ার প্রলেপ মাখানো আছে। প্রথম আলাপের পরেই একটি কথা বলেছিল দেবিকা, যদি সময় আর সুযোগ পান আর যদি ইচ্ছে থাকে, তবে মাঝে মাঝে আসবেন।

এই সামান্য অনুরোধের ভাষাটা সত্যিই ক্ষণিকের রক্তচ্ছটা হয়ে দেবিকার মুখ রাঙা করে দিয়েছিল। সেদিন বিভূতি ডাক্তারও দেবিকাকে দেখতে এসে আশ্চর্য হয়েছিলেন। কী ব্যাপার, দেবিকার চেহারা এই একদিনের মধ্যে এত ভাল হয়ে গেল কি করে? মুখটি তো খুবই লালচে দেখাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। রক্তাল্পতায় সাদাটে হয়ে গিয়েছে যে মেয়ের মুখ, সেই মেয়ের মুখে যেন রক্তাভ স্বাস্থ্যের সঞ্চার দেখতে পেয়েছিলেন বিভূতি ডাক্তার, তাই আশ্চর্য হয়েছিলেন।

সিজুয়া কলিয়ারী থেকে গিরিডি পৌঁছতে তিন ঘণ্টাও সময় লাগে না। তাই, প্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার গিরিডি এসেছে সুমন্ত।

মোহিতবাবু আর জয়ারও বুঝতে দেরি হয়নি, কেন আসে সুমন্ত। কিন্তু খুশি না হয়ে বরং বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন। ঘটনাকে তাঁদের মেয়ের জীবনে নিয়তির একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা বলেও মনে করেছিলেন। শুধু নিজেদের মেয়ের জন্যে নয়, সুমন্তর কথাটাও তাঁরা ভেবেছিলেন। ছেলেটা কেন এই ভুল করছে? দেবিকার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক নিবিড় করে তুলে কী লাভ হবে সুমন্তর? দেবিকাকে তো বিয়ে করতে পারবে না সুমন্ত। দেবিকাও সুমন্তকে বিয়ে করতে চাইবে না।

কিন্তু মোহিতবাবু আর জয়া দুজনেই একদিন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলেন, সুমন্ত সত্যিই দেবিকাকে বিয়ে করতে চায়। কথাটা বলেছিলেন, বিভূতি ডাক্তার।

হ্যাঁ, সব জেনেশুনেই দেবিকাকে বিয়ে করতে চাইছে সুমন্ত। দেবিকার প্রাণটা যে একটা নিবু-নিবু দীপের প্রাণ, জেনেও সুমন্তর কোন আপত্তি নেই।

মেয়েকেও একেবারে স্পষ্ট করে প্রশ্ন করেছিলেন মোহিতবাবু, তোমারও কি এই ইচ্ছে? হ্যাঁ, বলে দিতে একটুও দেরি করেনি দেবিকা।

—কিন্তু ভেবে দেখ। এ বিয়ের কোন মানে হয় না।

দেবিকা—সব ভেবে দেখেছি বলেই বলছি, তোমরা আপত্তি করো না।

সবই ভেবেছিল সুমন্ত আর দেবিকা, দুজনেই। সত্যি কথা, খুব বেশি করে ভাবলে বুঝতে অসুবিধে থাকে না যে, এ বিয়ের সত্যিই সে-রকম কোন মানে হয় না, যে-রকম মানে পৃথিবীর অন্য দুটি নরনারীর বিয়েতে থাকে। সুমন্তের জীবনে দেবিকা শুধু নামেই স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু জীবনের দরকারে হতে পারে না। সে সামর্থ্য ও শক্তি দেবিকার এই রুগ্ন জীর্ণ ও ভঙ্গুর শরীরে নেই। কিন্তু সেজন্য একটুও ব্যথিত নয় সুমন্ত। সুমন্তর ভালবাসায় সেই দুঃসাহস আছে, দেবিকাব শুধু হাত ধরেই ধন্য হয়ে আর সুখী হয়ে থাকতে পারবে সুমন্ত।

সুমন্তকেও একটা কথা বলে দিতে দেবিকার এই রোগার্ত বুকের নিশ্বাসেও একটুও অসুবিধে ঠেকেনি।—আমি তো নিভে যেতেই চলেছি, দিনও ফুরিয়ে আসছে। আমি তোমাকে শেষে একটা দুঃখ দিয়ে চলে যাব। কিন্তু তুমি সে দুঃখ ভুলে যেও।

সুমন্ত—তার মানে?

দেবিকা—তুমি আবার বিয়ে করো।

সুমন্ত হাসে—বাজে কথা।

বাজে কথা বটে। কিন্তু সুমন্ত আর দেবিকা দুজনেরই মনের মধ্যে কোন কপটতা নেই। অস্বীকার করবার উপায় নেই, সুমন্তর জীবনটা হঠাৎ একদিন একলা হয়ে যাবে; গিরিডির এই বাড়িতে এসে এই বারান্দাব এই চেয়ারে দেবিকাকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না। বিভূতি ডাক্তার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, বড়জোর আর এক বছর। সুমন্তর ভালবাসার প্রাণটাও যেন নীরবে চিৎকার করে বলে উঠেছে, এক মাস হলেই বা কি?

দু'বছর আগে ঠিক যখন এম-এ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিল দেবিকা, তখনই এই অদ্ভুত অসুখের অভিশাপ দেখা দিয়েছিল। আর পড়তে পারেনি, পরীক্ষাও দিতে পারেনি দেবিকা। রায়সাহেবের বউ নমিতা আরও কতবার এসেছে, কিন্তু আর ব্যাডমিণ্টন খেলবার সৌভাগ্য হয়নি। শুধু ওষুধ নিয়ম আর সাবধনতা নিয়ে রুগ্ন শরীরটাকে কোনমতে ধরে রেখে এই পৃথিবীর আলো-ছায়ার কাছ থেকে চরম বিদায় নেবার জন্যই তৈরী হয়েছিল যে মেয়ে, সেই মেয়েরই সঙ্গে সুমন্তর বিয়ে হয়ে গেল।

পুরো এক বছরও পার হয়নি, যে বিয়ের কোন মানে হয় না, সেই বিয়ে গিরিডির এই বাড়িতেই হয়ে গিয়েছে। বিয়েতে সুমন্তর দুই দাদা এসেছিলেন। তাঁরা কেউই প্রসন্ন হননি। শুধু একটি ঘণ্টা চুপ করে বসে থেকে আর গম্ভীর হয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখেই তাঁর চলে গিয়েছিলেন। বিভূতি কাকাও খুশি হননি। মোহিতবাবু আর জয়া তাঁদের মেয়ের মুখের হাসি দেখে হেসেছিলেন বটে, কিন্তু আড়ালে গিয়ে চোখও মুছে ছিলেন।

গিরিডির এবাড়ির জীবনের সমস্যা বলতে সত্যিই কিছু ছিল না। ছিল শুধু একটা বিষণ্ণ করুণ উদ্বেগ। দেবিকার এই রুগ্ন প্রাণের সব সাড়া যে-কোন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে, সুস্থ হয়ে উঠবার কোন লক্ষণও নেই। একটা শোকের আঘাত মাথা পেতে স্বীকার করবার জন্য মনে মনে তৈরী হয়েছিলেন মোহিতবাবু আর জয়া। কিন্তু বিয়ের পর সত্যিই একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে ; তাই ভয় পেয়ে আরও বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছেন দেবিকার বাবা আর মা। বড় কঠিন, বড়ই নিষ্ঠুর, আবার খুব করুণও বটে, এই সমস্যা।

সুমন্ত মাসের যে-কটা দিন তার সিজুয়া কোলিয়ারীর কাজের জীবনে ব্যস্ত থাকে, সে-কটা দিন গিরিডির এই বাড়ির ভয়টাও যেন আড়ালে চাপা পড়ে থাকে। বরং, মাঝে মাঝে বেশ খুশি হয়ে হাসতে পারেন মোহিতবাবু, যখন দেখতে পান যে, সুমন্তকে চিঠি লিখছে দেবিকা, আর দেবিকার সারা মুখ ভরে একটা রঙীন আলোর হাসি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু বিভূতি ডাক্তার খুবই স্পষ্টবক্তা ; তাঁর ভাষার মধ্যেও কোন রাখা-ঢাকা চাপাচাপির ব্যাপার নেই। বিভূতি ডাক্তার আবার বলেছেন—বিয়ে হলো, এক রকম ভালই হলো। কিন্তু আরও একটু সাবধান থাকতে হবে মোহিতবাবু।

—আপনি যা নিয়ম করে দিয়েছেন, তা তো সবই…।

—সে-সব ছাড়াও একটা সাবধানতা দরকার।

—বলুন কি করতে হবে ?

—কথাটা হলো, দেবিকার যদি ছেলেপুলে হয়, তবে কিন্তু সর্বনাশের ব্যাপার হবে। তা হলে আর দুটো মাস বেঁচে থাকবারও কোন আশা থাকবে না।

কিন্তু এই ভয়ানক করুণ সত্যটা কি সুমন্তর অজানা আছে ? বিভূতি ডাক্তার বলেন, তিনি সুমন্তকে একেবারে খোলা ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

তবে দেবিকা কি জানে না ? বিভূতি ডাক্তার বলেছেন, নিজেই দেবিকাকে কথাটা বলে দিয়েছে সুমন্ত। কাজেই এখন ব্যাপারটা আর কারও জানা-অজানা সমস্যার কথা নয়। এখন এ বাড়ির প্রাণের ভয় শুধু এই যে, যেন ভুল না হয়।

শিক্ষিত ছেলে স্থমন্ত এমন নিদারুণ ভুল করবেই বা কেন? শিক্ষিতা মেয়ে দেবিকার পক্ষেও এমন সাংঘাতিক অসতর্কতা সম্ভব নয়। ওরা দুজনের কেউই অবুঝ নয়। মোহিতবাবু আর জয়া মাঝে মাঝে বিশ্বাস করেন, না ওরা ভুল করবে না।

স্থমন্তর লক্ষ্মীমামী একদিন এসেছিলেন, তিনি নিজেও অনেক করে স্থমন্তর চিঠি খুঁজে বের করে নিয়ে পড়েছেন। লক্ষ্মীমামী তাঁর জয়াদিকেও চিঠির কথাগুলি শুনিয়ে দিয়েছেন। শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছেন জয়া। না, এত ভয় করবার কিছু নেই। স্থমন্ত তো দেবিকার কাছে লেখা চিঠিতে একেবারে স্পষ্ট করে লিখেছে, বিভূতিকাকা মিথ্যে ভয় করছেন। আমাকে আর তোমাকে বোধহয় দুটো পাগল বলে সন্দেহ করেছেন।

স্থমন্ত নিজেই নিয়ম করে নিয়েছে, প্রতি মাসে অন্তত দুটি তিনটি দিনের জন্য গিরিডিতে এসে থাকে আর চলে যায় স্থমন্ত। এই দুটি-তিনটি দিন গিরিডির এই বাড়ির বিষণ্ণ প্রাণেও একটা খুশির সাড়া জেগে ওঠে।

আবার মাঝে মাঝে সিজুয়া কোলিয়ারীর অফিসে গিরিডির টেলিফোনের একটা উদ্বেগের আহ্বানও ক্রিং-ক্রিং করে বেজে ওঠে। দেবিকার শরীর ভাল নয়, লক্ষণ খারাপ। যদি সম্ভব হয়, তবে তাড়াতাড়ি চলে এস।

এসেই দেখতে পেয়েছ স্থমন্ত, জ্ঞান হারিয়ে আর অসাড় হয়ে শুয়ে আছে দেবিকা। খোঁপাটা ভেঙ্গে গিয়ে এলোমেলো হয়ে আছে। শুকনো শীর্ণ হাত দুটো দুপাশে এলিয়ে পড়েছে। বিভূতিডাক্তার ঘরের ভিতরে চেয়ারে বসে আছেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দেবিকার বিছানার মাথার কাছে বসেছে স্থমন্ত। একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না, দেবিকার মাথায় আর কপালে আস্তে আস্তে হাত বোলায়, মাঝে মাঝে দেবিকার একটা হাত ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

স্থমন্ত যেন নিবু-নিবু দীপের সবচেয়ে বড় কামনার তৃপ্তিটি পূর্ণ করে দিয়ে বসে থাকে। এই তো চেয়েছিল দেবিকা। এর চেয়ে বেশি কিছু দাবি করা তো দেবিকার রুগ্ন প্রাণের আর দেহের সামর্থ্যে সম্ভব নয়। একদিকে মৃত্যুর হাত, আর, একদিকে স্থমন্তের হাত; দেবিকার প্রাণ যে এইরকম একটি অভ্যর্থনা নিয়ে চলে যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছে।

কিন্তু অন্যদিন, যেদিন দেবিকার অসুখের এরকম কোন বাড়াবাড়ি থাকে না, সেদিন স্থমন্তকে কাছে দেখতে পেলে দেবিকা যেন ভুলেই যায় যে, দীপ নিভছে।

স্থমন্ত আসে, সেদিন সময় মতো ওষুধ খেতে ভুলে যায় দেবিকা। বেশি কথা বলতে নিষেধ আছে কিন্তু ভিতরের ঘরে বসে একটানা একটি ঘণ্টা ধরে গল্প

করেও যেন ক্লান্ত হতে বা থামতে চায় না। স্নানের সময় পার হয়ে যায়, দেবিকা তবু সুমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দেবিকা হাসে—এবার এসেও আমাকে দেখতে পেলে কিন্তু আস্ছে মাসে কি দেখতে পাবে ?

সুমন্ত হাসে, কিন্তু হাসিটা যেন একটা চাপা বেদনার করুণ হাসি—তা, আশা করতেই হবে, দেখতে পাবো।

দেবিকা—আমার ভাবতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়, তুমি একদিন এখানে এসে আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, লক্ষ্মিটি, তুমি আমার জন্তে কান্নাকাটি করো না।

সুমন্ত—চুপ কর।

দেবিকা হাসতে চেষ্টা করে—সত্যিই, এছাড়া আমার আর কোন ছুঃখ নেই।

সুমন্তর চোখ ছুটোও যেন আসন্ন সেই শূন্যতার দিনটার রূপ দেখতে পেয়ে ছটফট করতে থাকে। ঘরের এই সব ছবি, ওই ফুলের টব, সবই সেদিন থাকবে। শুধু থাকবে না দেবিকা। দেবিকাকে সারা জীবনে এই পৃথিবীর কোন আলো-ছায়ার কাছে দেখতে পাওয়া যাবে না। তবু এর মধ্যে একটা সান্ত্বনা এই যে··· ।

সুমন্তর মনের কথাটা দেবিকারই হাসি-ভরা কথার ভাষাতে যেন ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে। দেবিকা বলে—তবু সুখের মরণই বলতে হবে। তোমার স্ত্রী হতে পেরেছি, এই তৃপ্তি নিয়ে সুখেই মরতে পারবো।—তারপরেই মুখ টিপে যেন আরও একটা খুশির হাসি হাসতে থাকে দেবিকা—তখন তোমারও মুক্তি।

সুমন্ত বলে—সাংঘাতিক মুক্তি। যাক্, ওসব কথা না তুললেই ভাল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, গিরিডির এবাড়ির প্রাণের উদ্বেগটাও যেন মিথ্যে হয়ে কোথাও সরে থাকে। মোহিতবাবু হেসে-হেসে সুমন্তর সঙ্গে গল্প করেন। জয়াও মাঝে মাঝে এসে সুমন্ত আর দেবিকার কাছে বসে গল্প করে চলে যান।

যখন রাত হয়, রাত নটা পার হয়েও ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে পৌঁছে যায়, তখন একটু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না জয়া। মোহিতবাবুও মাঝে মাঝে উপর-তলার ঘর থেকে নীচে নেমে এসে বারান্দায় পায়চারী করতে থাকেন। সুমন্ত যখন দেবিকার হাত ছেড়ে দিয়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে উপরতলার ঘরের দিকে চলে যায়, তখন নিশ্চিন্ত হন মোহিতবাবু, নিশ্চিন্ত হন জয়া।

অনেকদিন পরে আবার লক্ষ্মীমামী গিরিডির বাড়িতে এসেছেন। সুমন্তও এসেছে। বাড়ির সবারই মনেও পড়ে গিয়েছে, দেবিকা আর সুমন্তের বিয়ের একটি বছর পূর্ণ হলো। এই এক বছরের মধ্যে দেবিকার শরীরের কোন উন্নতি

হয়নি। কিন্তু কোন অবনতি হয়েছে বলেও বিভূতিডাক্তার মনে করেন না।

লক্ষ্মীমামী বলেন—ভগবানের দয়া।

কিন্তু দেবিকা নিজেই ঠাট্টা করে হেসে ওঠে—ভগবান যদি আরও বেশি দয়া করেন, তবে একজনের ওপর খুবই অবিচার করা হবে।

লক্ষ্মীমামী—বুঝলাম না।

দেবিকা—আধমরা ফিঙ্গের মতো এভাবে ধড়ফড় করে আর ধুকধুক করে যদি আরও ক'বছর বেঁচে থাকি, তবে তোমার ভাগ্নে বেচারার কি দশা হবে?

—কি হবে?

—বুঝে দেখ, কি বলছি।

চমকে ওঠেন লক্ষ্মীমামী। দেবিকার এই ঠাট্টার কথাটা যে ভয়ানক একটা বাস্তব সত্যের বজ্রধ্বনি। বেচারা সুমন্তের জীবনটা তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। দেবিকার সঙ্গে সুমন্তর বিয়ে মানে কদিনের একটা মায়ার বন্ধন স্বীকার করা মাত্র। সকলেরই জানা আছে, সে বন্ধন শিগগিরই ক্ষয় করে দেবার জন্য দেবিকার প্রাণের শিয়রে যমের ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সুমন্তর জীবনটা তো সব আশা আর পিপাসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকবে। দেবিকা যে সুমন্তর যত সাধ আর সখের, স্বাস্থ্যের আর বয়সের কাছে একটা বঞ্চনা। এমন বঞ্চনা চিরস্থায়ী হবে না জেনেই তো সুমন্তর সঙ্গে দেবিকার বিয়ে হয়েছে।

লক্ষ্মীমামী আর কথা বাড়িয়ে তুলতে চান না।

এমন বিয়ের এক বছর পূর্ণ হবার দিনটিতে কীই বা উৎসব হতে পারে? তেমন কিছুই হলো না। লক্ষ্মীমামী শুধু দুটো ফুলদানিতে দুটো টাটকা ফুলের তোড়া বসিয়ে দিয়ে দেবিকার ঘরে রেখে গেলেন)

সন্ধ্যা পার হয়। আর রাতটাও জ্যোৎস্নায় ভরে যায়। একবছর আগের রাতেও এইরকম একটা আলোমাখানো উতলা ভাব ছিল। মোহিত দত্তের এই বাড়ির বাগানের সব লতাপাতা ফুরফুরে হাওয়াতে সে রাতে যেরকম দুলেছিল, আজও ঠিক সেইরকম দুলছে।

রাত দশটা পার হয়ে যাবার পরেও দেবিকার ঘরের ভিতরে দেবিকার সঙ্গে গল্প করছে সুমন্ত। ঘরের দরজা খোলা। ঘরে আলো জ্বলে। এটাই নিয়ম। তবু একটু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না জয়া।—তুমি সুমন্তকে ডেকে একটু বলে দাও লক্ষ্মী, যেন আর বেশি গল্প না করে।

লক্ষ্মীমামী ডাক দেন—এবার তুমি ওপরে যাও, সুমন্ত।

—এখনই যাচ্ছি। উত্তর দেয় সুমন্ত। কিন্তু বুঝতে পারেন লক্ষ্মীমামী, তবু

দেবিকার সঙ্গে গল্প করেই চলেছে সুমন্ত।

জয়া বলেন—রাত এগারটা যে পার হতে বসলো লক্ষ্মী। আর তো এসব ভাল দেখায় না।

—কি বললে ?

—আমার সত্যিই ভয় করছে লক্ষ্মী।

—ভয় ?

—হ্যাঁ। তুমি সুমন্তকে আর একবার ডাক দাও, লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীমামী ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে, আর দেবিকার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিতে গিয়েই চমকে ওঠেন। সুমন্তর একটা হাত ধরে রেখেছে দেবিকা। দেবিকার মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু মেয়েটার চোখ দুটো যেন কথা বলছে।

সুমন্তর চোখেও কী অদ্ভুত চাহনি। দেবিকার চোখের ওই ভয়ানক ব্যাকুলতাকে শান্ত করার জন্য সুমন্তের চোখের দৃষ্টিটা ছটফট করছে। দেবিকা বলছে —আজ আর ওপরে যেও না।

সুমন্ত বলছে—আমারও আজ আর ওপরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

মরণভয় নেই মেয়েটার ? আর সুমন্তই বা কী ভয়ানক অবুঝ মনের ছেলে। এত রাতে, এভাবে, এমন করে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে যে দেবিকার শিয়রের মৃত্যু মুখ টিপে হেসে ফেলবে। মেয়েটাও কি ভুলে গেছে যে, ওর হার্ট খারাপ, লিভার খারাপ, ওর ডান পাঁজরের এক পাশে সাংঘাতিক একটা ব্যথা আছে। বিভূতিডাক্তার এত স্পষ্ট করে যে-কথাটা বলে দিয়েছেন, সে-কথা ভুলে যাবার জন্যেই কি ওরা দুজন আজ পাগল হয়ে উঠলো ?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়। জেগে উঠেছেন মোহিতবাবু। বোধহয় জয়া নিজেই গিয়ে আর আতঙ্কিত হয়ে মোহিতবাবুকে জাগিয়েছেন।

লক্ষ্মীমামীর আতঙ্কিত প্রাণটাও আর নীরব হয়ে থাকতে পারে না। চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে ফেলেন লক্ষ্মীমামী—ও সুমন্ত, আর রাত করো না। ছিঃ, দেবিকার শরীরের কথাটা তো একবার ভেবে দেখতে হয়।

—যাচ্ছি মামী। ব্যস্তভাবে সাড়া দেয় সুমন্ত।

ঘর ছেড়ে চলে যায় সুমন্ত। দেখতে পান লক্ষ্মীমামী, দেবিকার চোখ দুটো ছলছল করছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেবিকার দুই চোখের ঘন ভুরু দুটো যেন আহত সাপের শরীরের মতো কুঁচকে পাকিয়ে কাঁপছে।

আজ না হয় লক্ষ্মীমামী ছিলেন তাই এ বাড়ির প্রাণ একটা বিপদের ভয়

থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু তারপর? তারপর যতবারই সুমন্ত এবাড়িতে এসেছে, এ বাড়ির মন আতঙ্ক ভরে গিয়েছে। একদিন এমন ঘটনাও চোখে দেখতে হয়েছে, দেবিকা নিজেই মাঝরাতে ঘরের বাইরে এসে উপর তলায় যাবার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। জয়া বলেন—একি কাণ্ড!

দেবিকা বলে—কিছুতেই ঘুম আসছে না, মা।

মোহিতবাবু দেখেছেন, অনেক রাতে নীচের তলায় নেমে বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে আছে সুমন্ত। মোহিতবাবু ভয় পেয়েছেন, বিপন্ন বোধ করেছেন আর করুণস্বরে সুমন্তকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছেন।—দুঃখ করো না, সুমন্ত। এখনও ভোর হতে অনেক দেরি, এবার শুতে যাও।

জয়া মাঝে মাঝে মোহিতবাবুর কাছে এসে ফুঁপিয়ে উঠেছেন—এমন বিয়ে না হলেই তো ভাল ছিল। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

কিন্তু বিভূতিডাক্তার স্পষ্টবক্তা; আবার সাবধান করে দিয়েছেন। সাবধান, যতই দুঃখের ব্যাপার হোক, এমন ভুল করতে দেবেন না।

দুই

বিভূতিডাক্তার সবচেয়ে বেশি খুশি। ছ'মাসের মধ্যে দেবিকার অসুখের অনেক খারাপ লক্ষণ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দশ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে দেবিকার। মাথা ঘোরা আর নেই। পাঁজরের ব্যথাটাও খুব কম।

তবে কি সত্যিই সেরে উঠবে দেবিকা? বিভূতিডাক্তার বলেন—এখন আমি জোর করে বলতে পারি, আশা আছে।

মিথ্যে বলেননি বিভূতিডাক্তার। সত্যিই এক-একটা মাসে দেবিকার এই জীর্ণ শীর্ণ ও ভঙ্গুর শরীরটার উপর যেন একটা অভাবিত আকস্মিকের করুণা ঝরে পড়ছে। লালচে হয়ে উঠেছে দেবিকার সাদা ঠোঁট। খাবারের পরিমাণ প্রায় ডবল হয়ে গিয়েছে। লনের চারদিকে একবার ঘুরে বেড়ালে হাঁপ ধরে না।

রায়সাহেবের বউ নমিতা এসে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে।—আমি এখন চেঁচিয়ে বলতে পারি দেবি, আবার আমি তোমার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলবো।

সুমন্ত আসে। কিন্তু সুমন্তর চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের নিবিড়তা টলমল করে। দেবিকার হাত ধরতে গিয়েই সুমন্তর হাতটা যেন একটা প্রাণময় কোমলতার স্বাদ পেয়ে চমকে উঠেছে। দেবিকার হাতের সরু বালা দুটো আর কব্জির গাঁটের কাছে ঢলঢল করে না। হাড়সার সেই হাত দুটো বেশ সুডোল হয়ে উঠেছে। সত্যিই তো, এটা যে একটা আশাতীত ঘটনা।

আরও ছ'টা মাস পার হতেই গিরিডির এই বাড়ির জীবনে যেন চার বছর আগের সুস্থ সুখী হাসির কলনাদ আবার বেজে ওঠে। নমিতা এসেছে, নমিতার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলেছে দেবিকা, পনর মিনিট খেলার পরও হাঁপিয়ে পড়েনি।

যে সেতারের তারে মরচে ধরেছিল, সেই সেতারে নতুন তার পরানো হয়েছে। সন্ধ্যা বেলা একবার সেতার বাজাতে ভুলে যায় না দেবিকা। মোহিতবাবু বলেছেন, এবার পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হলেই তো ভাল হয় দেবি।

দেবিকা বলে—হ্যাঁ, পরীক্ষা দেব।

সুমন্তর একটা চিঠিতেও নতুন একটা অনুরোধের কথা যেন নতুন আশার গুঞ্জন তুলে দেবিকাকে নিশ্চিন্ত করে দেয়।—হ্যাঁ, তুমি এখন এম-এ পরীক্ষাটা দেবার জন্যেই তৈরী হও। আমি কিছুদিন নতুন কাজে ব্যস্ত থাকবো। কাজেই অন্তত তিন মাসের মধ্যে গিরিডি যাবার সুযোগ হয়ে উঠবে না। যাই হোক, তোমারই সুবিধে হবে। তোমার পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে না। আমি থাকলেই তো যত ব্যাঘাত আর উৎপাত। আশা করি, এখন আরও ভাল আছ।

দেবিকা জবাব দেয়।—তবু বলছি, যতই ব্যাঘাত আর উৎপাত হও না কেন, তিন মাসের পর কিন্তু আব দেরী করো না।

তিন মাসের মধ্যে একদিন হঠাৎ উৎপাতের মতো দেখা দিয়েছে সুমন্ত। সুমন্তর গাড়িটা এসে শুধু দুটি ঘণ্টার মতো গিরিডির এবাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা কাজের দরকারে মধুপুর যেতে হবে। তাই এসেছে সুমন্ত।

খুব ব্যস্ত সুমন্ত। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়েও চেয়ারে বসতে চায় না সুমন্ত। ঘরের ভিতরে ঘুরে ফিরে দেবিকার সঙ্গে গল্প করে আর চা খায়। দেবিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বাব বার হাসতে থাকে সুমন্ত। সুমন্তের পক্ষে দেবিকার এই সুস্থ সুন্দর চেহারাটাকে দেখতে পাওয়া যে একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। যে বাড়িতে এসে একদিন দুঃসহ একটা শূন্যতাকে দেখে ফিরে যেতে হবে বলে মনে করেছিল সুমন্ত, সে বাড়িতে দেবিকা আজ যেন একটি পূর্ণ অভ্যর্থনা হয়ে সুমন্তর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

যেমন মোহিতবাবু তেমনই জয়া, দুজনেই একটু বিস্মিত হলেন। সুমন্ত এল, কিন্তু একটি ঘণ্টাও থাকতে পারলো না। মধুপুর চলে গেল। কে জানে সুমন্তকে আজ এত ব্যস্ত করে তুলেছে কিসের জরুরী কাজ! এ বাড়ির এই ঘরের একটা চেয়ারেও কিছুক্ষণের জন্য বসে থাকতে পারলো না? সত্যিই সুমন্তর এই তাড়াহুড়ো ব্যস্ততার মধ্যে যেন একটা উদ্বেগও আছে। সুমন্তর গাড়িটাও এত জোর স্পীড নিয়ে চলে গেল যে, দেখলে মনে হবে, ছুটে পালিয়ে গেল গাড়িটা।

দেবিকাও ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছে, চলে যাচ্ছে সুমন্ত। কিন্তু সেজন্য দেবিকার চোখে কোন করুণতা আর কাতরতা নেই। হাসছে দেবিকার চোখ। আজ আর দেবিকার চোখের তারাতে সেই সাদাটে বিষাদের কোন চিহ্নও নেই। ঘন কালো চোখের তারা দুটো হাসতে গিয়ে আরও কালো হয়ে কাঁপছে আর দেখছে। আজ আর সুমন্তর দিকে তাকিয়ে দেবিকার চোখের চাহনিটার ব্যথিত হবার কোন দরকার হয় না। কারণ কিছুই ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

এম-এ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে হবে। কিন্তু বিভূতি ডাক্তার বললেন, এখন কিছুদিনের জন্যে ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে থাকলে দেবিকার স্বাস্থ্যের সবচেয়ে ভাল উপকার হবে। পরীক্ষা এখন থাকুক।

সুমন্ত চৌধুরী শুধু দেবিকার চিঠিতে জানতে পারে, ওয়াল্টেয়ারে চলে গিয়েছে দেবিকা, সঙ্গে গিয়েছেন দেবিকার মা। গিরিডির বাড়িতে এখন শুধু মোহিতবাবু আছেন। অন্তত তিনটে মাস ওয়াল্টেয়ারে থাকবে দেবিকা।

কিন্তু চিঠিতে একথাটা লিখতে পারেনি দেবিকা, বোধ হয় লিখতে ভুলেই গিয়েছে যে, তুমিও একবার ওয়াল্টেয়ারে এস। তবু সুমন্তর মনে কোন অভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না। বরং মনে হয়, এরকম তাগিদ না করে ভালই করেছে দেবিকা। সুমন্তর কাজের চাপ যে এখন আরও বেড়েছে। তাছাড়া খনির মেশিনারী কিনতে দুমাসের জন্য ইউরোপে যাবার কথাও উঠেছে। ইচ্ছে থাকলেও এখন ওয়াল্টেয়ারে যাওয়া সুমন্ত চৌধুরীর পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু ঝরিয়ার মণিবাবুর অনুরোধের চাপে পড়ে পনের দিনের জন্যে দার্জিলিং বেড়াতে যেতেই হয়। আর দার্জিলিংয়ে এসেও ওয়াল্টেয়ারে দেবিকার কাছে একটা চিঠি দিতেও ভুলে যায় সুমন্ত।

শুধু মোহিতবাবু খবর রাখেন, সুমন্ত এখন দার্জিলিংয়ে আছে। শুধু মোহিতবাবুই চিন্তা করেন, দার্জিলিংয়ে না গিয়ে সুমন্ত এখন একবার ওয়াল্টেয়ারে যেয়ে দেবিকাকে দেখে এলেই তো ভাল করতো। আজ তো সুমন্তর পক্ষে সবচেয়ে বেশি খুশি হবার কথা, দেবিকা সেরে উঠেছে। এমন সৌভাগ্য তো কোনদিনও আশা করতে সাহস করেনি সুমন্ত।

ওয়াল্টেয়ারে থেকে দেবিকা গিরিডিতে ফিরে আসবার পর মোহিতবাবু দেবিকার কাণ্ড দেখেও একটু আশ্চর্য হন। সুমন্ত এখন গিরিডিতে আসবার সুযোগ পাচ্ছে না, সময় করতে পাচ্ছে না, এজন্য দেবিকার মনে যেন কোন আক্ষেপ আর কোন অভিযোগ নেই। সন্দেহ করেন মোহিতবাবু, সুমন্তকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা চিঠিও লেখে কিনা দেবিকা।

জয়া জিজ্ঞাসা করে, সুমন্ত কবে আসবে?

দেবিকা হেসে হেসেই জবাব দেয়—সময় করতে পারলেই আসবে।

বিভূতি ডাক্তার আবার স্পষ্ট ভাষায় মোহিতবাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন, না, আর ভয় করবার কিছু নেই। দেবিকা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কথাটা বলতে গিয়ে বিভূতি ডাক্তারের গলার স্বরে যেন খুশির উল্লাস বেজে ওঠে।—এখন ছেলেপুলে হলেও দেবিকার স্বাস্থ্যের কোন বিপদ দেখা দেবে না। বরং ভালই হবে।

গিরিডির এ বাড়ির প্রাণটা এইবার এতদিনে যেন একটা দুঃস্বপ্নের গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে। আর দুঃখ করবার, ভয় করবার, উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। মেয়েটার তো বলতে গেলে পুনর্জন্ম হয়েছে। দেবিকার ভাগ্য আর বিভূতি ডাক্তারের চিকিৎসা এ বাড়ির মেয়ের অকাল মরণের অভিশাপ মিথ্যে করে দিয়েছে। সুমন্তর জীবনটাও একটা শূন্যতার আঘাত থেকে বেঁচে গেল।

মোহিতবাবু চিঠি দিয়ে সুমন্তকে জানিয়ে দিতে দেরি করেন না, দেবিকা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তার আগে বিভূতি ডাক্তার নিজেই সুমন্তকে চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন—তুমি এখন দেবিকাকে তোমার কাছে নিয়ে যেতে পার। দেবিকার স্বাস্থ্যের সব বিপদ কেটে গিয়েছে।

মোহিতবাবুর কাছে, বিভূতিকাকার কাছে, আর দেবিকারও কাছে চিঠি দিয়েছে সুমন্ত। কিন্তু স্পষ্ট করে জানাতে পারেনি, ঠিক কবে গিরিডিতে আসবার সুযোগ পাওয়া যাবে, আর ঠিক কবে দেবিকাকে সিজুয়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। একটা অসুবিধে আছে, সিজুয়া কোলিয়ারীর ম্যানেজারের বাংলোটা সুবিধের নয়। এটা একটা পুরনো ফাটলধরা বাড়ি। নতুন বাংলো তৈরী হচ্ছে।

জয়া একটু বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেন, না হয় পুরনো বাড়িই হলো, তাতে কি এসে যায়? অন্তত একটা ভাল ঘর তো আছে। দুটো প্রাণীর থাকবার পক্ষে একটা ভাল ঘরই যথেষ্ট।

দেবিকা হেসে ফেলে—সে যখন মনে করছে অসুবিধে আছে, তখন অসুবিধে আছেই। তা ছাড়া, এত ব্যস্ত হবার কী আছে?

লক্ষ্মীমামী যেদিন আবার গিরিডির বাড়িতে এলেন, সেদিন জয়া আর মোহিতবাবু তাঁদের মনের কথাগুলি খুলে বলবার সুযোগ পেলেন। এখন সুমন্ত একবার এলেই তো পারে। আর তো কোন ভয় নেই। বিভূতি ডাক্তার বলেছেন আর কোন সাবধানতার দরকার নেই।

লক্ষ্মীমামীর চোখ দুটোও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। না, আর ওদের প্রাণের ইচ্ছার উপর সেই ভয়ানক নিষ্ঠুর পাহারা রাখবার দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে। মনে পড়ে

লক্ষ্মীমামীর, সে রাতে দেবিকার ছলছল চোখের তারাতেও যেন আগুনের রেখা ঝলসে উঠেছিল। বাধা দিতে গিয়ে লক্ষ্মীমামী সেদিন নিজেও কেঁদে ফেলেছিলেন। আজ আর কোন সন্দেহ নেই, যে বিয়ের কোন মানে ছিল না, সে বিয়ের এখন খুবই মানে হয়।

লক্ষ্মীমামী খুব তাগিদ দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, তাই সুমন্ত এসেছে। কিন্তু দেখে বেশ আশ্চর্য হয়েছেন লক্ষ্মীমামী, সুমন্ত আর দেবিকা দুজনে শুধু বাইরের ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটি মিনিট মাত্র কথা বলেই চুপ করে গেল। সুমন্ত ব্যস্ত হয়ে ঘরের বাইরে চলে যায় আর বাগানের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। দেবিকা উপরতলায় উঠে যায়। যেন অপরিচিত দুটো মানুষ হঠাৎ মুখোমুখি দেখার ঘটনাকে শুধু একটা আলাপ করেই শেষ করে দিল।

সে রাতে ছিল আকাশভরা আলো, আজকের এই রাতে শুধু আকাশভরা কালো। কিন্তু গিরিডির এবাড়ির প্রাণে সে রাতের সেই করুণ আতঙ্ক আর নেই। তাই নীচতলার একটি ঘরের একটি খাটে নতুন করে বিছানা পাতা হয়েছে।

কিন্তু লক্ষ্মীমামী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, রাত দশটা বেজে গিয়েছে, তবু দেবিকা এই ঘরে ঢোকেনি। বারান্দার শেষ প্রান্তের ছোট ঘরের ভিতরে দরজার কাছে আর বাগানের ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে দেবিকা।

সুমন্ত কোথায়? দেখলেন লক্ষ্মীমামী, সুমন্ত তখনও বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে বই পড়ছে। লক্ষ্মীমামী বলেন—রাত হয়েছে, তুমি এখন ওঘরে যাও সুমন্ত।

দেবিকারও কাছে এসে লক্ষ্মীমামী বলেন—এখানে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ওঘরে যা। অনেক রাত হয়েছে।

দেবিকা বলে—না।

—কি?

—ওঘরে যাব না।

—কেন?

—বিশ্রী লাগছে।

ধমক দেন লক্ষ্মীমামী—বাজে কথা বলো না। যাও, এখনি যাও!

চলে গেলেন লক্ষ্মীমামী। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বুঝতেও পারেন না, এ আবার কোন্ সমস্যা? কিসের অভিশাপ?

মোহিতবাবু আর জয়া, আর লক্ষ্মীমামী, তিনজন তিনটি স্তব্ধ আতঙ্কের মূর্তির মতো উপরতলার একটি ঘরে বসে থাকেন আর রাত জাগেন। বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেন, এতক্ষণে বোধহয় নীচেরতলার বাইরের ঘরের আলো

নিভেছে, সুমন্ত শোবার ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু দেবিকা কি এখনও ওর বেয়াড়া অনিচ্ছা নিয়ে ছোট ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে?

নীচেরতলায় এসে দেখতে পেলেন লক্ষ্মীমামী, সুমন্ত তখনও বই পড়ছে, আর দেবিকা তেমনি দূরের ছোট ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আজকের এই অমানিশা যেন একটা নতুন অভিশাপ। সুমন্ত আজ দেবিকার জীবনের ভয়। দেবিকা আজ সুমন্তর জীবনের ভয়। আর, বাসরঘরের মতো ওই ঘরটা যেন একটা কারাগারের যাবজ্জীবন শাস্তির কুঠরী। ওঘরের ভিতরে ঢুকতে দু'জনের কারও মনে একটুও আগ্রহ নেই।

লক্ষ্মীমামী আর ডাকাডাকি করে এই ভয়ানক অমানিশার স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দেবার সাহস পেলেন না। কিন্তু আজও আবার চোখ মুছলেন। উপরতলায় উঠে গিয়ে মোহিতবাবু আর জয়ার কাছে একটা কথা শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন।—না, এমন বিয়ের কোন মানে হয় না।

অ না ত্মি ক

এক যে আছে একানড়ে···!

এই একানড়ে কিন্তু তালগাছে চড়ে থাকে না। তার দাঁত দুটো মূলোর মতো নয়। পিঠখানাও কুলোর মতো নয়। ইনি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, চমৎকার চেহারা, গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

কোমরে বিচুলির দড়ি ; বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি। না, এই একানড়ের কোমরে ওরকমের কোন বিদ্‌ঘুটে জঞ্জাল কেউ কখনও দেখতে পায়নি। বরং মাঝে মাঝে দেখা যায়, বিশেষ করে শীতকালের দুপুরে কিংবা বিকেলে, একটি বাদামী রঙের আলোয়ান কোমরে জড়িয়ে বাড়ি ফিরছেন এই একানড়ে। অফিস থেকে সোজা বাড়ি। মাঝপথে কোথাও থামেন না, আশে-পাশের কোন বাড়ির দিকে তাকান না। লোকের বাড়ি-বাড়ি বেড়াবার জন্যে এই একানড়ের মনে কোন সাধের তাগিদ নেই।

সুকিয়া স্ট্রীটের এক গলির একটি বাড়িতে অনন্ত মিত্তির নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। তাঁরই বিশেষ একটি দুর্নাম বা সুনাম এই যে, তিনি একটি অদ্ভুত একানড়ে।

অনন্ত মিত্তির নামে এই ভদ্রলোক একলা থাকতে ভালবাসেন। পাড়ার কোন উৎসবের ধারে-কাছেও আসেন না। ছেলেদের ক্লাবের কোন অনুষ্ঠানে তাঁকে

পাওয়া যায় না। অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা দিতেও তাঁর বেশ আপত্তি দেখা যায়। যদিই বা, অর্থাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'একটা টাকা চাঁদা কখনও দিয়েছেন, তবে বেশ গম্ভীর হয়ে আর মুখ ফিরিয়ে রেখে সেই চাঁদার টাকা জানালা দিয়ে বাইরের ছেলে-জনতার হাতে ফেলে দিয়েই ঘরের ভিতরে সরে গিয়েছেন। রসিদ নেবার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকেননি। রসিদ নেবার জন্য কোন আগ্রহও তাঁর নেই।

রসিদের কাগজটা জানালার ফাঁকে রেখে দিয়ে ছেলেরা চলে যায়। অনেকক্ষণ পরে, অনন্তবাবু নিজেই এসে সেই রসিদের কাগজটাকে টোকা মেরে জানালার বাইরে ফেলে দেন। কাগজটা যেন বাইরের পৃথিবীর যত ঝঞ্ঝাটের সঙ্গে অনন্ত মিত্তিরের একলা সুখী জীবনটাকে একটা সম্পর্কের বন্ধন দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। একটুও পছন্দ করেন না অনন্ত মিত্তির। ক্লাবের ছেলেরাও অনন্তবাবুর এই নির্লিপ্ততা একটুও পছন্দ করেন না। ছেলেরাই ঠাট্টা করে কথাটাকে রটিয়েছে —একানড়ে।

গলির একুশ নম্বর বাড়ির বাসিন্দা অনন্ত মিত্তির বাইশ বছর ধরে এই বাড়ির ভাড়াটে হয়ে দিন কাটিয়েছেন। পাড়ার জীবনে মাঝে মাঝে মেলা-মেশার আড়োলন জাগে। কোন বাড়িতে বিয়ে, কোন বাড়িতে শ্রাদ্ধ। অনন্তবাবুও নিমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। টালিগঞ্জের মানুষও ঝড়-বৃষ্টির বাধা উপেক্ষা করে নিমন্ত্রণের প্রীতিভোজে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু পাড়ার মানুষ অনন্তবাবু আসেন নি। সকলেই জানেন, হঠাৎ অসুস্থতা নয়, কোন জরুরী কাজের চাপও নয়, অনন্তবাবু ইচ্ছে করেই আসেন নি।

কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে, অনন্তবাবুর স্ত্রী রেণুকা, আর মেয়ে শুভা, দুজনেই এসেছে। একুশ নম্বর বাড়ির এই দুটি মানুষ কোন নিমন্ত্রণের আহ্বান তুচ্ছ করে না। কিন্তু একথাও কারও জানতে বাকি নেই যে, অনন্তবাবু তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের এই সব সামাজিকতার হৈ-চৈ একটুও পছন্দ করেন না। জানতে কোন অসুবিধে ছিল না, কারণ রেণুকা নিজেই উৎসবের বাড়ির মেয়েমহলের জিজ্ঞাসার দাবি শান্ত করতে গিয়ে স্পষ্ট করে বলেই ফেলেছেন, আসতে কেন দেরি হলো।—আসতে কি দেয়? শেষে একরকম ঝগড়া করেই চলে এসেছি।

তবে আর জানতে ও বুঝতে কিসের অসুবিধে আছে? অনন্তবাবু চান, তাঁর স্ত্রী আর মেয়েও একানড়ে হয়ে, এই পাড়ার মধ্যে ভিন্নতর একটি একলা-জগৎ সৃষ্টি করে দিনগুলি কাটিয়ে দিক।

অনন্ত মিত্তিরের এই বাড়ি, এই একুশ নম্বর, এই ভাড়া-বাড়ির ঘর বলতে একটি মাত্র ঘর। ঘরটি অবশ্য ক্ষুদ্র নয়; ঘরের বারান্দাও দৈর্ঘে-প্রস্থে বেশ বড়।

তবু শুধু একটি চেয়ার।

ক্লাবের ছেলেরাও বুঝে নিয়েছে, বাইরের মানুষ এখানে এসে যেন দশটা মিনিটও বসে থাকবার মতো কোন ঠাঁই না পায়, সেই জন্যেই একানড়ে অনন্ত মিত্তির সাবধান হয়ে এই একটি মাত্র চেয়ার রেখেছেন। যদি হঠাৎ বাইরের দু'জন ভদ্রলোক অনন্তবাবুর এই বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ান, তবে তাঁরা বসবেন কোথায়? এরকমের কোন প্রশ্ন অনন্তবাবুর মনে নেই। অনন্তবাবু চান না যে, বাইরের মানুষ হঠাৎ এসে একটা ভাল কথার ছুতো করে তাঁর বাড়িতে ভিড় করে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে তিনি ওই একলা চেয়ারটির উপর চুপ করে বসে থাকতে আর ভাবতে ভালবাসেন।

পাড়ার আর আশে-পাশের বাড়ির বয়স্ক ভদ্রলোকেরা ঠাট্টা করে অন্য একটা কথা বলেন—স্বামী একলানন্দ। অনন্তবাবু সম্পন্ন অবস্থার মানুষ নন। দেশী মার্চেন্ট অফিসের কনিষ্ঠ পদের কেরানী, কত টাকাই বা মাইনে পান? কিন্তু মনে হয়, যা পান তাতেই তিনি প্রসন্ন। এই বাইশ বছরের মধ্যে পাড়ার কোন মানুষের কাছে তিনি কখনও টাকা ধার চেয়েছেন এমন ঘটনার কথা কেউ কখনও শোনেনি। অনন্ত মিত্তির কাউকে কখনো একটি পয়সা ধার দিয়েছেন বলেও কেউ শোনেনি। ভদ্রলোক কারও উপকার নেন না; কারও উপকার করেন না। সত্যিই মনে-প্রাণে বিশুদ্ধ একটি একলানন্দ।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়িতে এসেই শুনতে পেয়েছেন অনন্তবাবু, ঘরের ভিতরে অনেক মানুষের কলরব।

কে ওরা? কেনই বা ওরা আসে আর এরকম একটা উৎপাত বাধিয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘরের ভিতরে বসে থাকে। বেশ বিরক্ত হয়ে আর ক্ষুব্ধ হয়ে বারান্দার সেই একলা চেয়ারটির উপর বসে থাকেন অনন্তবাবু।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে অনন্তবাবুর মেয়ে শুভা—একটু জিরিয়ে নাও বাবা, তারপর চা খেও।

—তার মানে এই যে, আমার চা পেতে এখন বেশ দেরী হবে? অনন্তবাবুর কথার মধ্যে আর গলার স্বরে আন্তরিক বিরক্তিটা আরও তীব্র হয়ে বেজে ওঠে।

শুভা বলে—হ্যাঁ, একটু দেরী হবে।

—কেন?

—পেয়ালা নেই।

—তার মানে?

—তার মানে, কমলা মাসিমাকে চা দেওয়া হয়েছে।

অনন্তবাবুর এই সংসারে যে একটি মাত্র চায়ের পেয়ালা আছে, সে পেয়ালা এখন অভ্যাগতা কমলা মাসিমার হাতের কাছে রয়েছে। সুতরাং অনন্তবাবুর চা পেতে একটু দেরী হবে বইকি!

শুভার চা খাওয়া অভ্যেস নেই। শুভার মা রেণুকা অবিশ্যি চা খান। কিন্তু অসুবিধে নেই। সে জন্যে দ্বিতীয় একটি পেয়ালার দরকার হয় না। অনন্তবাবুর চা খাওয়া সারা হলে পেয়ালাটা যখন মুক্তি পায়, তখন রেণুকা সেই পেয়ালাতে নিজের চা ঢেলে নেন। কোন সমস্যা নেই।

এখনও বাইরের যাঁরা ঘরের ভিতরে বসে আছেন আর গল্প গুঞ্জন ও হাসা-হাসির উৎপাত সৃষ্টি করছেন তাঁদের মধ্যে শুধু নবহরিবাবুর স্ত্রী কমলার চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। সুমতির মা, মনোজের কাকিমা আর জয়া কাজল শান্তি ওরা কেউই চা খায় না। ওরা এই কথা বলেছে বলেই অনন্তবাবুর স্ত্রী রেণুকা বিশ্বাস করেছেন যে, সত্যিই ওরা চা খায় না। কিন্তু ভুল বিশ্বাস। ওরা জানে, একলানন্দ অনন্তবাবুর বাড়িতে একটি ছাড়া দুটি পেয়ালা নেই। বেচারা রেণুকা মাসিমা অসুবিধেয় পড়বেন, অপ্রস্তুত হবেন, এক-এক করে একটি পেয়ালাতে এতগুলি মানুষকে চা খাওয়াতে গিয়ে হয়রান হবেন, তাই ওরা আগেই মিথ্যে কথা বলে সমস্যাটাকে মিথ্যে করে দিয়েছে।

অনন্তবাবুর বিরক্তির সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তার ভাবও আছে। ওরা চা নাই বা খেল, কিন্তু খাবার কি খায়নি? রেণুকা কি অন্তত একটি টাকার সিঙ্গাড়া আনিয়ে ফেলেনি? অনন্তবাবুর এই দুশ্চিন্তার সবই বর্ণে বর্ণে সত্য।

শুভাও বলে—আর সবাই শুধু খাবার খাচ্ছে, চা খাবে না।

অনন্তবাবু—কী খাবার?

শুভা—সিঙ্গাড়া আর সন্দেশ।

অনন্তবাবু—কত টাকার?

শুভা—দু' টাকা।

অনন্তবাবু—বেশ! চমৎকার!

দুটি টাকা ক্ষয় করিয়ে দিয়ে এই উৎপাত বড় জোর আর পাঁচ মিনিট পরেই সরে যাবে। যাই হোক, একটা বিরক্তির ব্যাপার হলেও, দুঃসহ রকমের কোন ভয়ের ব্যাপার নয়। চা খাওয়ার পর তারপর আরও একটি ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকবার পর আবার প্রসন্ন হতে পারবেন অনন্তবাবু। এ ধরনের উৎপাত অনন্তবাবুর জীবনের বড়রকমের কোন ভয় নয়। রেণুকাকে শুধু একটু বুঝিয়ে বললেই হবে—একটু হাত টান করে চলতে শেখ। ভুলে যেওনা যে, মেয়ের বিয়ে

দিতে হবে ; সে জন্যে অন্তত আটটি হাজার টাকার জোগাড় রাখতে হবে।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন অনন্তবাবু। দরজার কাছে যেন কোন আগন্তুকের পায়ের শব্দ বেজে উঠেছে। তবে কি সেই উৎপাতটা আবার এসেছে ? সেই দুঃসহ উৎপাত ? আনন্তবাবুর এই একলা জগতের ভিতর ভয়ানক একটা অনধিকার প্রবেশ।—না, সেই উৎপাতটা নয় ! লেংড়া আমের ঝুড়ি মাথায় করে একটা ফেরিওয়ালা এসেছে।

—না, আম চাই না। ফেরিওয়ালাকে হাঁকিয়ে দিয়ে অনন্ত মিত্তির আবার তাঁর জীবনের সব চেয়ে প্রিয় ভাবনার মধ্যে একলা হয়ে বসে থাকেন।

মেয়ের বিয়ের জন্যে আটটি হাজার টাকার সঞ্চয় এখন প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। কাজেই, অনন্তবাবু যেমন একটু নিরুদ্বিগ্ন হয়েছেন, তেমনই একটু বেশি সাবধানও হয়েছেন। এই সঞ্চয়ের উপর যেন কোন আঘাত না পড়ে। সংসারের খরচের টাকা আগে রেণুকার বাক্সে থাকতো। কিন্তু রেণুকার স্বভাবের একটি গোপন সত্য একদিন হঠাৎ জানতে পেরে সাবধান হয়ে গিয়েছেন অনন্তবাবু। সুমতির বিয়েতে বারো টাকা খরচ করে একটি ধনেখালি শাড়ি আশীর্বাদী দিয়েছিলেন রেণুকা। অনন্তবাবুকে না জানিয়ে, দত্তবাবুর ছেলে নৃপেনকে দিয়ে এই শাড়ি কিনিয়েছিলেন রেণুকা।

জানতে পেরে সেই যে সাবধান হয়ে গেলেন অনন্তবাবু, তারপর থেকে রেণুকার হাতের নাগালে পাঁচ টাকার বেশি একটি টাকাও আর রাখতে দিতে পারেননি।

কলেজে পড়ছে শুভা। শুভার বড়মামা জানিয়েছেন, ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু অন্তত আটটি হাজার টাকা খরচ করতে হবে। তা না হলে এখানে শুভার বিয়ে সম্ভব হবে না। নগদ বরপণের দাবি নেই কিন্তু বড়-ঘরের সঙ্গে কাজ করতে হলে দানসামগ্রীর কিছু বড়ত্ব চাই। মেয়েকে অন্তত ত্রিশ ভরি সোনার অলঙ্কারে সাজিয়ে দিতে হবে। বরযাত্রীর সংখ্যাও কম করে একশো জন হবে। কাজেই···।

অনন্তবাবু জবাব দিয়েছেন, রাজি আছি। পাত্র দেখতে শুনতে ভাল, পাত্র বেশ বিদ্বান, রোজগার ভাল, কলকাতাতে তিনতলা বাড়ি আছে। সুখে থাকবে শুভা। অনন্তবাবু আপত্তি করবেন কেন ?

আপত্তি দূরে থাকুক, এটাই যে অনন্তবাবুর জীবনের একমাত্র কামনার ধ্যান। যাঁরা অনন্ত মিত্তিরকে একলানন্দ বলেন কিংবা একানড়ে বলে ঠাট্টা করেন, তাঁরাও জানেন যে, ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের কোন সুখের বা সাধের আবদারের

কাছে কিন্তু একটুও কৃপণ নন।

রবিবারের সকালবেলাতে বন্ধু শুভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জয়া নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখেছে, তাতে জয়ার দু চোখে অদ্ভুত এক বিস্ময়ও চমকে উঠেছে। বারান্দার এক কিনারায় বসে অনন্ত মিত্তির ব্যস্তভাবে দু হাত চালিয়ে তাঁর মেয়ের জুতো পালিশ করছেন।

বাপের আদুরে মেয়ে কতই তো দেখা যায়। আর আদুরে মেয়ের বাপও তো কতই আছে। কিন্তু অনন্ত মিত্তির যেসব কাণ্ড করেন, তার তুলনা নেই বললেই চলে। শুভা চেঁচিয়ে আপত্তি করে, রাগারাগি বকাবকিও করে, কিন্তু অনন্তবাবু যেন কিছুই শুনতে পান না। জ্বরের শরীর নিয়ে বিছানার উপর চুপ করে বসে শুভার শাড়ির ছেঁড়া আঁচল সেলাই করেন।

শুভা কোন দাবি করে না, তবু শুভার জন্য বাজার থেকে হালফ্যাশনের দামী শাড়ি কিনে আনেন অনন্তবাবু। যখনই শুভাকে দেখতে রোগা-রোগা মনে হবে, তখনই পাঁচ-সাত টাকা খরচ করে পুষ্টির মন্ট কিনে ফেলবেন। মাঝে মাঝে অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে, আর বড়বাবুর কাছ থেকে বাড়ি যাবার অনুমতি নিয়ে, সোজা মেয়ে-কলেজের ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বৈশাখ মাসের দিন, তাই অফিসের কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও অনন্তবাবুর মনে একটা সন্দেহের প্রশ্ন ছটফট করে উঠেছে, মেয়েটা বোধহয় ছাতা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে।

ছুটির পর ফটকের বাইরে এসেই দেখতে পায় শুভা, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। শুভাকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসে শুভার মাথার উপরে ছাতা ধরেন অনন্তবাবু। শুভা লজ্জা পেয়ে ছটফটিয়ে ওঠে—কী করছো বাবা! আমাকেও বাবলু মনে করলে নাকি? জয়া কাজল আর শান্তি একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে থাকে।

মেয়ের বিয়ে হবে; যেদিন থেকে এ কথা শুনেছেন রেণুকা, সেদিন থেকেই তাঁর চোখ দুটো যখন-তখন ছলছল করে। মাঝেমাঝে ঘরের ভিতরে একলা বসে বিড়বিড়ও করেন, নিজের কথা ভাবছি না—ভাবছি, এই মানুষটার কী দশা হবে?

রেণুকার বাতের ব্যথা আজকাল আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছে। তার উপর হার্টের অবস্থাও ভাল নয়। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে কাজের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন, জোরে জোরে শ্বাস টানেন, তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকবারও সামর্থ্য থাকে না। শুয়ে পড়েন। অনন্তবাবু অফিস থেকে ফিরে এলে রেণুকা আর নিজের হাতে এক পেয়ালা চা তৈরী করে দিতেও পারেন না।

কিন্তু শুভা আছে। অনন্তবাবুর প্রত্যেকটি দরকারের আহ্বানে সাড়া দেবার

জন্ত মেয়ে যেন কান পেতে আছে। অনন্তবাবু যদি ডাক না দেন তাতেই বা কি আসে যায়? শুভা ঠিক সময়েই কাছে এসে দাঁড়াবে, বাজারের ঝোলাটি অনন্ত-বাবুর হাতের কাছে এগিয়ে দেবে। এই যে একটানা তিন বছর ধরে উলের জামাটা গায়ে দিচ্ছেন অনন্তবাবু, সেটা শুভারই হাতের কাজ। অনন্তবাবু জানেন না, পাঁচদিনের মধ্যে এই জামাটি বুনেছিল শুভা। তা ছাড়া উপায় ছিল না। ধারণা করতে পারেনি শুভা, নবেম্বর মাসটা শেষ না হতেই শীতের মেজাজ এত প্রখর হয়ে উঠবে।

মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে পুরো দুটি গেলাস জল খাওয়া অনন্তবাবুর অভ্যেস। কিন্তু সেজন্যে অনন্তবাবুকে কোন সমস্যায় পড়তে হয় না। শুভা যেন ওর ঘুমের নিয়মটাকেও চেষ্টা করে গড়ে নিয়েছে। ঠিক মাঝরাতে শুভা উঠে এসে অনন্তবাবুর বিছানার কাছে দাঁড়ায়। অনন্তবাবুর নিবিড় ঘুমের স্বপ্নটাও যেন একটা স্নিগ্ধ স্পর্শের স্বাদ পেয়ে চমকে ওঠে। কারণ, অনন্তবাবুর কপালে হাত রেখে ডাক দেয় শুভা—বাবা, জল খাও!

রেণুকা বলে—আমাকে তো ভগবান যত রোগজ্বালা দিয়ে আধমরা করে রেখেছেন। এই মানুষটার জন্যে আমি কতটুকু আর করতে পারি! যা করে মেয়েই করে। হাত মোছার তোয়ালেটিও মেয়েই বাপের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু এই মেয়ে যখন পরের বাড়ি চলে যাবে, তখন বাপের দশা কী হবে?

কিন্তু অনন্তবাবুর আসন্ন ভবিষ্যতের দুঃখের ছবিটা কল্পনা করে শুধু রেণুকাই যত আক্ষেপ করেন। অনন্তবাবুর চোখের চাহনিতে, মুখের ভাষায়, কিংবা চিন্তার মধ্যে কোন আক্ষেপ নেই। বরং দেখা যায়, মেয়ের সুখের জীবনের রূপটাকেই কল্পনা করে করে অনন্তবাবু যেন তাঁর মণ-প্রাণ বিচিত্র এক তৃপ্তি দিয়ে ভরে রেখেছেন। খবর পেয়েছেন অনন্তবাবু, শুভার ভাবী শ্বশুর জগৎবাবু নূতন গাড়ী কিনেছেন। জগৎবাবু নাকি বলেছেন, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি দিন শুভাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে যাবেন। মন্দিরের আরতি দেখে, আর ঘাটের সিঁড়িতে বসে গঙ্গার হাওয়া খেয়ে নিয়ে তারপর বাড়ি ফিরবেন।

এ তো নিতান্ত কল্পনার ছবি নয়, এ যে অনন্তবাবুর জীবনের এক সফল স্বপ্নের ছবি। লোকে না বুঝুক, রেণুকা কেন না বুঝবে, মেয়েকে ভালঘরে দেবার জন্যেই তো এই মানুষটা তার সারাজীবনের কেরানীগিরির সামান্য উপার্জনের উপর কঠোরভাবে খবরদারী করে কিছু টাকা জমাতে চেয়েছিল। নিজের গায়ের গরম জামার জন্যে উল কিনতে কি সহজে রাজি হয়েছিল এই মানুষ? শুভা রাগ করে বাপের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছিল বলেই শেষে বাধ্য হয়ে সেই উল কিনেছিলেন বাপ।

রেণুকাকে মাঝে মাঝে বেশ কঠিন একটা খোঁচা মেশানো কথার আঘাত পেতে হয়। মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে কি যেন ভাবেন অনন্তবাবু, তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমার দশা তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আমার মতো মানুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হওয়াই ভাল ছিল। খুব ভুল করেছ তুমি।

রেণুকা—আমি ভুল করিনি।

অনন্তবাবু—জানি, তোমার বাবাই ভুল করেছিলেন। একই কথা। কিন্তু তোমার মেয়ের বাবা আর এ ভুল করবে না। খেয়েপরে সুখে থাকবে, এমন ঘর না পেলে মেয়ের বিয়ে দেব না।

ভাল ঘর পেতে হলে ভাল খরচ করতে হবে, এই সার সত্যটিকে খুব ভাল করে বুঝে নিয়েছিলেন অনন্তবাবু। স্মরণ করতেও ভুলে যাননি যে, রেণুকার বাবার পক্ষে টাকা খরচের সামর্থ্য ছিল না বলেই অনন্ত মিত্রের মতো পাত্রের হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়েছিলেন। কাজেই, আশ্চয হবার কিছু নেই। অনন্তবাবুর চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা গর্বের গম্ভীরতা থমথম করে।

মেয়ের বিয়ের কথা মনে করতে গিয়ে মায়ের চোখ ভিজে যায়. বাপের শুকনো চোখ কিন্তু খটখট করে। মেয়ের মা যেমন আগে তেমনি আজও বিশ্বাস করেন, মেয়ের বাপ এই ভদ্রলোকের মনটা সত্যিই লোহা দিয়ে বাঁধানো একটা কঠিন মন। যে মেয়ে এই বাপের কাছে একটি সর্বক্ষণের মায়ার পুতুল, সে মেয়েকে পরের ঘরে পাঠিয়ে শূন্য হয়ে যেতে হবে, সেজন্যে মনের কোণে একটু ব্যথা বেজে ওঠে না। কোনদিনও দেখা গেল না যে, ভদ্রলোকের চোখ দুটো একটু সাঁতসেঁতে হয়েছে।

অনন্তবাবু বরং সেই শুকনো চোখের চাহনি তীব্র করে নিয়ে আরও ভয়ানক একটা খোঁচা-মেশানো কথা রেণুকাকে শুনিয়ে দিয়েছেন।—আমি কাঁদবো কেন? কাঁদবে তুমি, কারণ ভয় তোমার।

—কিসের ভয়?

—শুভা চলে গেলে তোমার বাতের শরীরের খাটুনি আরও বাড়বে, এই ভয়।

—এমন কথা তুমি মুখে আনতে পারলে?

—যা দেখছি তাই বলছি।

—কি দেখছো?

—ওই যে বসন্তদার মেয়েটা এলেই তুমি যেন হাতে স্বর্গ পাও।

হ্যাঁ বসন্তদার মেয়ে চারু। আজ এক বছর ধরে এই মেয়েটাই অনন্ত মিত্রের জীবনের একটা দুঃসহ উৎপাত, একটা আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। অথচ দেখতে পাওয়া

যায়, রেণুকা এই মেয়েটাকে বেশ সহ্য করতে পারছেন। মেয়েটা যখন এ বাড়িতে আসে আর দু'চারদিন থাকে, তখন রেণুকার জীবনটা যেন চমৎকার এক প্রিভি-লেজ লীভের আনন্দে একেবারে অলস হয়ে যায়। রান্না থেকে শুরু করে দু'বেলা বারান্দা ধোওয়া পর্যন্ত সব কাজ এই মেয়েই করে। এমন কি শুভাকেও চুপ করিয়ে বসিয়ে রাখে চারু, কোন কাজ করতে দেয় না।

সে-সময় এই বাড়ির একলামুখী আর আপনমুখী জীবনের নিয়ম-টিয়ম সবই কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যায়। শুভা নয়, ওই চারু মেয়েটাই ব্যস্তভাবে ছুটে এসে বলে—পান নাও কাকা।

অফিসে যাবার সময় চাদরটি কাঁধে ফেলে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন অনন্তবাবু, খুবই তিক্ত অপ্রসন্ন ও বিরক্ত মুখ। একটা পান মুখে দেবার ইচ্ছা থাকলেও সেকথা মুখ খুলে বলতে ইচ্ছেও করে না। বললেই তো ওই মেয়েটা তখুনি ব্যস্ত হয়ে পান সাজতে বসে যাবে। রেণুকা খাটের উপর বসে শুধু তাকিয়ে থাকবে, আর শুভাটা গুণগুণ করে গান গাইবে। অনন্তবাবু একটুও পছন্দ করেন না যে চারু পান হাতে নিয়ে এভাবে ছুটে এসে কাছে দাঁড়ায়।

কে এই বসন্তদা যাঁর মেয়ে চারু? অনন্তবাবুব কাছে বসন্তদা আজ একটা নাম মাত্র। আত্মীয় নন, ঠিক কুটুম্বও বলতে পারা যায় না, সম্পর্কের দিক দিয়ে বসন্তদা যেন একটা ছায়া-কুটুম্ব। শুধু মনে আছে, খুড়তুতো দাদার বিয়েতে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বরযাত্রী হয়ে নদীয়া জেলায় এক গ্রামে যেতে হয়েছিল। সে গ্রামে তিন দিন থাকা হয়েছিল। আর নতুন বউদির এক মাসতুতো দাদার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। তিনিই বসন্তদা। সারা রাত জেগে বসন্তদার সঙ্গে তাস খেলা হয়েছিল। একদিন জাল নিয়ে বসন্তদার সঙ্গে নদীতে মাছ ধরাও হয়েছিল। নৌকার লগি ঠেলেছিলেন বসন্তদা; অনন্ত শুধু জাল ফেলে ফেলে সের দশেক কালবোশ আর ফলুই তুলেছিল। সেই বসন্তদা বলেছিলেন—আমার বিয়েতে নেমন্তন্নের চিঠি দেব অনন্ত; আসতে ভুলে যেও না।

একদিন সেই বসন্তদার বিয়ের চিঠি এসেছিল ঠিকই; কিন্তু বিয়েতে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজ পুরনো দিনের স্মৃতির মাত্র এটুকু বিবরণ স্মরণ করতে পারেন অনন্ত মিত্র। কিন্তু আর কিছুই জানেন না।

সেই বসন্তদা আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর বিয়ের নিমন্ত্রণের সেই চিঠির পর কোথায় ছিলেন, কি করতেন আর কতদিন বেঁচে ছিলেন বসন্তদা, কিছুই জানেন না অনন্ত মিত্তির। কোন দিন জানবার দরকারও হয়নি। চেষ্টা করলে বসন্তদার চেহারাটা আজ স্পষ্ট করে কল্পনা করতেও পারবেন না অনন্তবাবু।

শুভা যে নতুন হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট্‌ শিখেছে, তারজন্য ভাল শোলা চাই। শুভা নিজেই একটা ঠিকানা দিয়েছিল, বরানগরের এক দোকানের ঠিকানা, যেখানে এই শোলা পাওয়া যায়। সেই শোলা কিনতে গিয়েই তো বিপদ হলো।

বরানগরের পথে ছেলেবেলার বন্ধু মাধব সেনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মাধব সেন বললেন—আমাদের পাড়াতে তোমার এক বউদি থাকেন; তিনি প্রাইমারী মেয়ে স্কুলের টিচার।

অনন্তবাবু আশ্চর্য হন—এরকমের কোন বউদি আমার নেই।

—কি আশ্চর্য. উনি যে তোমার নাম করে অনেক কথাই বললেন।

—কি বললেন?

—আমার বাড়ি হেতমপুর শুনে উনি বললেন, ওঁর এক দেবর অনন্ত মিত্তিরও হেতমপুরের মানুষ। তখন বুঝলাম, তুমি ছাড়া হেতমপুরের অনন্ত মিত্তির আর কেই বা হবে?

বিস্ময়ের কথা বটে। তাই মাধব সেনের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বরানগরের বস্তি-গোছের একটা পাড়ার একটি ঘরের দরজার কাছে এসে যাঁকে দেখতে পেলেন ও যাঁর পরিচয় পেলেন অনন্তবাবু, তিনি হলেন বসন্তদার বিধবা স্ত্রী। তিনি বললেন—আমি আপনাদেরই মঙ্গলা বউঠান।

ইচ্ছা ছিল না, তবু বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে দিলেন অনন্তবাবু। মনের দিক থেকে কোন তাগিদ নেই, তবু মুখের কথায় মঙ্গলা বউঠানকে অনুরোধ করলেন—সময় করে আমাদের ওখানে যাবেন একদিন।

মঙ্গলা বউঠান ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দিলেন—চারু এদিকে আয়, কাকাকে প্রণাম কর।

চারু আসে, অনন্তবাবুকে প্রণামও করে। এর পর হয়তো আরও দু'এক মিনিট থাকতেন অনন্তবাবু; কিন্তু আর থাকতে পারলেন না। কারণ, হঠাৎ যে-কথা বলে উঠলেন মঙ্গলা বউঠান, তারপর আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অনন্ত-বাবুর পক্ষে সম্ভব নয়।

মঙ্গলা বউঠান বললেন—এমন কাকা যখন মাথার উপরে আছেন, তখন তোর কোন ভাবনা নেই চারু।—তখুনি একটা দৌড় দিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল অনন্তবাবুর। কিন্তু সামলে গিয়েছিলেন।

বয়স কুড়ি-একুশের কম নয়, দেখতেও ভাল, চারুর মুখের দিকে চোখ পড়তেই ভয় পেয়েছিলেন অনন্তবাবু। কোথাকার কোন্ এক বসন্তদা, যিনি আজ ভবপারে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, তাঁরই মেয়ে এই চারু কেন যে বিধবা মায়ের

জীবনের দুশ্চিন্তা হয়ে উঠেছে, সেটা কি বুঝতে একটুও দেরি হবার কথা? চারুর বিয়ে হয়নি। আর এই মঙ্গলা বউঠানও কী সাংঘাতিক মতলবের মানুষ। এক কথায় পথের একটা মানুষকে মেয়ের কাকা বানিয়ে, সেই মেয়ের জন্যে সব ভাবনার দায় কাকার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন।

শুধু ভয় নয়, বিরক্তিও নয়, বেশ একটু ঘৃণাও বোধ করেছিলেন অনন্তবাবু। আর, কোন কথা না বলে চলেও এসেছিলেন।

কিন্তু পলাইতে পথ নাই, মঙ্গলা বউঠান আছে পিছে। এই মঙ্গলা বউঠান নিজেই চারুকে সঙ্গে নিয়ে অনন্তবাবুর এই বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন আর চলে গিয়েছেন। একদিন রেণুকার হার্টের কষ্ট দেখে নিজেই একটা ব্যবস্থা করে গেলেন মঙ্গলা বউঠান।—চারু কটা দিন এখানেই থাকুক। ঘরের সব কাজ চারুই করবে। তুমি একটুও ভেব না রেণু।

সত্যি কথা, রেণুকার ইচ্ছা ছিল, চারু কটা দিন থাকুক। শুভারও খুব গরজ, চারুদি কটা দিন এবাড়িতে থাকুক।

কাজের সাহায্য হবে, হ্যাঁ, এই সুবুদ্ধির ধারণা রেণুকার মনে অবশ্যই ছিল। আর শুভার মনে এই লোভও ছিল, চারুদি থাকলে যখন-তখন চারুদির গান শোনা যাবে। চারুদির গলা বড় মিষ্টি। চারুদি চমৎকার করে খোঁপা বাঁধবার আর্ট জানে।

এই এক বছরের মধ্যে এই চারু এই বাড়িতে অন্তত দশবার এসেছে। কোন দিনও চিঠি দিয়ে চারুকে কখনও আসতে বলা হয়নি। মেয়েটা নিজেই এসেছে। অনন্তবাবু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন—কি ব্যাপার?

চারু হাসতে থাকে—মা বললে, একবার গিয়ে দেখে আয়, তোর কাকিমা কেমন আছেন।

অনন্তবাবু—দেখলে তো, বেশ ভালই আছেন।

চারু আবার হাসে—না কাকা, কাকিমার হাঁটুতে একটা ব্যথা কনকন করছে ভাল করে হাঁটতে পারছেন না।

—তা তুমি আর কি করবে?

—আমি দুটো দিন থেকে যাই কাকা। শুভারও পরীক্ষার সময়। একা কাকিমা এই হাঁটুর ব্যথা নিয়ে ঘরের কাজ সামলাবেন কি করে?

রেণুকা বুঝতে পারে না, শুভার তো বুঝবার মতো বুদ্ধিই হয়নি যে, মঙ্গলা বউঠান নামে এক মতলবের মহিলা কী ভয়ানক চাল চেলেছেন। কোথাকার কোন্ এক বসন্তদা, তাঁর মেয়ের কাছ থেকে অনন্তবাবুর সংসার উপকার নিতে

গিয়ে কোন্ বিপদে জড়িয়ে পড়ছে, সেটা অনুমান করতে পারেন অনন্তবাবু। এইবার একদিন হঠাৎ এখানে এসে মঙ্গলা বউঠান যখন দাবি করবেন, আমার মেয়ের বিয়ের খরচ দিন, তখন কী হবে?

অনন্তবাবু বলেন—তুমি কেন মিছিমিছি বার বার ছুটে আস চারু, আমাদের সুবিধে-অসুবিধে আমরাই বুঝবো। মঙ্গলা বউঠান তোমাকে এখানে যখন তখন পাঠিয়ে দিয়ে বড়ই অন্যায় করেন।

চারু হাসে—আমিও তো তাই বলি। কিন্তু আমাকে উল্টে ধমকে দিয়ে মা বললে, আপনজনের দরকারের কাজে নিজেই গরজ করে যেতে হয়। পর তো নয় যে চিঠি দিয়ে ডাকবে।

এসব কথার উত্তর দেওয়া অনন্তবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু বুঝতে পারেন, খুবই কঠিন এক বুদ্ধির চক্রান্ত অনন্তবাবুর জীবনের এই সঞ্চয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে।

চারুর সঙ্গে খুব কম কথা বলেন অনন্তবাবু। চারু যখন এবাড়িতে থাকে, আর ঘুরঘুর করে সর্বক্ষণ কাজ করে, তখন সে দৃশ্য দেখতে একটুও ভাল লাগে না। মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙে যায়, জল খাওয়ার জন্য বিছানার ওপর উঠে বসেন তখন ব্যস্ত হয়ে কঠিন একটা ছায়া কাছে এসে কথা বলে—জল খাবে কাকা?

শুভা নয়, চারু এসেছে। অনন্তবাবুর পিপাসাটাও যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে। জল খাওয়ার স্পৃহাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু চারু জল নিয়ে আসে। অনন্তবাবুও জল খান।

চারু যে-কটা দিন এখানে থাকে তখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেই দেখতে পান অনন্তবাবু, ঘরের চেহারা ঝকঝক করছে। আর, বসন্তদার মেয়ে এই চারু উনানে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে বসে আছে।

—কাকিমা কোথায়?

—সুমতি মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন।

—তোমার কাকিমার না হার্টের কষ্ট বেড়েছে?

চারু হাসে—এবেলা ভাল আছেন।

—শুভা কোথায়?

—জয়া এসেছিল, শুভা বোধহয় জয়াদের বাড়িতে গিয়েছে।

অনন্তবাবুর মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহ গর্জন করে উঠতে চায়। কী অদ্ভুত কাণ্ড। কোথাকার এক বসন্তদার মেয়ের কাছে এবাড়ির আত্মাটা নিজেকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে। তাই মা আর মেয়ে দুজনেই বেড়াতে বের

হয়েছেন। জীবনে কারও কাছ থেকে কোন উপকার গ্রহণ করেনি যে মানুষ সে মানুষকে আজ বসন্তদার মেয়ের হাত থেকে চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিতে হবে। মেয়েটাও অদ্ভুত, উনানের ধোঁয়াতে ছোট রান্নাঘরটা ভরে গিয়েছে; তারই মধ্যে বসে আছে। মেয়েটাকে ভয়ানক এক উপকারের তপস্বিনীর মতো দেখাচ্ছে।

মঙ্গলা বউঠানের মতলবের কাছে হার মানবেন, তেমন মূর্খতার মানুষ নন অনন্তবাবু। তাঁর মনটাও নরম কাদা দিয়ে তৈরী কোন তুলতুলে পদার্থ নয়। চারুর জীবনের জন্য ভাবনা করবার কোন দায়িত্ব তাঁর নেই। মঙ্গলা বউঠান বুঝে নিন, তাঁর মেয়ের ভাগ্য কী বলে? বিয়ে হবে কি হবে না?

অনন্তবাবুর কথাতে কিংবা আচরণেও কোন ভুল হয়নি, হয়ও না, হবেও না। বসন্তদার মেয়ে চারুর সঙ্গে ভুলেও একটা হাসির কথা কিংবা মায়ার কথা বলাবলি করেন না অনন্তবাবু। অনন্তবাবু জানেন, মঙ্গলা বউঠান আর তার মেয়ে এই চারু, দুজনেই ধূর্ত দুটি মতলবের প্রাণী, যারা মানুষের মনের কোন দুর্বলতা বা কোমলতার গন্ধ পেলেই পেয়ে বসবে। হয়তো আট হাজার টাকার চার হাজার টাকা এই ছলনার হাত লুঠ করে নিয়ে সরে পড়বে। কোথাকার কোন্ বসন্তদার মেয়ে চারুর বিয়ে হয়ে যাবে, আর নিজের মেয়ে শুভার বড়ঘরে বিয়ের আশাটা ছলনা হয়ে অনন্ত মিত্তিরের সবচেয়ে বড় সুখের স্বপ্নটাকেই ছিন্নভিন্ন করে দেবে!

না, অসম্ভব। অনন্ত মিত্তির পাগল হয়ে গেলেও এমন ভুল করবেন না। এই চমৎকার চতুর কপটতার কাছে ঠকতে পারেন না।

চারুকে দেখতে যেমন ভাল লাগে না, ভাবতেও তেমনি বেশ ঘৃণা বোধ করেন অনন্তবাবু। রেণুকাকে অনেকবার আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে দিতে পেরেছেন অনন্তবাবু—সত্যি কথা এই যে, চারুকে আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি চাই না যে, কোন ছুতো করে চারু এখানে বার বার আসে আর থাকে। তোমরাও একটু সাবধান হও।

অনন্তবাবু নিজেই সবচেয়ে বেশি সাবধান হয়েছেন। শুভার বড়মামা যেদিন চিঠি দিলেন, এইবার প্রস্তুত হলে ভাল হয়, সেদিনই জবাব দিয়ে দিলেন অনন্তবাবু—আমি প্রস্তুত।

যাঁর মুখে কোনদিন হাসি দেখতে পায়নি পাড়ার কোন মানুষ, সেই অনন্তবাবুর সারা মুখ জুড়ে অদ্ভুত এক গর্বের তৃপ্তি হেসে ওঠে। পরম নিশ্চিন্ততার হাসিও বটে। এই হাসিটাই যে অনন্তবাবুর ভাগ্যের চরম লাভ। সব বাধা ব্যাঘাত জয় করতে পেরেছেন। মেয়েকে বড়ঘরে বিয়ে দিতে পারবেন। অনন্ত মিত্তির এইবার এই হাসিমুখ নিয়ে বাকি জীবন পার করে দিতে পারবেন।•

দুই

পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা দেখে আশ্চর্য হয়েছে, একানড়ে অনন্তবাবুর সেই গম্ভীর মুখ আর নেই। অনন্তবাবুর মুখে সব সময় হাসি ফুটে রয়েছে।

শুভার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বড়মামা নিজেই এবাড়িতে এসে বিয়ের সব কাজ চুকিয়ে দিয়েছেন।

পাড়ার মানুষও খুশি হয়ে শুভার বিয়ের প্রীতিভোজ খেয়েছে।

কিন্তু মেয়ের বিয়ের দিনেও একলানন্দ অনন্তবাবুকে পাড়ার ভদ্রলোকের দুটো কথা বলবার সুযোগ পেলেন না। তিনি বাড়ির ভিতরেই ছিলেন। বিনা কাজে একাই ঘুরঘুর করছেন, আর বার বার এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছেন।

রেণুকার চোখ তো সকাল থেকেই ছলছল করেছিল। কিন্তু অনন্তবাবুর চোখে হাসি। অদ্ভুত উজ্জ্বল হাসি। সকলেই বলছেন, খুব ভাল ঘরে শুভাকে দিতে পেরেছেন অনন্তবাবু। অনন্তবাবুর প্রাণের গরব না হেসে থাকতে পারবে কেন?

বিয়ের দিনে মঙ্গলা বউঠান এসেছিলেন। বিয়ের দিনেই চলে গেলেন। কিন্তু চারু থেকে গেল। রেণুকা একটা কথা কতবারই না বললো। —চারু না থাকলে আমার এই ভাঙা শরীরের হাড়গোড় কিছুই আর থাকতো না। উঃ, মেয়েটা দিনরাত কী খাটুনিই না খেটেছে।

কথাটা শুনতে পেয়েছেন অনন্তবাবু কিন্তু তার মনে কোন বিকার নেই। তিনি শুধু একবার জবাব দিতে গিয়ে রেণুকাকে একটি কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন—চারুকে কেউ কি দিব্যি দিয়েছিল যে খাটতে হবে?

ভয়ানক এক গোঁয়ার বুদ্ধিহীনের বাজে কথার মতো এই কথাটা রেণুকার কানে লেগেছে। খুব আশ্চর্য হয়েছেন রেণুকা। বুঝতে পারেন না রেণুকা, চারু মেয়েটার সব কাজের মধ্যেই একটা অপরাধ আবিষ্কার করেন কেন এই ভদ্রলোক।

রেণুকা শুধু বলেন,—কী অদ্ভুত মানুষ তুমি।

অনন্তবাবু বলেন—আমাকে গালমন্দ করো না। শুধু বিশ্বাস কর, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছ।

শুভা যেদিন চলে গেল, সেদিন রেণুকার চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে সুমতির মা নিজেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। কে না জানে, মেয়ে বিদায়ের দৃশ্যটা মেয়ে-মহলের চোখে কান্নাভরা করুণতা না জাগিয়ে পারে না।

কিন্তু মেয়ের বাপের চোখ কি এত শুকনো খটখটে হয়, আর এত হাসি নিয়ে ঝকঝক করতে পারে? লোকে জানে, পারে না। কিন্তু অনন্তবাবুর চোখের দিকে

তাকিয়ে সকলেই বিরল বিস্ময়ের ব্যাপার দেখতে পেয়েছে, সত্যিই অনন্তবাবু হাসছেন। যেন বিজয়ীর গর্বের হাসি। যেন সারা জীবনের সাধনার সফলতার হাসি। শুভার শ্বশুর নতুন গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। সেই গাড়িতে স্বামীর পাশে বসে চলে গেল শুভা। রেণুকাকে একবার একলা পেয়ে কথাটা বলেও নিলেন অনন্তবাবু।—কাঁদবো কেন ? মেয়েকে তো জলে ফেলে দিইনি যে কাঁদতে হবে।

সুকিয়া ষ্ট্রীটের গলিতে একুশ নম্বর বাড়ির অনন্ত মিত্তিরের জীবনে কোন ব্যথা নেই। শুভার তোয়ালেটার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন রেণুকা, কিন্তু অনন্তবাবু বারান্দায় পায়চারী করেন আর গুনগুন করে গান করেন।

শুভা নেই ; কিন্তু চারু এখনও আছে। বিয়ের পর পাঁচটা দিন পার হয়ে গিয়েছে, তবু চারু আছে।

কেন আছে চারু ? নিজেকে প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পান না অনন্তবাবু।

অফিসে যাবার সময় হয়। চারু এসে অনন্তবাবুর হাতের কাছে পানের ডিবে এগিয়ে দেয়। শুভার একটা অভ্যাস ছিল, মাঝে মাঝে মিছরির সরবত তৈরী করে নিয়ে অনন্তবাবুর চায়ের পিপাসাটাকে বাধা দিত।—না, যা গরম পড়েছে, আর চা খেতে পাবে না। সরবত খাও বাবা।

কি আশ্চর্য, কোথাকার কোন্ এক বসন্তদার মেয়ে এই চারুও বলে—এই গরমে আর চা খেওনা কাকা। সরবত খাও।

সরবত খান অনন্তবাবু. কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যান না, তুমি তো এবার বরানগরে চলে যাবে ?

—হ্যাঁ কাকা।

সামান্য একটা কথা ; কিন্তু এই সামান্য কথাটা বলতে গিয়ে চারু যেন মুখ লুকোতে চেষ্টা করে। লজ্জা ? কিসের লজ্জা ? মঙ্গলা বউঠানের মতো ধুরন্ধরা নারীর মেয়ের মুখে এই লজ্জা একটুও মানায় না। পরের বাড়িতে থাকতে যদি কোন লজ্জার বাধা থাকতো, তবে বারবার এখানে এসে ঠাঁই নেবার এত চেষ্টা করতো না।

সেদিন রবিবার, অনন্তবাবু বাড়িতেই ছিলেন। সারা দুপুর ধরে অনন্তবাবুর কামিজের ছেঁড়াগুলিকে সেলাই করেছে চারু। বিকেল যখন হয়েছে, তখন অনন্তবাবুর হাতের কাছে সরবতের গেলাস এনে ধরেছে চারু। সন্ধ্যা যখন হয়েছে, তখন অনন্তবাবুর বিছানার চাদর বদলে দিয়েছে চারু।

রাত্রিবেলা সুজির পায়েস খেতে ভালবাসেন অনন্তবাবু। শুভারই কাজ ছিল, সুজির পায়েসটা শুভা নিজের হাতে তৈরী করতো। রেণুকার হাতে সুজির পায়েস

ভাল হয় না। অনন্তবাবুর রাতের সুজির পায়েস আজও মিথ্যে হয়ে গেল না, যদিও শুভা নেই। চারু খুব ভাল সুজির পায়েস তৈরী করেছে।

মাঝরাতেও সেই একই ব্যাপার। শুভা নেই, তবু অনন্তবাবুকে জল খাওয়াবার জন্যে একটি মেয়ে ঠিক তাঁর বিছানার কাছে উপস্থিত হয়েছে। চারু নাকি? শুধু মৃদুস্বরে একটা প্রশ্ন করেন অনন্তবাবু। চারু বলে—হ্যাঁ, কাকা।

সকাল হয়েছে। অনন্তবাবু জেগেছেন, তবু শুয়ে আছেন। অনন্তবাবু জানেন, শুভা নেই, আজ আর শুভা চা নিয়ে আসবে না। ঠিক তখনই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে চারু।—ওঠো কাকা, মুখ ধুয়ে নিয়ে চা খাও।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে শুধু একটি চুমুক দিয়েছেন অনন্তবাবু, ঠিক তখন চারু আবার ঘরে ঢুকে অনন্তবাবুকে প্রণাম করে—যাই কাকা।

চারুর হাতে একটা ঝোলা। বেশ চমৎকার স্টাইল করে একটা শাড়িকে গায়ে জড়িয়েছে চারু। কি আশ্চর্য! বসন্তদার এই মেয়েকে সত্যিই যে মস্ত এক বড়-লোকের মেয়ের মতো দেখাচ্ছে।

এস, সামান্য একটা কথা। কিন্তু বলতে পারলেন না অনন্তবাবু। বলতে ইচ্ছেও নেই। যাও, কথাটা ভাল শোনায় না বলেই বলতে পারলেন না। অনন্ত-বাবু শুধু বললেন—হুঁ।

চলে গেল চারু।

রেণুকা ঘরে ঢোকেন।—খবরটা বোধহয় জান না?

—কিসের খবর?

—চারু আর এখানে আসতে পারবে না।

—কেন?

—চারুর বিয়ে।

চমকে ওঠেন অনন্তবাবু। রেণুকা বলেন—চারুর মা সেদিন দুঃখ করে অনেক কথা বলে গেলেন।

—কি কথা?

—টাকা পয়সা না থাকলে যা হয়, তাই হয়েছে। চারুকে খুব গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে হচ্ছে। বেশ বয়স্ক ছেলে, দেখতে শুনতে একটুও ভাল নয়, রোজগারও সামান্য। মোট কথা, বেশ অভাবের ঘর। বিয়েতে পাত্রপক্ষের কোন দাবী নেই, এক পয়সাও খরচ নেই; কাজেই রাজি হয়েছেন মঙ্গলা বউঠান।

—এ কি রকমের ব্যাপার হলো? অনন্তবাবুর হাতের পেয়ালা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

—যা হবার ছিল তাই হলো। চারুর জন্যে এর চেয়ে ভাল ঘর পাওয়া যাবেই বা কেমন করে ?

বেশ শান্ত সহজ স্বরে কথাটা বলেই পান মুখে দিলেন রেণুকা। কিন্তু অনন্তবাবুর সারা মুখ জুড়ে একটা যন্ত্রণার জ্বালা লালচে হয়ে ফুটে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠেন অনন্তবাবু—ভাবতে পারিনি, মঙ্গলা বউঠান যে এ-রকম সাংঘাতিক একটা মিথ্যুক।

পেয়ালার চা যেন পেয়ালাভরা গরম বিষ। তখনও ধোঁয়া ছড়াচ্ছে বসন্তদার মেয়ে চারুর হাতের তৈরী সেই চা। পেয়ালাটাকে নামিয়ে রেখে দিয়ে কাঁপতে থাকেন অনন্তবাবু।—এ কি হলো ? চারু তবে এতদিন ধরে মিছি-মিছি এসব কাণ্ড করলো কেন ?

টিপ টিপ করছে অনন্তবাবুর বুকটা! আর মুখটা যেন চাবুকের মার খাওয়া একটা মানুষের মুখ।—কোথায় চারু ? একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ান অনন্তবাবু। জানালার গরাদ শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন। বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকেন, চলে যাচ্ছে বসন্তদার মেয়ে চারু।

—কি হলো ? ডাকবো চারুকে ? রেণুকা জিজ্ঞেস করেন।

—আর ডেকে কি হবে ? অভিমানী ছেলেমানুষের মতো মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকেন অনন্তবাবু।

চারু চলে যাবার পর তুটি ঘণ্টা পার হয়ে যায়, তবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন অনন্তবাবু। রেণুকা এসে কতবার ডাক দিয়ে যান, এদিকে এস, বল তো আবার চা করে দিই।

কিন্তু শুনতে পেয়ে থাকলেও সাড়া দিতে পারেন না অনন্তবাবু। একলাসুখী জগৎটা যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আর ভদ্রলোক নিজেও যেন বধির হয়ে গিয়েছেন।

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে সুমতির বাবা আর মা একসঙ্গে অনন্ত মিত্তিরের বাড়ির এই জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে গেলেন!

সুমতির বাবা বলেন—শত হোক্ মেয়ের বাপ তো বটে। না কেঁদে পারবেন কেন ?

—মেয়েকে তো জলে ফেলে দেননি, বেশ ভাল ঘরেই দিয়েছেন। তবে এত কান্না কেন ?

—কে জানে কেন!